বঙ্গবন্ধু ও রক্তাক্ত বাংলা

—রঞ্জন

বাংলাদেশের নবজন্ম আজ ধ্রুবসত্য। রক্তারুণ দিগ্বলয়ে কাঁপছে উদয়-উষার সূর্য রেখা। বঙ্গোপসাগরের তরঙ্গে যে-নবজন্মের আর্তি, তার দিগন্ত-প্রকম্পিত শব্দমালা আজ বাঙালীর কণ্ঠে। শিশুঘাতী, নারীঘাতী বর্বরতার প্রতিরোধে এমন সম্মিলিত সংগ্রামের ইতিহাস নিজের বুকের রক্তে বাঙালী এমন করে আগে কোনদিন লেখে নি। অহিংস গণ-অসহযোগ থেকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ, সংসদীয় গণতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের দাবী থেকে স্বাধীনতার রক্ত পতাকা উত্তোলন; বিশ শতকের বিশ্ব-রাজনীতিতে এমন ঘটনা অকল্পনীয়, অভাবনীয়। গণ-অসহযোগের স্রষ্টা, সত্যাগ্রহের জনক ভারতের মহাত্মা গান্ধী আজ যদি বেঁচে থাকতেন, তাহলে সবিস্ময়ে হয়তো লক্ষ্য করতেন, এই টেকনোলজি আর টেকনোক্রাসির যুগে, মাওবাদ আর গুয়েভারা-মন্ত্রের জোয়ারের দিনে তার উনিশ শতকী গণ-অসহযোগের কি অমিতবিক্রম সাফল্য, কি বিস্ময়কর রূপান্তর। বাংলাদেশে অসহযোগ থেকে গেরিলাযুদ্ধ—গান্ধী আর গুয়েভারাবাদের যেন অভিনব সহযোগ। এ যেন অহিংস সত্যাগ্রহের আধুনিক ও সশস্ত্র রূপ।

শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। উনিশ শতকী জাতীয়তাবাদী চিন্তায় তিনি বিশ শতকের প্রাগ্রসর মুক্তিচিন্তার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের যোগ ঘটিয়েছেন। বিশ বছর আগেও যিনি ছিলেন ফরিদপুরের গ্রাম থেকে আগত একজন যুব নেতা, আজ তিনি সারা বিশ্বের সচমক বিস্ময় ও শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টির সামনে বাঙালী জাতির জনকে রূপান্তরিত হয়েছেন। সত্তর দশকে ইতিহাস তাঁর জন্য এমন ঈর্ষাযোগ্য আসন সংরক্ষিত রেখেছে, ষাট দশকেও তিনি তা নিশ্চয়ই জানতেন না। আর একথাও হয়তো জানতেন না, ইতিহাস নিজের প্রয়োজনে তার নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনকে উত্তরোল সংগ্রামের পথে টেনে নিয়ে যাবে। তিনি হবেন আন্দোলন নয়, সংগ্রামের নেতা। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা। এদিক থেকে তিনি ইতিহাসের মানস-সন্তান। ইতিহাস তাঁকে তৈরী করেছে। তাই তাঁর নেতৃত্ব ঐতিহাসিক।

দেশে দেশে নেতা অনেকেই জন্মান। কেউ ইতিহাসের একটি পংক্তি, কেউ একটি পাতা, কেউ বা এক অধ্যায়। কিন্তু কেউ আবার সমগ্র ইতিহাস।

শেখ মুজিব এই সমগ্র ইতিহাস। সারা বাংলার ইতিহাস। বাংলার ইতিহাসের পলিমাটিতে তার জন্ম। ধ্বংস, বিভীষিকা, বিরাট বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে সেই পলিমাটিকে সাড়ে সাতকোটী মানুষের চেতনায় শক্ত ও জমাট করে একটি ভূখণ্ডকে শুধু তাদের মানসে নয়, অস্তিত্বের বাস্তবতায় সত্য করে তোলা এক মহা ঐতিহাসিক দায়িত্ব। মুজিব মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে মৃত্যুঞ্জয় নেতার মত এই ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, দায়িত্ব পালন করেছেন। ইতিহাসের সন্তান ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করেছেন। এইখানেই তাঁর নেতৃত্বের ঐতিহাসিকতা।

বাংলাদেশের দেহে রক্ত ঝরেছে অনেক। কয়েক লাখ মানুষের মৃত্যু বিশ্ব-বিবেক বিদীর্ণ করেছে। কোটী শরণার্থীর দুর্দশা বিচলিত করেছে প্রত্যয়ী শান্তিবাদীরও সংযম। তবে একটি জাতির রূপান্তর ও নবজন্মের বিদীর্ণ বেদনাও সেখানে আজ অশ্রুত নয়। বাঙালীর হাতে আজ অস্ত্র। প্রতিরোধ থেকে প্রত্যাঘাতের চেতনায় এমন মূর্ত ঐক্যের বিরাট বিশাল বিস্তার স্বজন-হারানো বেদনাকে স্বদেশের প্রতি পবিত্র ও নিখাদ ভালবাসায় পরিণত করেছে। বাংলার ইতিহাসে শেখ মুজিবের আত্যন্তিক মূল্য এইখানে যে, তিনি এই হারানো স্বাদেশিকতার পুনর্জন্মের প্রতীক। এই স্বাদেশিকতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা তিনি অস্ত্রপ্রয়োগে নয়, অসহযোগের নৈতিক শক্তি দ্বারা করতে চেয়েছেন। বাংলাদেশের বর্তমান বিপ্লব তাই অপরাজেয় নৈতিক শক্তির বিপ্লব। এই শক্তির পরাজয় নেই। অস্ত্রধারণ আত্মরক্ষার জন্যে। আত্মপ্রসারণের জন্য নয়। বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠা তার লোকায়ত শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার হাজার বছরের ঐতিহ্যে। ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার কালো ধোঁয়ায় তার এই লোকায়ত সংস্কৃতি, স্বদেশ ও স্বজনকে বাঙালী বহুযুগের জন্য বিস্মৃত হয়েছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনের আঘাতে সে বিস্মরণের ঘোর কেটেছে চব্বিশ বছরে ধীরে ধীরে। এই কুয়াশা-মুক্তির ইতিহাস নতুন বাংলার ইতিহাস। মুজিবের বাংলার ইতিহাস।

দুই

কোন নেতার জীবনকালে তার নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বগুণের প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়। বলেছেন, অনেক খ্যাতনামা জীবনীকার। তবু নিজের জীবনকালেই কেউ কেউ অত্যাশ্চর্যভাবে কোন দেশ বা তার ইতিহাসের মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন, ভবিষ্যতের সমালোচনা ও মূল্যায়নের পরোয়া না করেই। যেমন,

ভারতের গান্ধী, মিশরের নাসের, ভিয়েৎনামের হো চি মিন, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্ণ, কেনিয়ার জোমো কেনিয়াত্তা, চীনের মাও সে তুং, রাশিয়ার লেনিন এবং আরো কেউ কেউ। আজ বাংলাদেশে মুজিবও তাই, ভবিষ্যতে তার নেতৃত্বের যে-মূল্যায়নই হোক না কেন! নবীন মিশরে অনেক নেতা জন্মেছেন। জগলুল পাশা থেকে নাহাশ পাশা। তারা নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনায় অনুপ্রাণিত করেছেন মিসরবাসীকে। ১৯৫২ সালে মিসরে মধ্যযুগীয় দুর্নীতিগ্রস্ত রাজতন্ত্র উচ্ছেদে নেতৃত্বের আসনে ছিলেন জেনারেল নাজিব। কিন্তু এরা কেউ মিসরের ইতিহাস নন, ইতিহাসের অংশ। কিন্তু ইতিহাস বলতে যাকে বোঝায় তিনি জামাল আবদুল নাসের। মিসর এখন পরিচিত 'নাসেরের মিসর' নামে। নাসের আর মিসর নামটি আজ পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি নামকে আরেক নাম ছাড়া ভাবাই যায় না। অথচ মিসরীয় ইতিহাসের বয়স কয়েক হাজার বছর। আর নাসের মারা গেছেন পঞ্চাশোর্ধ বয়সে। অর্থাৎ অর্ধ শতকের কিছু বেশী সময় যে-মানুষটি বেঁচেছেন, হাজার হাজার বছরের ইতিহাসে সব কিছু ছাপিয়ে তিনি একাই মূর্ত হয়ে উঠেছেন। মিসর একটি ভুইফোঁড় বা নতুন দেশ নয়। তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসও কয়েক হাজার বছরের। মিসর প্রাচীনতম সভ্যতার লীলাভূমি। সেই ফেরাওঁ, নীলনদ ও পিরামিডের দেশের পরিচয় আজ তার পুরনো নামে নয়, নতুন নামে—নাসেরের মিসর।

এটা কেমন করে সম্ভব? একজন ব্যক্তির মধ্যে ইতিহাসের পুনর্জন্ম বা নবজন্ম কি সম্ভব? না কি ইতিহাসের প্রয়োজনেই এই একজন ব্যক্তির জন্ম? নাসেরের মিসর, না মিসরের নাসের? গান্ধীর ভারত, না ভারতের গান্ধী? মুজিবের বাংলা না বাংলার মুজিব? এই প্রশ্নের জবাবও রয়েছে ইতিহাসে। ইতিহাস যে-ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্বের ধাত্রী দেবতা, সেই ব্যক্তিই আবার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোজনা করেন, ইতিহাসকে এগিয়ে দেন নতুন পথের বাঁকে। সুতরাং যে-ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের স্রষ্টা, ইতিহাসই তাকে সৃষ্টি করেছে। ইতিহাস থেকেই তার জন্ম।

স্বয়ম্ভু ব্যক্তিত্বের কোন ঐতিহাসিকতা নেই ইতিহাসে। তা তিনি যতই প্রাণ্ডিত্য ও খ্যাতির অধিকারী হোন না কেন। আবার অনেক অখ্যাত ও অজ্ঞাত জনকে ইতিহাস তার নিজের প্রয়োজনে রূপকথার হাতীর শুঁড় হয়ে তুলে নিয়েছে খ্যাতি ও সমারোহের মঞ্চে। কেবল ইতিহাসের প্রয়োজন পূরণ করে পথের রাখাল হয়েছেন কালের রাখাল রাজা। বিশ বছর আগেও জামাল নাসের এই

নামটি ছিল বিশ্ববাসীর কাছে অপরিচিত। কে জানতো, বিশ বছর আগে যে-তরুণ ছিলেন মিসরের মধ্যযুগীয় রাজা ফারুকের সেকেলে সেনাবাহিনীর একজন কর্নেল, পরবর্তী যুগে হবেন নবীন মিসরের স্রষ্টা? মিসর দেশ হবে তাঁর নামে পরিচিত?

আগেই বলেছি, ব্যক্তি কখনো ইতিহাসের একটি বা একাধিক পঙ্‌ক্তি, পৃষ্ঠা বা অধ্যায় হয়ে ওঠেন, কখনো গোটা ইতিহাস হয়ে ওঠেন। যিনি শুধু জাতির উত্থানে নেতৃত্ব দেন বা পতনে জড়িত থাকেন বা এই উত্থান পতন পর্বেই নিজের ব্যক্তিত্বের সম্প্রসারণ সীমাবদ্ধ রাখেন, তিনি ইতিহাসের এক বা একাধিক অধ্যায়। কিন্তু যিনি জাতির উত্থানে পতনে সুখে দুঃখে মিশে গিয়ে নিজের সুখ, দুঃখ, উত্থান, পতন, জীবন ও মৃত্যুকে এই ইতিহাসের ধারায় সমর্পিত করেন, ইতিহাসের অতীত ও বর্তমানের ঐতিহ্যে স্থিত হন, আবহমান ইতিহাসের স্রোতকে সংগ্রাম ও সাধনায় অধঃপাত থেকে উর্ধ্বমুখী করার চেষ্টা করেন, তিনিই ইতিহাসের মানস-পুত্র, গোটা ইতিহাসের প্রতিভূ, জাতির স্রষ্টা, নব নায়ক। জগলুল-নাহাশ মিসর ইতিহাসের এক একটি অধ্যায়। নাসের গোটা ইতিহাস। নওরোজী, গোখেল, মালব্য, মোহাম্মদ আলী ভারতের ইতিহাসের এক একটি অতি উজ্জ্বল অধ্যায়। গান্ধী সমগ্র ইতিহাস। ফজলুল হক, সোহ্‌রাওয়ার্দী বাংলাদেশের ইতিহাসের খণ্ড খণ্ড অধ্যায়। মুজিব সমগ্র ইতিহাস।

বিশ শতকের মধ্যভাগে মিসর ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নব জাগরণের মধ্যে একটি অত্যাশ্চর্য মিল লক্ষণীয়। মিসর সভ্যতার আদি লীলাভূমি। অন্যদিকে গাঙ্গেয় সমতট বা বাংলাদেশ সে প্রাচীন কালে বিজয়ী বহিরাগত শক্তির কাছে 'পক্ষী' ও 'রাক্ষস' জাতি হিসেবে পরিচিত। যদিও পরবর্তী কালে এই ভ্রম ও বিভ্রান্তি অপনোদনের চেষ্টা হয় নি, তা নয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর এক মুদ্রিত অভিভাষণে বলেছেন, "বাংলার ইতিহাস এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই যে, কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন বাংলা Egypt হইতে প্রাচীন অথবা নুতন। বাংলা Ninevah ও Babylon হইতেও প্রাচীন অথবা নুতন। বাংলা চীন হইতেও প্রাচীন অথবা নুতন। যখন আর্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে পাঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাংলা সভ্য ছিল। আর্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহারা বাঙ্গালীকে ধর্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।"*

*বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীনত্বের দিক থেকে বাংলাদেশ মিসরের সঙ্গে তুলনীয় হোক বা না হোক, পঞ্চ দশকে উভয়েরই নবজাগরণে একটা চরিত্রগত মিল লক্ষণীয়, যদিও এই মিল নব অভ্যুদয়ের পন্থা ও প্রকরণগত নয়।

মধ্যপ্রাচ্যে সমাজতন্ত্রের প্রসার বাংলাদেশের মতই সামন্তস্বার্থ ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বাধা ও বিপত্তির মধ্যে। সামন্তস্বার্থ দু'দেশেই ধর্মান্ধতাকে জিইয়ে রাখতে চেয়েছে। আরব-বিশ্বে জামালুদ্দিন আফ্‌গানীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্যান-ইসলামিজমের প্রাগ্রসর ও বিপ্লবী ভূমিকার মৃত্যু ঘটে। পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ এই মৃত প্যান-ইসলামিজমকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহারের আশায় বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের অভিজাত পাশা, খেদিবদের সহায়তায় গোঁড়া মুসলিম ধর্ম আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতার নীতি গ্রহণ করে এবং জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রী আদর্শের সম্প্রসারণ রোধে চেষ্টিত হয়। পাকিস্তানের জামাতে ইসলামীর মত মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুড বা মুসলিম ভ্রাতৃসজ্ঘ এরূপ একটি প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক সংস্থা। ষষ্ঠ দশকের পাকিস্তানে ক্ষমতার শীর্ষাসন থেকে আইয়ুবকে অপসারণের জন্য সাম্রাজ্যবাদী অর্থ ও সাহায্যপুষ্ট জামাতে ইসলামী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল। তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল, গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা নয়, আইয়ুবকে অপসারণ-পূর্বক ক্ষমতায় অধিকতর ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা। ফলে '৬৫ সালের সেপ্টেম্বর যুদ্ধের আগে আইয়ুব-বিরোধী যে-ব্যাপকভিত্তিক গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল, জামাতে ইসলামী তার অঙ্গদল হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠার চাইতে পরিবার পরিকল্পনা ও বহুবিবাহ রোধের মত প্রগতিশীল সংস্কার আইন রোধের জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। জামাতে ইসলামীর চরম প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকার ফলে এই গণতান্ত্রিক ঐক্য ভেঙে যায়। সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পর শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাংলাদেশের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং বাঙালীর পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার-ভিত্তিক ছয় দফা প্রস্তাব প্রণয়ন করেন, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত স্বার্থের প্রতিভূ জামাতে ইসলামী আইয়ুবের ফ্যাসিস্ট সামরিক জান্টার চাইতেও উচ্চকণ্ঠে ছয় দফার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। মিসরে প্রেসিডেন্ট নাসেরের ক্ষমতালাভের আগে ও পরে মুসলিম ব্রাদারহুডের ভূমিকাও জামাতে ইসলামীর অনুরূপ। মুসলিম ব্রাদারহুড্ রাজা ফারুকের অপসারণ চেয়েছে সেখানে ধর্মান্ধ ও মধ্যযুগীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য; কোন প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রসার বা গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তা-

বাদী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য নয়। ফলে প্রেসিডেন্ট নাসের ক্ষমতাসীন হয়ে যখন মধ্যযুগীয় মুসলিম জাতীয়তার বদলে সমাজতন্ত্রী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত আরব জাতীয়তাবাদকে তার বিপ্লবের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন, তখন মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা সৈয়দ কুতুব-নামক এক ব্যক্তি নাসের-বিরোধিতায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। (কতুবের নাসের-বিরোধিতার সঙ্গে জামাত নেতা মোল্লা মৌদুদীর মুজিব-বিরোধিতার সাদৃশ্য লক্ষণীয়।) ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ইজরায়েলের সঙ্গে মিসরের যুদ্ধের সময়েও মুসলিম ব্রাদারহুড্ নাসেরের পতন ঘটানোর সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে যোগ দেয় এবং নাসেরকে ইসলাম-বিরোধী প্রমাণের জন্য সারা মধ্যপ্রাচ্যে প্রচারণার ঝড় সৃষ্টি করে। নাসের অবশ্য মৃত্যুর আগেই অত্যন্ত শক্ত হাতে এই দলটিকে দমন করেন।

বাংলাদেশের রাজনীতি বিশেষ করে এই রাজনীতিতে শেখ মুজিবের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে মিসরীয় রাজনীতি এবং তাতে প্রেসিডেন্ট নাসেরের ভূমিকা এ জন্যেই স্মর্তব্য যে, মিসর এবং বাংলাদেশের ভৌগোলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার সংগ্রামী অভ্যুত্থানের প্রায় অভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এতদিন ধরে যাঁরা বলে আসছেন ধনতন্ত্রের অবক্ষয়ের যুগে ভৌগোলিক জাতীয়তার ভূমিকাও নিঃশেষিত প্রায় এবং এটা সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকতার যুগ, মিসর এবং বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। পঞ্চাশ দশকের শুরুতেই পশ্চাৎমুখী ধর্মীয় জাতীয়তায় নিগড় ভেঙে মিসরে আরব জাতীয়তাবাদের নবজন্মের মত বাংলাদেশে বাঙালী জাতীয়তাবাদের নবজন্ম লক্ষণীয়। নাসেরের মধ্যে চরিতার্থ হয়েছে আরব জাতির—বিশেষ করে মিসরবাসীর কয়েক শতাব্দীর পুনর্জাগরণের স্বপ্ন। তাই তিনি মিসরের ইতিহাস। মিসর আজ নাসেরের নামে খ্যাত। অন্যদিকে বাংলাদেশের কয়েক শতাব্দীর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জাগরণের স্বপ্ন চরিতার্থতা খুঁজেছে শেখ মুজিবের মধ্যে। তাই মুজিব আজ বাংলার ইতিহাস। বাংলাদেশ আজ মুজিবের নামে পরিচিত।

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক খ্যাতি শুরু পঞ্চ দশকের সূচনায়। একই সময়ে নাসেরের ক্ষমতারোহণ। নাসেরের রাজনীতির যাদুমন্ত্র আরব জাতীয়তাবাদ। মুজিবের রাজনীতির যাদুমন্ত্র বাঙালী জাতীয়তাবাদ। দু'জনেই ধর্মের মধ্যযুগীয় জীর্ণ অতীতের খোলস ভেঙেছেন। নাসের ফেরাওঁ আর পিরামিডের মিসরকে জাগাতে চেয়েছেন। মুজিব চেয়েছেন ঈশা খাঁ, তিতুমীর, সূর্য সেন আর ক্ষুদিরামের বাংলাকে জাগাতে। নাসেরকে যুদ্ধ করতে হয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল

সামন্তস্বার্থ, পশ্চাৎমুখী ধর্মান্ধতা ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের বিরুদ্ধে। মুজিবও ধর্মান্ধতা, প্রতিক্রিয়াশীল সামন্তস্বার্থ, এই সামন্তস্বার্থের পৃষ্ঠপোষক পশ্চিম পাকিস্তানের উদীয়মান ধনবাদী স্বার্থ এবং তার পৃষ্ঠপোষক ডলার সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য হয়েছেন। নাসের তাঁর জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে এশিয়ার সর্ববৃহৎ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হন নি। বরং সিরীয় কম্যুনিস্ট নেতা খালেদ বাগদাস পিকিংয়ের সভামঞ্চ থেকে প্রকাশ্যে নিন্দা করেছেন নাসেরের। তেমনি মুজিবও তাঁর দেশের জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে গেরিলা মুক্তিযুদ্ধের প্রবর্তক এশীয় কম্যুনিস্ট দেশটির সহানুভূতি অর্জনে সক্ষম হন নি। বরং বিরূপ সমালোচনা ও বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছেন। ব্যক্তি-চরিত্রের দিক থেকেও প্রায় একই বয়সী নাসের ও মুজিব প্রায় অভিন্ন। দু'জনেই আত্মপ্রত্যয়ী ও সাহসী। কিন্তু তাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা, মানস গঠন ও লক্ষ্য এক নয়। মুজিবের রাজনৈতিক চরিত্র গঠনের পটভূমিতে রয়েছে গোখেল, নওরোজি, গান্ধী, দেশবন্ধুর রাজনীতির নিয়মতান্ত্রিক প্রভাব। নাসেরের রাজনৈতিক শিক্ষার পটভূমিতে রয়েছে অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থানের সশস্ত্র সংঘর্ষের কৌশল। নাসের সামরিক কৌশলে বিশ্বাসী। মুজিব গণতন্ত্রতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী। নাসেরের আরব জাতীয়তাবাদ সম্প্রসারণবাদী। মুজিবের বাঙালী জাতীয়তাবাদ আত্মপ্রতিষ্ঠাবাদী। নাসেরের আন্দোলন সশস্ত্র। তাই তিনি আঘাতকারী ও সহসা বিজয়ী। মুজিবের আন্দোলন নিরস্ত্র। তাই তিনি অসহযোগী এবং বার বার নির্যাতিত। নাসের মিসরের নেপোলিয়ন (যদিও তাঁর শেষ পরিণতি নেপোলিয়নের মত নয়), মুজিব বাংলাদেশের গান্ধী (যদিও তার অসহযোগ গান্ধীর অহিংসার পরিধিতে আবদ্ধ থাকে নি)।

তিন

'লেনিন বাংলাদেশে জন্মালে রামকৃষ্ণ হতেন,' বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ু আর ভাববাদী মানসিকতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এটা সম্ভবতঃ একটা শ্লেষোক্তি। গান্ধীজীর নিরস্ত্র ও অহিংস কর্মযোগ তাই বাংলাদেশেই সর্বাধিক জনপ্রিয় হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ সাবেক অখণ্ড বাংলাদেশেই প্রথম সুভাষবাদী সশস্ত্র বিপ্লবের তরঙ্গে আবর্তিত হয়। বাংলাদেশের চল্লিশ দশক তাই নিরস্ত্র গণ-অসহযোগ ও সশস্ত্র বিপ্লবের প্রবল ঘূর্ণনে আবর্তিত ও অস্থিরচিত্ত। একদিকে গান্ধীজীর দেশ ছাড়ো

(কুইট্ ইণ্ডিয়া) অন্যদিকে সুভাষের 'Give me blood and I will give you freedom', অভী মন্ত্র বাঙালী মানসে রীতিমত ঝড় সৃষ্টি করেছে। এই ঝড়ের রাজনীতির যুগে মুজিব অতি তরুণ রাজনীতিবিদ। গান্ধীজীর অসহযোগের শক্তি তিনি দেখেছেন। সুভাষের বিপ্লবী ভাবধারা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। চল্লিশের বাংলার দ্বন্দ্বমূলক রাজনীতির কর্মধারার যোগসমষ্টি তাই সপ্ত দশকের শেখ মুজিব। আদর্শে তিনি অসহযোগী। তার প্রয়োগে তিনি বিপ্লবী। সত্যাগ্রহ থেকে অসহযোগ, অসহযোগ থেকে সশস্ত্র বিপ্লব। এটাকে গান্ধীবাদের স্বাভাবিক বিবর্তন বলে হয়তো অনেক গান্ধীবাদীই স্বীকার করতে চাইবেন না। কিন্তু এটা কি গান্ধীবাদের অনিবার্য রূপান্তর নয় ?

মুজিব-মানসে গান্ধীবাদ ও সুভাষবাদের দ্বন্দ্বও অতি স্পষ্ট। নিজের রাজনৈতিক সংগঠন তৈরীর ক্ষেত্রে মুজিব সুভাষবাদী, কিন্তু এই সংগঠনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আন্দোলন পরিচালনাকালে মুজিব গান্ধীবাদী। দৃশ্যতঃ মুজিব বাংলাদেশের সুভাষ। কিন্তু তাঁর রাজনীতিতে গান্ধীবাদের প্রভাব অনেক বেশী স্পষ্ট। বেয়াল্লিশ সালে গান্ধী বৃটিশদের বিরুদ্ধে 'কুইট্ ইণ্ডিয়া' আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। প্রায় একই সময়ে সুভাষ বৃটিশদের ভারত থেকে তাড়াবার জন্য নিজে দেশত্যাগ করেছেন এবং আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠন করে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই দু'টি আন্দোলনের লক্ষ্য এক, কিন্তু ধারা ছিল সমান্তরাল। পরস্পরের সঙ্গে তারা যুক্ত হয় নি কোনদিন। গান্ধী আন্দোলনের পর জেল থেকে বেরিয়ে বৃটিশদের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনায় বসেছেন। সুভাষ জাপানের সহযোগিতায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রধারণের অভিযোগ মাথায় নিয়ে রাজনৈতিক জীবন, এমন কি ইহজীবন থেকে নিরুদ্দিষ্ট হয়েছেন। বিস্ময়ের কথা এই যে, শেখ মুজিবও '৬৭ ও '৭১ সালে বিদেশের (ভারত) সহযোগিতায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অস্ত্রধারণের চক্রান্তের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন, কিন্তু তিনি সুযোগ পেয়েও দেশত্যাগ করেন নি, বরং গান্ধীজীর মত মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে কারাবরণ করেছেন। বাংলাদেশে-যে অমিতবিক্রম অসহযোগের তিনি জন্মদাতা, আজ তাই সশস্ত্র প্রতিরোধ (মুক্তিযুদ্ধ) সংগ্রামে রূপান্তরিত। এই সংগ্রামের নেতৃত্বও তাঁর হাতে। বেয়াল্লিশে ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধে যে-দু'টি আন্দোলনের ধারা ছিল সমান্তরাল, একাত্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে তা আজ পরস্পরযুক্ত। এটা হয়তো বিস্ময়কর, সঙ্গে সঙ্গে হয়তো বা ইতিহাসের অগ্রযাত্রার অনিবার্য

পরিণতি। ব্যক্তিচরিত্রে ও আদর্শে মুজিব অসহযোগী তাই তিনি কারাবরণ করেছেন। কিন্তু তাঁর রাজনীতির সুভাষবাদী পদ্ধতি আওয়ামী লীগকে বৈপ্লবিক মুক্তিযুদ্ধের পতাকা বহনে বাধ্য করেছে। বিশ শতকের এই শেষ পর্যায়ে জাতীয়তাবাদ উনবিংশ শতাব্দীর মৃত ধারণার ফসিল, তার সংগ্রামী ভূমিকার যুগ পচা অতীত, গান্ধীর অসহযোগবাদ খৃষ্টীয় অহিংস পলায়নবাদী (এস্কেপিজম) দর্শনের অষ্টাদশ শতকী অনগ্রসর তত্ত্ব বলে যাঁরা এতকাল থিয়োরি আউড়েছেন, বাংলাদেশের বর্তমান সংগ্রামী জাতীয়তার ইতিহাস নিশ্চয়ই তাঁদের জন্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার কাজ করবে। তত্ত্ব বা থিয়োরির একদেশ-দর্শিতা বা কূপমণ্ডুকতা দ্বারা-যে ইতিহাসের গতি বা লক্ষ্য নির্ণয় হয় না, এই সত্য বারবার প্রমাণিত হওয়া-সত্ত্বেও কখনো ধর্মবাণী, কখনো তত্ত্ববাণী ইতিহাস-বিচারে নিজের প্রবল পাণ্ডিত্যের বিজয় ঘোষণা করতে চেয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের যাত্রাপথে ধ্রুব সত্য বলে কিছু প্রমাণিত হয় নি।

শেখ মুজিবুর রহমান একজন সাধারণ বাঙালী নেতা। তাঁর পুঁথিগত শিক্ষা- ও মনীষা-সম্পর্কে উচ্চকণ্ঠ হওয়ার কিছু নেই। তাঁর নেতৃত্বের ও ব্যক্তিত্বের ভবিষ্যৎ মূল্যায়নের ব্যাপারেও অনেক রাজনৈতিক পণ্ডিত এখনো স্থিরনিশ্চয় নন। কিন্তু এই সাধারণ মানুষটিই আজ অসাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে সারা বিশ্বে চমক সৃষ্টি করেছেন। বাংলাদেশের বাউল গায়ক থেকে লণ্ডন, নিউইয়র্কের বিট্‌ল্ গায়কের কণ্ঠে আজ যে-বাংলাদেশের গান, তা মুজিবের বাংলার গান। মুজিব আজ শুধু বাংলার ইতিহাস নন, বাংলার মানচিত্র। বাংলাদেশ থেকে মুজিবকে, মুজিবকে বাংলাদেশ থেকে আলাদা করে ভাবা আজ অসম্ভব। সামরিক শক্তি বলে নাসের যা করেছেন, সুভাষ যা করতে চেয়েছেন, মুজিব করেছেন অসহযোগের শক্তি বলে। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আজ মুজিবের নেতৃত্বে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। অসহযোগের এমন ঐতিহাসিক রূপান্তর, এই শতকেই নতুন রাজনৈতিক দর্শনে রূপান্তরিত হবে না, তাই বা কে বলতে পারে ?

অহিংসা প্রাচ্যের প্রাচীন ধর্ম দর্শন। খৃস্টান ও বৌদ্ধধর্মের মূল দর্শন অহিংসা। ইসলামেরও মূল কথা শান্তি তথা অহিংসা। হিন্দু ধর্মেরও মূল কথা আত্মদমন, দান, দয়া—মূলত অহিংসা। অহিংসাকে কার্যকর রাজনৈতিক দর্শনে পরিণত করেন মহাত্মা গান্ধী। সশস্ত্র অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র অত্যাচারিতের অহিংস অসহযোগের চাইতে বড় প্রতিরোধ আর কিছু নেই—এই রাজনৈতিক

দর্শন দ্বারা গান্ধীজী সারা ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছেন। ভারতের রক্তপাতহীন স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করতে চেয়েছেন। গান্ধীজী যখন এই অহিংস অসহযোগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন, তখন 'বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না'। বৃটেন তখন বিশ্বের পয়লা নম্বরের সাম্রাজ্য শক্তি। এর বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ও অসামরিক ভারতীয়দের সশস্ত্র স্বাধীনতার যুদ্ধ সহজ ছিল না। গান্ধীজী তাই বৃটিশ শাসনের দু'টি মূল ভিত্তিকে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। এর একটি অর্থনৈতিক শোষণ এবং অন্যটি রাজনৈতিক শাসন। এই শাসনের ভিত্তি দুর্বল করার জন্য তিনি বৃটিশ পণ্য বর্জন (অহিংস অর্থনৈতিক অসহযোগ) এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আইন অমান্য তথা সত্যাগ্রহের (রাজনৈতিক অসহযোগ) কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। গান্ধীজী এই ধর্মনিরপেক্ষ গণ-অসহযোগ আন্দোলনের পতাকাতলে সারা ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যে-ঐক্য ও অসহযোগের শক্তির সামনে মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড ও আরউইনের মত জঁাদরেল বৃটিশ শাসকেরাও মাথা নত করেছেন। বিপ্লবের ব্যর্থতায় প্রতিক্রিয়া হয় সুদূরপ্রসারী। গান্ধীজী তাই সশস্ত্র বিপ্লবের চাইতে নিরস্ত্র ও ঐক্যবদ্ধ গণ-অসহযোগের প্রতিরোধ দ্বারা শাসন সংস্কারের বিবর্তনের ধারায় স্বাধীনতার শেষ সোপানে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন। ভারতবর্ষের বহু বিচিত্র ধর্ম ও জাতি সংস্কৃতিকে একই রাজনৈতিক লক্ষ্যের সূত্রে তিনি গ্রথিত করতে পেরেছিলেন এই গণ-অসহযোগের শক্তিতে। কিন্তু এই রাজনৈতিক ঐক্যকে তিনি স্থায়িত্ব দান করতে পারেন নি, শাসকদের বিভেদ-নীতির প্রাবল্যে। বাস্তবতাবোধের চাইতে নীতিবোধ যখন বড় হয়ে ওঠে, তখন নীতিরও অপমৃত্যু ঘটে। অহিংসাকে নীতি হিসেবে বাঁচাতে গিয়ে গান্ধীজী ভারতের রাজনৈতিক সমস্যার সাম্প্রদায়িক সমাধান মেনে নিয়ে না পারলেন অহিংসাকে বাঁচাতে, না পারলেন নিজে বাঁচতে। বিপ্লবের রক্তক্ষয় এড়াতে গিয়ে ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের রক্তপাত অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। আর সেই অশুভ ও অপবিত্র হিংসার প্রকাশ্য বলি হলেন মহাত্মা নিজে ভারত স্বাধীন হওয়ার দ্বিতীয় বছরেই।

বৃটিশ-শাসিত ভারত আর পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাবীদের দ্বারা শাসিত বাংলাদেশের মধ্যে পার্থক্য ছিল এইটুকু যে, ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বৃটিশ জাতি উন্নত ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী, অন্য পক্ষে বিংশ শতকের পঞ্চাশ, ষাট ও সত্তর দশকের পাঞ্জাবী শাসকেরা অনুন্নত রুচি ও চিন্তার অধিকারী এবং বলপ্রয়োগে শাসনের ফ্যাসিবাদী নীতিতে আস্থাশীল।

শাসক হিসেবে গান্ধীজী যাদের সম্মুখীন হয়েছেন বা যে-রাজনৈতিক শাসন-কাঠামোর মধ্যে তিনি তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের চরিত্র নির্মাণ করেছেন, পাঞ্জাবী-শাসিত বাংলাদেশে মুজিব তা পান নি। শাসক হিসেবে মুজিব যাদের পেয়েছেন তারা নীতিজ্ঞান-বর্জিত নিকৃষ্ট অত্যাচারী এবং তাদের রাজনৈতিক শাসন-কাঠামো ষোড়শ শতকের ডাচ ও পর্তুগীজ উপনিবেশের প্যাটার্নের। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বছরের মধ্যে পুলিশের বেতন-বৃদ্ধির আন্দোলন দমনের জন্য বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের তদানীন্তন পূর্বাঞ্চলীয় পাঞ্জাবী সেনাপতি (জি. ও. সি.) আইয়ুব তাঁর সেনাবাহিনীকে পবিত্র রমজান মাসের পয়লা তারিখে বিক্ষুব্ধ পুলিশের উপর গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেন। বৃটিশ শাসনের সূচনায় ঢাকার যে-ঐতিহাসিক লালবাগ বিদ্রোহী দেশীয় সেপাইদের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সূচনায় সেই লালবাগ নিরস্ত্র বাঙালী পুলিশের রক্তে লাল হয়েছে। জিন্না পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনে প্রতিশ্রুত ছিলেন। কিন্তু নিজেকে নিজে গভর্নর জেনারেল পদে মনোনীত করার পরই তিনি পার্লামেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বদলে বৃটিশ প্রবর্তিত ভারত শাসন আইনের ঔপনিবেশিক চরিত্রের সুযোগ গ্রহণপূর্বক নিজেকে রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান থেকে স্বেচ্ছাচারী শাসন-কর্তায় রূপান্তর করেন এবং নিজের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি পার্লামেণ্ট এবং রাষ্ট্রের সংখ্যাগুরু অংশ বাঙালীদের মতামতের তোয়াক্কা না করে ঘোষণা করেন, 'উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে'। দক্ষিণ আফ্রিকার ভেরউড কিংবা রোডেশিয়ার আয়ান স্মিথ যে-দম্ভ ও ঔদ্ধত্য নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ অশ্বেতাঙ্গ জাতির প্রতি অবিচার ও পীড়ন চালান, জিন্না তার চাইতেও ঔদ্ধত্য ও অসহিষ্ণু মনোভাব নিয়ে পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীদের চিরকালের জন্য দাস জাতিতে পরিণত করে রাখতে চেয়েছেন। শুধু বাঙালীদের প্রতি নয়, পাঠান, বেলুচ ও সিন্ধী জাতির প্রতি তিনি একই মনোভাব ও ব্যবহার দেখিয়েছেন। সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ্ফার খানের ভাষায়, "যে-খেলা আজ বাংলাদেশের সঙ্গে হচ্ছে, তা একদিন পাকিস্তানের জন্মলগ্নে আমাদের—অর্থাৎ পাঠানদের সাথে হয়েছিল। সীমান্ত প্রদেশের আইনসভায় আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। ৫০ জনের মধ্যে আমরা ছিলাম ৩৩ জন। মুসলিম লীগের সভ্যসংখ্যা ছিল ১৭। জিন্না সাহেব নিজের খেয়ালখুশিমত আইনসভা ভেঙে দেন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলিম লীগকে আহ্বান জানান মন্ত্রিসভা গঠনে। বান্নু যাওয়ার পথে আমাকে আটক করা হয়।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তৈরী করা হয় যে, ৫ লাখ টাকা সাহায্য দেওয়ার জন্য আমি ইপির ফকিরের সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছিলাম। এ ছাড়া আমি বিশ্বাস-ঘাতক এবং হিন্দুর দালাল ইত্যাদি নানা অভিযোগ। আটক ব্যক্তিদের সমর্থনে যখন বাবারুহের অধিবাসিগণ শুক্রবারের জুম্মার নামাজে সমবেত হয়েছিলেন, তখন তাদের উপর নির্বিচারে বোমা বর্ষণ ও মেশিনগানের গুলি চালান হয়। ফলে অসংখ্য শিশু, মহিলা ও পুরুষ হতাহত হয়। সারা সীমান্ত প্রদেশ জুড়ে মারধোর ও অপমানজনক ব্যবহার চলতে থাকে। হাজার হাজার খুদাই খিদমতগার কর্মীকে জেলে রাখা হয়। ওরা খুদাই খিদমতগার আন্দোলন নিষিদ্ধ করে দেন এবং আমাদের সংবাদপত্র 'পুস্তন' বন্ধ করে দেওয়া হয়। আমরা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে বলতে চাই যে, এখনও সীমান্তে বর্বরতা সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। আমরা একটা ছোট প্রদেশের নির্বাচনে জয়ী হয়েছিলাম। কিন্তু বাংলাদেশ সারা পাকিস্তানের নির্বাচনে জয়লাভ করেছিল। এখন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যে, বাংলাদেশ পাকিস্তান ভাঙতে চায় এবং আওয়ামী লীগের ছ'দফা পাকিস্তানের অখণ্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক।"*

সীমান্তের পাঠানদের যে-বর্বর উপায়ে দমন করা হয়েছে, ঠিক সেই একই উপায়ে দমন করা হয়েছে বালুচ জাতিকে এবং তাদের রাজনৈতিক অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষাকে। সীমান্তে জুম্মার নামাজের জামাতে গুলিবর্ষণ করা হয়েছে আর বেলুচিস্তানে বোমা বর্ষণ করা হয়েছে ঈদের জামাতে। বাংলাদেশে এই রক্তপাতই কখনো সীমিত ভাবে, কখনো ব্যাপক ভাবে বার বার হয়েছে। ১৯৪৮ সালে পুলিশের ধর্মঘট ভাঙার জন্য ঢাকার লালবাগে গুলিবর্ষণের কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৯৫২ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি তারিখে বাংলাদেশের তদানীন্তন পাঞ্জাবী চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদের নির্দেশে আবার চলে ভাষা আন্দোলন দমনের জন্য গুলিবর্ষণ। এই গুলিবর্ষণে নিহতদের লাশগুলো রাতারাতি সরিয়ে ফেলা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের বুকে সঙীন উঁচিয়ে ধরে সৈন্যবাহিনী বিশ্ববিদ্যালয়ে ও আবাসিক হলগুলোতে প্রবেশ করে ও যথেচ্ছ অত্যাচার চালায়। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার পর আবার বাংলাদেশের শহরে বন্দরে প্রতিটি প্রধান রাজপথে পাঞ্জাবী ও

---

* বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার বর্বর অত্যাচার শুরু হওয়ার পর এপ্রিল মাসে কাবুল থেকে প্রচারিত বিবৃতি।

বালুচ রেজিমেণ্ট মোতায়েন করা হয়। ১৯৫৫ সালে বাংলাদেশে নিযুক্ত পাঞ্জাবী চীফ সেক্রেটারি এন. এম. খাঁ ভাষা আন্দোলন দমনের জন্য আবার শক্তি প্রয়োগের হুকুম দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের ছাত্রদের উপর নির্মম অত্যাচার চালানো হয়। এই অত্যাচার থেকে ছাত্রীরাও রেহাই পায় নি। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তন এবং ১৯৬১ ও ৬২ সালে আবার ঢাকায় সৈন্যবাহিনীর গুলিতে নিরস্ত্র ছাত্র শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের অনেকের আত্মদান। ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন তারিখে শেখ মুজিবের মুক্তি ও ছয় দফা দাবী দিবসে আবার সৈন্যবাহিনী নিয়োগ এবং ঢাকার নাখালপাড়া, তেজগাঁয় দক্ষিণ আফ্রিকার শার্পভিল হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি। ১৯৬৮ সালের গণ-অভ্যুত্থানের সময় বাংলাদেশে অঘোষিত যুদ্ধাবস্থা, ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে সারা বাংলাদেশ জুড়ে সৈন্যবাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা। মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে নিরস্ত্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চীনা ও মার্কিন অস্ত্রে সজ্জিত পাঁচ ডিভিশন আধুনিক পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাদলের যুদ্ধ শুরু এবং নিরস্ত্র গণ-প্রতিরোধ ভাঙার কাজে ট্যাঙ্ক বিমান ও গানবোট ব্যবহার।

এখন প্রশ্ন, এই তুলনাহীন সশস্ত্র বর্বরতার বিরুদ্ধে অহিংস গণ-অসহযোগ আন্দোলন কি তার প্রথাসিদ্ধ পুরনো কায়দায় সার্থক প্রতিরোধ ব্যবস্থা? ১৯৪২ সালে যুদ্ধরত বৃটিশ জাতির অত্যন্ত বিব্রত অবস্থায় গান্ধীজী যখন কুইট্ ইণ্ডিয়া আন্দোলন শুরু করেন এবং কাঁথি, তমলুক ও মেদিনীপুরের কোন কোন অঞ্চলে যখন বিদ্রোহী স্বাধীন ভারত সরকারের প্রশাসন পর্যন্ত স্থাপিত হয়, তখন এই আন্দোলন দমনের জন্য বৃটিশ সরকার কামান, ট্যাঙ্ক ও বিমান শক্তি ব্যবহার শুরু করলে, শিশু-নারী-নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে হত্যা করা শুরু করলে গান্ধীজী কি করতেন? তাঁর অহিংস অসহযোগের নৈতিক জয়কে অবধারিত করা এবং পাশবিকতার বিরুদ্ধে মানবতার জয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি কি সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে তাঁর আশীর্বাদ জানাতে সম্মত হতেন না? আমাদের ধারণা, তিনি সম্মত হতেন। তার প্রমাণ, গান্ধীজীর জীবনাদর্শের দু'জন অকৃত্রিম অনুসারী সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ্ফার খান এবং আচার্য বিনোবা ভাবে-কর্তৃক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অকুণ্ঠ সমর্থন দান। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের শক্তি-প্রয়োগের নীতিকে তাঁরা নিন্দা করেন নি। বরং বর্বর পাশবিকতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগের মানবিকতার নীতিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বস্তুত এই মানবিকতার মধ্যেই অহিংস গণ-অসহযোগের প্রকৃত মূলমন্ত্র ও সত্য নিহিত।

চার

আমাদের বিশ্বাস, গান্ধীজী আজ বেঁচে থাকলে বাংলাদেশে গণ-অসহযোগের পূর্ণ সাফল্য এবং তাকে মুক্তিযুদ্ধে রূপান্তরিত হতে দেখে আনন্দিত হতেন এবং শেখ মুজিবকে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ অসহযোগী ও সত্যাগ্রহী রূপে আশীর্বাদ জানাতেন। ভারতে গান্ধীজীর জীবিতাবস্থায় অসহযোগের যে-পূর্ণ প্রয়োগ ঘটে নি, তা ঘটেছে শেখ মুজিবের বাংলাদেশে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি থেকে প্রশাসন ব্যবস্থার ছোট-বড় সবাই—এমন কি সুদূর গ্রামাঞ্চলের পর্ণকুটিরের একজন দীনমজুর পর্যন্ত শেখ মুজিবের অসহযোগের নির্দেশে যেভাবে সাড়া দিয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে খণ্ড বিখণ্ড শ্রেণীশত্রুতা নয়, যে-পরিপূর্ণ শ্রেণী-ঐক্য ও জাতীয় ঐক্য প্রয়োজন, বাংলাদেশে এবার তার পূর্ণ সাফল্য লক্ষ করা গেছে। এই ঐক্যের ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তা, সত্যাগ্রহ ও গণ-অসহযোগ। জাতীয় স্বাধীনতার শত্রু এবং জাতীয় জীবনের প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে বাংলাদেশে শ্রেণী-, ধর্ম-, বর্ণ-নির্বিশেষে এই জাতীয় ঐক্যের অমোঘ বর্ম তৈরী করেছেন শেখ মুজিব। ইতিহাসে তাঁর নেতৃত্বের এইখানেই অসাধারণ বৈশিষ্ট্য। শোষক ও শাসক-শক্তি তার প্রাণ-হননের চেষ্টায় সতত ব্যস্ত। বাম থেকে অভিযোগ উঠেছে, মুজিব সুবিধাবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল। ডান থেকে আঘাত এসেছে দেশদ্রোহিতা, উগ্র ও চরমনীতির অনুসারী প্রভৃতি অভিযোগের ছদ্মাবরণে। কিন্তু বাইরের ও ভেতরের শত আঘাতে মুজিব বিচ্যুত হন নি তাঁর লক্ষ্য থেকে। এই লক্ষ্য বাঙালীর মুক্তি, বাংলার মর্যাদা ও হারানো অধিকার প্রতিষ্ঠা। তাঁর পরিচয়, তিনি ডানপন্থী নন, বামপন্থী নন, এমন কি মধ্যপন্থীও নন, বরং এ-যুগের একজন শ্রেষ্ঠ জাতীয়তাবাদী, আধুনিক সত্যাগ্রহী।

সত্যাগ্রহী কথাটার সঙ্গে আমরা আধুনিক বিশেষণের যোগ এইজন্যই করলাম যে, বর্তমানের দ্রুত বিবর্তনের যুগে সব আদর্শ ও তত্ত্বেরই দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। যার প্রাণ আছে তাই গতিশীল, বর্ধিষ্ণু অথবা বিবর্তনশীল। গান্ধীর অসহযোগ বা সত্যাগ্রহও আদর্শ হিসেবে তার গতিশীল ভূমিকা এখনো হারায় নি, বরং বাংলাদেশে রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে তার সফল প্রয়োগ ও স্বাভাবিক বিবর্তন ঘটেছে, এ-কথা আজ দ্বিধাহীনভাবে বলা চলে। বর্তমান শতকের গোড়ার

দিকে বিশ্বের অদ্বিতীয় সাম্রাজ্য-শক্তি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতার যুদ্ধে জয়লাভ করা যাবে না, এই উপলব্ধি থেকে ভারতীয় নেতাদের অনেকেই গান্ধীজীর অসহযোগের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। বাংলাদেশের নেতারাও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পরই বুঝতে পারেন, তাঁদের সারল্য ও ধর্মীয় জাতীয়তা সম্পর্কিত বিভ্রান্তির সুযোগে পশ্চিম পাকিস্তানে যে-রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে, তার বিরুদ্ধে অস্ত্রহীনের বিদ্রোহ ব্যর্থ হতে বাধ্য। ফলে ফজলুল হক, সোহ্‌রাওয়ার্দী-প্রমুখ নেতারা সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে আপোষ ও ক্ষমতার সামান্য অংশভাগী হওয়ার নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁরা হতাশ হয়ে বুঝতে পারেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্র-কাঠামো সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার অনুরূপ। বাংলাদেশের মানুষের জন্য সেখানে স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগের সামান্য অবকাশও নেই। বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট মিলিটারি জাণ্টা যে-শাসন ও শোষণ কায়েম করেছে তার চরিত্র মূলত ষোড়শ শতকের ডাচ ও পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক প্যাটার্নের।

এই মধ্যযুগীয় ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য শেখ মুজিব 'বাংলার ম্যাগ্‌না কার্টা' হিসেবে পরিচিত ছয় দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন এবং গান্ধীজীর অনুসৃত পথে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসন ও শোষণের ভিত্তি দুর্বল করার জন্য রাজনৈতিক অসহযোগের নীতি ঘোষণা করেন। এই রাজনৈতিক অসহযোগের মূল কথা, বিদেশী প্রশাসনের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগ দ্বারা তাকে বিকল করে দেওয়া এবং অর্থনৈতিক অসহযোগের মূল কথা, পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্য সর্বতোভাবে বর্জন। অর্থাৎ অর্থনৈতিক শোষণের পথ বন্ধ করা। বাঙালী জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ বাঙালীকে এই নতুন রাজনৈতিক দর্শনে অনুপ্রাণিত করা এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব। এই জাতীয়তার মূলে আবার প্রেরণা জুগিয়েছে, বাঙালীর হাজার বছরের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষার ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সফল হন নি। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিরোধ-চেতনা সমৃদ্ধ রাজনীতি দেশের হাজার বছরের নিজস্ব সংস্কৃতি-চিন্তা ও শক্তি দ্বারা আরো গতিশীল ও ব্যাপ্ত হয়েছে। মুজিবের আন্দোলনে সাহায্য জুগিয়েছেন চণ্ডীদাস, লালন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, সুকান্ত, মুকুন্দদাস এবং আরো অনেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুর ত্রিশ

বছর পরে স্বাদেশিকতার গান কণ্ঠে আবার পুনরাবির্ভূত হয়েছেন বাংলাদেশের পদ্মাতীরে মুক্তিযুদ্ধের চারণ কবি রূপে।

শেখ মুজিব তাই আজ বাংলার ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস মুজিবের ইতিহাস। বাংলাদেশে আজ গান্ধীজীর অসহযোগের রাজনৈতিক দর্শন সুভাষবাদের বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতির বৈদ্যুতিক স্পর্শে দ্রুত শিহরণশীল। সুদূর লাতিন আমেরিকার বিপ্লবী চে গুয়েভারার গেরিলাযুদ্ধের কৌশল আজ বাংলাদেশের অসহযোগী মুক্তিযুদ্ধের নতুন ক্রিয়াপদ্ধতি। সুভাষ ট্রাডিশনাল বিপ্লবী নন, গুয়েভারা নন ট্রাডিশনাল কম্যুনিস্ট। শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনেও কোন প্রথার বা তত্ত্বের মিলন ঘটে নি, ঐতিহ্যের সমন্বয় ঘটেছে। অসহযোগ-পন্থী বাংলাদেশে আজ এই বহুমুখী ও আধুনিক ঐতিহ্যের সমন্বয়ে এক শক্তিশালী রাজনৈতিক দর্শন। যে-দর্শন ভবিষ্যতে এশিয়ার আরো বহুদেশের নিপীড়িত জনতাকে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করবে, তাদের জাতীয় স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করবে।

শেখ মুজিব শুধু রক্তাক্ত বাংলার নবনায়ক নন, তিনি গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রক্তাক্ত যুগ-সন্ধিক্ষণের নব নায়ক। নতুন ইতিহাসের নির্মাতা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

ভবিষ্যতের মুল্যায়নে শেখ মুজিব ইতিহাসে কিভাবে বিশ্লেষিত হবেন তা ভবিষ্যতের জন্যই তোলা থাক। বর্তমানের এশিয়ায় শেখ মুজিব এক ঐতিহাসিক পুরুষ এবং তাঁর আন্দোলন এক ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধ। এই মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের উনিশ জন বিশিষ্ট নবীন ও প্রবীণ চিন্তাশীল লেখক উনিশটি প্রবন্ধ লিখেছেন 'রক্তাক্ত বাংলা' গ্রন্থে। রক্তাক্ত বাংলার এই যুগসন্ধিক্ষণে রক্তাক্ত বাংলা গ্রন্থ তাই তাঁদেরই প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ—যাঁরা অকুতোভয়ে রক্ত দিয়েছেন এবং এখনো দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর সংগ্রাম ও স্বাধীন বাংলার অস্তিত্বকে সার্থক ও বাস্তব করে তোলার জন্য। জয় বাংলা।

আমাদের বাঁচার দাবি ৬-দফা কর্মসূচী

—শেখ মুজিবুর রহমান

আমি পূর্ব পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬-দফা কর্মসূচী দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশ্‌মনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার দাবি, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্প-ব্যয়ে শিক্ষা-লাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকলপ্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবিতেও এঁরা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬-দফা দাবিতে-যে পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে তাতে আমার কোনও সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের বিবৃতিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি। তাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬-দফা দাবি অনুমোদন করিয়াছেন। ফলে ৬-দফা দাবি আজ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবিতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবেন না, সে বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু এও আমি জানি, জনগণের দুশ্‌মনদের ক্ষমতা অসীম, তাঁদের বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার এঁদের অফুরন্ত, মুখ এঁদের দশটা, গলার সুর এঁদের শতাধিক।

এঁরা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে এঁরা আছেন সরকারী দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া এঁরা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দুশ্‌মনির বেলায় এঁরা সকলে একজোট। এঁরা নানা ছলা-কলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন, সে চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিষ্কাম সেবার জন্য এঁরা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। এঁদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার-সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ৬-দফা দাবির তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, তাঁরা সকলে অবিলম্বে ৬-দফার ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬-দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচার-পত্র প্রকাশ করা হইবে। আশা করি সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মিগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রেই এইসব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভা-সমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তি কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে-আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতেই হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ এক বাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোট দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নিবাচনে পূর্ব বাংলার মুসলিম আসনের শতকরা সাড়ে ৯৭টি-যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার

দাবি ছিল তার অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারী সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ব বাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাব-ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই ; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরান দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহোর-প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাঁরা আঁৎকিয়া উঠেন, তাঁরা হয় পাকিস্তান-সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান।

এই দফায় পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইনসভার সার্বভৌমত্বের যে-দাবি করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভাল, না প্রেসিডেন্শিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাহীন আইনসভাই ভাল, এ বিচার-ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির এই তরফদারেরা এইসব প্রশ্নে রেফারেণ্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাই-এর প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁরা যদি নিজেদের মতে এতই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণ-ভোট হইয়া যাক।

২নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবল মাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট সমস্ত বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরা করতঃ ধ্বংস করিবার

প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইঁহাদেরে এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইঁহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালে যে-'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে-'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকী সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, এই তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি-ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান পরিত্যক্ত হয়। তাহা না হইলে এই তিন বিষয় লইয়াই আজও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য কিন্তু তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র-বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে-যে-বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ারে দেওয়া হয়। এই মূলনীতি-অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ছিল। পেশাওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য ত নয়ই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তাই স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন-টেলিগ্রাম পোস্টাফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুইটি বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া 'স্টেট্' বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থী শোষকরা জনগণকে এই বলিয়া ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু

করিয়াছে যে, 'স্টেট' অর্থে আমি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্টেট বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেট্‌স্‌' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানী, এমন কি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাদের প্রদেশ-সমূহকে 'স্টেট্‌' ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা 'প্রদেশ' নয় 'স্টেট্‌'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট্‌' হওয়ার সম্মান পাইতে পারে তবে পূর্ব পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেই বা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা-সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টার্নেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুইটি প্রস্তাবের যে-কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে:

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়-যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা-অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রের হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট্‌ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে; দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যাইবে যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টার্নেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ দফা প্রস্তাবের খেলাফে কোনও সুপারিশ করিয়াছি, এ কথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তবে, শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাত হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন। আমরা তাঁদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তাঁরা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না ?

আর যদি অবস্থা গতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না ; পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে-প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া বৃটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থ-বিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রের বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাঙ্কের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই ; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙিয়া পড়ে নাই। অত-যে শক্তিশালী দোর্দণ্ড-প্রতাপ সোভিয়েট ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রী বা অর্থ-দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিক সমূহেরই অর্থমন্ত্রী ও অর্থ-দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সবকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐ সব প্রাদেশিক মন্ত্রী ও মন্ত্রী-দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহু-দিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরি-উক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নক্শার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে,

আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতীক- ও নিদর্শন-স্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নক্শার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতি সহজেই পূর্ব পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাঙ্কিং, ইন্‌সিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশন-সমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারী স্টেট্ ব্যাঙ্ক ও ন্যাশনাল ব্যাঙ্কসহ সমস্ত ব্যাঙ্কের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি ব্যাঙ্ক ইহার সাম্প্রতিক ব্যতিক্রম মাত্র। এইসব ব্যাঙ্কের ডিপজিটের টাকা, শেয়ার মানি, সিকিউরিটি মানি, শিল্প-বাণিজ্যের আয়, মুনাফা ও শেয়ার মানি, এক কথায় পূর্ব পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনের টাকা বালুচরে ঢালা পানির মত একটানে তলদেশে হেড অফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব পাকিস্তান শুক্না বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউব-ওয়েল খুদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউব-ওয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফর্মেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফর্মেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনও দিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফর্মেশন।

শুধু ফ্লাইট-অব্-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতি-হেতু পূর্ব

পাকিস্তানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্যতা, জনগণের বিশেষতঃ পাট-চাষীদের দুর্দশা, সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এই অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকলপ্রকার ট্যাক্স-খাজনা কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-সমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালাবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশী চমকিয়া উঠিয়াছে। তারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাতে-যে একেবারে খয়রাতী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবেন কেমনে? পররাষ্ট্র নীতিই বা চালাইবেন কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার ত অনাহারে মারা যাইবেন। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র।

কায়েমী স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্য যে নয় সেটা বুঝিবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি তাঁদের নিশ্চয়ই আছে। তবু-যে তাঁরা এ সব কথা বলিতেছেন, তার একমাত্র কারণ তাঁদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তাঁরা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকার নির্বিঘ্নে চলার মত যথেষ্ট অর্থের

ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সেই ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এইটাই সরকারী তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যর্থ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁরা এটাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁরা এই খবরও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে-প্ল্যান বৃটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩ নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রী ও অর্থ-দফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েট ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা অর্থ-দফতর বলিয়া কোনও বস্তুর অস্তিত্বই নাই। তাতে কি অর্থাভাবে সোভিয়েট ইউনিয়ন ধ্বংস হইয়া গিয়াছে? তার দেশরক্ষা বাহিনী পররাষ্ট্র-দফতর কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকর হইলেও তেমনি পকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন এমন বিধান থাকিবে যে-আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে-খাতেই যে-টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না কেন, শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত সেই টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের জন্য কোনও দফতর বা অফিসার বাহিনী রাখিতে হইবে না। তৃতীয়তঃ, অঞ্চলে ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাতে আদায়ী খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসারবাহিনীকেও উন্নততর সংকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থতঃ, ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিঙ্গল্ ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। সিঙ্গল্ ট্যাক্সেশনের নীতিকে সকলেই অধিকতর বৈজ্ঞানিক ও ফলপ্রসূ বলিয়া অভিহিত করিতেছেন।

ট্যাক্সেশনকে ফেডারেশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপে বলা যাইতে পারে।

৫নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাপারে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি :

(১) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে,

(২) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে,

(৩) ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চল হইতে সমান ভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে,

(৪) দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে উভয় অঞ্চলের মধ্যে আমদানী-রফ্‌তানী চলিবে,

(৫) ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফ্‌তানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক নিশ্চিত মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতই অত্যাবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলালেই দেখা যাইবে যে :

(ক) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের বিদেশী আয় পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব পাকিস্তান যে-পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে-পরিমাণ রফ্‌তানী করে, আমদানী

করে সাধারণতঃ তার অর্ধেকেরও কম। ফলে অর্থনীতির অমোঘ নিয়ম-অনুসারেই পূর্ব পাকিস্তানে ইন্‌ফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তার ফলে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশী। বিদেশ হইতে আমদানী-করা একই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করিলেই এটা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বণ্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ার থাকার ফলেই আমাদের এই দুর্দশা।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাট-চাষীকে পাটের ন্যায্য মূল্য ত দূরের কথা আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাট-চাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন ; কিন্তু চাষীকে পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারেন না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ায় আর কোন দেশে নাই। যত দিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, তত দিন পাটের দাম থাকে পনর-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম হয় পঞ্চাশ। এ খেলা গরীব পাট-চাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট-ব্যবসায় জাতীয়করণ করিয়া পাট রফ্‌তানীকে সরকারী আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের সেই আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই-যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তাহা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে-বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাট-চাষীকে পাটের ন্যায্য মুল্য দিতে হইলে, আমদানী-রফ্‌তানী সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ান্তর নাই।

৬নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব পাকিস্তানে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষী-বাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এই দাবি অন্যায়ও নয় নূতনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসার বাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্র বাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম। তাহা ত করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই. পি. আর. বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌ-বাহিনীর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করতঃ এই অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবিও পূরণ করেন নাই। পূর্ব পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা-ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন্ মুখে? মাত্র সতর দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরুপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর ত আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যতঃ আমাদের তাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে এও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত-পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন। অস্ত্র-কারখানা স্থাপন করুন। নৌ-বাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা অল্প খরচে ছোটখাট অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া আধা সামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের অত আপত্তি কেন? পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিলে তাও কেন্দ্রীয় রক্ষা-তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? ঐ সব প্রশ্নের উত্তর নাই। তবু কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না।

এ অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরিবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায় ? এই দাবি করিলেই সেটা হইবে দেশদ্রোহিতা ?

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই-বোনদের খেদমতে, আমার কয়েকটি আরজ আছে :

এক, তাঁরা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬-দফা কর্মসূচীতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এই দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিম পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই, আমি যখন বলি, পূর্ব পাকিস্থানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে, তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না। আমি জানি, এই বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যত দিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, তত দিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না। কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্যে দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সে অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা। ধরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব পাকিস্তানে হইত তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুন শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইত পূর্ব পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থবিজ্ঞানের কথা : সরকারী আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারী ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারী ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারী, আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান-সমূহ এবং বিদেশী মিশন-সমূহ তাঁদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই

পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে প্রতি বছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরীব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে এইসব খরচ পূর্ব পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা এই পরিমাণে ধনী হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণে গরীব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যে-সব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার তহমত দিতেছেন সেই সব দাবি আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মত আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদের অন্যায়ও হইত না।

তিন, আপনারা ঐ সব দাবি করিলে আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ও-সব আপনাদের হক্ পাওনা। নিজের হক্ পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবি করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করার আগেই আপনাদের হক্ আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক্ দাবি করিতেছি বলিয়া আমাদেরে স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হক্‌টাও খাইয়া ফেলিতেছেন, আপনাদেরে লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হক্‌টাই চাই। আপনাদের হক্‌টা আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবার আওকাৎ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত চান? শুনুন তবে:

(১) প্রথম গণ-পরিষদে আমাদের মেম্বর সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ২৮। আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফ্‌তরা পূর্ব পাকিস্তানে আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই-এর দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬টাতে পূর্ব পাকিস্তানীর ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বর নির্বাচন করিয়াছিলাম।

(৩) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম। তা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।

(৪) ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।

(৫) আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও সমতা-বোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলে সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যা-গুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার, সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে-যেখানে আমাদের দান করিবার আওকাৎ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার, থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবি করিবার, আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্য সত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথক ভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম পূর্ব পাকিস্তানীরা মেজরিটি বলিয়াই পাকিস্তান শুধু পূর্ব পাকিস্তানীদের নয়, ছোট-বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানীর। পূর্ব পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব পাকিস্তানীরা সব অধিকার ও চাকুরি গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পি. আই. ডি. সি. আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডি-আই টি, আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল্ পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলতঃ পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিস্প্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমন উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন

ইন্সাফ-বোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। এটা যার মধ্যে আছে কেবল তিনি দেশপ্রেমিক। যে-নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বের যোগ্য। যে-নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা, যে-নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এইসব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে-নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে-নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া শুনিয়া যাহারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায়, তারা পাকিস্তানের দুশ্মন; যে-নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশ্মনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী। কেবল তাঁরই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ছয় দফা কর্মসূচীর বিচার করিবেন। তা যদি তাঁহারা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ছয় দফা শুধু পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি।

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬-দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান-বিরোধী বা পাকিস্তান-ধ্বংস-কারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তি-তর্ক-সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরো অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। তথাপি কায়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজাম লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মত মুরুব্বিরাই এঁদের কাছে গাল খাইয়াছেন, এঁদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন্ ছার? দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে বাংলা ফজলুল হক্‌কে এঁরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী এও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এঁদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল

পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল-জুলুম ভুগিবার তক্‌দির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোওয়ায়, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে সব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এই কাজে যে-কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সুহ্‌রাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁর পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোঠা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই-বোনেরা, আল্লাহ্‌র দরগায় শুধু এই দোওয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাঁদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

৪ ঠা চৈত্র—১৩৭২।

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের গতিপ্রকৃতি

—রণেশ দাশগুপ্ত

॥ ১ ॥

উপক্রমণিকা

পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের গতিপ্রকৃতি নিরূপণের ব্যাপারটিকে পাঁচ অংশে ভাগ করে নেয়া যেতে পারে।

প্রথম অংশ ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত চব্বিশ বছরের ঘটনাবলীর একটা চুম্বক। পর্যায়ের পর পর্যায়ে যে ঘটনা-ধারা দ্বন্দ্বাত্মক গতিপথে অগ্রসর হয়ে ১৯৪৭-৪৮ সালের নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায়ের আন্দোলন থেকে বৈপ্লবিক গণতন্ত্রের সংগ্রামে এবং সার্বভৌম স্বাধীনতা-ঘোষণায় উপনীত হলো ১৯৭১ সালে, এখানে তার ক্রমাত্মক ও বিপ্লবাত্মক দিক-গুলি ধরা পড়বে।

দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে পূর্ব বাংলাকে যে বিশেষ ঔপনিবেশিক শোষক ও শাসকচক্রের বিরুদ্ধে উপরি-উক্ত চব্বিশ বছর ধরে লড়াই করে আসতে হয়েছে এবং ১৯৭১ সালে যে চক্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলাকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত হতে হলো, তার চরিত্র-বিচার তথা শ্রেণী-নির্ণয় ও গোষ্ঠী-চিহ্নণ। পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম যে প্রথমাবধি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিসংগ্রাম এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধও যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মুক্তিযুদ্ধ, সেটিও এখানে মূল বিবেচ্য।

তৃতীয় অংশ হচ্ছে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গীতে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সঞ্চালক শক্তিগুলির শ্রেণীগত ভূমিকা ও গুণাগুণ-বিচার এবং সে দিক থেকে মুক্তিসংগ্রামের চরিত্র নির্ণয়। সে পরিপ্রেক্ষিতেই এই সব শক্তির ভবিষ্যৎ গতি পরিণতিও এই অংশে আলোচ্য।

চতুর্থ অংশ হচ্ছে, পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে সংগ্রামী অতীতের এবং বিশেষ করে নিকট অতীতের যে উপাদানগুলি কাজ করছে কিংবা করতে যাচ্ছে, তার মূল্যায়ন।

পঞ্চম অংশ হচ্ছে, পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের আন্তর্জাতিকতা-নির্ণয়।

॥ ২ ॥

পূর্ব বাংলার ঘটনা-ধারার চুম্বক

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ঘটনা-ধারাকে প্রাথমিকভাবে নিম্নোক্ত পর্যায়-গুলিতে সাধারণভাবে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে :

(১) **১৯৪৭-৪৮**—তথাকথিত ক্ষমতা হস্তান্তর। সাম্রাজ্যবাদী শাসনযন্ত্রের রূপান্তর। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মাথাভারি তথাকথিত দেশী সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের হাতে রাজদণ্ড। এই আমলাতন্ত্রের অধিষ্ঠান পশ্চিম পাকিস্তানে। সত্যকার স্বাধীনতার দাবীতে এগিয়ে আসে মেহনতী সমাজ। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে আমলাতান্ত্রিক দণ্ড-পরিচালনার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজের প্রতিরোধ ও প্রতিবাদের সূচনা। ন্যায্য বেতনের দাবীতে নিম্নপদস্থ কর্মচারী ও পুলিশ ধর্মঘট। শাসকচক্রের জবাব জেল, লাঠি, টিয়ার গ্যাস, গুলী।

(২) **১৯৪৯-৫১**—আমলাতান্ত্রিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিকতা আর নিয়ম-ভাঙ্গার আওতায় গণবিক্ষোভ। সরকার-বিরোধী গণতান্ত্রিক দল ও মত গঠন। গণতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, প্রজাতান্ত্রিক সার্বভৌমত্বের রূপরেখা নির্ণয়। জমির অধিকারের এবং খাজনা-হ্রাসের দাবীতে ব্যাপক দরিদ্র ও নিঃস্ব কৃষকদের বিক্ষোভ।

অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের বাইশ পরিবারের ভিতপত্তন, মার্কিন নয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে এই কায়েমী স্বার্থবাদী পুঁজিপতি জমিদার গোষ্ঠী ও সামরিক বেসামরিক আমলাদের গাঁটছড়া। দমননীতি ও সরকারী সন্ত্রাসের রাজত্ব।

(৩) **১৯৫২-৫৩**—বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে পূর্ব বাংলার গণ-বিদ্রোহ। ছাত্রজনতার বৈপ্লবিক রূপ। বাংলাভাষা আন্দোলনে সরকারী বেসরকারী কর্মচারীদের যোগদান। বিকল্প সরকারের ঝলক। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিদিবস ২১-এ ফেব্রুয়ারীর সূচনা। হাজার হাজার ছাত্র জনতা বুদ্ধিজীবী কারাগারে নিক্ষিপ্ত। শ্রমিকদের মধ্যে নতুন সংগঠনের তৎপরতা।

(৪) **১৯৫৪-৫৭**—প্রাদেশিক সাধারণ নির্বাচন, শাসকদল মুসলিম লীগ তথা আমলাতন্ত্রের বিপর্যয়। গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের নৌকার জয়। একুশ দফা। আমলাতন্ত্রের প্রত্যাঘাত। বেসামরিক আমলাতন্ত্রের সামরিক সাজ। গণতান্ত্রিক

শিবির-রক্ষায় ছাত্রসমাজ। আমলাতন্ত্রের আক্রমণ ও পশ্চাদপসরণ কৌশল। ১৯৫৬ সালের নিয়ন্ত্রিত শাসনতন্ত্রের টানা-পোড়েন। পূর্ব বাংলার মোকাবেলায় পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারী এক ইউনিট। পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক সীমাবদ্ধ স্বায়ত্তশাসনের পরীক্ষা ও ব্যর্থতা। ক্ষমতার রাজনীতির খেসারত। পুলিশ ধর্মঘট।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার-কর্তৃক বিভেদ-সৃষ্টি এবং শ্রমিক সমাজে সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির প্রয়াস। কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা।

(৫) **১৯৫৮-৬১**—সামরিক স্বৈরাচারী শাসনের প্রবর্তন। জেলজুলুম লাঠি টিয়ার-গ্যাস বেত্রদণ্ড। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শোষকচক্রের ধারক আইয়ুবশাহী। মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে রাওয়ালপিণ্ডিভিত্তিক ঔপনিবেশিক কেন্দ্রীয় শাসনের নব পর্যায়। প্রত্যক্ষ নির্বাচন বাতিল।

(৬) **১৯৬২-৬৫**—সামরিক-স্বৈরাচার-বিরোধী গণ-অভ্যুদয়ের প্রথম পর্ব। ছাত্র-অভ্যুদয়। গণতান্ত্রিক শিবির ও গণতান্ত্রিক দলগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

(৭) **১৯৬৫-৬৬**—সামরিক স্বৈরাচারী আইয়ুবশাহীর দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা। নির্বাচনে পরাজিত। গণশিবিরে বিভ্রান্তি। যুদ্ধ উপলক্ষ্যে জরুরী স্বৈর-কানুন।

(৮) **১৯৬৬-৬৭**—সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী গণ-অভ্যুদয়ের দ্বিতীয় পর্ব। ছয় দফা।

জরুরী কানুন প্রত্যাহারের দাবীতে সংগ্রাম। খণ্ড খণ্ড দাবী আদায়ের জন্য শ্রমিকদের খণ্ড খণ্ড সংগ্রাম। ভুট্টো খাবো না। সামরিক শাসকচক্রের প্রত্যাঘাত ও অস্ত্রের ভাষা। বাঙ্গালী সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পত্তন। শেখ মুজিবুর রহমান অভিযুক্তদের প্রধান।

(৯) **১৯৬৮-৬৯**—সামরিক স্বৈরাচারবিরোধী গণ-অভ্যুদয়ের তৃতীয় পর্ব। পূর্ণ গণতন্ত্র, পূর্ব বাংলার স্বাধিকার এবং রাজবন্দীদের মুক্তির দাবীতে গণবিপ্লবী অভ্যুত্থান। জনগণ-কর্তৃক কারফিউ-ভঙ্গ। গণতান্ত্রিক বিপ্লবে শামিল পূর্ব বাংলার শ্রমিক কৃষক ছাত্র মেহনতী জনতা, নারী সমাজ। এগারো দফা। সামরিক স্বৈরশাহী শাসকচক্রের পশ্চাদপসরণ। সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের স্বাক্ষাত।

(১০) **১৯৬৯—মার্চ থেকে ডিসেম্বর:** আবার সামরিক শাসন। সামরিক শাসকচক্রের নয়া নাম ইয়াহিয়া-শাহী। শাসকচক্র-কর্তৃক বন্ধঘরের

রাজনীতি জারীর প্রয়াস। অপর দিকে গণজীবনে ধূমায়িত চাপা বিক্ষোভ। ছাত্র-সমাজ ও শ্রমিক-সমাজ-কর্তৃক সামরিক আইন লঙ্ঘনের সূত্রপাত। সামরিক শাসক-চক্রের নয়া প্রস্তুতি। ধর্মের আবরণে প্রতিক্রিয়ার সাজগোজ। বেত্রাঘাত জেলজুলুম লাঠি গুলীর সামরিক শাসন।

(১১) **১৯৭০—জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর:** শাসকচক্রের পশ্চাদপসরণ —খোলা ময়দানের রাজনীতির পুনঃপ্রবর্তন। গণ-অভ্যুত্থানমূলক প্রগতিবাদী ও বিপ্লবী তত্ত্বের খোলা বিতর্ক। ভাত ও ভোট। সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি এবং অনুষ্ঠান। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট। প্রলয়ঙ্কর সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। পূর্ব বাংলা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন সামরিক স্বৈরাচারী চক্রের ঔপনিবেশিক অধিকার রক্ষার জন্য নয়া ষড়যন্ত্র-জাল ও ক্ষমতা-রক্ষার প্রত্যক্ষ হুমকি। সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নৌকার জয়।

(১২) **১৯৭১**—পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তান-ভিত্তিক বাইশ পরিবারের সমরসজ্জা। সাধারণ নির্বাচনের গণ-রায় কার্যকরী করণে শাসকচক্রের অস্বীকৃতি। পূর্ব বাংলার জনগণের তরফ থেকে পাল্টা প্রতিরোধ-ব্যবস্থা। গণ-অসহযোগ। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের প্রস্তুতি। শাসকচক্র-কর্তৃক নির্বাচনী গণভোট বানচাল ও জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী নিয়োগ। গণ-অসহযোগ থেকে মুক্তিযুদ্ধ।

ঘটনাধারার বিশ্লেষণ থেকে দশটি সত্য

উপরি-উক্ত পর্যায়গুলি থেকে যে প্রথম সত্য বেরিয়ে আসে সেটা এই যে, পূর্ব বাংলার গণ-অসহযোগ এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ কোন হঠকারী বিপ্লবী অথবা সংগ্রামীর সৃষ্টি নয়। যে বৈপ্লবিক ঘটনার ধারায় অনিবার্যভাবে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করেছে, তা পূর্ব বাংলার সর্বস্তরের নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অংশগ্রহণ মারফতই ঘটেছে।

দ্বিতীয় সত্য এই যে, পূর্ব বাংলার ছাত্র-সমাজ জনগণের পুরোগামী হিসেবে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের পতাকাকে প্রথমাবধি বহন করে নিয়ে এসেছে এবং বারংবার গণশিবির-নির্মাণের দায়িত্ব বহন করেছে।

তৃতীয় সত্য এই যে, পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম বরাবরই একটা না একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে পেয়েছে। পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম নিছক জাতীয়তাবাদী ভাবপ্রবণতাময় সংগ্রাম বলে কোন কোন মহলে যে-ধারণা রয়েছে সেটা ভুল। পূর্ব

বাংলার মুক্তিসংগ্রাম বরাবরই বৈপ্লবিক সংগ্রামী কর্মসূচী-ভিত্তিক। ১৯৫৪ সালে তৈরী হয়েছিল একুশ দফা। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা। ১৯৬৮-৬৯ সালে ১১ দফা। সংগ্রামের পর্যায়-অনুযায়ী এই দফাগুলির তারতম্য ও বিকাশ ঘটেছে।

চতুর্থ সত্য এই যে, ১৯৭১ সালে ই.পি. আর., বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং পুলিশ বাহিনী যে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের পুরোভাগে এসে দাঁড়ালো, সেটা ঘটনাচক্রে আকস্মিক-ভাবে ঘটে নি। ১৯৪৮ এবং ১৯৫৫ সালের পুলিশ ধর্মঘট এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে বাঙ্গালী সামরিক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত আগরতলা মামলার ঘটনা অনুসরণ করলে আমরা বুঝতে পারব, ই.পি.আর., পুলিশ এবং বেঙ্গল রেজিমেন্ট। কেন শেষ পর্যন্ত একটা গণ বৈপ্লবিক ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করলো না।

পঞ্চম সত্য এই যে, গণতান্ত্রিক শিবিরের নবনব পর্যায়ের পুনর্গঠন এবং তার মারফত পূর্ব বাংলার সাড়ে সাত কোটি বাসিন্দার যে ঐক্য শেষ পর্যন্ত গণ-অসহ-যোগের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলো, তার মধ্যে গণশিবির সংগঠিত হওয়ার একটা অব্যাহত ধারা রয়েছে। মাঝে মাঝে গণ-ঐক্যের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি দেখা দিলেও গণশিবিরের ঐক্য তাকে কাটিয়ে উঠেছে। সংগ্রামী, প্রগতিশীল ও বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে বারংবার মতদ্বৈধতা আত্মপ্রকাশ করলেও নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার সংগ্রামে এই সব দল অনেকাংশে মতদ্বৈধতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

ষষ্ঠ সত্য এই যে, পূর্ব বাংলার সরকারী ও আধা-সরকারী কর্মচারীরা প্রথমাবধি রাজদণ্ডধারীদের বিরুদ্ধে জনগণের বৃহত্তর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে সার্বিক সাধারণ ধর্মঘটে সরকারী কর্মচারীদের যোগদান গণচাপ বা হুমকী থেকে আসে নি। এর মূলে রয়েছে সরকারী কর্মচারীদের নিজস্ব উদ্যোগ ও চিন্তা।

সপ্তম সত্য এই যে, একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলা বৃহৎ থেকে বৃহত্তর সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে এবং পূর্ব বাংলার মুক্তি-সংগ্রাম যে অদম্য সেকথা প্রমাণিত করেছে, তেমনি আরেক দিকে করাচী লাহোর রাওয়ালপিণ্ডি-ভিত্তিক বাইশ পরিবারের রক্ষক সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী-পুঁজিবাদী শাসকচক্র পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে বহাল রাখার জন্য নির্যাতন নিপীড়ন-মূলক প্রশাসনিক ও সামরিক ব্যবস্থার মাত্রা চড়িয়ে এসেছে। ছয় দফার ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমানের অনমনীয়তা কিংবা ছাত্র জনতা ও বিপ্লবী দল-সমূহ-কর্তৃক পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা-ঘোষণাই ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্রকে পূর্ব বাংলার

যুদ্ধাভিযানে প্ররোচিত করেছে বলে যে-কথা বলা হয় কোন কোন মহল থেকে, সেটা হয় ইচ্ছাকৃত অপপ্রচার নয়তো অজ্ঞানতা-প্রসূত দায়-সারা রায়। সংশ্লিষ্ট শাসকচক্র গত চব্বিশ বছরে প্রধানত মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহায়তায় যে যুদ্ধযন্ত্র গড়ে তুলেছে, তার প্রধান উদ্দেশ্য হয়েছে প্রথমত পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে সুরক্ষিত রাখা এবং দ্বিতীয়ত পশ্চিম পাকিস্তানের দরিদ্র জনগণকে দাবিয়ে রেখে তাদের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধরথচক্রে বেঁধে রাখা। সামরিক বাহিনী যে ঔপনিবেশিক স্বার্থরক্ষার বাহিনী হিসেবেই লালিত পালিত হয়েছে তার দু'টি প্রমাণ। একটি প্রমাণ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী সামন্তবাদী পুঁজিবাদী শাসকচক্র যে-সরকার খাড়া করেছে, তা সামরিক সরকার। দ্বিতীয়ত, সামরিক বাহিনীতে পূর্ব বাংলার লোক কার্যত নেওয়া হয় নি এবং পূর্ব বাংলায় সামরিক বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন, পূর্ব বাংলায় প্রধান নৌ-ঘাঁটি স্থাপন প্রভৃতির দাবীকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

অষ্টম সত্য এই যে, শাসকচক্র মাঝে মাঝে গণ-অভ্যুদয়ের চাপে পশ্চাদপসরণ করলেও, মূলগতভাবে পূর্ব বাংলার জনগণের উপর আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি করে এসেছে। ক্ষমতা হস্তান্তরের বিপরীত ব্যবস্থাই করেছে তারা।

নবম সত্য এই যে, পূর্ব বাংলার জনগণের উপর পর্যায়ের পর পর্যায়ে সামরিক শাসন জারী হলেও এবং স্বৈরাচারী ব্যবস্থার জৌলুষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলেও জনগণ কখনও গণতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী জয় সম্বন্ধে মনোবল হারিয়ে ফেলে নি। জনগণ বরং বৃহত্তর বৈপ্লবিক শক্তি এবং প্রেরণা নিয়েই বিরতির বলয়গুলিকে অতিক্রম করে এসেছে। সাধারণ নির্বাচনেই হোক অথবা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানগুলিতেই হোক অথবা খণ্ড খণ্ড ভাবে স্থানীয় দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে হোক, জনগণ যেখানে তাদের উদ্যোগ প্রকাশের অবকাশ পেয়েছে, সেখানেই প্রমাণিত হয়েছে যে, স্বৈরাচারী সামরিক শাসনের গণবিরোধী নিষ্পেষণ-যন্ত্র জনগণের মনোবলকে বিন্দুমাত্র ভাঙ্গতে পারে নি। জনগণ প্রতিক্রিয়ার পর্যায়গুলিকে পেরিয়ে এসেছে ছোটখাট প্রশ্নে সংগ্রাম শুরু করে কিংবা খণ্ড খণ্ড দাবী আদায়ের সংগ্রামের সোপানে আরোহণ করেছে গণবৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে।

গত চব্বিশ বছরে স্বৈরাচারী আইয়ুব-শাহী কিংবা ইয়াহিয়া-শাহীর জগদ্দল পাথরকে পূর্ববাংলার বুকের উপর সমাসীন দেখে যারা পূর্ব বাংলার জনগণের পরাজয়ের কথা চিন্তা করেছে, তারা-যে ভুল করেছে সেটা বারবার ধরা পড়েছে।

পূর্ব বাংলার উপেক্ষিত বঞ্চিত সাড়ে সাত কোটি মানুষ এক অপরাজেয় জাতিসত্তা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ঘটনাধারার বৈপ্লবিক প্রামাণ্যতা এখানেই যে, এই অপরাজেয় জাতিসত্তার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী জনতার নির্মীয়মাণ বিপ্লবী শক্তি। শাসকচক্রের জোরজুলুম একে নিবৃত্ত করতে পারে নি।

দশম সত্য এই যে, পর্যায়ের পর পর্যায়ে অধিকতর ক্রূর এবং প্রতিহিংসা-পরায়ণ ঔপনিবেশিকতাবাদী পাকিস্তানী শাসকচক্রের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম জনগণের গভীরতম স্তরগুলি থেকে নতুনভাবে শক্তিসঞ্চয় করে এবং নতুনতর চেতনা নিয়ে সংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছে বলেই নেতৃত্বের বৈপ্লবিক সম্প্রসারণ অনিবার্য ঐতিহাসিক সত্য। গণতন্ত্রের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছে সমাজতন্ত্রের দাবী।

॥ ৩ ॥

ঔপনিবেশিক শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণীচিহ্নণ

যে নিপীড়ক ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মুক্তি-সংগ্রাম শেষপর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হলো, তাদের সাধারণভাবে বুঝে উঠতে পূর্ব বাংলার জনগণের বেশি সময় লাগে নি। তবে এই শাসকগোষ্ঠীকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করার ব্যাপারটা মূলত বিশেষজ্ঞ ও তাত্ত্বিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নি কখনও। তবে আপাতদৃষ্টিতে এবং ঢালাও প্রচারের ক্ষেত্রে কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হয়ে থাকতে পারে যে, ব্যাপারটা পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বন্দ্ব। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য গড়ে উঠেছে গত চব্বিশ বছরে তাকে এবং এই বৈষম্যের ফলভোগকারী যারা তাদের নির্দিষ্ট করে দেখানোর কাজটাও তাত্ত্বিকদের মধ্যে নিবদ্ধ রয়েছে।

তবে তত্ত্বের ক্ষেত্রেও উপরি-উক্ত শাসক ও শাসকগোষ্ঠীর শ্রেণীচিহ্নণ এবং চরিত্র-পরিচয় সহজ হয় নি এ কারণে যে, এই গোষ্ঠীর বিন্যাসের মধ্যে তারতম্য ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘটে এসেছে অবিশ্রান্তভাবে। শোষক ও শাসক-চক্রের মধ্যে এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র, হত্যাকাণ্ড এবং রাষ্ট্রনৈতিক অচলাবস্থা ও

অস্থিরতার মধ্যে বার বার বিস্ফোরিত হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় সামরিক কর্তাদের নিজেদের মধ্যে, সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের নিজেদের মধ্যে, সামরিক আমলা পুঁজিপতি জায়গীরদার এবং বেসামরিক আমলা পুঁজিপতি জায়গীরদারদের মধ্যে ক্ষমতার কাড়াকাড়ি চলেছে কখনও খোলাখুলিভাবে এবং কখনও আড়ালে আবডালে। এর কারণ এই যে, পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলার সম্পদের উপর একচেটিয়া মালিকানা প্রতিষ্ঠার জন্যে শাসক ও শোষকগোষ্ঠীর চক্রগুলি একে অপরকে ঘায়েল করতে চেষ্টা করেছে।

পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ করে রাখার ব্যাপারে এরা সবাই একযোগ থাকলেও মুনাফার পাহাড়ের মালিকানা ষোল আনা পাওয়ার জন্যে উপরি-উক্ত শোষক ও শাসকগোষ্ঠীর চক্রগুলো পরস্পরকে ছাড়িয়ে ওঠে একাধিপত্যের চেষ্টা করে এসেছে।

এটা মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী ভূম্যধিকারীদের চরিত্রানুগ যেমন, তেমনি পুঁজিবাদী একচেটিয়া মালিকানা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের অনিবার্য পরিণতিও বটে।

এই সঙ্গে যোগ হয়েছে সাবেক এবং নয়া ঔপনিবেশিক পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব। বৃটিশ বা স্টার্লিং সাম্রাজ্যবাদের অভিভাবকত্ব থেকে সরিয়ে উপরি-উক্ত শাসক ও শোষকগোষ্ঠীকে বেহাত করে নিয়েছে মার্কিন বা ডলার সাম্রাজ্যবাদীরা। এটা নিয়েও ভিতরে ভিতরে বহু রকমের আকর্ষণ বিকর্ষণ থাণ্ডব তাণ্ডব ঘটেছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বের দরুন প্রকাশ্যভাবেও উপরতলাতে ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি হয়েছে, রদবদল হয়েছে সরকারের, রাষ্ট্র-ব্যবস্থার, কাণ্ডারীর ও দল উপদলের। এই কারণেই পূর্ব বাংলার শত্রু-জোটকে চিহ্নিত করার কাজটা সহজ হয় নি। কোন কোন সময় ঠিক করে বলা যায় নি, শাসকগোষ্ঠী ঠিক কাদের নিয়ে গঠিত।

প্রগতিবাদী তাত্ত্বিকরা পূর্ব বাংলার শত্রুগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের জোটকে। পশ্চিম পাকিস্তানের বনেদী বৃহৎ ভূম্যধিকারী পরিবারগুলি, আঙ্গুল ফুলে দুই দশকে কলাগাছ হয়ে ওঠা কোটিপতি ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতি পরিবারগুলি এবং এদের অভিভাবক ও সহায়ক বৃটিশ ও মার্কিন সহ পশ্চিমী বৃহৎ পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীরা এবং প্রধানত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরাই হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকারী সেই শাসক ও শোষকগোষ্ঠী, যারা পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ করে রাখতে চেয়েছে।

যেহেতু ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আশ্রিত উপরি-উক্ত বৃহৎ জমিদার ও বৃহৎ পুঁজিপতিগোষ্ঠীর অবস্থান পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী-লাহোর এবং রাওয়াল-পিণ্ডি-ইসলামাবাদে, সেজন্য স্বাভাবিক এবং যুক্তিসঙ্গতভাবেই একে পশ্চিম পাকিস্তানী নামে অভিহিত করা হয়েছে, যদিও এ সম্বন্ধে সতর্ক না থাকার দরুন কোন কোন সময়ে পূর্ব বাংলার জনচেতনার ক্ষেত্রে অস্বচ্ছতা ঘটে থাকতে পারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন নিপীড়িত জাতিসত্তা ও মেহনতী শ্রেণীর প্রতি ভাবগত ভাবে অবিচার করা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু একুশ দফা, ছয় দফা এবং ১১ দফার মতো সংগ্রামী কর্মসূচী লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব এ সম্পর্কে সতর্ক থেকেছেন।

শুধু বিপ্লববাদী প্রগতিপন্থী তাত্ত্বিকরাই যে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকারী এক বিশেষ গোষ্ঠীকে সামগ্রিকভাবে পূর্ব বাংলার এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের শোষক শাসক তথা শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তা নয়। হার্ভার্ড কেম্ব্রিজ ফেরত বিভিন্ন পশ্চিমী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদরা এবং এমন কি পশ্চিমী তালিম-প্রাপ্ত ইসলামাবাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদরাও দেখিয়েছেন, পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ জমা হয়েছে ২২টি পরিবারের হাতে, যারা লাহোর, করাচী, রাওয়ালপিণ্ডি, ইসলামাবাদে সমাসীন থেকে রাষ্ট্রযন্ত্রের ধারণ বহনেরও মালিক হিসেবে ক্ষমতার চক্রে আরোহণ-অবরোহণের খেলায় অভ্যস্ত। ডালপালা মিলিয়ে এই ২২ পরিবারকে ২০০ পরিবারে চিহ্নিত করেছেন অর্থনীতিবিদরা। বড় বড় ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানীর পুঁজি এদের হাতে। সুতরাং, আর্থিক চাবিকাঠিও থেকেছে এদের হাতে। পূর্ব বাংলাকে এরা শুধু পণ্যদ্রব্যের একচেটিয়া বাজারে পর্যবসিত করতে চায় নি। আর্থিক দিক দিয়ে পূর্ব বাংলাকে অধমর্ণ করে তুলতে এবং করে রাখতে চেয়েছে এরা। পূর্ব বাংলা গত ২৪ বছরে মাত্র দু'টি ব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে পেরেছে, যাদের স্থানীয় চরিত্র রয়েছে কিছুটা।

দুই দশক আগে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ী শিল্পপতিরা অনধিক দশ কোটি টাকা মূল্যের পণ্য রফতানী করতো পূর্ব বাংলায়। ১৯৭০ সালে এই পণ্য রফতানীর মূল্য দাঁড়ায় ১৩০ কোটি টাকা। পূর্ব বাংলাকে নিংড়ে নিংড়ে শোষণ করার মাত্রা এভাবে বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে উপরি-উক্ত শোষক ও শাসকগোষ্ঠী যে পূর্ব বাংলার উপর ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী সামরিক কব্জাকে কেন

প্রসারিত ও অনবরত শক্ত করার চেষ্টা করে এসেছে, তা বুঝতে দেরি হবার কথা নয় কারও পক্ষে এ হিসেব সামনে রাখলে। পশ্চিম পাকিস্তানের বাইশ বা দুই শত পরিবার বহির্বিশ্বে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব বাংলার পণ্য রফতানী করে বৈদেশিক বাণিজ্যে বৎসরে ২৫০ কোটি টাকা নগদ আদায় করেছে। এর মধ্যে পূর্ব বাংলার পণ্য প্রথম দিকে ছিল অর্ধেকেরও বেশি অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ। দুই দশক ধরে এই রফতানীর মারফত প্রাপ্ত টাকায় করাচী লাহোর মুলতান প্রভৃতি জায়গায় দ্রুত মুনাফা অর্জনকারী হাল্‌কা ভোগ্যদ্রব্য-উৎপাদন-কারী শিল্প কারখানা গড়ে তুলে তার সাহায্যে বৈদেশিক বাণিজ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপাদিত পণ্যের রফতানী বৃদ্ধি করলেও, ১৯৬৭ সালের হিসেবেও বৈদেশিক বাণিজ্যে পূর্ব বাংলার পণ্য প্রায় আধাআধি দেখাতে হয়েছে। গত চব্বিশ বছরে পূর্ব বাংলা থেকে রফতানী-করা পণ্যের আয়ের উপরেই দাঁড়িয়ে থেকেছে পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকারী বৃহৎ ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের সমস্ত জারিজুরি। এই রফতানীর টাকাতে ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠেছে পশ্চিম পাকিস্তানেরর সেই ফড়িয়া বা মুৎসুদ্দী ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিরা, যারা বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের আমলে বৃটিশ পুঁজিপতি সাম্রাজ্যবাদীদের সামান্য বখরা মাত্র পেয়ে দরিদ্র ভারতীয় উপমহাদেশে পুঁজি সঞ্চয় করেছিল।

পূর্ব বাংলার পাট, চা ও চামড়ার কাঁচা টাকায় গত চব্বিশ বছরে উপরি-উক্ত মুৎসুদ্দীদের অংশীদার হয়ে ওঠে—বড় বড় জায়গীরদারদের একটি অংশ যারা জ্যামিতিক হারে টাকা বাড়াবার একটা যন্ত্র খুঁজে পায় এতে এবং এই কারণেই বড় বড় জমির মালিকানা বজায় রেখে বৃহৎ বাঁধা আয়ের ব্যবস্থা রাখার সঙ্গে সঙ্গে কোটি কোটি অলস টাকা নিয়োগ করেছে শিল্প কারখানায় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে বা আমদানী রফতানীতে। এইভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ ভূস্বামীদের একাংশ পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ করার ব্যাপারে বিশেষভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠে মুৎসুদ্দী ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে। আফ্রো-এশিয়া কিংবা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, মায় সামরিক মিত্র তুরস্কে অথবা ইরানে যেখানে এক কোটি টাকা রফতানী বৃদ্ধি করা গলদ্‌ঘর্ম হওয়ার ব্যাপার, সেখানে পূর্ব বাংলায় জ্যামিতিক হারে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদিত পণ্য রফতানী বৃদ্ধি একটা অস্বাভাবিক স্ফীতি দিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের উপরি-উক্ত বনেদী এবং নয়া ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের। নিদারুণ প্রতিযোগিতাময়

আন্তর্জাতিক বাজারে এই ফেঁপে-ওঠা ব্যবসায়ী পুঁজিপতিরা দুই দশক ধরে একটা দরজাই খোলা চেয়েছে এবং সেটা হচ্ছে পূর্ব বাংলা।

এভাবে দ্রুত মুনাফা অর্জন করে সম্পদ গড়ে তোলার পথ খোলা পাওয়ায় মুৎসুদ্দী ব্যবসায়ী পুঁজিপতি এবং বৃহৎ ভূস্বামীদের চক্রে যোগদান করেছে ক্রম-বর্ধমান হারে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক এবং বেসামরিক বড় বড় আমলারা। পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে রক্ষা করার জন্যে এই সামরিক ও বেসামরিক বড় বড় আমলারা যে শেষ পর্যন্ত সমগ্র যুদ্ধ-যন্ত্র নিয়ে পূর্ব বাংলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, এর মূল সূত্র এখানেই। কোন এক সময়ে পূর্ব বাংলার মানুষ যে সামরিক বাহিনীকে রক্ষক মনে করতো এবং যাদের উপর দেশরক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করতেও রাজী হয়েছিল, তারা শুধু বাজেট বরাদ্দের সিংহভাগ নিয়ে খুশি না থেকে পূর্ব বাংলার পশ্চিমী ভক্ষকদের হিস্‌সাদার হয়ে উঠলো উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায়। বিশেষ করে সামরিক ও বেসামরিক কর্তারা পূর্ব বাংলার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ঔপনিবেশিক লুঠেরা হিসেবে। এই সামরিক এবং বেসামরিক কর্তৃমণ্ডলী শুধু সামন্তবাদ পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক বাহিনীর পরিচারক রইল না, তারা ভাগীদারও হয়ে উঠলো। এই কারণেই এক সময়ে বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলে যে সেনাবাহিনী অন্যতম নিয়মানুবর্তী ও করিৎকর্মা সেনাবাহিনী হিসেবে তকমা পেয়েছিল, এবং আনুষ্ঠানিকভাবে বৃটিশ চলে গেলে যে সেনাবাহিনী সীমান্তরক্ষাতেই প্রধানত নিয়োজিত ছিল, তাকে দেখা গেল পূর্ব বাংলায় খোলাখুলিভাবে লুণ্ঠনরত। যে সেনাবাহিনীকে ছয় দফার প্রণেতারাও পূর্ব বাংলা রক্ষার দায়িত্ব দিতে রাজী ছিলেন, তাদেরই দেখা গেল পূর্ব বাংলার নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর আধুনিকতম মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে এবং পূর্ব বাংলার মা-বোনদের ইজ্জত নাশ করতে। এখানে একটা কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করে রাখা দরকার। ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে যাবার পরে পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত অংশে দ্বিজাতিতত্ত্বে প্রভাবিত হলেও সেনাবাহিনী সরাসরি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করে নি। একথা বরং জোর দিয়েই বলা যায় যে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনের সর্বশেষ উপায়। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৫-এ মার্চের পরে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লিপ্ত করা হয়েছে। এই ঘটনা ঘটতে পেরেছে এই কারণে যে, পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে রক্ষা করার একটা শেষ চেষ্টার জন্যে সংশ্লিষ্ট

সামরিক কর্তৃপক্ষ একমাত্র মুনাফার হিসেব এবং নীতিবোধ ছাড়া অন্য যে-কোন হিসেব ও নীতিবোধকে ঝেড়ে মুছে ফেলে দিয়েছে।

অবশ্য এখানেও একটা শ্রেণীবিন্যাস কাজ করেছে। সমরকর্তাদের মধ্যে সকলেই যে পূর্ব বাংলার উপনিবেশ হিসেবে শোষণ করার চক্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা নয়। সমরকর্তাদের মধ্যে যারা বিশেষভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বড় বড় জায়গীরদার জমিদার এবং অভিজাত পুঁজিপতিদের পরিবারভুক্ত হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্তবাদী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদী শোষকগোষ্ঠীর শ্রেণীবিন্যাসে জায়গা করে নিয়েছে, উপরে বর্ণিত অংশীদার হওয়ার পদ্ধতিক্রমে তারাই সামরিক বাহিনীকে প্রত্যক্ষভাবে পূর্ব বাংলাতে ব্যাপক নরহত্যা ও লুঠতরাজ চালানোর অভিযানে নিয়োজিত করেছে এবং বেশ কিছুকাল ধরে তার প্রস্তুতিও চালিয়ে এসেছে। এই বিশেষ সামরিক কর্তারাই শাসক ও শোষকচক্রের অন্যান্য শরিকদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সামরিক বাহিনীর নীতিবোধসম্পন্ন অথবা 'বিবেকবান' অথবা বিভিন্ন জাতি-সত্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী অথবা (এ কথাটা বর্তমান বিশ্বে অবিশ্বাস্য নয়) শোষণ-বিরোধী অংশকে কোণঠাসা করে দিয়েছে অথবা বিতাড়িত করেছে। পূর্ব বাংলার বিরুদ্ধে সামরিক প্রস্তুতির কালে এবং বিশেষ করে ১৯৭১ সালের ২৫-এ মার্চের মুখে এই ঘটনা ঘটেছে।

সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকাকে উপরি-উক্ত সামরিক শোষকচক্রের রক্ষক হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা যখন মুসলিম লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল, তখন বড় বড় জায়গীরদার জমিদার এবং বড় বড় ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের নির্বাচিত প্রতিভূ হিসেবে যাঁরা সরকার গঠন করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন 'রাজনীতিক'। এই 'রাজনীতিক'দের যোগাযোগ ছিল প্রধানত বৃটিশের সঙ্গে। এই 'রাজনীতিক'রা অবশ্য যে প্রশাসনিক কাঠামো এবং সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ওয়ারিস সূত্রে পেয়েছিলেন তাকে অনুগত ওয়ারিসের মতোই অক্ষুণ্ণ রেখে সরকারী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। এই কারণে বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের সামরিক ও বেসামরিক বড় আমলারা দেশরক্ষা ও প্রশাসন-যন্ত্রের নিয়ন্ত্রণকর্তা থেকে যায়। গণবিরোধী ও গণ-বিচ্ছিন্ন সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্র শাসনযন্ত্রের তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জায়গীরদার ও পুঁজিপতিদের কাছ থেকে উৎসাহিত হয়ে পূর্বাপেক্ষা আরও বেশি ক্ষমতাগ্রাসী হয়ে ওঠে। এই

অবস্থায় মার্কিন নয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ যখন পশ্চিম পাকিস্তানে বৃটিশের জায়গায় জমিয়ে বসার জন্যে থাবা বিস্তার করে, তখন তারা রাজনীতিকদের জালে টানবার জন্যে যত না চেষ্টা করেছিল তার থেকে বেশি চেষ্টা করেছিল আমলাতন্ত্রকে বাগাবার। এ কাজটা সহজতরও হয়েছিল, কারণ প্রশাসনিক-যন্ত্র এবং সামরিক বাহিনীর ব্যয়ভার বহনের বাৎসরিক বাজেট বরাদ্দ সমস্যার সমাধান করে দিয়েছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের ডলার বরাদ্দ। সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের উপর ভর করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সোভিয়েট-বিরোধী ও চীনবিরোধী যুদ্ধ-জোট তৈরীর জন্যে রাতারাতি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। উপরি-উক্ত আমলাতন্ত্র পশ্চিম পাকিস্তান-কেন্দ্রিক হওয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান-ভিত্তিক। পূর্ব বাংলাকে শিল্পের দিক দিয়ে বঞ্চিত রেখে বাজার হিসেবে ব্যবহার করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জায়গীরদার জমিদার পুঁজিপতি আমলাতন্ত্র যে-কার্যক্রম গ্রহণ করেছিল তাতে শরিক হয়েছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র যেমন বৃটিশ ও অন্যান্য পশ্চিমী পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগসাজস রেখে মূলত মার্কিনী ডলার-চক্রের সঙ্গে নিজেদের অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করার ব্যবস্থা করেছিল, তেমনি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থও উপরি-উক্ত কায়েমী স্বার্থবাদীদের, সঙ্গে নিজেকে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করেছিল। এই কারণেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রকে শুধু-যে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য দিয়েই পরিপুষ্ট করে তুলেছে তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে এবং বিশেষভাবে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সমর্থনও জুগিয়েছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ চেয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও সম্প্রসারণ। পূর্ব বাংলার শিল্প স্থাপনে অথবা অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে যে-মৌখিক প্রতিশ্রুতি এসেছে নানা সময়ে, সেগুলি মৌখিকই থেকে গিয়েছে। মার্কিনী ও অন্যান্য পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা যে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অঙ্গ, সে সত্যটা চূড়ান্তভাবে ধরা পড়েছে ১৯৭১ সালে ২৫-এ মার্চের পরে।

পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীদের একাংশ পশ্চিমী দেশে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন। এই কারণেও এঁদের মধ্যে যারা মনে করেছিলেন, পূর্ব বাংলার পক্ষে মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্র থাকবে অন্তত মুখরক্ষার জন্যে, তারা হতাশ হয়েছেন। কিন্তু আশা করাটাই হয়েছিল অবাস্তব, কারণ গত ২৪ বছরের ভিতরের সত্য এই যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত থেকেছে এবং সেই চক্রকে ক্রমাগত শক্তিশালী করে এসেছে কোটি কোটি ডলার বরাদ্দ করে। পূর্ব বাংলায় যে-কোন সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক শৈল্পিক উন্নয়ন প্রকল্পের জন্যে এদের কাছ থেকে ডলার বরাদ্দ পাওয়া যায় নি, যদিও সমগ্রভাবে ডলার বরাদ্দ এবং ঋণের দায় পূর্ব বাংলার ঘাড়ে চাপানো হয়। (পূর্ব বাংলা নিশ্চয় এই ঋণের দায়দায়িত্ব স্বীকার করবে না।) যাই হোক দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধু অববাহিকা প্রকল্পে ১৯৬০-৭০ সালে দুই পর্যায়ে মার্কিনী মুরুব্বীরা দু'হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। কিন্তু ১৯৭০ সালেও পূর্ব বাংলার বন্যা প্রতিরোধ মহাপ্রকল্পের কাগজপত্র দাখিল করে এদের কাছ থেকে ২৫০ কোটি টাকার প্রতিশ্রুতিটা পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

তাছাড়া মার্কিন এবং বৃটিশ তথা পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যের ধারাই হচ্ছে ব্যক্তিগত বৃহৎ পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা এবং তথাকথিত 'স্বাধীন' অর্থ-নীতিকে উৎসাহিত করা। অর্থাৎ ধনীকে আরও ধনী করা এবং গরীবকে আরও গরীব করা এদের স্বভাব-নীতি। এরা পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিদের খুদে পুঁজিপতি থেকে বৃহৎ পুঁজিপতিতে পরিণত হতে সাহায্য করেছে। এরা পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ পুঁজিপতিদের তথাকথিত 'স্বাধীন' অর্থনীতির স্টীম রোলারে পূর্ব বাংলার মেহনতী মানুষদের নিষ্পিষ্ট করে দিতে সাহায্য করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববাংলার নিজস্ব পুঁজি গড়ে ওঠার ব্যাপারটাকে দমিয়ে রাখার জন্যেও পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীদের নগদ অর্থ, যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র জুগিয়েছে। এদের 'স্বাধীন' অর্থনীতি পূর্ব বাংলাকে পরাধীন করে রাখারই কায়েমী ব্যবস্থা হিসেবে কার্যকরী হয়ে এসেছে গত চব্বিশ বছর ধরে। এ অবস্থায়, পূর্ব-বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের কবল থেকে মুক্ত হবার জন্যে যে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে, তাকে বার বার বিশেষ করে মার্কিন এবং সাধারণভাবে বৃটিশ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে নিয়োজিত হতে হয়েছে। অবশ্য এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সাধারণত অদৃশ্য থাকে বলেই সব সময় এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ মোকাবেলা হয় নি।

॥ ৪ ॥

মুক্তিসংগ্রামের পক্ষভুক্ত শক্তিসমূহের শ্রেণী ভূমিকা

১৯৪৭-৪৮ থেকেই, অর্থাৎ প্রথমাবধি, পশ্চিম পাকিস্তানের জমিদার জায়গীরদার পুঁজিপতি সামরিক বেসামরিক বড় আমলা ও সাম্রাজ্যবাদী কায়েমী স্বার্থের জোট পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে দেখেছে এবং সেইভাবেই চূড়ান্ত ভাবে শোষণ করার ব্যবস্থা পাকাপাকি করতে চেয়েছে।

সুতরাং একটা উপনিবেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের যে ব্যাপক সামাজিক ভিত্তি থাকে, বা যে সংগ্রামী বহুশ্রেণী-ভিত্তিকতা থাকে, পূর্ব বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে সে ব্যাপারটা ঘটেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী ঔপনিবেশিক চক্রের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সাল থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের যে সংগ্রামের সূচনা, সেখানে শ্রেণীসত্তা অপেক্ষা জাতিসত্তা প্রবলতর থেকেছে। শুধু তাই নয়, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে ভিত্তি করে বাঙ্গালী জাতিসত্তার বৈপ্লবিক বিকাশও ঘটেছে। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের সূত্রপাত এবং বাংলা ভাষা এখানে পূর্ব বাংলায় জাতিসত্তার মূল প্রাণোপকরণ হিসেবে সামনে এসেছে। যে-কোন ভাষার জাতিগত রূপটাই প্রধান, এর শ্রেণীরূপ গৌণ থাকে। এই কারণে বাংলা ভাষার সংগ্রাম ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রামে নিয়োজিত বিভিন্ন নিপীড়িত শ্রেণীকে একত্রিত রাখার ব্যাপারে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

তবু পূর্ব বাংলার বিশেষ বিশেষ শ্রেণী মুক্তিসংগ্রামে বিশেষ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে শ্রেণীগত ভাবেও। মুক্তিসংগ্রামের পর্যায়ে পর্যায়ে পূর্ব বাংলার শ্রেণী-সজ্জা কিছুটা নতুন করে বিন্যস্ত হয়েছে এবং আগামী দিনে এ দিকটা আরও স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে। বৈপ্লবিক মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী মানুষের কার্যকারিতা তার শ্রেণীসত্তার তীব্রতা এবং সংগঠন শক্তির মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপে প্রকাশ পেতে পারে। সামগ্রিকভাবে অন্যান্য সংগ্রামী শ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রেও এটা সত্য। শ্রমিক ও কৃষকেরা নিজ নিজ শ্রেণী সংগঠনের মারফত সংগ্রামে না নামলে সেই সংগ্রামকে সম্মিলিত করার ক্ষেত্রেও সঠিক ও পূর্ণ শক্তি জোগাতে পারে না। শ্রমিক ও কৃষকের নিজস্ব সচেতন শ্রেণী-

সংগঠন মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী জাতিকে দুর্বল না করে শক্তিশালী করে। পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রেও এ সত্য প্রযোজ্য। খুব বেশি করেই প্রযোজ্য এবং প্রমাণিত।

সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে দেখা যাবে, পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের লক্ষ্য নিরূপণ করতে গিয়ে যখনই এক একটি দফা রচিত হয়েছে, তখনই জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ চাহিদাগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে এসব দফায়। কারণ, এই বিন্যাসের মধ্য দিয়ে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সনদে প্রত্যেকটি সংগ্রামী শ্রেণীর অংশীদারিত্বকে দেবার চেষ্টা হয়েছে স্বীকৃতির একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা।

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় তদানীন্তন সমস্ত সরকার-বিরোধী দলকে নিয়ে সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল, তার সনদ হিসেবে রচিত হয়েছিল একুশ দফা। এই একুশ দফার দিকে নজর দিলেই আমরা দেখতে পাব, কিভাবে সামগ্রিকভাবে পূর্ব বাংলার সমস্ত নির্যাতিত মানুষের এবং বিশেষভাবে বিভিন্ন সংগ্রামী শ্রেণীর অধিকার ও প্রয়োজন-সংক্রান্ত দাবীকে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল।

একুশ দফার মূল ছকটিকে নিম্নোক্ত চুম্বকে সাজিয়ে দেওয়া যায়ঃ

(১) পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র দফতর এবং মুদ্রা বাদে অন্যান্য সকল বিষয় প্রাদেশিক দায়িত্বে।

(২) সেনাবাহিনীর পরিচালকমণ্ডলী এবং নৌ-দফতরের অবস্থান করাচী থেকে পূর্ব বাংলায় স্থানান্তরিত হবে এবং পূর্ব বাংলায় অস্ত্র-কারখানা স্থাপন করা হবে।

(৩) বাংলা হবে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতা-মূলক। শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

(৪) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী স্বত্বের উচ্ছেদ করা হবে। বাড়তি জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। যুক্তিসঙ্গত হারে খাজনার পরিমাণকে নামিয়ে আনা হবে। সার্টিফিকেট প্রথা (অর্থাৎ ঋণের দায়ে জমি নিলাম) রহিত করা হবে।

(৫) কৃষি সমবায় স্থাপন। জলসেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য সমস্যার সমাধান। দুর্ভিক্ষের চিরন্তন ভীতি দূর করা।

॥ ৪ ॥

মুক্তিসংগ্রামের পক্ষভুক্ত শক্তিসমূহের শ্রেণী ভূমিকা

১৯৪৭-৪৮ থেকেই, অর্থাৎ প্রথমাবধি, পশ্চিম পাকিস্তানের জমিদার জায়গীরদার পুঁজিপতি সামরিক বেসামরিক বড় আমলা ও সাম্রাজ্যবাদী কায়েমী স্বার্থের জোট পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ হিসেবে দেখেছে এবং সেইভাবেই চূড়ান্ত ভাবে শোষণ করার ব্যবস্থা পাকাপাকি করতে চেয়েছে।

সুতরাং একটা উপনিবেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের যে ব্যাপক সামাজিক ভিত্তি থাকে, বা যে সংগ্রামী বহুশ্রেণী-ভিত্তিকতা থাকে, পূর্ব বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের ক্ষেত্রে সে ব্যাপারটা ঘটেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী ঔপনিবেশিক চক্রের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সাল থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের যে সংগ্রামের সূচনা, সেখানে শ্রেণীসত্তা অপেক্ষা জাতিসত্তা প্রবলতর থেকেছে। শুধু তাই নয়, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে ভিত্তি করে বাঙ্গালী জাতিসত্তার বৈপ্লবিক বিকাশও ঘটেছে। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের সূত্রপাত এবং বাংলা ভাষা এখানে পূর্ব বাংলায় জাতিসত্তার মূল প্রাণোপকরণ হিসেবে সামনে এসেছে। যে-কোন ভাষার জাতিগত রূপটাই প্রধান, এর শ্রেণীরূপ গৌণ থাকে। এই কারণে বাংলা ভাষার সংগ্রাম ঔপনিবেশিকতাবিরোধী সংগ্রামে নিয়োজিত বিভিন্ন নিপীড়িত শ্রেণীকে একত্রিত রাখার ব্যাপারে একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

তবু পূর্ব বাংলার বিশেষ বিশেষ শ্রেণী মুক্তিসংগ্রামে বিশেষ বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে শ্রেণীগত ভাবেও। মুক্তিসংগ্রামের পর্যায়ে পর্যায়ে পূর্ব বাংলার শ্রেণী-সজ্জা কিছুটা নতুন করে বিন্যস্ত হয়েছে এবং আগামী দিনে এ দিকটা আরও স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসবে। বৈপ্লবিক মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী মানুষের কার্যকারিতা তার শ্রেণীসত্তার তীব্রতা এবং সংগঠন শক্তির মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপে প্রকাশ পেতে পারে। সামগ্রিকভাবে অন্যান্য সংগ্রামী শ্রেণীর সঙ্গে মিলিত হয়ে সংগ্রাম করার ক্ষেত্রেও এটা সত্য। শ্রমিক ও কৃষকেরা নিজ নিজ শ্রেণী সংগঠনের মারফত সংগ্রামে না নামলে সেই সংগ্রামকে সম্মিলিত করার ক্ষেত্রেও সঠিক ও পূর্ণ শক্তি জোগাতে পারে না। শ্রমিক ও কৃষকের নিজস্ব সচেতন শ্রেণী-

সংগঠন মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী জাতিকে দুর্বল না করে শক্তিশালী করে। পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রেও এ সত্য প্রযোজ্য। খুব বেশি করেই প্রযোজ্য এবং প্রমাণিত।

সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে দেখা যাবে, পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের লক্ষ্য নিরূপণ করতে গিয়ে যখনই এক একটি দফা রচিত হয়েছে, তখনই জনগণের বিভিন্ন শ্রেণীর বিশেষ বিশেষ চাহিদাগুলিকে বিন্যস্ত করা হয়েছে এসব দফায়। কারণ, এই বিন্যাসের মধ্য দিয়ে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের সনদে প্রত্যেকটি সংগ্রামী শ্রেণীর অংশীদারিত্বকে দেবার চেষ্টা হয়েছে স্বীকৃতির একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা।

১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় তদানীন্তন সমস্ত সরকার-বিরোধী দলকে নিয়ে সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে যে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল, তার সনদ হিসেবে রচিত হয়েছিল একুশ দফা। এই একুশ দফার দিকে নজর দিলেই আমরা দেখতে পাব, কিভাবে সামগ্রিকভাবে পূর্ব বাংলার সমস্ত নির্যাতিত মানুষের এবং বিশেষভাবে বিভিন্ন সংগ্রামী শ্রেণীর অধিকার ও প্রয়োজন-সংক্রান্ত দাবীকে সন্নিবেশিত করা হয়েছিল।

একুশ দফার মূল ছকটিকে নিম্নোক্ত চুম্বকে সাজিয়ে দেওয়া যায় :

(১) পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র দফতর এবং মুদ্রা বাদে অন্যান্য সকল বিষয় প্রাদেশিক দায়িত্বে।

(২) সেনাবাহিনীর পরিচালকমণ্ডলী এবং নৌ-দফতরের অবস্থান করাচী থেকে পূর্ব বাংলায় স্থানান্তরিত হবে এবং পূর্ব বাংলায় অস্ত্র-কারখানা স্থাপন করা হবে।

(৩) বাংলা হবে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতা-মূলক। শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা।

(৪) বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী স্বত্বের উচ্ছেদ করা হবে। বাড়তি জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যুক্তিসঙ্গত হারে খাজনার পরিমাণকে নামিয়ে আনা হবে। সার্টিফিকেট প্রথা (অর্থাৎ ঋণের দায়ে জমি নিলাম) রহিত করা হবে।

(৫) কৃষি সমবায় স্থাপন। জলসেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য সমস্যার সমাধান। দুর্ভিক্ষের চিরন্তন ভীতি দূর করা।

(৬) পাট ব্যবসা জাতীয়করণ। পাটচাষীদের পাটের ন্যায্য মূল্য প্রদান। ফাটকা বাজারী বন্ধ করা।

(৭) পূর্ব বাংলার শিল্পায়ন। লবণ উৎপাদন বৃদ্ধি। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবস্থার উন্নতিসাধন।

(৮) প্রশাসন যন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণ। মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান। নিরাপত্তা আইন প্রত্যাহার। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, বিচার বিভাগ ও শাসন বিভাগের পৃথক্‌করণ। শরণার্থীদের (মোহাজের) পূর্ণ অধিকার প্রদান এবং তাদের অবস্থার উন্নতি-সাধন।

(৯) দুর্নীতি উচ্ছেদ।

(১০) উচ্চপদস্থ এবং নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বেতনের হারের পুনর্বিন্যাস এবং তারতম্য হ্রাস।

(১১) মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকার বেশি হবে না।

(১২) আই. এল. ও.'এর বিধান-অনুযায়ী শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা বিধান।

উপরি-উক্ত সনদের দফাগুলি থেকে বুঝতে পারা যায়, মোটামুটি চারটি শ্রেণীর দাবীকে এতে বিশেষভাবে সামনে রাখা হয়েছিল : যথা (১) কৃষক, (২) জাতীয় বুর্জোয়া বা উদীয়মান স্থানীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী, (৩) শ্রমিক, (৪) মধ্যবিত্ত। এই শ্রেণীগুলির ভূমিকার একটা বিশ্লেষণ এই সূত্রে করা যেতে পারে :

(১) কৃষক-প্রধান বাংলাদেশে বিশেষ করে দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষীরাই যে কৃষক-সমাজের অপরিমেয় অধিকাংশ এবং পূর্ব বাংলার মুক্তি আন্দোলনে বৈপ্লবিক গতিবেগ সৃষ্টি করার ব্যাপারে দরিদ্র এবং ভূমিহীন চাষীরাই যে গ্রামাঞ্চলে মূল রাজনৈতিক শক্তি, এ সত্য একুশ দফার একাধিক ধারায় প্রকাশ পেয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের প্রবঞ্চক ভূমিনীতি বা কৃষকনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম একুশ দফায় দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষীর পক্ষপাতী প্রস্তাব প্রণয়নে সহায়ক হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের মধ্যে প্রাধান্য ছিল বৃহৎ জায়গীরদার ও জমিদারদের। পূর্ব বাংলায় ১৯৫০ সালে মধ্যস্বত্ব বিলোপের আইন জারী করে যে জমিদারী স্বত্ব ক্রয়ের ব্যবস্থা হয় তাতে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থার সঙ্গে ১০০ বিঘা পর্যন্ত সর্বোচ্চ মালিকানা নির্ধারিত করা হয়েছিল। এ আইন

ছিল ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের। অপরদিকে সরকার-বিরোধী দলগুলির মধ্যে ধনী কৃষক ও জোতদারদের প্রতি নির্দিষ্ট শত্রুতা না থাকলেও তারা প্রধানত মুসলিম লীগের জোতদার-প্রবণ মনোভাবের বিপরীত মেরু থেকেই কৃষক সমস্যাকে দেখতে চেষ্টা করে। এই কারণেই তারা দরিদ্র ও ভূমিহীন চাষীদের দাবীকে সামনে আনে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে যে, কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের মুখপাত্র মুসলিম লীগ সরকার ১০০ বিঘা পর্যন্ত সর্বোচ্চ মালিকানার দফা-সমন্বিত জমিদারী স্বত্ব ক্রয় আইনের প্রয়োগকেও স্থগিত রেখেছিল এবং পরবর্তী কালে সামরিক শাসনের আমলে ১০০ বিঘাকে ৩০০ বিঘাতে উন্নীত করে নিয়েছিল।

ঔপনিবেশিক কায়েমী স্বার্থবাদী শাসক ও শোষকচক্র এভাবে গ্রামাঞ্চলে একটা বিশেষ ভূমিস্বার্থবাদী (সামন্তবাদী) গোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে নিজেদের অবস্থানকে পূর্ব বাংলার গ্রামাঞ্চলে শক্ত করে রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে। পরবর্তী কালে আইয়ুব খানের আমলে বিশেষ ভূম্যধিকারী স্বার্থবাদীদের পোষণ করার ব্যবস্থা মৌলিক গণতন্ত্রের পরগাছা প্রথা দ্বারা পাকাপাকি করার চেষ্টা হয়। আইয়ুব খানের আমলে বিত্তহীন চাষীর সংখ্যা এই কারণেই বেড়ে যায় এবং বিত্তবান ধনী কৃষক ও জোতদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উপরি-উক্ত সামন্তবাদী শোষণ ব্যবস্থারই আরেকটি দিক, পূর্ব বাংলার কৃষকের গায়ের রক্ত জল করে তৈরী পাটের উপর লাহোর-করাচী-রাওয়ালপিণ্ডির ঔপনিবেশিক চক্রের পুঁজিবাদী খপ্পর। কাঁচা পাটের ব্যবসা এবং পাট শিল্পে পুঁজি নিয়োগ করে শতকরা দুই শতাংশ মুনাফা লুণ্ঠনের ব্যবস্থা করেছে এই শাসক-শোষক সাম্রাজ্যবাদী চক্র তাদের ইঙ্গ-মার্কিন পৃষ্ঠপোষকদের সাহায্যে।

ঔপনিবেশিক চক্রের পুঁজিবাদী সামন্তবাদী বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার অপরিমেয় অধিকাংশ নিঃস্ব রিক্ত দরিদ্র কৃষকের সুদূরপ্রসারী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রাথমিক মৌলিক সনদ হিসেবে রচিত হয়েছিল একুশ দফা।

পরবর্তী কালে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম আরও কয়েকটি সনদ রচনা করেছে। যেমন, ১৯৬২-৬৩ সালে আইয়ুব-বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা এন. ডি. এফ-এর ১৭ দফা, ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা এবং ১৯৬৮-৬৯ সালে সংগ্রামী ছাত্র-সংস্থাসমূহের ১১ দফা। এই তিনটি সনদের প্রথমটিতে পূর্ণ গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার দাবী, দ্বিতীয়টিতে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবী

এবং তৃতীয়টিতে সামন্তবাদী-পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান করে পূর্ব বাংলার জনগণের শোষণমুক্তির একটি ছোটখাট পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচীর প্রাথমিক খসড়া দাখিল করা হয়। পরবর্তী দু'টি সনদই একুশ দফা সনদের একার্থে পরিপূরক। যেমন দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়, একুশ দফার মধ্যে সরাসরি-ভাবে মার্কিন কিংবা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা লিপিবদ্ধ হয় নি, যদিও সাম্রাজ্যবাদী কব্জা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একুশ দফার পাশাপাশি বিভিন্ন সংগ্রামী দলিলপত্র তৈরী হয়েছিল। শেষপর্যন্ত ১১ দফা সনদে সরাসরি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

একুশ দফার ভিত্তিতেই পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের পক্ষভুক্ত বিভিন্ন সংগ্রামী দলের কর্মসূচী প্রণীত হয়েছে একাদিক্রমে। সুতরাং, নিঃস্ব রিক্ত দরিদ্র কৃষক শ্রেণী ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত মুক্তিসংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকচক্রের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত বৈপ্লবিক শক্তি হিসেবে কাজ করে এসেছে, এর মধ্য দিয়ে ক্রমাগত প্রসার লাভই করে এসেছে। এই বিরাট কৃষকশক্তি শত বঞ্চনা-লাঞ্ছনার মধ্যেও নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। বরং কৃষক-শক্তি একদিকে যেমন পূর্ণ গণতন্ত্র এবং পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামের মূল শক্তিভাণ্ডার বা রিজার্ভ হিসেবে কাজ করে এসেছে, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কার্যক্রমে ও চিন্তা চেতনায় অংশীদার হওয়ার দরুন সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী কার্যক্রমেরও মূল সম্ভাব্য সহযোগী হিসেবে গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ কৃষক বিপ্লব যে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে জাতীয় বুর্জোয়া বা স্থানীয় পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ী-গোষ্ঠীর হাতকে শক্তিশালী করেই ক্ষান্ত থাকে নি, বরং জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে শ্রমিক কৃষকের পূর্ণাঙ্গ মুক্তির দিকেই অগ্রসর করে নিয়ে এসেছে, ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সালের ঘটনাবলীতে তারই গতিধারা পরিস্ফুট।

এখানে আরও একটা কথা মনে রাখলে ভাল হয়। পূর্ব বাংলায় ১৯৪৭ সালের পূর্বেকার বহু সংগ্রামের ঐতিহ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল কৃষক আন্দোলন ও সংগঠন। সাম্রাজ্যবাদ-সামন্তবাদ-পুঁজিবাদের সাবেক প্রতিভূ বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খল ছিন্ন করার সংগ্রামে পূর্ব বাংলার নির্যাতিত কৃষক সমাজ যে বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তা পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে নিয়োজিত হয়েছে।

(২) পূর্ব বাংলার উঠতি জাতীয় বুর্জোয়া বা স্থানীয় শিল্পপতি ব্যবসায়ী

অথবা সম্ভাব্য শিল্পপতি ব্যবসায়ীরা পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ের সনদ নির্ণয়ে কমবেশি উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে এসেছে। যে বিরোধ এর মূলে কাজ করেছে তা একই সঙ্গে শ্রেণীগত ও দেশগত। পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের শিল্পায়নকে স্তব্ধ করে রেখে দিয়েছে রাওয়ালপিণ্ডি-করাচী-লাহোরের ঔপনিবেশিক শোষক ও শাসকচক্র। প্রধানত, পূর্ব বাংলার পাট রপ্তানীর টাকায় অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় করাচী-লাহোর-রাওয়ালপিণ্ডি-ইসলামাবাদের আওতায় গড়ে তোলা হয়েছে আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থা। এই বঞ্চনা এবং সম্পদ অপহরণের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার সম্ভাব্য শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা শ্রেণীগতভাবে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং এই বঞ্চনা আর শোষণের অবসান করে পূর্ব বাংলার শিল্পায়নের দাবীতে শ্রেণীগত তাগিদে এগিয়ে এসেছে দেশগত মুক্তির সংগ্রামী কার্যক্রমে। পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের শিল্পায়নের তাগিদ পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের সমস্ত কার্যক্রমের অন্যতম মৌলিক তাগিদ। নিপীড়িত জনগণের সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের তথা কৃষক, শ্রমিক আর মধ্যবিত্তেরও দারিদ্র্যের চক্র থেকে বেরিয়ে আসার পথ হিসেবেই শিল্পায়নের তাগিদ চিহ্নিত হয়েছে বিভিন্ন সংগ্রামী সনদে। পূর্ব বাংলার শিল্পায়নের কার্যক্রম একুশ দফার অন্যতম দফা, ছয় দফার কেন্দ্রীয় দফা, এগারো দফার অন্যতম দফা। জাতীয় মুক্তির এই বিকাশমান দফাগুলিতে স্বাধীনতার উপকরণগত ভিত্তি তৈরীর ব্যাপারে পূর্ব বাংলার জনগণের বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তর একটা সম্মিলিত কার্যক্রমে দাঁড়াতে পেরেছে। পূর্ব বাংলার জাতীয় বুর্জোয়ার অবস্থান রয়েছে এর মধ্যে।

পূর্ব বাংলার শিল্পায়নকে ঔপনিবেশিক দখলদাররা সরকারী ভাবে ঠেকিয়ে রেখে এসেছে। অপরদিকে পূর্ব বাংলার স্থানীয় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিভিন্নভাবে সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করেছে স্থানীয় পুঁজির ভিত্তিতে মিল কারখানা গড়ে তুলে। এই স্থানীয় পুঁজি-নিয়োগকারী জাতীয় বুর্জোয়ারা পূর্ব বাংলার পরনির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপনের তাগিদের ব্যাপারে এদিক দিয়ে সহায়ক শক্তি হিসেবেই কাজ করে এসেছে। এবং এই কারণেই মুক্তিসংগ্রামের সনদ তৈরীর ব্যাপারে জাতীয় বুর্জোয়ারা সামগ্রিকভাবেও কথা বলতে চেষ্টা করেছে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে গণ-অভ্যুদয়গুলিতে শরিক হয়েছে।

(৩) তৃতীয় যে শ্রেণীশক্তি পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের অন্যতম মূলাধার হিসেবে কাজ করে এসেছে, সে হচ্ছে সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণী।

পূর্ব বাংলার সংগ্রামী শ্রমিকশক্তির বিকাশকে দু'টি পর্যায়ে ভাগ করে নেয়া যায়।

১৯৪৭ সালের পূর্বেই গড়ে উঠেছিল পূর্ব বাংলায় একটা শক্তিশালী শ্রমিক আন্দোলন, যা প্রধানত বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করার সংগ্রামে নিয়োজিত ছিল। সূতাকল, রেল এবং চা বাগান ও স্টীমারের শ্রমিকেরা গড়ে তুলেছিল শক্তিশালী সংস্থা।

কিন্তু প্রথমত ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের টানাপোড়েনে এইসব সংস্থার ভিতগুলি বেশ কিছুটা নড়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিকগোষ্ঠী পশ্চিমে পূর্বে তাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ভেঙে দেবার জন্যে শ্রমিক শক্তির উপর হেনেছিল প্রচণ্ড আঘাত।

ইতিহাসের দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারায় পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্রে একটা বিচার্য সত্য এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর-করাচী-রাওয়ালপিণ্ডির পুঁজিপতি-জায়গীরদার-সাম্রাজ্যবাদী-গোষ্ঠীর প্রতিপক্ষ হিসেবে পূর্ব বাংলায় জাতীয় বুর্জোয়া সংগঠিত হওয়ার পূর্বে সংগ্রামী সংগঠিত কৃষকদের মতো শ্রমিকেরাই ছিল সংগঠিত সংগ্রামী শক্তি। এই কারণে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী শ্রমিকশক্তি উপরি-উক্ত নয়া ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকচক্রের বিষ নজরে পড়েছিল। সংগ্রামী শ্রমিকদের উপর নেমে এসেছিল প্রচণ্ড দমননীতি।

শ্রমিকশ্রেণী অবশ্য হাল ছাড়ে নি। শ্রমিকশ্রেণী পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের প্রত্যেকটি পর্যায়ে ক্রমবর্ধমান শক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। ১৯৫৪ সালেই শ্রমিকশ্রেণী তার সংগ্রামী সংগঠিত শক্তি নিয়ে মুক্তিসংগ্রামের পুরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছিল। একুশ দফায় শ্রমিক-সংক্রান্ত দফাতেই এর প্রমাণ পাওয়া যায়। পরবর্তী এগারো দফায় রয়েছে এই প্রমাণেরই ফলশ্রুতি।

শ্রমিকশ্রেণী তার নিজস্ব শ্রেণীগত দাবী বা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দাবীর সংগ্রাম চালিয়েও পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশের সাধারণ মুক্তিসংগ্রামকে শক্তি জুগিয়ে এসেছে।

পূর্ব বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে কৃষক সমাজের নির্যাতিত স্তরগুলির যে সংযোগ রয়ে গিয়েছে, সেটি তার বৈপ্লবিক শ্রেণীগত ভূমিকা পালনের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে বাধ্য।

পূর্ব বাংলা অতীতে তাঁতের দেশ ছিল। ইংরেজের আমলেও মোটা কাপড় বোনা হতো। ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলা সামান্যই যন্ত্রশিল্প পেয়েছিল, তবে তাঁতে সে সমৃদ্ধ ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র তাদের মিলের কাপড় পূর্ব বাংলায় চালান দেবার জন্যে তাঁতগুলির সূতা সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এর ফলে ক্রমান্বয়ে গ্রাম ছেড়ে তাঁতিরা শহরের বস্তিতে শ্রমিক হয়েছে। জমি হারিয়েও ছোট ছোট চাষীরা ভিড় করেছে পশ্চিমী টাকার তৈরী পাটকলে। পূর্ব বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর অধিকাংশই ১৯৫০-৫১ সালের পর গ্রামীণ সমাজ থেকে এইভাবে বেরিয়ে এসেছেন। কৃষি-কাজের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক ১৯৭১ সালেও নিকট থেকেছে। এদিক দিয়ে যন্ত্রশিল্পে জীবনের অভিজ্ঞতা এখনও পূর্ব বাংলার শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে গভীরভাবে বসতে পারে নি এবং এই কারণে শ্রমিক শ্রেণীর ঐতিহাসিক বৈপ্লবিক সচেতনতা গড়ে ওঠার ব্যাপারে অসম্পূর্ণতার দরুন অসুবিধা থেকে যাবার কথা। অপরদিকে অবশ্য কৃষক-শ্রমিক মৈত্রীর ব্যাপারে শ্রমিক-শক্তির সামাজিক নৈকট্যের দরুন সুবিধা হবারই কথা।

পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি কৃষকের সমাজকে একটা সংগ্রামী অগ্রফলক জোগানোর ব্যাপারে শ্রমিকশক্তি বিভিন্ন সময়ে উদ্যোগে নিয়ে কাজ করেছে এবং আগামীকালেও করতে পারবে।

ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকচক্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে পূর্ব বাংলার শিল্পায়নের সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় বুর্জোয়ার সহযোগী। কিন্তু পুঁজিপতি ব্যবসায়ী বুর্জোয়ার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর একটা সহজাত ঐতিহাসিক বিরোধকেও হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে ভবিষ্যৎকে বোঝবার ব্যাপারে।

লাহোর-করাচী-রাওয়ালপিণ্ডির ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী চক্রের বিরুদ্ধে আপোষহীন মুক্তিসংগ্রামের পটভূমিতে এ বিরোধ পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে নি এবং করবে না। কিন্তু পূর্ব বাংলার মুক্তির অর্থই হবে সর্বপ্রকার শোষণ থেকে মুক্তি, এবং এ কারণেই শ্রমিকশক্তি জাতীয় বুর্জোয়ার তুলনায় পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের নেতৃত্ব করতে এবং মুক্তিসনদ রচনায় অধিকতর উদ্যোগী এবং সচেষ্ট হবে এটা অনিবার্য।

(৪) মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে ফেলা যেতে পারে, কৃষক, শ্রমিক এবং জাতীয় বুর্জোয়া ছাড়া সমাজের বাকি অংশের মধ্যে শহর ও গ্রামাঞ্চলের নিম্নবিত্ত ও মাঝামাঝি ধরনের বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের এবং প্রধানত বুদ্ধিজীবীদের।

পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত বুদ্ধিজীবী অংশ শ্রমিকশ্রেণীর মতো ১৯৪৭ সালের অনেক আগেই নিজেদের শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের একাংশ প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে মুসলিম হিসেবে নিজেদের একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চেতনার রূপরেখা ধরে এগিয়ে আসতে আসতে অবশেষে লাহোরের পাকিস্তান প্রস্তাবে উপনীত হলেও সেখানে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম আবাসভূমির রাষ্ট্রীয় সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে পূর্বাঞ্চল বা বাংলাদেশের একটা স্বতন্ত্র সার্বভৌমত্বের ছকও নির্ধারিত করেছিল।

এখানে প্রমাণিত হয় মুসলিম মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের দূর চিন্তার সক্ষমতা অথবা সম্ভাব্যতা।

১৯৪৮-৪৯ সালে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের রূপরেখা নির্ণয়ের প্রাথমিক দায়িত্বভারও গ্রহণ করে উপরি-উক্ত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-গোষ্ঠী।

মুক্তিসংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-শ্রেণী থেকেই আসে পূর্ব বাংলার নয়া ইতিহাস সৃষ্টিকারী ছাত্রসমাজ, যারা '৪৮ এবং '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সূত্রপাত পর্যন্ত প্রত্যেকটি গণ-অভ্যুদয়ে কার্যকর নেতৃত্ব দিয়েছে। ইতিমধ্যে ক্রমে ক্রমে পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজের শ্রেণীসজ্জার কাঠামোর পরিবর্তন রয়েছে বলেই ছাত্রছাত্রীরা মুক্তি-সংগ্রামের বৈপ্লবিক নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত রয়েছে প্রতিটি ধাপে অনায়াসেই। ছাত্রসমাজে কৃষক ও অন্যান্য মেহনতী ঘরের ছেলেমেয়েদের অনুপাত বৃদ্ধি পাওয়াতেই ঘটনাটা ঘটেছে।

কিন্তু শ্রেণীকাঠামোর দিক দিয়ে পরিবর্তন এলেও ছাত্রসমাজের নেতৃত্বে ১৯৭১ সাল পর্যন্তও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের ছেলেমেয়েদেরই প্রাধান্য রয়েছে নীতিগত ও কর্মসূচীগত রূপরেখা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। শ্রমিক কৃষকের মতো বুকের রক্ত ঢেলেই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের ছেলেমেয়েরা এই প্রাধান্যের দাবীদারও হতে পেরেছে।

মধ্যবিত্তশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী অংশ থেকেই এসেছে পূর্ব বাংলার আরেকটি উদ্যোগী সংগ্রামী ধারার বাহক—সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীবৃন্দ, যাঁরা একদিকে যেমন ১৯৪৮ সালেও যথাযোগ্য বেতন ও মর্যাদার দাবীতে ধর্মঘট করে পথে নেমেছিলেন, তেমনি ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক মার্চ মাসের অসহযোগ

সংগ্রামে সর্বস্ব পণ করে শরিক হতে দ্বিধা করেন নি। বিশেষ করে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী ফেব্রুয়ারীর বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুদয়ে ঢাকা নগরীর গণ-উত্থানগুলিতে ছাত্রসমাজ এবং শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে সরকারী বেসরকারী কর্মচারীরা এমনভাবে শরিক হয়ে ছিলেন যে, দেখে মনে হয়েছে, তারাও সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীরই অংশ, "শৃঙ্খল ছাড়া তাঁদের আর কিছু হারাবার নেই।"

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছেন পূর্ব বাংলার মুক্তি-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বিভিন্ন সংগ্রামী রাজনৈতিক দলের সংগঠকবৃন্দ। এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী অংশ থেকেই বেরিয়ে এসেছেন পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে নব নব দিগন্তের সন্ধানী ও সৃজনশীল সংগ্রামী লেখক লেখিকা ও শিল্পীরা। এই মধ্যবিত্তরাই সৃষ্টি করেছে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী সাহিত্য শিল্পকলা, রাজনৈতিক তত্ত্ব। এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী অংশই পূর্ব বাংলায় নারী-সমাজকে দিয়েছে সর্বাঙ্গীণ মুক্তির ছাড়পত্র, যে-কারণে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের সমস্ত পর্যায়ে নারীসমাজ একটি বিশিষ্ট সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করতে পেরেছে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দোদুল্যমান-চিত্ততা একটি ঐতিহাসিক সত্য। একদিকে চরম আত্মত্যাগে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা ঝাঁপ দিতে দ্বিধা করে নি, অপরদিকে প্রতিক্রিয়া যখন বাসা বেঁধেছে তখন মধ্যবিত্তদের একাংশ গতানুগতিক জীবনে আবদ্ধ থাকতে কিংবা আপোষরফার হাত ধরতে সাময়িকভাবে হলেও ইতস্তত করে নি। অন্তত এ ধরনের বুদ্ধিজীবীদের মনের কথা যাই থাক, বাইরে থেকে সে কথাই মনে হয়েছে। কিন্তু পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের চরিত্র হচ্ছে এই যে, কোন সংগ্রামী শ্রেণীরই দ্বিধা সঙ্কোচ দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। মধ্যবিত্তশ্রেণীর দ্বিধা সঙ্কোচও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বস্তুত পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-শ্রেণী একটি সম্প্রসারণশীল সমাজ। এর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে এসেছে কোন কোন সময়ে জ্যামিতিক হারে। শিল্পায়নের দ্বার রুদ্ধ থাকার দরুন, শিক্ষার বিস্তারের দুর্নিবার তাগিদ নিয়ে গ্রামীণ সমাজের মধ্য থেকে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী সমাজ শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় পরিমাণগতভাবে অনেক বেশি বেড়েছে। এ অবস্থায় পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ভূমিকা বরাবরই প্রাধান্য বিস্তার করে এসেছে। আগামী দিনেও মুক্তিসংগ্রামকে পুরোপুরি সার্থক করে তোলার কাজে মধ্যবিত্তশ্রেণী তার এতাবৎকালের বৈপ্লবিক উপাদানগুলিকে রক্ষা করতে পারলে শ্রমিক ও কৃষকদের সহযোগী হিসেবে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যেই থেকে যাবে।

অবশ্য এ ভূমিকা বজায় রাখার জন্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রগতিশীল অগ্রফলককে সর্বদাই সজাগ ও উদ্যোগী থাকতে হবে এবং চিন্তাচেতনাকে অবিকৃতভাবে প্রসারিত করে নিয়ে যেতে হবে।

॥ ৫ ॥

জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে জাতীয় ঐতিহ্যের উপাদান

পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে বাংলাদেশ তথা পূর্ব বাংলার জাতীয় ঐতিহ্যের উপাদান-সম্পর্কিত প্রশ্নটি মূলত বাঙ্গালীত্বের প্রশ্ন।

একে বাংলাদেশের অথবা বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির প্রশ্ন হিসেবেও উপস্থিত করা যেতে পারে। এখানে দুই ভাবে বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতি পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়েছে।

প্রথমত, বাংলাভাষা এবং এই ভাষায় রচিত হাজার বছরের সাহিত্য পূর্ব বাংলার বাসিন্দাদের পৃথক রাজনৈতিক জাতীয় সত্তা দেবার ব্যাপারে তৈরী উপাদান হিসেবে কাজ করেছে।

দ্বিতীয়ত, একটি বিশেষ এলাকায় বিশেষ জাতিগত বৈশিষ্ট্য দাখিল করার ব্যাপারে হাজার হাজার বছরের পরিশীলিত সঞ্চয় এবং ভুবন-বিদিত ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত জাতিগত ঐক্যের উৎস হিসেবে কাজ করেছে বাঙ্গালী সাংস্কৃতিক চেতনা।

প্রথমোক্তটি অর্থাৎ বিশেষ করে বাংলাভাষা ১৯৪৮ সালেই রাষ্ট্রনৈতিক সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে সামনে এসেছে।

দ্বিতীয়টি, অর্থাৎ সংস্কৃতি-সংক্রান্ত বিষয়টি প্রথম দিকে তথাকথিত সাংস্কৃতিক মহলেই আবদ্ধ থেকেছে। পূর্ব বাংলার কোন কোন সংগ্রামী মহল থেকেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ব্যাপারটিকে রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামের বাইরে রাখার প্রবণতা ঘটেছে। কিন্তু যে ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষকচক্র পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক শাসনের জোয়ালে আবদ্ধ রাখার চেষ্টা করে এসেছে, তারাই যেমন বাংলাভাষাকে দমন করার এবং খর্ব করার চেষ্টা করে এসেছে, তেমনি বাঙ্গালী সংস্কৃতিকে দমন ও খর্ব করার চেষ্টা করে

এসেছে এবং নিছক রাজনৈতিক মুক্তিসংগ্রামী মহলগুলিকে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার রক্ষারও দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য করেছে।

বস্তুত, বাঙ্গালী সংস্কৃতির চেতনা সুপ্ত অথবা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রবাহিত হয়ে আসছিল গণ-মনে। এর মধ্যে অধিকাংশই ছিল চর্চার অভাবে বিস্মৃতির অন্ধকারে নিমজ্জিত। কিন্তু পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম যত বেশি এগিয়ে এসেছে, সংগ্রামী তত বেশি আত্মসচেতন হবার সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রয়োজনীয়তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে। তবে, আসল কথা পূর্ব বাংলার অধিবাসী-বৃন্দের জাতিসত্তার স্বাধীন বিকাশের সংগ্রামে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বৈপ্লবিক উপকরণ হিসেবে কাজ করার সম্ভাবনাকে আঁচ করেছে প্রথমে বিপক্ষ ঔপনিবেশিক চক্র। তারা হামলা চালিয়েছে বাঙ্গালী সংস্কৃতির যে-কোন রকমের অভিব্যক্তির উপর। উৎখাত করতে চেয়েছে তারা একান্ত বাঙ্গালী জীবনযাপনের রীতি-পদ্ধতিগুলিকে। ডলার সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ঔপনিবেশিক-চক্র ইসলামকে বাঙ্গালী সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছে। ঔপনিবেশিক চক্র দুভাবেই এ চেষ্টা চালিয়েছে। প্রথমত পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ছাঁটাই করে রাওয়ালপিণ্ডি লাহোর করাচীর পোশাক পরানোর চেষ্টার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়ত পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গায়ের জোরে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টার মাধ্যমে। পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী সমস্ত স্তর ও শ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই ঔপনিবেশিক চক্রের এই প্রচেষ্টাদ্বয়কে প্রতিহত করার জন্যে এগিয়ে এসেছে এবং এর মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতির জন্যে সংগ্রাম এবং রাজনৈতিক মুক্তির জন্যে সংগ্রাম একই কার্যক্রমে অবিচ্ছেদ্যভাবে শরিক হয়েছে।

এখানে একটা কথা পরিষ্কার করে রাখা দরকার। বাঙ্গালী সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক কর্মীরা হিন্দু-মুসলিম-নির্বিশেষে সচেষ্ট। ঔপনিবেশিক দখলদারেরা প্রচার করতে চেয়েছে যে, এটা হিন্দু বুদ্ধি-জীবীদের সৃষ্টি অথবা কলকাতা বা ভারতের কাছ থেকে ধার করা জিনিস। কিন্তু বিগত যে ষাটের দশকে ভারত এবং পূর্ব বাংলার মধ্যে যে-কোন প্রকার চিন্তার লেন-দেনে পর্যন্ত প্রাচীর খাড়া করা হয়েছিল, সেই দশকেই বাঙ্গালী জাতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের বিষয়টি পেয়েছে পূর্ব বাংলাতে গভীরতম ও ব্যাপকতম চর্চা। দ্বিতীয়ত, বাঙ্গালী সংস্কৃতির অভ্যুদয়ের প্রশ্নে বাইরের হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের তৈরী করা কোন ফর্মার কথা উঠতেই পারে না, কারণ, যাঁরা খোলাখুলি বাঙ্গালী

সংস্কৃতির অনুশীলন করেছেন এবং 'ধর্মে মুসলমান এবং সংস্কৃতিতে বাঙ্গালী' বলে নিজেদের দাখিল করতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন নি, তাঁরা পূর্ব বাংলার সেরা বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজ উদ্যোগেই এ কাজ করেছেন।

পূর্ব বাংলার বাঙ্গালী জাতির যে নিজস্ব মনোজগতে দাঁড়াবার জায়গা রয়েছে, সেকথাটা সত্য হয়ে উঠেছে একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাংলা' কিংবা জীবনানন্দ দাসের 'রূপসী বাংলা'তে, তেমনি হাজার বছরের ইতিহাসের হাঁড়ি-কুড়ি তৈজসপত্র অস্ত্রশস্ত্র আসবাব অলঙ্কারের সজীব উদ্ধারকার্যে। মুক্তিসংগ্রামের মনোজগত অনুভূতিগত ও উপকরণগত উভয় দিক দিয়েই সত্য হয়ে উঠেছে। আবেগ থেকে প্রমুক্ত মহাস্থানগড় কিংবা ময়নামতী কিংবা সোনারগাঁর নিদর্শনগুলি গণ-রাজনীতির উপাদানও পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামীদের হাতে তুলে দেবে নিশ্চয়।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক বিকাশ এর ফলে আরও বেশি গভীরতা পাবে ঐতিহ্যগতভাবে।

॥ ৬ ॥

পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে আন্তর্জাতিকতা

১৯৪০ সালে লাহোরে গৃহীত পাকিস্তান প্রস্তাবের ফলশ্রুতি হিসেবে ইতিহাসের দ্বন্দ্বাত্মক গতিপথে স্থাপিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে পূর্ব বাংলা চিহ্নিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে। ইসলাম ও আরবের নাম করলেও প্রকৃত পক্ষে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের ধনবাদী সভ্যতার ধারক বাহক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র; কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ইসলামিক দেশসমূহের প্রতি মুখে অন্তত ভ্রাতৃত্ব জা' তে হয়েছিল এই চক্রকে; সেদিক দিয়ে পঞ্চাশের দশকে উক্ত চক্র দাবার ঘুঁটি হিসেবে পূর্ব বাংলাকে দাখিল করেছিল মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যে একটি মুসলিম অঞ্চল হিসেবে। পূর্ব বাংলার প্রাথমিক আন্তর্জাতিক সংযোগ ঘটেছিল এভাবেই।

কিন্তু এর মধ্যেই পূর্ব বাংলা সবচেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠ হয়েছিল মোসাদ্দেকের ইরানের সঙ্গে। মধ্যপ্রাচ্যে ইরানেই সেদিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল। মোসাদ্দেক বিদেশী তেল কোম্পানীগুলিকে জাতীয় সম্পত্তি বলে ঘোষণা করেছিলেন। ইরানের জায়গীর-জমিদার পুঁজিপতিরা এতে প্রমাদ গণেছিল। তারা হাত মিলিয়েছিল তেল কোম্পানীর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-মার্কিন

মালিকদের সঙ্গে। মোসাদ্দেকের ইরানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা। বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা প্রায় একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসক ও শোষক-চক্রের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশ বানাবার ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের জায়গীরদার জমিদার পুঁজিপতি সামরিক বেসামরিক বড় আমলাদের দোসর হয়ে বসেছিল।

মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহের প্রতি সত্যিকার ভাবে ভ্রাতৃত্ব জানাতে গিয়েই পূর্ব বাংলা প্রথম দিকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানাতে শুরু করে। এরপরেই সুয়েজ জাতীয়করণের পরে নাসেরের মিশরকে যখন সাম্রাজ্যবাদী হামলার সম্মুখীন হতে হয়, তখন পূর্ব বাংলা ছিল সারা এশিয়ার মধ্যে একটি বিশেষ দেশ যেখানে জনগণ সক্রিয়ভাবে মিশরের উপর হামলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

অপরদিকে যে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র মুসলিম দেশসমূহের প্রতি ভ্রাতৃত্ব জানিয়েছে দিনে একবার এবং রাতে একবার করে, তারা মোসাদ্দেকের পতন ঘটাবার রক্তাক্ত ষড়যন্ত্রে জড়িত ইঙ্গ-মার্কিন নায়কদের সঙ্গে পূর্বের তুলনায় আরও বেশি শক্ত করে জোট বাঁধে এবং মিশর আক্রান্ত হলে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে দেন দরবার অক্ষুণ্ণ রাখে।

এই অভিজ্ঞতার আলোকে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও ধর্মনিরপেক্ষ আন্তর্জাতিকতার যে বিকাশ ঘটেছে তার মধ্যে দিয়েও পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী ঔপনিবেশিক চক্রের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। পূর্ব বাংলাকে সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের প্রতি আকৃষ্ট ও ঘনিষ্ঠ করেছে ইরান ও মিশর প্রভৃতি দেশের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে সমাজতন্ত্রী দেশসমূহের সক্রিয় সাহায্য ও সমর্থন।

পশ্চিম পাকিস্তানের করাচী-লাহোর-রাওয়ালপিণ্ডির শাসক ও শোষকচক্র পূর্ব বাংলাকে দুইভাবে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্যে যাবতীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করে এসেছে। প্রথমত, পূর্ব বাংলাকে যেহেতু তারা একটা উপনিবেশ করে রাখতে চেয়েছে, সেজন্যে বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের সামান্যতম কূটনৈতিক সুযোগ সুবিধাগুলি থেকে তারা পূর্ব বাংলাকে বঞ্চিত করে রেখেছে। সোভিয়েট ইউনিয়ন এবং গণ-চীনের কূটনৈতিক প্রতিনিধি দফতর স্থাপিত হয়েছে ১৯৬০ সালের পরে যখন করাচী-লাহোর-রাওয়ালপিণ্ডি গং-শাসকচক্র

সামরিক শাসন জারী করে পূর্ব বাংলার সামান্যতম জনপ্রতিনিধিত্ব ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে এই কথা মনে করে নিশ্চিন্ত হয়েছিল যে, পূর্ব বাংলার বক্তব্য বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক দফতরে কোনক্রমেই কার্যকরী সংযোগ স্থাপন করতে পারবে না। আটঘাট বেঁধেই পূর্ব বাংলায় 'নিষিদ্ধ' দেশসমূহের কূটনৈতিক দফতর স্থাপনের বিরুদ্ধে বাধা-নিষেধ তুলে নেওয়া হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, রাওয়ালপিণ্ডি গং-শাসকচক্র পূর্ব বাংলাকে ইঙ্গ-মার্কিন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা বা সিয়াটো সামরিক জোটের হাতে তুলে দিয়েছিল ১৯৫৩-৫৪ সালেই। বস্তুত, পূর্ব বাংলা এর পরে বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এখতিয়ারে চলে যায় এবং বিশ্বের কোন্ দেশের কূটনৈতিক দফতর পূর্ব বাংলায় স্থাপিত হবে কিংবা পূর্ব বাংলার বাসিন্দারা কখন কোন্ দেশে সফরে যাবেন সেটা ঠিক করার এখতিয়ার চলে যায় মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীদের ছায়া-কর্মচারীদের হাতে।

এইভাবে রাওয়ালপিণ্ডি গং-শাসকচক্রের উপনিবেশ এবং মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদীদের সামরিক রাজনৈতিক ঘাঁটি হিসেবে নিগৃহীত হওয়ার দরুন সাড়ে সাত কোটি মানুষের বাসভূমি পূর্ব বাংলা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সরাসরি পরিচয়ের সূত্র স্থাপন করতে পারে নি। এর ফলে বৈপ্লবিক সংযোগ দূরে থাকুক, নিতান্ত বৈষয়িক সংযোগগুলিও স্থাপিত হতে পারে নি। বন্যা-নিরোধ প্রকল্পের ব্যাপারে পূর্ব বাংলাকে রাওয়ালপিণ্ডি গং-ঔপনিবেশিক শাসকচক্র পুরো দুটো দশক একেবারে অসহায় করে রেখেছে। এ ব্যাপারে রাওয়ালপিণ্ডি চক্র নিজেরা তো কিছু করেই নি, পূর্ব বাংলাকেও কিছু করতে দেয় নি। কূটনৈতিক সম্পর্কের সমস্ত তারগুলি রাওয়ালপিণ্ডি আর ইসলামাবাদে বাঁধা থাকার ফলে পূর্ব বাংলার প্রতি শুভেচ্ছা থাকলেও বিশেষ করে সমাজতন্ত্রী দেশসমূহ এ ব্যাপারে কোন কিছু করতে পারে নি।

রাওয়ালপিণ্ডি গং-এর শাসকচক্র ইসলামের নামে এবং পাকিস্তানের অখণ্ডতার অজুহাত দিয়ে পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের পূর্ব অঞ্চল হিসেবে বিশ্বের দরবারে জাহির করলেও, সাড়ে সাত কোটি লোকের বাসভূমি পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের একটা জেলা হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করে আসছিল। গত দুই দশকে রাওয়ালপিণ্ডির নিমন্ত্রণ পেয়ে বছর বছর বিভিন্ন দেশের যেসব রাষ্ট্রনায়ক অথবা প্রতিনিধিদল ইসলামাবাদ করাচী লাহোর সফরে এসেছেন, তাঁদের

অনেকেই পূর্ব বাংলায় পদার্পণ করেন নি এবং করলেও প্রায় উড়ে চলে গিয়েছেন পূর্ব বাংলার উপর দিয়ে। পাছে পূর্ব বাংলার দারিদ্র্যের হৃদয়বিদারক ছবি রাওয়ালপিণ্ডি গং-এর 'গোমর ফাঁক' করে দেয়, পাছে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সফরকারীদের সঙ্গে কোন ফাঁক দিয়ে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামী জনগণের সংযোগ স্থাপিত হয়ে যায়, এই আশঙ্কায় পূর্ব বাংলার দারিদ্র্য ও বঞ্চিত জীবনের জন্যে দায়ী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী-গোষ্ঠী পূর্ব বাংলাকে অবরোধ করে রেখেছিল।

বৈদেশিক মুদ্রার খাতিরে এই ঔপনিবেশিক বেনিয়ারা পশ্চিমী সাম্রাজ্য-বাদের চৌহদ্দির বাইরে যে-কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তার ফল যাতে পূর্ব বাংলায় সামান্য মাত্র তোলপাড় সৃষ্টি করতে না পারে, তার জন্যেও সমস্ত আটঘাঁট বেঁধে রেখেছিল তারা।

মুক্তিযুদ্ধে নিয়োজিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এই অবরোধকে চিরকালের মতো ভেঙ্গে দিয়েছে।

পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রাম আন্তর্জাতিক সংযোগের ব্যাপারে বরাবর স্বাধীনতার কার্যসূচীকে সামনে রেখে এগিয়ে চলে এসেছে :

(১) বিশ্বের সমস্ত দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্যে প্রয়োজন পড়েছে রাওয়ালপিণ্ডি গং-এর ঔপনিবেশিক কর্তৃত্বের অবসান করার। স্বাধীন স্বতন্ত্র সার্বভৌম বাংলাদেশ হিসেবে ১৯৭১ সালে পূর্ব বাংলার আবির্ভাব এই কার্যসূচীরই একটি অনিবার্য পরিণতি।

(২) বিশ্বের সমস্ত দেশের সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্যেই ইঙ্গ-মার্কিন এবং বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের খপ্পর থেকে পূর্ব বাংলার বেরিয়ে আসা অপরিহার্য হয়েছে।

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ

—জহির রায়হান

সন ১৯৪৭।

ব্রিটিশ ভারত তার স্বাধীনতা লগ্নে তিনটি ভাগে বিভক্ত হলো। ১৯৪০ সালে গৃহীত লাহোর প্রস্তাবে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছিলো—That geographically contiguous units are demarcated into regions which shall be so constituted, with such territorial re-adjustment as may be necessary (that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the north-western and eastern zones of India should be grouped to constitute "Independent States" in which the Constituent Units shall be autonomous and sovereign).

কার্যত হলো উল্টো।

নবাব, ওমরাহ ও ভূস্বামীদের দ্বারা গঠিত মুসলিম লীগের নেতারা ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের নামে পূর্ব বাংলার প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলো। বিশ্বাসঘাতকতা করলো বাংলার মীরজাফর খাজা নাজিমউদ্দিন, খাজা শাহাবুদ্দিন, নুরুল আমীন, হামিদুল হক চৌধুরী প্রভৃতি মুসলিম লীগ নেতারা।

পূর্ব বাংলা শৃঙ্খলিত হলো পশ্চিম পাকিস্তানী নয়া ধনপতি ও তাদের দালালদের হাতে।

দু'টি দেশ। মাঝখানে স্থলপথে দু হাজার মাইল ও জলপথে তিন হাজার মাইল ব্যবধান।

দু'টি দেশ।

তার ভাষা আলাদা।

সংস্কৃতি আলাদা।

আচার আচরণ, ঐতিহ্য আলাদা।

ধ্যান ধারণা অর্থনীতি আলাদা।

দু'টি ভিন্নমুখী দেশ আর জাতিকে ধর্মের দোহাই দিয়ে একটি রাষ্ট্রে আবদ্ধ রাখা হলো।

উদ্দেশ্যও ছিলো একটি।

পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানী ও ভারতত্যাগী মুসলমান ধনপতিদের অবাধ শোষণের ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করা।

শুরু হলো পূর্ব বাংলার উপরে পশ্চিম পাকিস্তানের ধনকুবেরদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নির্যাতনের এক করুণ ইতিহাস।

প্রথম হামলা এলো ভাষার ক্ষেত্রে।

সংখ্যাগুরু বাঙ্গালীর মুখের ভাষা বাংলাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘুদের ভাষা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত হলো।

কিন্তু বাংলার তরুণরা রুখে দাঁড়ালো।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারী।

আবুল বরকত, সালাম, রফিক, শফিক আর জব্বারের বুকের রক্তের বিনিময়ে বাঙ্গালী তার মুখের ভাষাকে হরণের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিলো।

একুশে ফেব্রুয়ারী উনিশ শো বাহান্ন সাল।

বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনার উন্মেষের দিন।

স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম পদক্ষেপ॥

জাতীয় চেতনার উন্মেষের মুহূর্তে বাঙ্গালী অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো কি নিদারুণ ভাবে তাদের শোষণ করা হচ্ছে।

দেখলো। যদিও পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগের বাস পূর্ব বাংলায় তবু বাংলার মানুষকে সবদিক দিয়ে কি ভাবে বঞ্চিত করেছে ওরা।

দেখলো।

কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বস্তরে নিযুক্ত বাঙ্গালীর হার শতকরা মাত্র ৪ জন আর অবাঙ্গালীর হার হচ্ছে শতকরা ৯৬ জন।

দেখলো।

বৈদেশিক বিভাগে রাষ্ট্রদূত পদসহ সমস্ত শ্রেণীর অবাঙ্গালী কর্মচারীর সংখ্যা শতকরা ৯৫ জন। আর বাঙ্গালীর সংখ্যা হচ্ছে শতকরা মাত্র ৫ জন।

দেখলো।

কমার্স ও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল বোর্ড। ডেভেলপমেন্ট বোর্ড। সেন্ট্রাল এডুকেশন বোর্ড। তাতে একটি বাঙ্গালীও নেই।

সব অবাঙ্গালীদের দিয়ে ভরা।

সব বাঙ্গালী অবাক হয়ে দেখলো।

যদিও কেন্দ্রীয় পাক সরকারের আয়ের শতকরা ৭০ ভাগ আসে পূর্ব বাংলা থেকে। তবু।

শিক্ষা খাতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্যে ব্যয় করা হলো মাথাপিছু ৪ টাকা ৬ আনা ৩ পাই। আর পূর্ব বাংলার জন্যে মাথাপিছু মাত্র ১ পাই।

শিল্প ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য মাথাপিছু ৭১ টাকা ৪ আনা ১৫ পাই। আর পূর্ব বাংলার জন্যে মাথাপিছু মাত্র ৫ টাকা ১২ আনা ৫ পাই।

সমাজ উন্নয়ন ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্যে মাথাপিছু ৫ টাকা ২ আনা ৭ পাই। আর পূর্ববঙ্গবাসীদের মাথা পিছু মাত্র ৯ আনা ৬ পাই।

কি নিদারুণ বৈষম্য।

কি ভয়াবহ শোষণ।

বাঙ্গালী দেখলো।

তার হাতে একটি কলকারখানাও নেই।

সব অবাঙ্গালী ধনকুবেরদের হাতে।

বাঙ্গালী দেখলো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে যে-বছরে মাত্র ৭০ লক্ষ টাকা সাহায্য দেয়া হয়েছে—সে বছরে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দেয়া হয়েছে ৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা।

যে-বছরে ঢাকা রেডিওর জন্যে ব্যয় করা হয়েছে মাত্র ১ লক্ষ ৯২ হাজার টাকা। সেই একই বছরে পশ্চিম পাকিস্তানের রেডিও স্টেশনগুলোর জন্যে ব্যয় করা হয়েছে ৯ লক্ষ ১২ হাজার টাকা।

বাঙ্গালী দেখলো।

তাদের হাতে একটিও ব্যাঙ্ক নেই।

একটি বীমা কোম্পানীও নেই। সব অবাঙ্গালীদের হাতে।

আর দেশরক্ষা বিভাগ?

শতকরা ৯১.৯ ভাগ অবাঙ্গালী।

আর।

শতকরা ৮·১ ভাগ বাঙ্গালী।

পূর্ব বাংলার নবজাগ্রত মানুষ তাই সঙ্ঘটিত বিরোধী দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে স্বায়ত্তশাসনের আওয়াজ তুললো।

আওয়াজ তুললো স্বাধিকারের।

এলো ১৯৫৪ সাল।

শহীদ সোহরাওয়ার্দী, এ. কে. ফজলুল হক, আর মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গড়ে উঠলো পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকদের দালাল মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষের ঐক্যজোট যুক্তফ্রন্ট।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো।

দালাল মুসলিম লীগ আর তার কুচক্রী নেতাদের নিশ্চিহ্ন করে দিলো বাংলার মানুষ ভোটের মাধ্যমে।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কিত হলো।

শুরু হলো একের পর এক প্রাসাদ রাজনীতির চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে ভরা অধ্যায়। কি করে বাংলাকে দাবিয়ে রাখা যায়। কি করে বাঙ্গালীকে শোষণ করা যায়।

১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল এই চারটি বছর ধরে পাকিস্তানের ইতিহাস হচ্ছে, গুটিকয়েক ক্ষমতালিপ্সু, কায়েমী স্বার্থবাদী, আমলা মুৎসুদ্দি, সামন্তপ্রভু, ধনপতি, মত্তপ বদ্ধোন্মাদ রাজনৈতিক স্বার্থশিকারীর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ইতিহাস।

আর।

এই ইতিহাসের গুপ্ত পথ বেয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হলেন জেনারেল আইয়ুব খান। বাঙ্গালীর আশা-আকাঙ্ক্ষার বুকে পদাঘাত করে সারা দেশে সামরিক শাসন জারী করলেন তিনি।

বাক্-স্বাধীনতা।

ব্যক্তি স্বাধীনতা।

সভা সমিতি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

সমস্ত স্বাধীনতা হরণ করে নিয়ে বাংলার মানুষকে অবাধ শোষণের পথ উন্মুক্ত করলেন জেনারেল আইয়ুব খান আর তাঁর সামরিক জান্টা। আইয়ুব খান ছিলেন এই সামরিক জান্টার মুখপাত্র।

দেশপ্রেমিকদের ধরে ধরে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন তাঁরা।

কারারুদ্ধ করলেন বাংলার জাতীয় আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে। কারারুদ্ধ করলেন মাওলানা ভাসানীকে। কিন্তু শত নিষ্পেষণের ভেতর দিয়েও আবার ধীরে ধীরে বাংলার মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে লাগলো।

১৯৬২ সালে ঢাকার রাজপথে আবার শহীদের রক্ত ঝরলো।

রক্তের ধারা আবার প্রবাহিত হলো ঢাকার রাজপথে ১৯৬৪ সালে।

আবার ইসলামাবাদ প্রাসাদে নতুন চক্রান্ত শুরু হলো।

ডিকটেটর আইয়ুব খান তাঁর আমলা এবং দালালদের নিয়ে ষড়যন্ত্রে বসলেন। এই ষড়যন্ত্রের ফসল।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।

আর মামলার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো, বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের নায়ক শেখ মুজিবুর রহমানকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বাংলার বুকে তাঁদের কায়েমী স্বার্থ আরো পাকাপোক্ত করা।

কিন্তু এই দুর্বার আন্দোলনের পথ বেয়ে এলো ১৯৬৯ সাল।

ডিকটেটর আইয়ুব খানের শোষণ ও শাসনের বিরুদ্ধে সারা পূর্ব বাংলা গর্জে উঠলো।

বাঙ্গালীর মুক্তিসনদ ৬ দফা আর ১১ দফার দাবীতে বাংলার ছাত্র যুবক, কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে এক দুর্বার গণ-আন্দোলনের জন্ম দিলো।

অসংখ্য শহীদের রক্তে রাঙ্গা হলো পূর্ব বাংলার শহর বন্দর নগর। শহীদের অমরত্ব লাভ করলেন আসাদ, জোহা, জহুরুল হক আরো অসংখ্য দেশপ্রেমিক।

কিন্তু শত গুলিবর্ষণেও এ আন্দোলনকে স্তব্ধ করা গেলো না।

জাগ্রত জনতার প্রচণ্ড আঘাতে আইয়ুবশাহী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের নায়ক শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরো একটি চক্রান্তের জাল বুনলেন তাঁরা।

আইয়ুব খান ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন ইয়াহিয়া খানের কাছে।

এক খান গেলেন আর এক খান এলেন। দেশে আবার সামরিক শাসন জারী করলেন তাঁরা।

কিন্তু আন্দোলনের এই উত্তাল জোয়ারের মুখে ধূর্ত ইয়াহিয়া খান কোন রকম হুমকির পথে অগ্রসর না হয়ে অতি চতুরতার সঙ্গে নিজেকে জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অগ্রদূত হিসেবে উপস্থিত করলেন।

জানালেন, দেশে সাধারণ নির্বাচন দেবেন তিনি।

জানালেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করলে তাঁদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে নিজের পবিত্র দায়িত্ব সম্পন্ন করবেন তিনি।

জনগণ আশ্বস্ত হলো। বিশ্বাস করলো এই কপট সেনাপতিকে।

একদিকে তারা নির্বাচনের কথা বলেছে অন্যদিক থেকে এই দু বছরে সব-কিছু বানচাল করে দেবার প্রস্তুতি চালিয়েছে।

নির্বাচনের দিন ঘনিয়ে এলো।

৬ দফা ও ১১ দফার মুক্তিসনদ হাতে নিয়ে নির্বাচনে অবতীর্ণ হলেন শেখ মুজিবুর আর তাঁর দল আওয়ামী লীগ।

শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে এক বিস্ময়কর ইতিহাস সৃষ্টি করলো পূর্ব বাংলার জনগণ।

ইতিহাস সৃষ্টি করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর তাঁর দল।

আইন পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেলেন তাঁরা।

গণতন্ত্রের ইতিহাসে এ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

এ এক অভূতপূর্ব বিজয়।

বাংলার নিপীড়িত জনগণ সমস্ত দক্ষিণপন্থী চক্রান্তকে বানচাল করে দিয়ে স্বাধিকারের প্রশ্নে তাঁদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে বরণ করে নিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

বাংলার মানুষ যখন বিজয় উল্লাসে মত্ত।

তখন।

ইসলামাবাদ প্রাসাদের অধিপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খান লারকানার একচ্ছত্র ভূস্বামী আইয়ুব খানের পোষ্যপুত্র আইয়ুবশাহী ৮ বছরের মন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর সঙ্গে কূট পরামর্শে মগ্ন।

ফলাফল?

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলেন। সহাস্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে সম্বোধন করলেন।

তারপর ?

লারকানার জঙ্গলে পশু শিকারে মিলিত হলেন তিন নায়ক। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান, চীফ অফ স্টাফ আব্‌দুল হামিদ খান আর সুদক্ষ অভিনেতা প্রিন্‌স অফ ডেনমার্ক জুলফিকার আলী ভুট্টো।

ফলাফল ?

জেনারেল ইয়াহিয়া খান সংখ্যালঘু দলের নেতা ভুট্টোর ইচ্ছা মোতাবেক সংখ্যাগুরু দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলের ইচ্ছাকে পদদলিত করে আইন পরিষদের ৩রা মার্চ আহূত বৈঠককে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে মুলতবী ঘোষণা করলেন।

সারা বাংলা বিস্ময়ে হতবাক হলো।

বিক্ষোভে ফেটে পড়লো তারা।

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহস্র প্ররোচনার মুখেও অবিচল থেকে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পথ ধরলেন।

বাংলার প্রতিটি নাগরিক।

কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছাত্র, যুবক, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী।

এক মন, এক প্রাণ, একটি আশা বুকে নিয়ে অহিংস আন্দোলনে যোগ দিলেন।

অহিংস আন্দোলনের এ এক অপরূপ অভিব্যক্তি।

শহরে, গঞ্জে, ক্ষেতে, খামারে, অফিসে, আদালতে, জীবনের সর্বত্র।

চাকা বন্ধ। চাকা বন্ধ। চাকা বন্ধ।

অহিংস আন্দোলনের মুখেও সশস্ত্র প্ররোচনা দেবার চেষ্টা করলো জঙ্গীশাহী।

কৃষকের, শ্রমিকের, ছাত্র ও যুবকের বুকের তাজা রক্তে লাল হয়ে গেলো শ্যামল প্রান্তর। অসংখ্য তরুণ প্রাণ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো।

তবু।

বাংলার জনগণ তাদের নেতার প্রদর্শিত পথে আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলো।

ইতিমধ্যে ইয়াহিয়া, ভুট্টো, কাইউম খান প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানী শোষকের দল আবার রুদ্ধদ্বার কক্ষে মিলিত হতে লাগলেন।

ফলাফল ?

শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দলের সঙ্গে আলোচনার জন্যে একে একে ঢাকায় এলেন তাঁরা।

মুখে আলোচনার বাণী এবং আলোচনার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত।

আর অন্যদিকে, লোকচক্ষুর অন্তরালে বিরাট সামরিক প্রস্তুতি নিতে থাকলেন তাঁরা।

জল এবং বিমানপথে হাজার হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য আমদানি করলেন তাঁরা পূর্ব বাংলার মাটিতে।

সামরিক নিবাসগুলোকে আরো সুদৃঢ় করলেন।

ঢাকা সৈন্য শিবির এবং বিমানপোতের চারপাশে অসংখ্য বিমান-ধ্বংসী কামান বসানো হলো।

বিমানপোতের আশেপাশের বাড়ির ছাদে মেসিনগান বসানো হলো।

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হলো।

একদিকে আলোচনার প্রহসন চললো। আর, অন্যদিকে প্রস্তুতি চললো এক বিরাটকায় সামরিক অভিযানের।

ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর সামরিক জান্টার প্রধানরা আসলে আলোচনার নামে সময় নিচ্ছিলেন।

আরো।

আরো।

আরো।

সামরিক বাহিনীর লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র এনে পূর্ব বাংলার মানুষকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছিলেন অথচ মুখে বলছিলেন শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

তারপর ?

২৫-এ মার্চ, ১৯৭১ সাল।

রাতের সুপ্তির নীচে যখন বাংলার মানুষ ঘুমিয়ে পড়েছে।

তখন রাতের অন্ধকারকে আশ্রয় করে মিথ্যেবাদী তস্কর ইয়াহিয়া খান চুপিচুপি ঢাকা থেকে পালিয়ে গেলেন এবং তাঁর বর্বর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে গেলেন বাংলার নিরীহ নিরপরাধ নিরস্ত্র মানুষকে নিধনের যজ্ঞে।

ইতিহাসের এক বিভীষিকাময় গণহত্যা শুরু হলো।

ট্যাঙ্ক, মেসিনগান, মর্টার, বোমারু বিমান ব্যবহৃত হলো, নিরস্ত্র মানুষকে মারার জন্যে।

পাকিস্তানের হিটলার ইয়াহিয়া খান হিটলারের বর্বরতাকেও ছাড়িয়ে গেলেন।

সাড়ে সাত কোটি মানুষের শ্রম আর ঘামের বিনিময়ে আয় করা অর্থ দিয়ে কেনা বুলেট দিয়ে ঝাঁঝরা করে দিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃৎপিণ্ড।

হিটলার ইয়াহিয়া খান আর তাঁর আইকম্যান টিক্কা খানের হিংস্র বন্য সেনারা অসউইজ আর বুখেনওয়াল্ডের হত্যাকাণ্ডকেও ম্লান করে দিলো।

কিন্তু।

মৃত্যুর এই বিভীষিকার মধ্যেও অসহায় বাঙ্গালী তার দুর্জয় মনোবল আর সাহস নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো মরণপণ প্রতিরোধ যুদ্ধে।

বাংলার সিংহরা গর্জে উঠলো।

গণ-মানুষ শ্রমিক কৃষাণ ছাত্র জনতা বিদ্রোহ করলো। বিদ্রোহ করলো বাংলার বীর বেঙ্গল রেজিমেন্ট। ই. পি. আর. বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, আনসার।

মাতৃভূমির পবিত্র মাটিকে মুক্ত করার অনন্ত শপথ নিয়ে হানাদার কুকুরদের সঙ্গে এক অসম সংগ্রামে লিপ্ত হলো বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা।

পলাশীর আম্রকাননে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্ত গিয়েছিল।

মুজিবনগরের আম্রকাননে আবার বাংলার স্বাধীনতা ঘোষিত হলো।

প্রতিষ্ঠিত হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

আর।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানালো, বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ।

সমর্থন জানালেন জননেতা মাওলানা ভাসানী।

বামপন্থী নেতা অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর আহম্মদ।

বিপ্লবী নেতা মণি সিং।

শ্রমিক নেতা কাজী জাফর। আরও অনেকে।

দলমত ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী-নির্বিশেষে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ এক

কাতারে এক সারিতে দাঁড়িয়ে একটি বিদেশী পেশাদার সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়ছে।

লড়ছে বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, যুবক, মধ্যবিত্ত।

লড়ছে লেখক, সাংবাদিক, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক।

অধ্যাপক, ইঞ্জিনীয়ার, বুদ্ধিজীবীরা।

লড়ছেন, পূর্ব বাংলার প্রশাসনিক ব্যবস্থার দিকপাল অফিসাররা, যাঁরা বিদ্রোহ করেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে, তাঁরা।

লড়ছে বাংলার মানুষ॥

নিপীড়িত মানুষ॥

লড়ছে এক জীবনমরণ-সংগ্রামে।

এ সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।

এ সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম॥

রাষ্ট্রভাষা ও প্রাসঙ্গিক বিতর্ক

—ডঃ আনিসুজ্জামান

এক

আরম্ভের আগেও আরম্ভ আছে। ছাব্বিশে মার্চের আগে একুশে ফেব্রুয়ারি। একুশে ফেব্রুয়ারির শুরু ১৯৪৭-৪৮-এর ছায়াচ্ছন্ন দিনগুলিতে।

পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের প্রথম সংঘাত বেধেছিল রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে। প্রথম পর্যায়ে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন অল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ। এক অর্থে, প্রশ্নটা তাঁরাই প্রথমে উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু ভাষার বিষয়টি এত তাড়াতাড়ি উঠল কেন ?

পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার মধ্যে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের যে-কল্পনা তাঁরা করেছিলেন, তার বাস্তব রূপায়ণের পদক্ষেপ হিসেবেই ভাষার দাবী তুলেছিলেন তাঁরা। দ্বিতীয়তঃ, ভাষা-সম্পর্কে বাঙালি মুসলমান সমাজে উনিশ শতক থেকেই একটা ক্রমবর্ধমান সচেতনতার পরিচয় পাই। আরবী, ফারসী, উর্দু, ইংরেজি, বাংলা—সমাজ-জীবনে এই পাঁচ ভাষার আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে যত আলোচনা বাঙালি মুসলমান লেখকেরা করেছেন, আর খুব কম বিষয় নিয়েই বোধ হয় তাঁরা এত উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী কয়েক দশকে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের ক্রমবর্ধমান প্রীতিই শুধু প্রকাশ পায় নি, সমাজে ও শিক্ষাক্ষেত্রে মাতৃভাষার যথাযোগ্য মর্যাদা-প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচয়ও পাওয়া গিয়েছিল।

তাই এটা বিস্ময়কর নয় যে, পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার আগেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে কিছু কথাবার্তা হয়েছিল। 'পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' গ্রন্থে বদরুদ্দীন উমর ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ের যে-বিস্তৃত ইতিহাস সংকলন করেছেন, তাতে দেখা যায় যে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ১৯৪৬ সালের ঘোষণা-পত্রে বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিশ্রুতি ছিল এবং পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলাভাষাকে সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ (ও প্রয়োজনবোধে উর্দুকে দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে গণ্য) করার দাবী জানিয়েছিলেন।

পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের নেতৃত্বে গঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তমদ্দুন মজলিস রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি সরাসরি উত্থাপন করেন, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষাকে স্বীকৃতি দেবার দাবীতে কয়েকজন অধ্যাপক ও লেখকের রচনা-সংকলন প্রকাশ করে। প্রধানতঃ এঁদেরই উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছাত্রাবাসে এ বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরেকজন অধ্যাপক এই পরিষদের আহ্বায়ক নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৭-এর ডিসেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকেরা পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে ভাষার প্রশ্নে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

গণপরিষদে বাংলাভাষার ব্যবহার সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের (গত মার্চ মাসে কুমিল্লায় সামরিক বাহিনী এঁকে হত্যা করে) আনীত প্রস্তাব অগ্রাহ্য হলে ভাষার দাবী আন্দোলনের রূপ নেয়। জনমত ও সংবাদপত্রের মতামত গণ্য না করে খাজা নাজিমুদ্দীন গণপরিষদে ঘোষণা করেছিলেন যে, পূর্ব বাংলার জনসাধারণ উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। পূর্ব বাংলার মানুষের অভিপ্রায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ২৬-এ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ও ১১ই মার্চে সাধারণ ধর্মঘট আহূত হয়। শেষোক্ত দিনে পুলিশ ছাত্র-মিছিলের উপর লাঠিচার্জ করে এবং কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে। কয়েকদিনের মধ্যেই অবশ্য আন্দোলনের মুখে ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আপোষ করেন নাজিমুদ্দীন। এই আপোষের প্রধান শর্ত ছিল এই যে, রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবী তাঁরা উত্থাপন করবেন।

এর কয়েকদিন পর জিন্নাহ্ ঢাকায় আসেন—রাষ্ট্রপ্রধানরূপে এই ছিল তাঁর প্রথম সফর। ২১-এ মার্চে জনসভায় এবং ২৪-এ মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন-উৎসবে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা-রূপে স্বীকৃতিজ্ঞাপনের ঘোষণা তিনি করেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্য থেকে ক্ষীণকণ্ঠে আপত্তি উঠেছিল উভয় ক্ষেত্রেই—শেষোক্ত অনুষ্ঠানে সেটা তিনি শুনতেও পেয়েছিলেন। ছাত্র-প্রতিনিধিদল ভাষার দাবী নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তিনি ক্রুদ্ধ হন বটে, কিন্তু ছাত্ররা তাদের দাবীতে অনড় ছিল।

এই আন্দোলনের সূত্রে ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিলে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক

সভায় প্রাদেশিক সরকারের কাজে বাংলাভাষার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু দেশের রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলাকে গ্রহণের সুপারিশ তাঁরা গ্রাহ্য করেন নি।

পরবর্তী তিন বছর ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস হিসেবে পূর্ব বাংলার সর্বত্র পালিত হয়। ১৯৫২ সালের ৩০-এ জানুয়ারি আবার ঢাকায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী-রূপে নাজিমুদ্দীন এক জনসভায় উর্দু ই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা করেন। এর প্রতিবাদে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট, ১১ই ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশে আন্দোলনের প্রস্তুতি-দিবস এবং ২১-এ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়। ২০-এ ফেব্রুয়ারি বিকেলে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু একুশ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় সে সিদ্ধান্ত কেউ মেনে নেয় নি। ছাত্ররা সংগঠিতভাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ শুরু করে। এত বেশি ছাত্র স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার হতে চাইছিল যে, পুলিশ প্রথমে লাঠি চার্জ ও পরে কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে কাজ হয় নি। ছাত্ররা পরিষদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে অটল থাকে এবং মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের গেট দিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতে চায়। পুলিশ গুলি চালায়।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত ও তার সঙ্গী বিক্ষোভকারীদের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বেতার কেন্দ্র এবং রেলওয়ের মতো যেসব সংগঠনে তখনো পর্যন্ত ধর্মঘট হয় নি—সেখানেও কর্মীরা কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। পরিষদের অভ্যন্তরে তুমুল বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে মুসলিম লীগ পরিষদ দলের একজন সদস্য-পদ ত্যাগ করেন ও অপরজন দলত্যাগ করেন। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা, ২২-এ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। আগের দিন সন্ধ্যায় শহরের নিয়ন্ত্রণভার ই. পি. আর. বাহিনীর উপরে ন্যস্ত হয়। এই দিন তারা একাধিক জায়গায় মিছিলের উপর গুলি বর্ষণ করে। ঢাকা হাইকোর্টের কর্মচারী শফিকুর রহমান এবং আরো কয়েকজন এই দিন প্রাণদান করেন।

২৫-এ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে আন্দোলন চলতে থাকে। ইতি-মধ্যে সরকার ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেন। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ও বিরোধী-দলীয় রাজনৈতিক নেতা ছাড়াও ঢাকা বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও জগন্নাথ কলেজের একজন অধ্যাপককে গ্রেপ্তার করা হয়। পূর্ব বাংলার অন্যত্রও ছাত্র, শিক্ষক, রাজনৈতিক কর্মীকে কারারুদ্ধ করা হয়। সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে সরকার আন্দোলনের অগ্রগতি থামিয়ে দিতে পারলেও সংকল্প থেকে জনসাধারণকে ভ্রষ্ট করতে পারেন নি।

একুশে ফেব্রুয়ারিতেও রাষ্ট্রভাষার দাবীতে দু'ধরনের স্লোগান শোনা গিয়েছিল: 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এবং 'অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। দ্বিতীয় স্লোগানের মর্ম এই ছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষার দাবী সম্পর্কেও আমরা সহানুভূতিসম্পন্ন। তবে একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তপাতের পরে সে স্লোগান চাপা পড়ে। প্রথম স্লোগানের পক্ষপাতী যাঁরা ছিলেন, তাঁদের বক্তব্য ছিল এই যে, আমাদের দাবী আমরা জানাব; অন্য প্রদেশের জনসাধারণের দাবী প্রকাশের দায়িত্ব তাঁদের; আর তাছাড়া উর্দু'র প্রশ্নে তাঁরা যখন কোন আপত্তি তোলেন নি, তখন ধরে নেওয়া যায় যে, এতে তাঁদের সায় আছে। সুতরাং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' বললে বোঝাবে যে, সরকার যা চাইছেন, এ দাবী তার অতিরিক্ত।

একুশে ফেব্রুয়ারির আত্মাহুতি চকিতে সমগ্র পূর্ব বাংলার জনসাধারণকে আপন অভিজ্ঞান দান করেছিল। এর আগে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার মানুষের বিক্ষোভ নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে নি। কিন্তু এখন থেকে পূর্ব বাংলার মানুষের চৈতন্যের সঙ্গে একুশে ফেব্রুয়ারি এক হয়ে গেল। ১৯৫৩ সালে একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার জনসভার পর যে-মিছিল বের হয়, তখন পর্যন্ত তা ছিল প্রদেশের বৃহত্তম মিছিল। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের মুখে একুশে ফেব্রুয়ারিতে নতুন ঐক্যবদ্ধ সংকল্পের প্রকাশ ঘটে। ১৯৫৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রদেশে ছিল গভর্ণরের শাসন: যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে ৯২ (ক) ধারার প্রয়োগ চলছিল। এবারেও ১৪৪ ধারা; কালো পতাকা প্রদর্শন নিষিদ্ধ। তা-সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আরো একবার ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে; বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ছাত্রদের উপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে; শুধু অধ্যাপকদের কমনরুমে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়ে ফিরে আসে। পরের বছর আর বাধানিষেধ ছিল না। তখন শাসনতন্ত্র গৃহীত হতে যাচ্ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিসর্জন দিয়েও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সন্তুষ্ট —রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলা শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতি পাচ্ছে বলে।

শাসনতন্ত্রে অবশ্য বলা হয় যে, কুড়ি বছর পরে এই বিধান প্রয়োগ করা

হবে—ততদিনে রাষ্ট্রভাষা পরিবর্তনের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রধানতঃ এই দীর্ঘ মেয়াদের জন্য আপত্তি উত্থাপন করা হয়। কিন্তু ১৯৫৯ সালে—আইউবের সামরিক শাসনে সকলে আবার নতুন করে, উদ্বিগ্ন হন রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র বাতিল হয়ে গেছে। সেই অজুহাতে পশ্চিম পাকিস্তানে আঞ্জুমান-তরক্কী-এ-উর্দু আবার উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণার দাবী জানান। প্রতিবাদও উঠল সঙ্গে সঙ্গে, এমন কি, পূর্ব বাংলার উর্দু-ভাষী লেখক ও বুদ্ধিজীবীরাও এই প্রতিবাদে যোগ দেন। পরে এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয় যে, এ বিষয় নিয়ে আর নতুন করে বিতর্ক চলতে দেওয়া হবে না—১৯৫৬ সালের সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকবে, আইউবের শাসনতন্ত্র ১৯৬২ সালে এল। তখন দেখা গেল, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে আর নতুন খেলা খেলতে কেন্দ্রীয় সরকার সাহস করেন নি। তবে কুড়ি বছর পর প্রয়োগের প্রশ্নটি এক অভিজ্ঞ কমিটি বিবেচনা করবেন, এ ধরনের একটা কথা জুড়ে দেওয়া হল।*

দুই

১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ইসলামী আদর্শ ও জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়ে বাংলাভাষার জন্য আরবী হরফ প্রবর্তনের প্রচেষ্টা শুরু করেন। প্রস্তাবটা প্রথমে প্রকাশ পায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর একটি বক্তৃতায়। সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্ররা দৃঢ় প্রতিবাদ করেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ বাংলা হরফে উর্দু লেখার একটা বিকল্প প্রস্তাবও উত্থাপন করেন। এ-সত্ত্বেও আরবী হরফে বাংলা শিক্ষাদানের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা সরকারী উদ্যোগে হতে থাকে। এই সৎকার্যে সরকার বহু অর্থ ব্যয় করেছিলেন। ১৯৪৯ ও ১৯৫০ সাল ছিল এ ক্ষেত্রে তাঁদের সবচাইতে তৎপরতার সময়, তবে আরবী হরফের পক্ষে দু-চারজনের বেশি সমর্থক তাঁরা পান নি, বিরোধিতা হয়েছিল প্রবল। এমন কি, পূর্ব বাংলা সরকার যে-ভাষা সংস্কার কমিটি গঠন করেছিলেন, তাঁরাও এর বিরোধিতা করেছিলেন। ফলে প্রকাশ্যে আর আরবী হরফ নিয়ে মাতামাতি করা সম্ভবপর হয় নি সরকারের পক্ষে। তবে সরকার হাল ছেড়েও দেন নি একেবারে। আরবী হরফে বাংলা লেখার চর্চা করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানকে আইউব সরকারের সময়েও অর্থসাহায্য করা হত।

আইউব-সরকার কিন্তু আরবী হরফে অতটা উৎসাহী আর হতে পারেন নি। পূর্ববর্তী দশকের প্রয়াস যেভাবে ব্যর্থ হয়েছিল, তার স্মৃতি নিশ্চয় মুছে যায় নি একেবারে। কিন্তু আইউবের শখ হল বাংলা ও উর্দু উভয়ের জন্যই রোমান হরফ প্রবর্তন করা—শুধু বাংলা হরফের বিলোপসাধন আর এতদিনে সম্ভবপর ছিল না। বৈজ্ঞানিকতা ও জাতীয় ঐক্যের যুক্তিতে তিনি এই প্রস্তাব আনলেন—সম্ভবতঃ ১৯৬২ সালে। কিন্তু এবারেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্ররা প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিলেন। উর্দু ভাষার অধ্যাপক ও লেখকরাও এতে যোগ দেন: পশ্চিম পাকিস্তানের উর্দু-প্রেমিক অনেকেই আপত্তি জানান এর পরে। ফলে, সে চেষ্টাও পরিত্যক্ত হয়।

বর্ণমালা-ঘটিত বিরোধের আরো একটি অধ্যায় আছে।

সর্বজনীন শিক্ষাবিস্তারের সুবিধে হবে মনে করে ১৯৪৭-৪৮ সালে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ 'শোজা বাংলা' নামে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। এতে বাংলা বর্ণমালার কিছু সংস্কারের প্রস্তাব ছিল। এই পরিকল্পনায় কেউ কেউ উৎসাহিত হন এবং এই প্রস্তাবিত হরফ-সংস্কারের ভিত্তিতে কিছু বইপত্রও প্রকাশিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান সরকার-কর্তৃক গঠিত ভাষা সংস্কার কমিটি কিন্তু হরফ-সংস্কারের এই পরিকল্পনাও এড়িয়ে যান।

বাংলাভাষার কোন কোন তাত্ত্বিক নিছক অনুশীলনী হিসেবে বাংলা বর্ণমালার সংস্কার-প্রস্তাব নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেন। বাংলাভাষার প্রতি এঁদের প্রীতিতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। প্রধানত, এই পথ ধরেই ১৯৬২তে বাংলা একাডেমী একটি হরফ-সংস্কার কমিটি গঠন করেন। বাংলাভাষার পণ্ডিতদের নিয়ে তাঁরা হরফ-সংস্কারের একটা পরিকল্পনা পেশ করেন, তা যথারীতি গৃহীত হয়। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক এবং আরো কোন কোন তরুণ ভাষাতাত্ত্বিক এই সংস্কার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। এই সমস্ত আলোচনা ছিল অ্যাকাডেমিক, ; তাছাড়া বাংলা অ্যাকাডেমি তাঁদের প্রস্তাবকে কার্যকরী রূপ দেবার কোন চেষ্টা করেন নি।

ইতিমধ্যে ঢাকায় বাংলা কলেজ নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। এর কর্ণধার ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রাক্তন অধ্যাপক—যিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম যুগে অত্যন্ত সক্রিয় ও স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেন। এ-সত্ত্বেও পরে তিনি অন্ধ ধর্মানুগত্য থেকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির

সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং সবরকম প্রগতিশীল আন্দোলনের বিরুদ্ধে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি পূর্ব বাংলার ভাষাকে আঞ্চলিক ভিত্তিতে স্বতন্ত্র রূপদানের চেষ্টা করেন এবং প্রধানতঃ সেই উদ্দেশ্য থেকেই বাংলা বর্ণমালার সংস্কারসাধনে প্রবৃত্ত হন। একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়ে তাঁর এই সংস্কার-প্রচেষ্টার প্রয়োগক্ষেত্র তিনি লাভ করেন। বাংলাভাষার মাধ্যমে এই কলেজে ডিগ্রী পর্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা হয় এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় বইপত্র অনেকগুলি এই কলেজ থেকে ছাপা হয়। এইসব বইপত্রে তাঁর অভিপ্রেত হরফ-সংস্কার তথা বানান-সংস্কারের প্রয়োগ ঘটে। দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে এই বানান এত স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে যে, তাতে অনেকেই পীড়া বোধ না করে পারেন নি।

বাংলা কলেজের এই প্রচেষ্টা নিয়ে যখন তর্ক চলছে, তখন সরকারের ইঙ্গিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অকস্মাৎ বাংলা বর্ণমালা ও বানান-সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটিতে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই, অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ প্রভৃতি ছিলেন। কমিটির কাজ শেষ হবার আগেই ডক্টর শহীদুল্লাহ্ রোগাক্রান্ত ও পঙ্গু হয়ে পড়েন। ডক্টর এনামুল হক, অধ্যাপক আবদুল হাই ও অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর বাধা দান-সত্ত্বেও কমিটি হরফ-সংস্কারের পক্ষে মত দেন। বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলে বিষয়টি আলোচনার সময়ে অনেক সদস্য বলেন যে, বিশেষজ্ঞদের অধিকাংশই যেখানে সংস্কার-প্রস্তাবের বিরোধী, সেখানে সরলীকরণের এই প্রস্তাব গ্রহণ না করাই উচিত। কিন্তু শেষপর্যন্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয় ১৯৬৮ সালে।

বিশেষজ্ঞদের আপত্তির একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে, এই প্রচেষ্টা ঐতিহ্য থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করবে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁরা বলেন যে, শুধু সরলীকরণের দ্বারা সাক্ষরতা বৃদ্ধি পায় না—সুতরাং এই অজুহাত অচল। বরঞ্চ, বাংলা বর্ণমালার বিরুদ্ধে জটিলতা ও অবৈজ্ঞানিকতার অভিযোগ এনে রাষ্ট্রভাষা রূপে বাংলার প্রয়োগকে শুধু পিছিয়ে দেওয়া হবে।

এই নিয়ে বেশ একটা আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। শিক্ষকরা শুধু নন, লেখকরাও এ বিষয়ে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। সরকার-পৃষ্ঠপোষিত লেখক-সংঘ এই প্রতিবাদ-জ্ঞাপনে বেশ সক্রিয়তার পরিচয় দেন। জসীমউদ্‌দীন একটি স্বতন্ত্র বিবৃতি দিয়ে বলেন যে, বাংলা বর্ণমালার সংস্কার হওয়া উচিত; তবে

দুই বাংলার বিশেষজ্ঞদের ঐকমত-অনুযায়ী শুধু তা হতে পারে। সেই ব্যবস্থা এখানে করা হয় নি বলে তিনি সংস্কার-প্রস্তাবের বিরোধী।

ছাত্ররাও এই বিষয়ে প্রতিবাদজ্ঞাপনে অগ্রসর হয় এবং আবার একটা সংকটের মতো অবস্থা দেখা দেয়। তারা বলে যে, বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির উপর হামলার এ এক নবতম রূপ মাত্র। অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যখন বোঝা যায় যে, প্রস্তাব পাশ হয়ে থাকলেও এর বাস্তব-প্রয়োগ কেউ মেনে নেবে না।

বছরের শেষে আইউব-বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতায় এ বিতর্ক চাপা পড়ে। ১৯৬৯-এর একুশে ফেব্রুয়ারিতে পূর্ব বাংলার সর্বত্র হরফ-সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৭১-এর একুশে ফেব্রুয়ারির একটি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান ছিল 'বর্ণতরু'র প্রতিষ্ঠা : ক্রিসমাস ট্রির মতো বাংলা হরফের ছোট গাছ। আর কাগজের বিজ্ঞাপনে ও যানবাহনের গায়ে একটি বর্ণ বড় করে ছেপে তার উপরে ও নিচে লেখা হয়েছিল : "একটি বাংলা অক্ষর/একটি বাঙ্গালীর জীবন"।

তিন

১৯৪৯ সালে পূর্ব বাংলা সরকার 'পূর্ব বাংলা ভাষা-সংস্কার কমিটি' গঠন করেন। কমিটির দায়িত্ব ছিল পূর্ব বাংলার ভাষার সংস্কার ও সরলীকরণের প্রশ্ন বিবেচনা করা ; নতুন পারিভাষিক শব্দ-গঠনের প্রক্রিয়া নির্ণয় করা ; এবং পাকিস্তানের, বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার প্রতিভা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভাষাবিকাশের পথ নির্দেশ করা। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ এ কমিটির সভাপতি ছিলেন। অধ্যাপক, লেখক ও সরকারী কর্মচারীরা অনেকে এর সদস্য ছিলেন।

আরবী হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব-প্রত্যাখ্যান এই কমিটির একমাত্র ইতিবাচক সুপারিশ ছিল। অন্যত্র তাঁরা জোর দেন সংস্কৃত প্রভাব এড়িয়ে আঞ্চলিক ও আরবী-ফারসী মূলের শব্দ-ব্যবহারের উপরে। উদাহরণ হিসেবে তাঁরা কতকগুলো বাক্য তুলে ধরেছিলেন, তার একটাই তাঁদের প্রবণতা বোঝার জন্য যথেষ্ট। "আমি তোমায় জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না" এই বাক্যের বদলে "আমি তোমায় কেয়ামতের দিন পর্যন্ত ভুলিব না" ব্যবহার করাই তাঁরা মনে করেছিলেন পূর্ব বাংলার জনসাধারণের অনুকূল হবে।

এর মূল কথাটা হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানে বাংলাভাষার একটা স্বতন্ত্র রূপ সৃষ্টি করা আবশ্যক। কিন্তু স্বাতন্ত্র্য শুধু সৃষ্টিশীল লেখকের কুশলী রচনার ভিত্তিতে দেখা দেয়, আইন করে নয়, একথাটা তাঁরা বোঝেন নি। স্বতন্ত্র হতে হবে, এই মনোভাব থেকে ১৯৪৯-৫০ সালে কোন কোন লেখক আরবী-ফারসী শব্দের বহুল প্রয়োগের দিকে ঝুঁকেছিলেন। গোলাম মোস্তফা, মীজানুর রহমান ও মুহাম্মদখারুল ইসলাম ছিলেন এঁদের মধ্যে প্রধান। ফররুখ আহ্‌মদ আগেই এ পথের পথিক ছিলেন: তাঁর সাফল্য স্বীকৃতিও পেয়েছিল। গোলাম মোস্তফা খানিকটা তরে গিয়েছিলেন, কিন্তু বাকিদের ভরাডুবি হয়েছিল।

পরবর্তী দশকে পূর্ব বাংলার ভাষাস্বাতন্ত্র্যের বক্তব্যটা জোর পেয়েছিল আবুল মনসুর আহ্‌মদ, ইবরাহিম খাঁ ও আবুল কাসেমের রচনায়। এবারে স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তি ছিল আঞ্চলিকতা ও লৌকিক শব্দচয়ন। আবুল মনসুরের মতে ময়মনসিংহের (তাঁর ও ইবরাহিম খাঁর জেলা) উপভাষাকে ভিত্তি করেই পূর্ব বাংলার গ্রহণযোগ্য স্ট্যাণ্ডার্ড ভাষা গড়ে তুলতে হবে। ইবরাহিম খাঁ তাই "মাতৃভাষা" না লিখে লিখলেন "মায়ের বুলি"। আবুল কাসেম জিদ ধরলেন, "বৃষ" না লিখে "বিরিষ" লিখতে হবে—তাঁর জেলা চট্টগ্রামে এরকম প্রচলন আছে বলে।

কিন্তু এই বিধিপত্র গৃহীত হয় নি—সাধারণ্যে নয়, সাহিত্যিকের কাছেও নয়। রঙ্গব্যঙ্গ রচনায় আরবী-ফারসী শব্দের কুশল প্রয়োগ কিংবা গল্পে-উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার সার্থক ব্যবহার যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা পরিচালিত হয়েছিলেন সম্পূর্ণ অন্য বিবেচনার দ্বারা। রসসৃষ্টির বা বাস্তবতাবোধের প্রেরণাই ছিল তাঁদের কাছে মুখ্য; শিল্পকর্মের কাছেই ছিল তাঁদের জবাবদিহির দায়িত্ব। এমন কি, তৎসম শব্দের যে প্রয়োগবাহুল্য দেখা দিল এ শতকের প্রবন্ধে, তার খানিকটা হয়তো ছিল ভাষাস্বাতন্ত্র্যের প্রচারকদের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়াজাত—কিন্তু অনেকটাই এসেছিল লেখকের মেজাজ ও বিষয়ের অনুরোধে। সুতরাং স্বাতন্ত্র্যের নামে বাংলা ভাষার প্রকৃতিবদলের চেষ্টা সফল হয় নি।

চার

পাকিস্তানসৃষ্টির পরপরই সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্য বিষয়ে একটা বক্তব্যের অবতারণা করা হয়। সেটা এই যে, বাংলা সাহিত্যের যে-অংশ হিন্দু

ঐতিহ্য ও ধ্যানধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত, তার উত্তরাধিকার আমরা আর স্বীকার করব না। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে একজন কবি প্রস্তাব করেছিলেন যে, নজরুল-কাব্যের "অবাঞ্ছিত অংশ" বাদ দিয়ে তাঁর নির্বাচিত রচনাবলীর একটি সংস্করণ পূর্ব বাংলায় প্রকাশ করা হোক। "অবাঞ্ছিত" মানে হিন্দু ঐতিহ্যমণ্ডিত। এর ফলে নজরুলের রচনাসম্ভারের একটা বড় অংশ যে বাদ পড়বে, সে বিষয়ে প্রস্তাবক সচেতন ছিলেন।

এই বক্তব্যের সঙ্গে সরকারী নীতির সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। বেতারে ও সরকারী পত্রপত্রিকায় নজরুলের রচনা সম্পর্কে একই মনোভাবের প্রকাশ দেখতে পাওয়া গেল। আর তা শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ থাকল না। বেতার থেকে কীর্তন-শ্যামাসঙ্গীতের প্রচার বন্ধ হয়েছিল; উনিশ শতকের নাট্যকার ও সঙ্গীত-রচয়িতাদের সৃষ্টির প্রচারেও এই হিন্দু-সংস্রবের বিচার চলত নিপুণভাবে। সরকার-প্রচারিত সাহিত্যপত্রে অমুসলমান লেখকদের আলোচনা সযত্নে পরিহার করা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়েছিলেন অনেকে। সামান্য পরিবর্তন সত্ত্বেও কিন্তু সে পাঠ্য-তালিকার কাঠামোর রদবদল হয় নি—প্রধানত অধ্যাপকমণ্ডলীর শুভবুদ্ধির জন্যে।

ভাষা-আন্দোলনের ফলে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শোচনীয় পরাজয় ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান প্রীতির প্রকাশে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে পূর্বোক্ত বক্তব্য শিক্ষিত সাধারণের কাছে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য হয়। ঋতু-উৎসব ও বাংলা নববর্ষ-উদ্‌যাপনের ওপরে এর পরে যে জোর পড়েছিল, তার একটা কারণ ঐতিহ্যপ্রীতি, অপর কারণ সরকারী সাংস্কৃতিক নীতির প্রতিবাদজ্ঞাপন। পুরোনো বাংলা গানের আসর নাম দিয়ে যেসব অনুষ্ঠান হয়েছে, সেখানে সবাই প্রাণ ভরে শুনেছেন কীর্তন-শ্যামাসঙ্গীত থেকে শুরু করে মুকুন্দ দাসের গান। এমন কি চর্যাপদে সুর বসিয়েও গাওয়া হয়েছে এবং তার অর্থ না বুঝেও শ্রোতারা মুগ্ধচিত্তে তা শুনেছেন। রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য, মধুসূদনের নাটক বা বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাসে'র নাট্য-রূপের জনপ্রিয়তাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। সাত দিনে হাজার হাজার লোক গভীর আগ্রহ নিয়ে বাংলা ভাষার বিকাশ, সাহিত্যের ইতিহাস ও লিপির বিবর্তন-সম্পর্কিত প্রদর্শনী দেখেন এবং প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ও প্রথম যুগের

মুদ্রিত গ্রন্থের সঙ্গে পরিচিত হন ; তাঁরা শোনেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিতা, সেকাল থেকে একালের গান এবং বিভিন্ন যুগের সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা। সকলের অনুরোধ, এমন অনুষ্ঠান বছরে-বছরে শহরে-শহরে হোক। এরপর থেকে হাজার বছরের বাংলা কবিতা ও গানের অনুষ্ঠান পূর্ব বাংলায় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর সময়ে পূর্ব বাংলায় যাতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন না হয়, সেজন্যে আইউব-সরকার খুব তৎপর হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের সকল চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ঢাকার প্রধান রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সমিতির সভাপতি ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের জনৈক বিচারপতি। তাঁকে এক সময়ে সরকারী মহল থেকে জানানো হয় যে, শতবার্ষিকী-অনুষ্ঠানের জন্যে একটি বিদেশী দূতাবাস থেকে গোপন অর্থসাহায্য করা হচ্ছে। সরকার আশা করেছিলেন যে, এমন সংবাদ পেলে তিনি শতবার্ষিকী-অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংস্রব রাখবেন না। কিন্তু বিচারপতি তাঁর সমিতির সদস্যদেরকে শুধু চাঁদা তুলতে নিষেধ করে দেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পরিচিত কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে অনুরোধ করেন অনুষ্ঠানের জন্যে সবটা অর্থ সংগ্রহ করে দিতে। সে ভদ্রলোক তা করেও ছিলেন। শতবার্ষিকী-উদ্‌যাপন বিষয়ে সরকারী বিরূপতার কথা জানার পরে প্রায় একটা গণ-আন্দোলনের উত্তেজনা জড়িয়ে যায় অনুষ্ঠান-গুলির সঙ্গে।

কিন্তু ১৯৬১-তে সরকার যা করতে পারেন নি, ১৯৬৫-তে তা পারলেন। পাক-ভারত সংঘর্ষের সময়ে বেতারে রবীন্দ্র-সংগীত, রবীন্দ্রনাথের নাটক এবং প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগের সকল অমুসলমান নাট্যকার ও সঙ্গীত-রচয়িতার রচনা-প্রচার বন্ধ করা হয়। যুদ্ধবিরতির পরে পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীদের দাবীতে বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার পুনরায় শুরু হয়। তবে ভারত থেকে বই আমদানি নিষিদ্ধ করেন কেন্দ্রীয় সরকার এবং একটি প্রাদেশিক অর্ডিনান্সের বলে পূর্ব বাংলায় ভারতীয় পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ নিষিদ্ধ হয়। এর ফলে আবার বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের নিরবচ্ছিন্ন যোগ ব্যাহত হল। এ বিষয়ে বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হয় নি। তবে চর্যাপদ-কৃষ্ণকীর্তন থেকে শুরু করে বিদ্যাসাগর-মধুসূদন-দীনবন্ধু-বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী পূর্ব বাংলায় পুনর্মুদ্রিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' এবং

কোন কোন কাব্য ও নাটকেরও পুনর্মুদ্রণ হয়। ছাত্রছাত্রী ও পাঠকসাধারণের চাহিদাপূরণের অন্য কোন উপায় সেখানে ছিল না।

১৯৬৮-তে পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী জাতীয় পরিষদে এক প্রশ্নোত্তরে ঘোষণা করেন যে, বেতার ও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রচার কমিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেননা তা পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে। সরকারী বক্তব্যের প্রতিবাদে প্রথম যে বিবৃতি দেওয়া হয়, তাতে বলা হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষী পাকিস্তানীদের সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সরকারী নীতিনির্ধারণে এই সত্যের তাৎপর্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

কিন্তু সরকারী নীতির সমর্থনেও কিছুসংখ্যক লেখক-শিল্পী-সাংবাদিক-অধ্যাপক এগিয়ে এসেছিলেন। এঁদের অনেকে সরকারী ও আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ছিলেন। সংখ্যায় ও গুরুত্বে তাঁরা ভারি নন; কিন্তু সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা তাঁদের পক্ষে। সুতরাং এ নিয়ে বেশ একটা বাদ-প্রতিবাদ হল। সেবারে বাইশে শ্রাবণে প্রদেশের সর্বত্র খুব বড় করে রবীন্দ্র-জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। এ বিতর্ক উপলক্ষেই ঢাকায় সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ নামে একটি সংস্থা গঠিত হয়, যদিও তা সক্রিয় হতে পারে নি। কিন্তু এই "সাংস্কৃতিক স্বাধিকার" কথা দুটোর মধ্যে অনেকখানি বক্তব্য ছিল—যা এর ঘোষণাপত্রে প্রচারিত হয়েছিল। বিরোধী পক্ষ গড়ে তোলেন নজরুল একাডেমী: সেই সংস্থা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ও স্থায়িত্ব লাভ করে।

নজরুলের নাম সরকারও এভাবে ব্যবহার করেছেন। জাতীয় কবির সম্মান দিয়ে নজরুলের একটা খণ্ডিত রূপ তাঁরা তুলে ধরেছেন সব সময়ে। সরকার-পৃষ্ঠপোষিত কোন কোন প্রতিষ্ঠান সাড়ম্বরে নজরুল-জয়ন্তীর অনুষ্ঠান করলেও রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে নীরব থাকতেন। এবং নজরুলকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে তাঁদেরও সঙ্কোচ হত। কেননা, তিনি অবাঞ্ছিত অংশেরও কবি।

পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার বহমান ধারা এই ভেদবুদ্ধিকে বিনষ্ট করে, ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুতির এই বিপদ লঙ্ঘন করে, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর সকল রকম আক্রমণ প্রতিহত করে অগ্রসর হয়েছে। বিরোধের যে-ইতিহাস উপরে বর্ণিত হল, তা বহু বর্ষের, বহু তিক্ততার। এ-বিরোধে অনেক সময়ের অপচয় হয়েছে, অনেক শক্তিরও। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, এই বিরোধ

সত্ত্বেও—কিংবা এই বিরোধের দরুনও বলা যেতে পারে—পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনে একটা নতুন প্রত্যয় দেখা দিয়েছিল।

এই প্রত্যয়ের আরেক ভিত্তি ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণা-কর্মে অগ্রগতি। এ সম্পর্কে অনেক জিজ্ঞাসা, অনেক অতৃপ্তিবোধ ব্যক্ত করেছেন অনেকে; কিন্তু অকুণ্ঠ প্রশংসা ও আত্মতৃপ্তির উপলক্ষও পাওয়া গেছে বারংবার। বাংলা একাডেমীর 'আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' কিংবা প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা কি লোকসাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ চেষ্টা অথবা কেন্দ্রীয় বাংলা বোর্ডের উদ্যোগে উচ্চতর শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তকরচনার প্রয়াস এবং সরকারী নথিপত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহারের আদর্শ প্রণয়ন—এসবের মধ্য দিয়ে একটা স্থির লক্ষ্যের দিকে যাত্রাপথ নির্দিষ্ট হয়েছিল। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের বিকাশও এ প্রত্যয়কে দৃঢ়তাদানে সাহায্য করেছিল।

পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দাবীর জবাবে ১৯৭১এর পঁচিশে মার্চে যে বর্বর আক্রমণের সূচনা হয় ঢাকায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা একাডেমী ও শহীদ মিনারও সেই আক্রমণের শিকার হয়। এটা আকস্মিক নয়। সাংস্কৃতিক আত্ম-বিকাশকে পাকিস্তানের শাসকরা চিরকালই দমন করতে চেয়েছিলেন ছলে-বলে-কৌশলে। আর বাংলাদেশের মানুষ সে চেষ্টা বারবার ব্যর্থ করেছে, আবারও করবে।

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন

—শওকত ওসমান

॥ ১ ॥

বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক আন্দোলন অঙ্গাঙ্গী জড়িত। দেখা গেছে রাজনৈতিক কিছু মুনাফা আদায়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সাংস্কৃতিক আন্দোলন। আবার শেষোক্ত আলোড়ন উপরি উপরি যাই হোক, তার দীর্ঘ মেয়াদী উদ্দেশ্য কিন্তু রাজনৈতিক। বাংলাদেশে এখনকার প্রবণতার হেতু সন্ধানের জন্য পাকিস্তানের রাজনৈতিক পটভূমি-সম্পর্কে কিছু বলা দরকার।

অনেকে তো পাকিস্তানের জন্মলগ্ন নিজের নাড়িতেই অনুভব করেছেন।

তাঁদের জন্যে বেশী কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু অনেকের জ্ঞান কেবল ইতিহাস মারফৎ। তাই অতীতের কবর আবার নতুন করে খুঁড়ে দেখতে হয়।

পাকিস্তান গঠিত হয় দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর। মুসলমানরা এক জাতি, যেহেতু তাদের ধর্ম এক। মোদ্দা কথা এইখানে এসে দাঁড়ায়। ধর্মকেই জাতীয়তা গঠনের একমাত্র উপাদান-রূপে তখন মুসলিম লীগ প্রচার করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের হালে এই তত্ত্ব পানি না পেলেও রাজনৈতিক চাপে তা সহজে টিকে গেল না শুধু, দেশই দ্বি-খণ্ডিত করে ছাড়ল। এই সাফল্যের কারণ-সম্পর্কে নানা বিশ্লেষণ আছে। জাতীয়তাবাদী নেতাদের উপর অনেকে দোষ চাপিয়েছে। কারো মতে মুসলিম লীগ দায়ী। কেউ কেউ তৃতীয় পক্ষ ইংরেজের কারসাজি বলে প্রচার করেছেন। অতিসরলীকরণের প্রবণতায় এমন সব কথা আজো শুনতে হয়। কিন্তু যা তত্ত্ব হিসেবে টেকে না তা রাজনৈতিক সত্য হিসেবে কি করে জানান দিল? মনস্তাত্ত্বিকেরা যুক্তিবিচারহীন আবেগ-জগতের দিকে ইশারা দেন। দশ কোটি মুসলমান নচেৎ কী ভাবে একটা অযৌক্তিক সমাধানের দিকে ছুটে গেল। দুই দশক পরে ঐ গড্ডলিকা-প্রবাহের পরিণাম অতি স্পষ্ট। বাংলাদেশের জন্মই নচেৎ হোত না। কিন্তু এক যুগে দশ কোটি মানুষ মোহগ্রস্ত হোয়েছিল। নিজের মঙ্গলামঙ্গল দেখে নি। সংখ্যালঘিষ্ঠ বাঙালী মুসলমানের পাকিস্তানের জন্য কোন মাথাব্যথা থাকা উচিত ছিল না। কিন্তু তারাও সেদিন চোখ বুঁজে নিয়েছিল, যুক্তির ধার ধারে নি। আধুনিক শিল্পসমাজের রাজনৈতিক আন্দোলন:

পাকিস্তান। কিন্তু তার ভাবধারা মধ্যযুগীয় ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবিশ্যি এখানে ইসলাম ধর্ম বলতে বোঝায় লীগ নেতারা যা বুঝতেন। কারণ, এই ইসলামের স্বরূপ ব্যাখ্যা-সম্পর্কে তাঁদের কোন চেষ্টা ছিল না। এই স্বরূপ যত ঘোলাটে থাকে, ততই মঙ্গল। রাজনৈতিক মুনাফা-অনুযায়ী তার অদলবদল চলত। জিন্নাহ্ সাহেব যিনি ভুলেও সহজে পশ্চিম মুখে আছাড় খেয়ে পড়তেন না, তিনি হোলেন মুসলমানদের ইমাম। আর বিশ্বে কোরাণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার বা তফ্‌সীর-কারক মৌলানা আজাদ হোলেন 'শো-বয়'। এমন বহু স্ববিরোধের ছবি তখন পাওয়া যায়। একদিকে ভাবধারা মধ্যযুগীয়, কিন্তু উদ্দেশ্য জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে চিন্তা আবার অত্যাধুনিক। অর্থাৎ পাকিস্তান আন্দোলনের কোন যুক্তিযুক্ত বনিয়াদ ছিল না। কিন্তু তবু একটা নতুন রাষ্ট্র গড়ে উঠল। এই স্ববিরোধ তখন স্পষ্ট হয় নি। কিন্তু যখন পাকিস্তান রাষ্ট্র চালু হোল এবং কালে কালে তার সমস্যাগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, তখন আভ্যন্তরীণ বিরোধের কেলাসন ঘটতে লাগল। বেশ দ্রুতই বলতে হয়। আর স্ববিরোধ কি একটা? কতো রকমের। দেশ ভাগের পূর্বে বিভাগই সকল জাতির উন্নতি। কিন্তু দেশবিভাগের পর তারাই পাকিস্তানকে এক ইউনিট বানিয়ে ফেললে এবং ঘোষণা করলে, অমন অখণ্ডতার মধ্যেই জাতীয় উন্নতির পথ নিহিত। দু'মুখো সাপের বিষ নাকি নামে না। কথাটা প্রবাদ হোলেও এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত সত্যি। ১৯৬৫-৭১ এই ছ' বছরে যে-ঘূর্ণীপাকে পাকিস্তান উপনীত তা ইতিহাসের তুষারঝটিকা বলা চলে। বাংলাদেশে সাংস্কৃতিক আন্দোলন পূর্বোক্ত স্ববিরোধ ধ্বংসের শঙ্খনাদ।

এই সঙ্গে বাঙালী মুসলমানের মানস পটভূমির সঙ্গে কিছু পরিচয় দরকার। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্বের চরিত্রও কিছু আলোচনার দাবী রাখে, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানে যার রূপ স্বতন্ত্র আলাদা। বর্তমান স্ববিরোধের প্রকাশ একদিক থেকে অতীত-বীজের পরিণতি মাত্র। পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ-নেতৃত্ব মধ্যবিত্তশ্রেণী হতে উদ্ভূত। এরা সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারায় আপ্লুত থাকলেও বাংলাদেশে পাশ্চাত্য চিন্তার অভিঘাতও ঢের বেশী। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃত্ব পুরোমাত্রায় সামন্ততান্ত্রিক। সিন্ধু, পাঞ্জাব, বেলুচিস্তান কি উত্তর সীমান্ত প্রদেশে তার একই চেহারা। সকলেই বিরাট ভূখণ্ডের মালিক। মধ্যবিত্ত পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলই না। সামাজিক কাঠামোর পার্থক্য পরবর্তী কালে

রাজনীতিতেও প্রতিফলিত। ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার জন্যে নিখিল পাকিস্তান ভিত্তিতে কোন শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গড়াও সম্ভব ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে কিছু কিছু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে। পণ্যের উৎপাদনের সঙ্গে তার বিক্রয়-বণ্টন ব্যবস্থা স্বতই জড়িত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব তখন ঘটতে বাধ্য। পরবর্তী কালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নিখিল-পাকিস্তান চরিত্র কিছু কিছু ফুটে ওঠে কিন্তু তা তেমন স্পষ্ট নয়। তাই দেখা যায়, বাংলাদেশের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারে যখন মোজাফ্‌ফার আহম্মদ-পরিচালিত ন্যাশনাল আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান শাখা শেখ মুজিবকে পূর্ণ সমর্থন দেয়, তখন পশ্চিম পাকিস্তান শাখা চুপচাপ থাকে। ওয়ালী খান যিনি ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন, তাঁর সঙ্গে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আলোচনা পর্যন্ত হয় নি বলে খেদোক্তি করেন। এইসব স্ববিরোধ কিন্তু পরিবেশ ও নেতৃত্বের চরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল। দুই মুণ্ড-বিশিষ্ট পাকিস্তানে এক রব শোনার সম্ভাবনা কম। জোড় মগজের প্রতিক্রিয়া স্থানকালের প্রতি সাম্য নাও রাখতে পারে।

অপর পক্ষে বাঙালী মুসলমানের মানস-আবহ প্রায় স্বতন্ত্র। ব্রিটিশের প্রথম পদপাত বাংলাদেশেই। দেড় শ' বছর সেখানে সংখ্যায় প্রচুর না হোলেও মধ্যবিত্ত মুসলমান গড়ে উঠেছিল। বাংলার নানা সামাজিক আন্দোলনের প্রভাবও তাদের উপর ক্রিয়াশীল ছিল। দুই অঞ্চলের দুই কবির তুলনায় এই পার্থক্য ধরা পড়ে। ইকবালের কাছে ধর্মবিশ্বাস প্রগতির একমাত্র সহায়। নজরুল বিশ্বাসের যাথার্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। ইকবাল শেষপর্যন্ত বিশ্ব মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেন, নজরুল প্যান-ইসলামিক আচ্ছন্নতার প্রতি বিদ্রূপ হানেন: পান-ইসলাম, চুরুট ইসলাম। পশ্চিম পাকিস্তানে এখনও ট্রাইব্যাল দাঙ্গা প্রায় অনুষ্ঠিত হয়। শিয়া-সুন্নীর বিরোধও বিশেষভাবে প্রকট। তার কারণ, মধ্যযুগীয় মানসিকতার শিকড় সেখানে উৎপাটিত নয়। তেমন কোন সামাজিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় নি যা এসব ঝেঁটিয়ে বিদায় দিতে পারে। খ্রীস্টান ধর্মের অনুরূপ ইসলামে রিফর্মেশন-জাতীয় কোন সামাজিক বিপ্লব ঘটে নি। যেটুকু ঘটেছে তা নেহাৎ পরিবেশের চাপে। তার পেছনে কোন জোরদার যুক্তিবাদী আন্দোলন বা প্রচেষ্টার সাক্ষ্য মেলে না। ফলে, সামন্ততান্ত্রিক পশ্চিম পাকিস্তানের মানস-আবহ মধ্যযুগের চৌকাটে আবদ্ধ। ছিটেফোঁটা যেটুকু গণ্ডীভাঙা আয়াস চোখে

পড়ে তা সীমাবদ্ধ কিছু ব্যক্তির মধ্যেই। বর্তমান জীবনযাপনের ধারার স্রোত উত্থিত আধুনিক চেতনা পশ্চিম পাকিস্তানে তেমন সোচ্চার কোথায়? তবে একটি ব্যাপার বেশ দেখা যায়, যা ম্যাক্স ওয়েবার অনেক আগেই বলে গেছেন। সমাজে শ্রেণীস্তর ভেদে ধর্মের চেহারা প্রকট হয়। উপরের তলায় তা-ই ধর্ম যা তাদের আর্থিক সুবিধা আরাম-আয়েস, জীবনোপভোগকে অব্যাহত রাখে। শাস্ত্রীয় অনুমোদন সেখানে তুচ্ছ। ইসলামে পর্দাপ্রথার উপর কত কড়াকড়ি আরোপ করা আছে। উচ্চশ্রেণী তার কোন তোয়াক্কা রাখে না। এই খাদে ইসলামকে নামিয়ে আনতে পারে অভিজাতশ্রেণী, কারণ নচেৎ আয়েসে বিঘ্ন ঘটে। অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে এমন কনসেশান ভোগ করা যায়। সুদের উপর কী কঠিন ছিলেন মধ্যযুগের সমস্ত পয়গম্বরগণ। অথচ 'স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠা করতে ইসলামের ধারক ও বাহক পাকিস্তানী শাসকশ্রেণী বিবেকে কোন খোঁচা অনুভব করে নি। কে না জানে ব্যাঙ্ক সুদেরই অন্যতম কায়িক প্রতিবিম্ব'। এমন বহু উদাহরণ দেওয়া যায়। আধুনিক যন্ত্রাক্ত সমাজে প্রাচীন কৃষিনির্ভর সমাজের ধর্ম কতখানি চালু বা অচল থাকতে পারে, তা নিয়ে কোন মানসিক দ্বৈরথ পাকিস্তানে কেউ দেখবে না। মাঝে মাঝে কিছু মগজী কসরৎ জমে ওঠে, তা স্বল্প-শিক্ষিত পাণ্ডিত্যাভিমানী আলেম কি ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। নীচু তলায় অবিশ্যি ধর্ম আবেগের স্তরে থাকে। যুক্তিবিচার সেখানে অনুপস্থিত। ম্যাকস ওয়েবার আরো বলেছেন যে, অন্ধ আবেগের ভেতর এখন ধর্মের প্রকাশ বিধায় শাসকশ্রেণী সহজে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারে। বিশেষতঃ চিরন্তনতার দোহাই দেওয়া ঐ ক্ষেত্রে খুবই সহজ। মুসলিম লীগের নেতা বা সমর্থকদের মধ্যে বুদ্ধিচর্চায় ব্রতী অনুশীলিত একজন মানুষও দেখা যায়-নি। আবেগের স্তরে ধর্মের এই উপস্থিতি পাকিস্তান আন্দোলনকে আসল সাহায্য দিয়েছিল। যুক্তিবিচারহীন এক ভাবধারা যে নতুন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে সক্ষম হোল, তার অন্যতম বিশিষ্ট কারণ বোধহয় এইখানে নিহিত। অবিশ্যি আর্থিক সামাজিক বা অন্যান্য উপাদানকে খাটো করে দেখাও উচিত নয়। আবেগ মানুষকে কি পরিমাণ অন্ধ করে দিতে পারে, তার প্রমাণ তো বাংলাদেশের মুসলমানদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সব স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হোয়েও বাঙালী মুসলমানেরা কেন পাকিস্তান-মরীচিকার পেছনে পেছনে হন্ত হয়ে দৌড় মেরেছিল? আজ তারা ধনেপ্রাণে যে-বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন, জাতি হিসেবে

নিজের অস্তিত্ব বিলোপের আশঙ্কায় মরীয়া এবং যুধ্যমান, তা তাদের অতীতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ছাড়া আর কি বলা চলে ?

এইখানে বাঙালী মুসলমানের মানসিক আবহের এক দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এক ধরনের হীনম্মন্যতা যেন তাদের মজ্জাগত। দেশে দেশে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব স্থানের লোক নিজের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোয়ে ওঠে। উদাহরণত, ইরানীরা আরবদের শুধু হানাদার মনে করে না, একটা ঘৃণা ভেতরে পুষে রাখে। কারণ, আরবদের স্বাধীনতা তাদের কম ভোগায় নি। জাতীয়তাবাদ আন্দোলন-প্রসূত এই দৃষ্টিভঙ্গী আজ তাদের হাজার ক্রিয়াকলাপে স্পষ্ট। বর্তমান শাহান শা' অভিষেক কালে উপাধি গ্রহণ করেন আরিয়া মেহের অর্থাৎ প্রাচীন আর্যমিহির। তুরস্কে একই অবস্থা। কিন্তু বাঙালী মুসলমানের দেহ যেখানেই পড়ে থাক, তার আত্মা আরবের মরুপ্রান্তরে কুদোকুদি করার জন্যে সর্বদা অস্থির। আরব দূর-আস্ত্। এবং যাতায়াত ব্যয়সাপেক্ষ। বাঙালী মুসলমানের আত্মা তাই শেষপর্যন্ত বাঙলার বাইরে অবিভক্ত ভারতের কোন প্রদেশে গিয়ে প্রশান্তি লাভ করত। নামের শেষে নিজের শহর বা গ্রাম জুড়ে দেওয়ার অবাঙালীর রীতি, কত বাঙালী মুসলমানকে না একদা পেয়ে বসেছিল। বোকাই নগরী নামে এক মুসলিম লীগ নেতা ছিলেন। শুধু তা-ই নয়, ধর্মপ্রাণ বাঙালী মুসলমান যখন পীরের সন্ধানী তখন আর কোন কিছুতেই আর অত সন্তুষ্ট হয় না, যদি অবাঙালী মুর্শেদ পাওয়া যায়। একান্ত মাদানী (মদিনাবাসী) গাদানী না মেলে, ছাই, একটা জোনপুরী শাহরনপুরী পেলেও খুশীর চোটে যে অষ্টখণ্ড। চাটগাঁর জামে মসজিদের ইমাম ছিলেন একজন মদিনাবাসী। সুদূর সীমান্তবাসী পীর পর্যন্ত বাংলাদেশে বিচরণ করে এবং বেশ সোনাদানা হাতিয়ে নিয়ে যায় বছর বছর। পশ্চিম পাকিস্তানের বাংলাদেশ শোষণ কেবল ব্যবসাবাণিজ্য গত নয়, আধ্যাত্মিকও।

বাঙালীর এই বহির্মানসিকতার উৎস কোথায় ? সমাজতাত্ত্বিকেরা মনে করেন, বাঙালী মুসলমানের নেতৃত্ব পূর্বে জমি-নির্ভর শ্রেণী থেকে আগত। অধিকাংশই বহিরাগত, তাদের দৃষ্টি বাংলার বাইরেই পড়ে থাকত। কানপুর, জৌনপুর, দিল্লী, দেওবন্দ, ইরান, তুরান ছিল তাদের মানসিক অনুপ্রেরণার উৎস। সাধারণ মুসলমান দৈনন্দিন জীবনের প্রতিঘাতে হয়তো পুরোপুরি আচ্ছন্ন হোয়ে পড়ত না কিন্তু নেতৃত্বের খোঁজে এবং ঝাঁঝে এক ধরনের হীনম্মন্যতা মনে পুষে রাখতে

বাধ্য হোত। সাধারণ মুসলমান-যে পুরোপুরি কুক্ষিগত হোয়ে পড়ত না, তার প্রমাণ বাংলাদেশেরই নানা আন্দোলন। বাউলদের মধ্যে ইরান তুরানের ছিটে-ফোঁটা পাওয়া যায়, তা নিতান্ত ধর্মীয় উৎসাহজাত, নচেৎ লৌকিকপ্রবণতার স্বাক্ষরই সেখানে বেশী। স্বীকার না করে উপায় নেই, বাঙালী মুসলমানের হীনম্মন্যতা যেন মুসলিম লীগ আন্দোলনেও স্পষ্ট। বাঙালী মুসলমান নেতারা অমেরুদণ্ডী জীবের মতই লীগ ওয়াকিং কমিটির শোভা বর্ধন করত। ফজলুল হকের মত মানুষ মাথা চাড়া দিয়েও শেষ রক্ষায় অসমর্থ হন। বাঙালী মুসলমান বর্তমানে পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্তকরণে তৎপর। বাংলাদেশ যে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ হবে,—তার মানস-বীজ বাঙালীর মধ্যে নিহিত ছিল। অন্যদিকে প্রাচীন ঐতিহ্য ধারায় পশ্চিম পাকিস্তান বিশেষতঃ পাঞ্জাবের অধিবাসীরা নিজেদের Herenvolk ঠাউরে এসেছে। তদুপরি অর্থনৈতিক দিক থেকে তারা অবিভক্ত ভারতে অগ্রসর ছিল। অবিশ্যি উৎসভূমি কোন গৌরবময় ব্যাপার নয়। ইংরেজদের জন্য বেতনভুক সৈন্যসংগ্রহের প্রধান ঘাঁটি ছিল পাঞ্জাব। সাম্রাজ্যবাদীদের প্রসাদ এখানে একটু বেশী পরিমাণেই চুঁইয়ে পড়ত। ফলে, অর্থনৈতিক উন্নতি। সৈন্য রিক্রুটের সহায়ক বিরাট ভূ-খণ্ডের মালিকরা এখানে সাম্রাজবাদের দোসর। প্রভুদের কল্যাণে এবং অনুকরণে তারা আধুনিক হালচাল রপ্ত করত। লেবাসে ফিট্‌ফাট, তাজা-তন্দুরস্ত্ এই মুসলমানদের বাঙালী মুসলমানরা বড় সমীহার চোখে দেখতে অভ্যস্ত ছিল। কারণ বহির্মানসিকতা তো তার মধ্যেই বহু শত বছর থেকে চালু ছিল। ইসলামের বন্ধন আধ্যাত্মিকভাবে তা-কে কি করেছিল পাঞ্জাবী মুসলমানের সামনে বিচার করা কঠিন, কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে তাকে কেঁচো বানিয়ে ছিল। সুদীর্ঘ তেইশ বছর লেগে গেল সেইটুকু উপলব্ধি করতে। নেজাম-এ-ইসলাম, জমাতে ইসলামী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে এখনও অবিশ্যি-যে টিকে আছে, রাজনৈতিক ধার ভোঁতা হোয়ে গেলেও, তার কারণ, রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে সামন্ততন্ত্রের মৃত্যু, কিন্তু সামাজিক শক্তি হিসেবে তার জের পশ্চিম পাকিস্তানে এখনও বেশ প্রবল। পাকিস্তানের পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী তার উপনিবেশকে টিকিয়ে রাখতে খুবই তৎপর। পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এই আর এক বৈশিষ্ট্য। স্থানকাল-বহির্ভূত এক ধরনের বায়বীয়তা শাসকগোষ্ঠী-কর্তৃক সব সময়ই জীইয়ে রাখার অপচেষ্টা।

॥ ২ ॥

দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হোল পশ্চিম পাকিস্তানে করাচী শহরে। তার জন্যে তখন যুক্তি খুঁজে বের করতে হয় নি। নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী যে-কোন জায়গায় হোতে পারত। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা নিজেদের কোলে ঝোল মাখবেন, তা আর বিচিত্র কী। বাঙালীদের তরফ থেকে কোন উচ্চবাচ্যই ওঠে নি, কিন্তু উঠতে পারত। তখন নিস্তব্ধতার কারণ বাঙালীর মানস-আবহেই জমা ছিল। অবিশ্যি অনেক পরে বাঙালী তার ভুল বুঝতে পারে। বর্তমানে ঢাকায় দ্বিতীয় রাজধানী গড়ে উঠছে, প্রায় সমাপ্তির পথে। তা নিতান্ত রাজনৈতিক আন্দোলনের ফল। কিন্তু সুখসুবিধা যা গুছিয়ে নেওয়ার তা পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী আগেই আত্মসাৎ করে নিয়েছিল। ইসলামাবাদে বর্তমান রাজধানী গড়ার কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু পাঞ্জাবের শাসকগোষ্ঠী করাচী থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত করে তুঘ্‌লকী পুরাণকে ম্লান করে দিলে। ষোল শ' কোটি টঙ্কার শহর বর্তমান ইসলামাবাদ। একদম পাকিস্তানকে পাঞ্জাবের পকেটের ভেতর ঢোকাতে না পারলে স্বস্তি কোথায়? তৎসঙ্গে ষোল শ' কোটি টাকা ব্যয়-জাত ঝোল-ঝালের স্বাদ তো আছেই।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনে হঠাৎ রাজধানীর কথা উত্থাপন অনেকের কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হোতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থায় তেমন হেলা° দৃষ্টি অন্যায়। গোড়া থেকে বাঙালী মুসলমান সেই দিকে নজর দিলে হয়তো বাংলাদেশের ইতিহাস স্বতন্ত্র কিছু হোত। বারো শ' মাইল দূরে রাজধানী! এমন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য সুখ-সুবিধা আদায়ের ব্যাপারে যারা নিকটে থাকে তারাই উপকৃত হয়। পাক-রাষ্ট্র কতগুলো সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দেয়। কিন্তু ছিটেফোঁটা মাত্র বাংলাদেশের কপালে জোটে। আর যা জোটে তা নেহায়েৎ শাসন বিভাগের মর্জির উপর নির্ভরশীল। সমাজে সাংস্কৃতিক বিকাশের এই দিক কারো নজর এড়ানো উচিত নয়। কারণ, রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ব্যবস্থা যখন আছে, তখন তা থেকে বঞ্চিত হওয়া খুব সৌভাগ্যের ব্যাপার—যেহেতু নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা যায়—এমন মনে করা সব সময় যুক্তিযুক্ত নয়। অনুন্নত দেশে রাষ্ট্রীয় আর্থিক আনুকূল্য একদম তুচ্ছতার সঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া যায় কি? দূরত্ব-হেতু

বাঙালী মুসলমানের পক্ষে ধর্ণা দেওয়া ছিল কঠিন। লালফিতার দৌরাত্ম্য থেকে প্রশাসন মুক্ত, এমন বলা যায় না। বাঙালীর পক্ষে তাই তৃষিত চাতকের মত চেয়েই থাকতে হোত। সাংস্কৃতিক বিকাশে বাইরের এই পরিবেশগত চাপটুকুও লক্ষণীয়। শাসকগোষ্ঠীর মানসিকতা অনেক সময় বোঝা দায় হোত। আক্রোশ যেত প্রশাসন-ব্যবস্থার উপর। প্রজাদের নায়েবের উপর আক্রোশ এবং জমিদারের উপর আক্রোশ—দু'য়ের মধ্যে তফাৎ অনেক। বাঙালীর চোখে বাস্তবের ছোঁওয়া লাগতে তাই অনেক দিন লেগে গেছে। এসব বাহ্যিক দিক, তবু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির হদিসে তার অভিঘাত একদম উপেক্ষা করা চলে না।

॥ ৩ ॥

দ্বিজাতিতত্ত্বের নোঙরে বাঁধা পাকিস্তান রাষ্ট্র। তা থেকে এদিক ওদিক করা অমন ধর্মপীঠের সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে অবিশ্যি রাষ্ট্রনায়কেরা কিছু কিছু বেফাস কথা বলে ফেললে তা খণ্ডন করতে বেশী বিলম্ব করে নি। স্বয়ং জিন্না সাহেবের কথা ধরা যাক। শাসনতন্ত্র পরিষদে ঠিক দেশবিভাগের পরই তিনি ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রে হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমান মুসলমান থাকবে না, সকলেই হবে পাকিস্তানী। কিন্তু যখনই রাষ্ট্রীয় ভাষার প্রশ্ন উঠল তিনিই হেঁকে উঠলেন, "উর্দু এবং একমাত্র উর্দু'ই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" বিভিন্ন ভাষাকে স্বীকার করলে বিভিন্ন জাতির কথা স্বীকার করে নিতে হয়। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার তত্ত্ববিশারদ কী ভাবে আর সে ফাঁদে ঢোকেন? কেউ কেউ অলঙ্কারের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করে সব ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা পান। এক নেতা বলেছিলেন, পাকিস্তানের দুই অঞ্চল দুই চোখের মত। কিন্তু তার মুখ তো আর দু'টো হোতে পারে না। সুতরাং উর্দু'ই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এই দিকে কিন্তু ঠিকই রাস্তা ধরেছিল। মনে মনে তারা জানত, কোন রকমে যদি ভাষার দিক থেকে বাঙালীদের পঙ্গু করে দেওয়া যায়, তাদের মেরুদণ্ড ভাঙতে বেশী দেরী হবে না। সমাজ-জীবনে সংহতির এই হাতিয়ার ধরে তাই তারা প্রথমেই টানাটানি শুরু করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর প্রথম পাঁচ বছর ভাষার প্রশ্ন বাঙালীদের বেশ আলোড়িত

করে তুলেছিল। তদানীন্তন সভাসমিতির রিপোর্টে পত্রপত্রিকায় তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। অবিশ্যি সব বাঙালীই একমত ছিলেন, এমন বলা যায় না। শাসকপুষ্ট দালালও ছিল প্রচুর। তবে মোদ্দা কথা, পাকিস্তানের মোহ তখনও সাধারণ মানুষের চোখ থেকে মুছে যায় নি। নিরপেক্ষ দর্শকের সংখ্যাও ছিল অনেক। কিন্তু ক্রমশঃ বাঙালী তার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার-সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিল। ভাষা আন্দোলন নিমিত্ত মাত্র। এই সময়ও দ্বিজাতিতত্ত্বের যতো রকম অর্বাচীন প্রয়োগ হোতে পারে শাসকশ্রেণী তা বেশ তাগিদের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রচারণা কালে বলা হোত, বাংলা কাফেরদের ভাষা। (যেন আর্বী মুসলমানদের ভাষা ছিল ইসলাম প্রবর্তনার পূর্বে ?) বাংলা সাহিত্যে প্রচুর দেবদেবীর উল্লেখ থাকার ফলে মুসলমানদের ধর্মীয় ভাব ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং পরিত্যাজ্য। এবংবিধ অযৌক্তিক কোথাও কোথাও অশালীন মন্তব্যের চোটে একদা কান ঝালাপালা হওয়ার উপক্রম ছিল। জনমত একদম উপেক্ষা করা চলে না। পাকিস্তান সরকার তখন আরো এক চাল চেলেছিল। বাংলাভাষা থাকুক, কিন্তু তার অক্ষর বদ্‌লে ফেলে আর্বী অথবা রোমান করো। শুধু ঘোষণা নয়—এই বাবদ পঞ্চাশ ষাট লাখ তখন খরচ করা হয়। উপরি উপরি এইসব হিতৈষণা আসলে জাতীয়তা-বাদ খর্ব করার মতলব ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ভবী অত সহজে ভোলে না। বাঙালী জনসাধারণ যখন সোচ্চার এগিয়ে এলো তখন শাসকগোষ্ঠী গুলি চালিয়ে একবার মোকাবিলা করে দেখে নিলে পর্যন্ত। মহান একুশে ফেব্রুয়ারী বাঙালী জাতীয় জীবনে এক বিশেষ স্মারকস্তম্ভ হোয়ে রইল। পিছু হট্‌তে বাধ্য হোল শাসকগোষ্ঠী। বাংলাভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা লাভ করল। অবিশ্যি ঐ ঘোষণা পর্যন্তই। কারণ, আজও সরকারী কাজকর্ম ইংরেজীতেই চালু আছে। পরবর্তী কালে রাজনৈতিক ডামাডোলের তলায় বাংলাভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদার কথা চাপা পড়ে গেছে। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে আইয়ুবী সামরিক স্বৈরতন্ত্র চালু হওয়ার পর সেই প্রশ্ন আর বিশেষভাবে উত্থাপিত হয় নি।

পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা বাংলাভাষাকে হত্যার নানা ফন্দীফিকির গ্রহণ করে। তা পাকিস্তানের জন্মাবধি অব্যাহত। রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা থেকে যখন খারিজ করা গেল না, অন্য পাঁয়তারা শুরু হোল। পাঠ্য পুস্তকে প্রচুর আর্বী-ফার্সী ঢোকাও। যেহেতু রাষ্ট্রযন্ত্র হাতের মুঠোয়, শিক্ষাবিভাগের কর্তারা তেমন

হুকুম পালনে তৎপর রইলেন। এমন কি বানান পর্যন্ত বেঁধে দেওয়া হোল। নামাজ বর্গীয়-জ না অন্তস্থ-য হবে তা একদম বিধিবদ্ধ। পরীক্ষার্থীরা নাচার। পরীক্ষা পাশের জন্য এসব গলাধঃকরণে বাধ্য। কাজী নজরুলের নাম পর্যন্ত পাঠ্য পুস্তকে অন্তস্থ-য দিয়ে লেখা হোতে লাগল। কারণ, বাংলাকে যতদূর সম্ভব আর্বী-ফার্সী উচ্চারণের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হবে। এইভাবে ইসলামী জোস (তেজ) বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে উদ্দীপিত হোলে দুই পাকিস্তান এক অঙ্গের মত নড়াচড়া করবে।

এমন জুলুম আদৌ ছোটখাট ব্যাপার নয়। বিভ্রান্তি মারফৎ একটা জাতিকে কি ভাবে মেরুদণ্ডহীন করা যায়, পশ্চিমের শাসকগোষ্ঠী সেই পথই নিয়েছিল। যখন তা আর সম্ভব হোল না, তখন মৃত্যুকামড় সহ নিজেদের বর্বরতা নিয়েই আত্মপ্রকাশ করল। বাংলাদেশে বর্তমানে অনুষ্ঠিত গণহত্যা শাসকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার শেষ প্রচেষ্টা। তাই অত নির্দয়, তাই সভ্যতার মাপকাঠি বিবর্জিত।

কিন্তু শুধু জোরজবরদস্তি নয়, পাকিস্তান সরকারের আর এক সূক্ষ্ম চাল লক্ষণীয়। উপরে থেকে সংস্কৃতির মুরুব্বী সেজে নিজের নখ-দন্ত কৌশলে চাপা রাখার চেষ্টা। রাইটার্স গিল্ড এই জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান। সরকার বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা ব্যয় মারফৎ সাহিত্যের বিকাশের নানা দিক প্রশস্ত করল। আপাতদৃষ্টিতে তা-ই মনে হয়। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য, সব বিকাশের ধারা সরকারী কুক্ষিগত রাখা। অথবা যদি কোন বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়, সরকার যেন আগেই তার খবর পায় এবং সেই মত বিনষ্টি-নীতি প্রয়োগ করতে পারে। রাইটার্স গিল্ডের ক্ষেত্রে সরকার কিছুটা সফলতা লাভ করে বৈকি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ধোপে টেকে নি। কারণ, অধিকাংশ সময়ে দেখা গেছে, একটু প্রগতি-মনা পরিচালক যখন কর্ণধার, বহু লেখা সরকার-বিরোধী, যথারীতি প্রচারিত হোয়েছে। অথচ সরকার কিছু উচ্চবাচ্য করতে সাহস পায় নি, পাছে রাইটার্স গিল্ড ভেঙে যায় এবং সরকারী দুরভিসন্ধি প্রকাশ পায়। অনেক সরকারী বিরোধী বই পর্যন্ত পুরস্কৃত হোয়ে যাওয়ার পর টনক নড়েছে। এই ক্ষেত্রেও কিন্তু পূর্ব-পশ্চিমের ফারাকের জের স্পষ্ট ছিল। সরকার গড়ে রাইটার্স গিল্ডের পেছনে বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা খরচ করত। পূর্ব পাকিস্তানে হিস্যায় কখনও চল্লিশ হাজারও আসত না। তাছাড়া, হেড আফিস করাচীতে অবস্থিত। ফলে আনুষঙ্গিক ব্যয়ের সুযোগ পশ্চিমেই। পূর্ববঙ্গ স্বভাবতই

বঞ্চিত হোত। ম্যালোরিয়া হয় বাংলাদেশে। কিন্তু ম্যালেরিয়া গবেষণাকেন্দ্র রাওলপিণ্ডিতে অবস্থিত। এই নমুনা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীদের মনোবৃত্তি যাচাই করা যায়।

জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ব্যুরো অফ ন্যাশনাল রিকনষ্ট্রাক্শন (সংক্ষেপে বিয়েনার) ঠিক ঐ কিসিমের আর এক প্রতিষ্ঠান; অবিশ্যি কর্মক্ষেত্র আরো প্রসারিত এবং উদ্দেশ্য আরো মারাত্মক। এই সংগঠন মারফৎ সরকার বুদ্ধিজীবীদের মানসিক প্রবণতার উপর লক্ষ্য রাখত। এখানেও উৎকোচের ব্যবস্থা ছিল মজার। দুঃস্থ লেখকদের পাণ্ডুলিপি বাজার দরের চেয়ে ঢের বেশী চড়া মূল্যে কিনে নাও। ফলে, লেখক প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রথমে কৃতজ্ঞ এবং পরে মুখাপেক্ষী, এমন কী সমর্থক সেজে বসে থাকতে বাধ্য। এইভাবে বহু তরুণ লেখক মগজ বিকিয়ে দিয়েছে। আবার প্রতিষ্ঠিত লেখক মাথা চাড়া না মারে, তারও ব্যবস্থা রাখো। সংবাদপত্র-সেবীদের মুখ বন্ধ করে রাখার বন্দোবস্ত ছিল এই প্রতিষ্ঠান মারফৎ। বহু চরিত্রহীন ব্যক্তি এইভাবে গোপনে বিয়েনারের সমর্থক হোয়ে পড়ত অথবা তার সমাজবিরোধী কাজের ক্ষেত্রে চুপচাপ থাকত। নগদ নারায়ণ অবিশ্যি আভ্যন্তরীণ যোগসেতু। দেখা গেছে, বহু অনভিজ্ঞ তরুণ পরিচালকের স্রেফ খেয়ালখুশীর উপর লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হোয়ে পড়েছে। সাধারণ সরকারী আউট ঐ প্রতিষ্ঠানের উপর প্রযোজ্য নয়। এখন ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার। বিয়েনারের পরিচালকই সামরিক জাণ্টা-কর্তৃক প্রবর্তমান শিক্ষা-কমিশনের সদস্য সচিব। অবিশ্যি ঐ ভদ্রলোক আইয়ুব খানের আমল থেকেই বহালতবিয়ৎ ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশের দায়িত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অর্থাৎ, বিয়েনারকে এক কথায় বলা যায়, সরকারের সাংস্কৃতিক গোয়েন্দা বিভাগ। পাকিস্তানে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের চেয়ে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব আরো জটিল। আবেগের বেসাতি সরকার বেশ দক্ষতার সঙ্গে প্রথম থেকে চালু রেখেছিল।

হিন্দুস্থানীরা ঠিকই বলে, "তুম্ মে থোড়া কসর রহ্ গয়া," অর্থাৎ লেজের দিকে কিছু খুঁৎ রয়ে গেছে বা কিছুটা খাটো। সরকারী অর্থব্যয়ে বাংলাদেশী সংস্কৃতি-নাশকতায় যে কতো ব্যয় হয়েছে তার পরিমাপ দেওয়া আজ সম্ভব নয়। শুধু বিয়েনারের বাজেট বছরে তেত্রিশ লক্ষ টাকা। দরিদ্র দেশে এই বিপুল পরিমাণ অর্থের অপচয় সম্ভব হোত, কারণ গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের কোন ব্যবস্থা

ছিল না। স্বৈরতন্ত্রেই এজাতীয় ব্যাপার ঘটে। কিন্তু এত নাগপাশও বাঙালী জাতীয়তাবাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারে নি। কারণ, পরিবেশ-গত দুর্দশার প্রতিকার—আসল জায়গা থেকে, সরকার সব সময় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। তাই লাখ লাখ টাকার শ্রাদ্ধ কিছু সাময়িক বিভ্রান্তি হয়ত সৃষ্টি করেছে, কিন্তু আসল লক্ষ্য থেকে বাঙালীদের দৃষ্টি ফেরাতে পারে নি। সরকারী নীতির পাশাপাশি প্রথমে ঝিরিঝিরি, পরে স্রোতের আকারেই জাতীয়তাবাদের লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে লাগল। জাতীয়তার বিকাশের প্রথম যুগে মানুষ সুদূর অতীত থেকে প্রেরণা প্রয়াসী হোয়ে ওঠে। দেখা গেল, জহির রায়হান পরিচালিত 'বেহুলা' ফিল্মের বক্স-মূল্য আশাতীত। মনে রাখা দরকার, চাঁদ-সদাগর-বেহুলা কাহিনী এই বাংলাদেশের নদীমাতৃক দেশের প্রতিচ্ছায়া হোয়ে ওঠে। তাই ভেলায় ভেসে চলে বেহুলা সুন্দরী। বাঙালী মনের কাছে এর আবেদন সম্প্রদায়ের গণ্ডীভুক্ত নয়। হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খৃস্টান সকলেই অতীতের এই কাহিনীর মধ্যে নিজেদের স্বরূপ খুঁজে পায়। তাছাড়া নিছক মানবিক দিক থেকেও কাহিনী বিশেষভাবে চিত্তপ্লাবী। তাই ফিল্মের জগতে অমন প্রতিষ্ঠিত হোয়ে ওঠে। পাকিস্তান সরকারের অবিশ্যি এসব জানার কথা নয়। তাই গোকুলে এই ভাবেই হত্যাকারীর বয়স বাড়ে। এক কথায় বাঙালী মনে নিজের স্বাজাত্যে ফুটতে লাগল। তাছাড়া নিজের অস্তিত্ব জীয়োনো কঠিন। তাই পদ্মপুরাণের কাহিনী মুসলমান পরিচালক এবং দর্শকদের ঐভাবে আকর্ষণ করে। পয়লা-বৈশাখের উৎসবের ক্রমোত্তর জাঁকজমক ঘটা এবং অজস্র দর্শক-সংখ্যার বৃদ্ধির দিকে যাঁরা লক্ষ্য রেখেছেন, তাঁদের কাছে আর বিশদ বলার কিছু প্রয়োজন নেই। বৎসরের প্রথম দিন বাঙালী মুসলমান তার নিজের করে নিলে। কুখ্যাত মোনেম খাঁর শাসনও আর সেদিকে জোরজবরদস্তি ঘটাতে সাহস পায় নি। এক দিন বাংলাদেশে গাড়ির নম্বর পর্যন্ত বাংলা হোয়ে গেল। স্বৈরতন্ত্র এখানেও চুপ রইল। কারণ, তাদের জানা ছিল, বাধা দিলে তা টিকবে না। নতুন পল্লীর নামকরণ একই খাতে বইতে লাগল। পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সরকার নিজস্ব ইমারৎ এবং পল্লীর নাম রাখলো আর্বী বা ফার্সী। যথা, গুল্‌ফেশান, কাহ্‌কেশান ইত্যাদি। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের পর নাম বদলাতে লাগল। এই সরকার প্রজাদের ভাষা বোঝে না। তাই বোধ হয়, প্রবণতা লক্ষ্য করে নি। তেমন ঘটলে বাধা সৃষ্টি হোত। অবিশ্যি

বাধা টিকত কিনা সন্দেহ। এবার সরকারী ইমারতের নাম শুনুন: সাগরিকা, অরুণিমা, নীহারিকা আর নতুন পল্লী একদম বাঙালী মনের প্রতিধ্বনি: বারিধারা, বনানী, উত্তরা ইত্যাদি। এইসব প্রবণতার দিকে বাঙালীদের ঠেলে দেওয়ার মূলে ছিল, সরকারী দূরদৃষ্টির অভাব। অবিশ্যি রাষ্ট্রের বনিয়াদের গোড়ায় ডিনামাইট স্থাপন তাদের পক্ষে অসম্ভব। বহুজাতিবিশিষ্ট রাষ্ট্র পাকিস্তান, একথা মেনে নিলে আর পাকিস্তান থাকে না অথবা তার রূপ অসাম্প্রদায়িক হোতে বাধ্য। শাসকদের পক্ষে এমন 'হারাকিরি' অসম্ভব। মিথ্যের আওতায় শোষণের সাপ নির্বিবাদে বাস করে। পাকিস্তানী শাসক-সম্প্রদায়ের চেয়ে ভালভাবে কে আর তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে? আজও সেই জিগীর অব্যাহত আছে: ইসলাম, অখণ্ড পাকিস্তান, জাতীয় সংহতি ইত্যাদি।

তাই বাঙালী মুসলমান ক্রমশঃই স্বজাত্যবোধের দিকে ঝুঁকতে লাগল। রবীন্দ্রসংগীতের প্রসার এদিকে কিছু আলোকপাতে সক্ষম। প্রথমতঃ, রবীন্দ্রনাথ অর্থ বাংলাসাহিত্য—একথা বললে কিছু অত্যুক্তি করা হয় না। ঐক্যের প্রবণতা সাহিত্যে সংগীতে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। তাই রবীন্দ্রনাথের দিকে ঝুঁকে পড়া বিচিত্র নয়। শাসকশ্রেণী প্রমাদ গণল প্রথম থেকেই। সোজাসুজি রবীন্দ্রনাথকে নাকচ করা যায় না। সুতরাং ভারত-বিদ্বেষ তথা পশ্চিম বঙ্গ বিদ্বেষের আড়ালে ঘোষণা করা হোল: পাকিস্তানী সাহিত্যের আলাদা স্বাতন্ত্র্য আছে। এমন স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টিই সত্যিকার সাহিত্যিকের জাতীয় কর্তব্য। এখানেও ইসলামের মত কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা বা নির্দেশ থাকে না—কী স্বরূপে পাকিস্তানী সাহিত্যিককে চেনা যাবে? অর্থাৎ ধূয়া যত ধোঁয়াটে করে রাখা যায়, ততই প্রতিপক্ষের উপর জুলুম সহজ হয়। পাকিস্তানের শুরু থেকেই ভারতবিদ্বেষ আর সরকার ছাড়তে পারে নি। আইন মারফৎ পশ্চিম বঙ্গ থেকে বই, রেকর্ড (বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ) বন্ধ করে দেওয়া হোলো। তখন ইংলণ্ড, আমেরিকা ঘুরে বই বা রেকর্ড আসতে লাগল। এবার আইন মোক্ষম: যে-কোন দেশ থেকেই হোক ভারতীয় বই ও রেকর্ড আমদানি নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক আইন-অনুসারে ব্যক্তিগতভাবে এক ডজন রেকর্ড সঙ্গে আনা যায়। পাকিস্তান সরকার তা-ও ভঙ্গ করলে। পশ্চিম বঙ্গে বা ভারতে ছাপা বইয়ের পুনর্মুদ্রণ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হোল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তা প্রযোজ্য নয়। সেদিকে ব্যবসা অব্যাহত রইল। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পর্যন্ত বাংলা

পড়ানো হয়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পশ্চিম বঙ্গেই লিখিত। পাঠ্য বই ছাড়া ছাত্রদের কী ভাবে চলবে, পাক-সরকার এতটুকু ভেবে দেখে নি। সাহিত্য জাতীয়তার উৎস। তার রসসিঞ্চন-পথ যত দিকে আছে বন্ধ করো। কিন্তু লেজের দিকে খুঁৎ রয়ে গেল। জাতীয় প্রবণতা এই চাপের মুখে আরো জোরদার হোল, ভেতরে এবং বাইরে। শামসুর রহমান, সিকান্দার আবু জাফর, আল্ মাহমুদ, হাসান হাফিজর রহমান এবং শহীদ কাদ্রীর উনিশ শ' পঁয়ষট্টি উত্তর কবিতা পড়লে দেখা যায়, ফল্গুধারা ক্রমশঃ ঘূর্ণীমুখর এবং দারুণ মানসিক লাভা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কিভাবে গেঁজে উঠছে নিষ্কাশন-পথের সন্ধানে। গণতান্ত্রিক ভিত্তি না থাকার ফলে দেখা যায়, মাত্র কুড়ি পঁচিশটা লোক পাকিস্তানের বারো কোটি লোকের ভাগ্য-নিয়ন্তা হোয়ে বসেছিল। তাদের শিক্ষাদীক্ষা সাধনা করুণা-উদ্রেকের ব্যাপার। জিন্নাহ্ তবু ছিল ম্যাট্রিকুলেট, অবিশ্যি ব্যারিস্টার। খাজা শাহাবউদ্দীনের মত এক-চোখা (একটি চোখ সত্যি খারাপ) নন-ম্যাট্রিকুলেট পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজনীতিতে কম ভূমিকা পালন করে নি। অবিশ্যি এমন মূর্খের দল অনেক সময় জন-সাধারণের চক্ষু-উন্মীলনের বড় সাহায্য দেয়। সূক্ষ্ম চাল তাদের অজ্ঞাত। তাই হঠাৎই খাজা সাহেব রবীন্দ্রসংগীত রেডিও পাকিস্তান থেকে নিষিদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করে। তার প্রতিবাদে তুমুল ঝড় উঠল। শাসকগোষ্ঠী শেষে পিছু হটতে বাধ্য হয়। রবীন্দ্র-বিরোধিতায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন হেয় হয় যে, পাকিস্তানী দূতাবাসগুলো পর্যন্ত সরকারকে অমন কাজ থেকে নিরস্ত হওয়ার জন্যে অনুরোধ জানায়।

পাকিস্তানের ভারত-বিদ্বেষ রাষ্ট্রীয় কারণে যতটুকু, কেবল পূর্ব পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক আন্দোলন বানচাল বা বিকৃত করার জন্যে তার চেয়ে ঢের বেশী। পশ্চিম এবং পূর্ববঙ্গের যোগসূত্র শাসকদের আরো হন্যে করে তুলেছিল। কিন্তু প্রবণতার ঐক্য অত সহজে ধ্বংস করা যায় না। কীর্তন গানের আবেদন একজন পাঞ্জাবীর কাছে কতটুকু? বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের তা বাঁচার সম্পদ। কেবল ধর্মের দোহাই মেরে যদি মানুষের ঐতিহ্য ধ্বংস করা যেত তা হোলে খোদ মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম-দেশে এত জাতির স্বাতন্ত্র্য থাকত না। আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনগুলোর পুরোপুরি ফল কিছু সাময়িক বিভ্রান্তি মাত্র। তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-যে সিদ্ধি হয় না, তার প্রমাণ মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম-অধ্যুষিত

দেশগুলোর অন্তর্বিরোধ। রাজতন্ত্রী ইরানের সঙ্গে প্রজাতন্ত্রী ইরাকের কী হৃদ্যতা থাকবে? এক সুদানের মধ্যে কাফ্রি এবং আর্বী মুসলমানদের কলহ অত সহজে মিটল কই? বহু বছর আর্বী মুসলমানেরা, ইসলামের স্বর্ণযুগে বিশেষতঃ, কাফ্রিদের গোলামের বেশী মর্যাদা দেয় নি। ইতিহাসের জের এত সহজে কাটে কী? মনের বিরুদ্ধে লড়াই যারা অহরহ চালিয়ে যেতে চায়, তাদের ইতিহাস-জ্ঞান আদৌ থাকে না। পাকিস্তান সরকার তার প্রকৃষ্ট নজীর।

বাংলাদেশের ভূমিষ্টি-আগার তো তাদের সকল নাশকতামূলক কার্যের প্রতিবাদ। সাম্প্রদায়িকতার জিগীরের পেছনে এত অর্থব্যয় এত উদ্যোগের অপচয়, কিন্তু তার একুন ফল ঠিক বিপরীত। হেগেলীয় নিগেশন অফ নিগেশনের (নেতির নেতি) জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত পাকিস্তান রাষ্ট্র। সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর জন্ম, কিন্তু উত্তরকালে অতি জোরদার অসাম্প্রদায়িকতার বনিয়াদ সেখানেই প্রতিষ্ঠিত।

পরিবেশ-অনুযায়ী ইতিহাসে এই পরিণতি অবধারিত ছিল।

বাংলাদেশ স্বীকৃতি চায়

—রামেন্দু মজুমদার

বাংলাদেশে এখন যুদ্ধ চলছে।

বাংলার মাটি থেকে হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে উৎখাত করার জন্য এ যুদ্ধ। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ একাত্ম হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছে। বাংলার মানুষ কিন্তু যুদ্ধ চায় নি। চেয়েছিল শান্তির পথে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যেই পূর্ণ মর্যাদা আর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে থাকতে চেয়েছিল তারা। কিন্তু গত চব্বিশ বছর ধরে সংখ্যাগুরু বাংলাদেশের সব অধিকারই অস্বীকার করেছে সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তান। বাংলাদেশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশ।

সেই একই অন্যায় অধিকারের সূত্র ধরে পশ্চিম পাকিস্তানী শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধি জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নির্বাচনের গণ-রায়কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে ১৯৭১ সালের ২৫-এ মার্চ রাতের অন্ধকারে বাঙালী নিধন অভিযানের সূচনা করেন। কয়েক মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু অবিশ্বাস্য গণহত্যার বিরতি নেই। হত্যা আর অত্যাচারের যে-ছবি বহির্বিশ্বের কাছে ফুটে উঠেছে, তা হিটলার আর চেঙ্গিস খানের বিভীষিকাকেও ম্লান করে দিয়েছে।

লাখো লাখো বাঙালীর মৃতদেহের নীচে কবর হয়ে গেছে পাকিস্তানের। হামলার প্রথম প্রহরেই জন্ম নিয়েছে একটি নতুন রাষ্ট্র। স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরের আম্রকাননে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার। শপথ গ্রহণ করেন উপ-রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী আর অন্যান্য মন্ত্রীরা। সেদিন থেকেই বিশ্বের সব রাষ্ট্রের কাছে বাংলাদেশের সরকার ও নির্যাতিত জনগণের পক্ষ থেকে আবেদন জানানো হয়েছে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে। ভারত সহ বিশ্বের অনেক দেশের জনগণের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হয়েছে সে দাবী। কিন্তু আজ পর্যন্ত বিশ্বের কোন দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসে নি। কেন আসে নি সে বিতর্কে জড়িত হওয়া বর্তমান আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। বাংলাদেশ কেন

স্বীকৃতি চায় আর তার জন্যে তার যোগ্যতাই বা কতটুকু তা-ই আমাদের বিবেচ্য।

কেন বাংলাদেশ?

স্বীকৃতি দেবার আগে এ প্রশ্নটি সব দেশেরই প্রথমে মনে হয়েছে। এ প্রশ্নের জবাব পেতে হ'লে, স্বাধিকারের দাবী কি ক'রে স্বাধীনতা ঘোষণায় পরিণত হ'ল, তা একবার তলিয়ে দেখা দরকার। বাংলাদেশ কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হ'ল, তা সংক্ষেপে আলোচনা করব।

অর্থনৈতিক শোষণ ও বৈষম্য

পাকিস্তান-সৃষ্টির পর থেকেই এর দু'অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দিন দিন বাড়তে থাকে। পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯৫৯-৬০ সালে একজন পশ্চিম পাকিস্তানীর গড়পড়তা মাথাপিছু আয়ের হার তার একজন বাংলাদেশের 'ভাই'এর চেয়ে ৩২% বেশী ছিল। দশ বছর পর সে বৈষম্যের হার বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ৬১%-এ।

সমগ্র পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬% বাংলাদেশে হ'লেও উন্নয়ন খাতে ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই হয়েছে অনেক বেশী। ২০% থেকে ৩৬% এর মধ্যেই বাংলাদেশের অংশ সীমাবদ্ধ ছিল।

পাকিস্তানের আমদানি-রফ্‌তানিতে বাংলাদেশের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলাদেশ পাকিস্তানের রফতানির বিরাট অংশের যোগানদার হ'লেও আমদানির বেলায় তার ভাগ্য একটা ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। যেমন ১৯৬১-৬২ সালে পাকিস্তানের রফতানির ৭০·৫% ভাগই ছিল বাংলাদেশের পণ্য। আর সেবার আমদানিতে বাংলাদেশের অংশ ছিল ২৮·১%।

এভাবে বাংলাদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করা হ'ত পশ্চিম পাকিস্তানের সার্বিক উন্নতির জন্যে। সব শিল্প গড়ে উঠতে লাগল সেখানেই। বাংলাদেশের কিষানের রক্ত জল করা অর্থে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরাট মরুপ্রান্তর শ্যামল হ'ল। পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যে কাঁচা মাল জুগিয়েছে বাংলাদেশ। এ সব শিল্প প্রতিষ্ঠান ন্যূনতম মজুরীতে বাঙালী শ্রমিকদের নিয়োগ করত। আর সে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত পণ্যসমূহের একচেটিয়া বাজারও সেই বাংলাদেশ। উল্লেখযোগ্য, পাকিস্তানের মোট সম্পদের ৮০% এর

মালিক যে-২২ পরিবার, তাদের সবাই পশ্চিম পাকিস্তানী। একচেটিয়া শোষণের এতসব যন্ত্র চালু থাকতে, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করবে কোন্ দুঃখে ?

রাজনৈতিক পটভূমি

বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রথম উন্মেষ আসলে ঘটেছিল সেই ১৯৪৮ সালে— ভাষার প্রশ্নে মোহাম্মদ আলি জিন্নার ঘোষণার বিরোধিতার মধ্যেই। ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন মুখ্যতঃ সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলেও পাকিস্তানের রাজনীতিতে এর প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এই বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রথম বিজয় সূচিত হয়। বাংলাদেশের মানুষ যখন বুঝতে পারল, মুসলিম লীগ পাকিস্তানের জন্মদাতা হ'লেও তা পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদীদের একটি সংগঠন ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন তারা মুসলিম লীগের পূর্ণ বিরোধিতা করতেও দ্বিধা করল না। বাংলাদেশে ক্ষমতায় এল যুক্তফ্রন্ট। কিন্তু মিথ্যা অজুহাতে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশে আইনসভা বাতিল করলেন। ১৯৫৪ সালেই গভর্নরের শাসন চালু হ'ল বাংলাদেশে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের নতুন সংবিধানে পূর্ব বাংলার নাম বদলে রাখা হ'ল 'পূর্ব পাকিস্তান'। ১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানী-আহুত কাগমারী সম্মেলনে বাংলাদেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রকাশ্য সাবধান বাণী উচ্চারিত হ'ল। ভাসানী বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের উপর শোষণ চলছে। শোষণ চলতে চলতে এমন এক দিন আসবে যখন পূর্ব পাকিস্তানের লোক পাকিস্তান থেকে আলাদা হ'য়ে যেতে চাইবে। সে বছরেই বাংলাদেশের প্রাদেশিক পরিষদে গৃহীত স্বায়ত্তশাসনের একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার-কর্তৃক বিচ্ছিন্নতা-বাদী আন্দোলন বলে বাতিল করা হয়।

১৯৫৮ সাল। পাকিস্তানে গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটিয়ে ক্ষমতায় এলেন সেনাপতি আইয়ুব খান। দশ বছর রাজত্ব চালালেন তিনি। ১৯৬৯ সালে সমগ্র পাকিস্তান বিশেষ করে বাংলাদেশব্যাপী প্রবল গণ-অভ্যুত্থানের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ক্ষমতা তুলে দিলেন সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হাতে। ইতিমধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা ও সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা আন্দোলন দুর্বার গতি লাভ করেছিল। ইয়াহিয়া ক্ষমতায় এসে দেশে সব

রাজনৈতিক কার্যকলাপ সামরিক আইন জারী করে বন্ধ করলেন। বিড়াল তপস্বী ইয়াহিয়া খান প্রতিশ্রুতি দিলেন, দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবেন।

১৯৭০ সালে পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ল। আওয়ামী লীগ তাদের ৬ দফা কর্মসূচী সামনে রেখে জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশের ১৬৯টির মধ্যে ১৬৭টি আসনেই জয়লাভ করে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক-গোষ্ঠী বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা অস্বীকারের চরম পন্থা গ্রহণ করল। ১৯৭১ সালের ২৫-এ মার্চ সেনাপতি ইয়াহিয়া খান বাংলা-দেশের ঘুমন্ত মানুষের উপর লেলিয়ে দিলেন সুসজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী। রচিত হ'ল পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কময় অধ্যায়। পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে জন্ম নিল নতুন দেশ—স্বাধীন বাংলাদেশ।

সাম্প্রতিক ঘটনা-প্রবাহ

নির্বাচন সমাপ্ত হবার পর দেশের সংবিধান নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনায় বসেন। সিন্ধু ও পাঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা জুলফিকার আলি ভুট্টোর সঙ্গেও ইয়াহিয়ার অনেক আলোচনা হয়। ৩রা মার্চ, ১৯৭১, জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ ঘোষিত হয়। কিন্তু ১লা মার্চ হঠাৎ ইয়াহিয়া খান অনির্দিষ্ট কালের জন্যে অধিবেশন স্থগিত রাখলেন। শেখ মুজিব অভিযোগ করলেন, এ এক চক্রান্ত। তাঁর সঙ্গে কোন আলোচনা না করে ভুট্টোর পরামর্শে ইয়াহিয়া এ-কাজ করেছেন। বাংলাদেশ ইয়াহিয়ার এ সিদ্ধান্তে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ল।

শেখ মুজিবের আহ্বানে পর পর পাঁচ দিন বাংলাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হ'ল। বিক্ষোভরত জনতার উপর সেনাবাহিনী গুলি চালাল। বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নিহত হ'ল কয়েক শ' মানুষ। ৬ই মার্চ ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন, ২৫-এ মার্চ অধিবেশন বসবে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতির জন্য দায়ী করলেন শেখ মুজিব ও তাঁর সমর্থকদের। ৭ই মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় ঘোষণা করলেন তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী। জাতীয় পরিষদে যোগ দেবার ৪টি শর্ত দিলেন তিনি। সামরিক আইন তুলে নিতে হবে,

সেনাবাহিনীকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নিতে হবে, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে আর সেনাবাহিনীর গত কয়েক দিনের কার্য-কলাপের তদন্ত করতে হবে।

পরদিন থেকেই শুরু হ'ল অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। বাংলাদেশের সব সরকারী-বেসরকারী অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ বন্ধ রইল। বাংলাদেশের মানুষ এক অভূতপূর্ব ঐক্যের নজির রাখলেন। নতুন সামরিক গভর্নর লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ পর্যন্ত করালেন না কোন বিচারপতি। ১৫ই মার্চ শেখ মুজিব ৩৫টি বিধি জারী করে বাংলাদেশের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করলেন। বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করলেন, জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রায় সব ক'টি আসন বিজয়ী আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবে তাঁর ক্ষমতা গ্রহণ, নির্বাচনে বাংলাদেশে মানুষের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ। সেই ১৫ই মার্চই ঢাকা এলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। তারপর দীর্ঘ দশ দিন ধরে চলল অলোচনার প্রহসন। শেখ মুজিবের সঙ্গে দফায় দফায় বাংলাদেশের ন্যায্য দাবী মেটানোর প্রসঙ্গে আলোচনা করলেন ইয়াহিয়া খান। আলোচনায় যোগ দিতে এলেন ভুট্টো আর পশ্চিম পাকি-স্তানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতাদের আলাদা আলাদা বৈঠক হ'ল।

বাংলাদেশের সব কিছু শেখ মুজিবের নির্দেশেই পরিচালিত হচ্ছে। তাঁর ধানমণ্ডী বাড়িই হয়ে দাঁড়াল গভর্নমেন্ট হাউস। আর এদিকে করাচী থেকে উড়োজাহাজ ভর্তি সৈন্য আর গোলাবারুদ আসছে। একেক দিন ১০টি/১২টি পর্যন্ত পি. আই. এ. বিমান রণসম্ভার বোঝাই করে নিয়ে এসেছে ঢাকায়। মুজিব এ ব্যাপারে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। তবু আলোচনা চালিয়ে গেলেন। একটা আশা—যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাংলার মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পায়।

কিন্তু ২৫-এ মার্চ রাতে জঙ্গী সরকারের স্বরূপ প্রকাশ পেল। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রাতের অন্ধকারে পশ্চিম পকিস্তানে ফিরে গেলেন ইয়াহিয়া খান। শুরু হ'ল বর্বর গণহত্যা। অকথ্য। নিষ্ঠুর। অবর্ণনীয়।

আওয়ামী লীগ ও তার নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাস করতেন অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের মারফত বাঙালীর মুক্তি আসবে। তাই তাঁরা শেষ

দিন পর্যন্ত চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি যে, একটা দেশের সরকার সে দেশেরই লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করতে পারে। তাঁরা ভাবতে পারেন নি, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা হ'তে পারে, তাঁদের দলকে অবৈধ ঘোষণা করা-যেতে পারে। সেজন্যে তাঁদের কোন প্রস্তুতি ছিল না। অগণিত মানুষ অসহায়ের মত মরেছে।

কিন্তু বীর বাঙালী অস্ত্রও ধরেছে। সেনাবাহিনীর ইস্টবেঙ্গল রেজিমেণ্ট, পুলিশ, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্-এর দেশপ্রেমিক সেনানীরা বাংলাদেশকে রক্ষার জন্যে, গণহত্যা বন্ধের জন্যে, হানাদার বাহিনীকে উৎখাত করার জন্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাণ্টা আক্রমণ চালিয়েছে। এদের নিয়েই প্রথমে গড়ে উঠেছে মুক্তিফৌজ। ক্রমে তা সুসংগঠিত হয়েছে। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও যুবকেরা দলে দলে যোগ দিয়েছে মুক্তিফৌজে বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করবার জন্যে।

গৃহযুদ্ধ বা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়

বাংলাদেশের বর্তমান সংগ্রামকে গৃহযুদ্ধ বলে কেউ কেউ আখ্যাত করেছেন। পাকিস্তান সরকারের ভাষায় এটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। বাংলাদেশ-সম্পর্কে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক তথ্যাবলী বিশ্ববাসীর কাছে অজানা থাকাতে এসব ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের দুটো অংশের মাঝে-যে হাজার মাইলের ব্যবধান এ সোজা কথাটাও অনেক দেশের প্রতিনিধিদের কাছে জানা নেই। এমনই দক্ষ বৈদেশিক প্রচার পাকিস্তান সরকারের। গত নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ের পর থেকে বাংলাদেশ-সম্পর্কে বিদেশী সাংবাদিকদের কল্যাণে বিশ্ববাসী জানতে শুরু করেছে।

বাংলাদেশের অধিবাসীদের মধ্যে দুটো দলের যদি সশস্ত্র সংঘর্ষ হ'ত, তবে এটাকে গৃহযুদ্ধ বলা যেত। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের নিজেদের মধ্যে কোন সংঘর্ষ নেই। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা হানাদার সৈন্যবাহিনী নির্যাতন চালাচ্ছে বাংলার অসামরিক মানুষের উপর। একদিকে আধুনিক অস্ত্রসজ্জিত পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আর অপরদিকে নিরস্ত্র নিরপরাধ বাংলাদেশের অসামরিক জনগণ। আঘাতের পরই কেবল বাংলার মানুষ আত্মরক্ষার জন্যে অস্ত্র ধারণ করেছে। তাহলে এটাকে গৃহযুদ্ধ বলা যাবে কোন যুক্তিতে?

পাকিস্তান সরকার বলছেন, বাংলাদেশের বর্তমান সংগ্রাম নিছক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন যা কিনা ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের সক্রিয় প্রচেষ্টার ফল।

বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬%। সংখ্যাগরিষ্ঠ কি ক'রে বিচ্ছিন্নতাবাদী হতে পারে? বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও তার ন্যায্য অধিকার কোন দিন পায় নি। বাঙালী যখনই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চেয়েছে, তখনই হাজার মাইল দূর থেকে তা দমন করার বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কোন দিন তার ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে নি। সংখ্যালঘু পশ্চিম পাকিস্তানের উপরই-যে স্বর্গীয় দায়িত্ব অর্পিত ছিল। শেষপর্যন্ত অবাধ নির্বাচনের গণ-রায়কে পর্যন্ত তারা অস্বীকার করেছে। যে-আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে জাতীয় পরিষদের ১৬৯টির মধ্যে ১৬৭ আসন ও প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টির মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করেছে, সে-আওয়ামী লীগকে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী অবৈধ ঘোষণা করতে দ্বিধা করে নি।* তাই বলছি, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করবার সংগ্রাম কোন দিন বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হ'তে পারে না।

বাংলাদেশের মানুষ এক জাতি

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি অবাস্তব রাজনৈতিক তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। মুসলিম লীগ ধর্মকেই রাষ্ট্রগঠনের ও জাতীয়তা নির্ধারণের একমাত্র নীতি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। ধর্মের উপর ভিত্তি করে দেশ গড়ার কোন নজির এ দুনিয়ায় না থাকলেও, মুসলিম লীগ পাকিস্তান কায়েম করে। পাকিস্তান [illegible] সে ভুল আজ বাংলাদেশের মানুষকে রক্ত দিয়ে শুধতে হচ্ছে।

বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশই যুক্তরাষ্ট্রীয় বা আধা-যুক্তরাষ্ট্রীয়। তাই কোন দেশ বিভক্তকরণের সংগ্রাম কেউ চট্ করে সমর্থন করতে চায় না। বাংলাদেশের ব্যাপারেও বিশ্বের অন্যান্য দেশের নীরবতা এ জন্যেই। নাইজেরিয়ার এক

* একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, শেখ মুজিবুর রহমান কখনো বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করতে চান নি। প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে, তিনি প্রদেশগুলোর জন্যে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন দাবী করেছিলেন। নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি এ ব্যাপারে বাংলাদেশের গণ-রায় পেয়েছিলেন।

প্রতিনিধির মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাওকে বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধিকারের আন্দোলন সমর্থন করলে আমার দেশের বায়াফ্রা পৃথক্‌করণের আন্দোলনকেও সমর্থন করতে হয়।' রাজেশ্বর রাও জবাব দিয়েছিলেন, 'পাকিস্তানের সেই জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশেরও বেশী মানুষ পূর্ববঙ্গে বাস করে। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যেকার ব্যবধান এক হাজার মাইলেরও বেশী। পূর্ববঙ্গের ভাষা অন্যতম সমৃদ্ধিশালী ভাষা এবং সেই ভাষার বিরাট ঐতিহ্যও রয়েছে। তাই পূর্ব বঙ্গের মানুষের আলাদা জাত হিসেবে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ গড়ার দাবী মোটেই অযৌক্তিক অথবা অ-মার্কসবাদী নয়।' Marxism and the National and Colonial Question-নামক গ্রন্থে স্তালিন জাতির সংজ্ঞা দিয়েছেন :

A nation is a historically evolved, stable community of language, territory, economic life, and psychological make-up manifested in a community of culture.

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে উপরের সব কথাগুলিই প্রযোজ্য। বাংলাদেশের মানুষের একটি গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার রয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের ভাষা এক—বাংলা। এ ভাষায় পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৬৪·৬%এর বেশী লোক কথা বলে। এ ভাষায় রচিত সাহিত্য বিশ্বের দরবারে সুপ্রতিষ্ঠিত, সমাদৃত। এ ভাষার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বাংলার সংস্কৃতি। বাংলাদেশ একটি ভূখণ্ড। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে এর ব্যবধান হাজার মাইলের। তাও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসতে হ'লে ভিন্ন দেশের জল, স্থল ও আকাশ সীমা অতিক্রম করে আসতে হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাংলাদেশকে একটি উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করেছে। বাংলাদেশের মানুষ তাদের শ্রমলব্ধ সম্পদ ভোগ করতে পারে নি, তা ব্যয়িত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানীদের কল্যাণে।

তাই পূর্ব আর পশ্চিম কোনদিন এক হ'তে পারে না। বাংলাদেশের মানুষ আর পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ে এক জাতি গঠিত হ'তে পারে না। এ দুয়ের মধ্যে কেবল ধর্ম ছাড়া আর কোন মিল নেই। কেবল ধর্মই যদি রাষ্ট্রগঠনের একমাত্র ভিত্তি হ'ত, তবে সব মুসলমান দেশ মিলে এক রাষ্ট্র হ'ত। খৃস্টান

ধর্মাবলম্বীরা ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্র করত না। বাংলাদেশ আর পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। ভাষা আলাদা, সংস্কৃতি আলাদা, সামাজিক রীতিনীতি ভিন্ন, রুচি ভিন্ন। ভৌগোলিক দূরত্বও অনেক। এ যেন অমিলের ঐক্য। তাই আজ বাংলাদেশের মানুষ ধর্মের বিভেদ ভুলে গিয়ে গঠন করেছে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান সবাই মিলে গড়ে তুলবে ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়

পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশের সংগ্রামকে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে বিশ্বকে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোন দেশে নির্বিচারে গণহত্যা চললে, বিশ্ববাসী কি নীরব দর্শক হয়েই থাকবে? তার কি কোন দায়িত্ব নেই? বাংলাদেশের ঘটনা কেবল পাকিস্তানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। পাক-সেনার অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়ে এ পর্যন্ত ৭০ লক্ষ শরণার্থী ভারতে চলে এসেছেন। তাঁদের আশ্রয় ও ভরণপোষণের জন্যে ভারতকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। ব্রহ্মদেশেও কিছু-সংখ্যক শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছেন। বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য করবার দায়িত্ব কি কেবল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের? নিশ্চয়ই বিশ্ববাসীর একটা কর্তব্য আছে। অবশ্য সাহায্য সম্ভার নিয়ে অনেক দেশই এগিয়ে এসেছেন। তবে শরণার্থী-আগমন যাতে বন্ধ হয় সেরকম অবস্থা বাংলাদেশে সৃষ্টি করতে পাক সরকারকে বাধ্য করতে হবে।

জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সরকার

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমান অস্থায়ী সরকার আইনানুগ—এটাই বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেবার প্রধান যুক্তি। বাংলাদেশের জনগণ গত নির্বাচনে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে আওয়ামী লীগকে একবাক্যে সমর্থন জানিয়েছিল। বাংলাদেশে জাতীয় পরিষদের ২টি ও প্রাদেশিক পরিষদের ১২টি ছাড়া সব ক'টি আসনই লাভ করেছিল আওয়ামী লীগ। বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন কেবল জনগণের নির্বাচিত

প্রতিনিধিরাই। আর কারো এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নেই। শেখ মুজিব ১৫ই মার্চ ঘোষণা করেছিলেন :

It would be in the consonance with the declared wishes of the people of Bangla Desh that no one should interfere with the exercise of authority by the elected representatives of the people.

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষিত হয়। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রেও এ কথাই বলা হয়েছে :

Whereas in the facts and circumstances of such treacherous conduct Banga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of 75 millions of people of Bangla Desh, in due fulfilment of the legitimate right of self-determination of the people of Bangla Desh, duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971, and urged the people of Bangla Desh to defend the honour and integrity of Bangla Desh......

and

Whereas the Government by levying an unjust war and committing genocide and by other repressive measures made it possible for the elected representatives of the people of Bangla Desh to meet and frame a constitution, and give to themselves a Government,...

We, the elected representatives of the people of Bangla Desh,...

declare and constitute Bangla Desh to be a sovereign People's Republic...

সেনাপতি ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট। তিনি বাংলাদেশের জনগণের প্রতিনিধি নন। তাই বাংলাদেশের উপর কর্তৃত্ব করতে চান তিনি কোন্ অধিকারে? তিনি কি বেমালুম ভুলে গেলেন যে, এই সেদিনই তো তিনি ঢাকাতে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের ভাবী

প্রধান মন্ত্রী বলে আখ্যা দিয়েছিলেন? স্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমান সরকারই একমাত্র গণপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার।

বাংলাদেশের ভূখণ্ডে সরকারের আধিপত্য

কোন দেশকে স্বীকৃতি দেবার আগে এবং পরে যে-প্রশ্নটি বিবেচ্য, তা হচ্ছে সে দেশের ভূখণ্ডের উপর সরকারের কর্তৃত্ব বহাল রয়েছে কিনা। বাংলাদেশের বড়ো শহরগুলো হানাদার পাক-সেনা জোর করে দখল করে রেখেছে, সন্দেহ নেই। তবে দেশের ৭০% থেকে ৮০% অংশ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের আয়ত্তে রয়েছে।

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা ও বিদেশী সাংবাদিকরা এ সত্যের উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে ব্রিটেনের লেবার পার্টির এম. পি. মিঃ জন স্টোনহাউস স্বীকার করেছেন:

Pakistan Army is not in control of more than one-third of the territory. It certainly controls the major towns because it has the fire power to do so, but over the country-side they do not have any control and there is no doubt that the provisional Government of Bangla Desh does control, through the Mukti Fouj, sizeable slices of the countryside.

তাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার আগে যে-দুটো প্রধান শর্ত অন্যান্য দেশের বিবেচ্য, তা বাংলাদেশ পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে। এর পর আর দ্বিধা করা উচিত কি?

বাংলাদেশ কেন স্বীকৃতি চায়

বাংলাদেশের মানুষ মুক্তিফৌজের সঙ্গে এক হয়ে আজ মরণপণ সংগ্রামে মেতেছে। হানাদার সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ ভাবে উৎসাদন না করা পর্যন্ত এ লড়াইয়ের শেষ নেই। বাংলাদেশের মানুষ প্রত্যাশা করে না যে, অন্যদেশ যুদ্ধ করে তাদের মাতৃভূমি শত্রুমুক্ত করে দেবে। বাংলাদেশের বীর জনতার নিজেদেরই সে ক্ষমতা রয়েছে। তবু বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ স্বীকৃতি চায়। তাতে সংগ্রামরত বাঙালীর মনোবল দৃঢ়তর হবে। মুক্তিফৌজের কোন আধুনিক অস্ত্র নেই। তাদের একমাত্র সম্বল পাক-সেনার কাছ থেকে দখল করা অস্ত্র।

স্বীকৃতি দেওয়ার পর বিশ্বের অন্যান্য দেশ বাংলাদেশকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারে যাতে সেখানে নির্বিচার গণহত্যা বন্ধ হয়, হানাদার সেনা উৎসাদিত হয়।

সম্প্রতি বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বাংলাদেশের বীর জনতাকে স্বর্ণপদক দেওয়ার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের বর্তমান সংগ্রাম বিশ্ববাসীর কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কোন দেশ অবিশ্যি এ প্রবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করে নি। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়েছে। সরকারী ভাবে অনেক দেশই বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত শরণার্থীদের জন্যে সাহায্য-সম্ভার পাঠিয়েছে।

রাজনৈতিক সমাধান

বিশ্বের অনেক দেশই বাংলাদেশে একটা রাজনৈতিক সমাধান কামনা করেছে। এ রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ কি তা প্রকাশ্যে ঘোষণা না করলেও, সবাই ইঙ্গিতে সেনাপতি ইয়াহিয়া খানকে বোঝালো যে, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে একটা সমঝোতায় আসতে হবে। গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিলেই বাংলাদেশের বর্তমান সমস্যার সমাধান হ'তে পারে, তার আগে নয়। গণতান্ত্রিক জার্মানী প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে। এ ব্যাপারে অনেক রাষ্ট্রপ্রধানই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ ক'রে প্যারিসে সমবেত একাদশ রাষ্ট্র পাক-সহায়ক সমিতির কাছে এক রিপোর্ট পেশ করলেন। তার ভিত্তিতে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সমিতির বৈঠক স্থগিত রাখা হ'ল। বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত সমিতি পাকিস্তানকে সব ধরনের সাহায্য দেয়া সমীচীন হবে না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

ইয়াহিয়া খান গত ২৮-এ জুন এক বেতার ভাষণে বাংলাদেশের জন্যে তাঁর রাজনৈতিক সমাধানের কাঠামো ঘোষণা করলেন। উদ্ভট সব পরিকল্পনা। ইয়াহিয়া বললেন, আওয়ামী লীগকে বে-আইনী ঘোষণা করা হ'লেও, সে দল থেকে নির্বাচিত সব প্রতিনিধিই রাষ্ট্রদ্রোহী নন। যে-দলের কর্মসূচী রাষ্ট্রবিরোধী বলে আখ্যাত হ'ল, সে দলের মনোনীত সব সদস্য রাষ্ট্রদ্রোহী নন। কি অকাট্য যুক্তি! ইয়াহিয়া আরো জানালেন, তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী

সদস্যদের তালিকা প্রস্তুত করছেন। তাঁরা বাদে অন্য সব আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের জাতীয় পরিষদে সদস্যপদ বহাল থাকবে। শীগ্‌গিরই তিনি জাতীয় পরিষদের সব সদস্যদের আহ্বান জানাবেন। যাঁরা আসবেন না, তাঁদের সদস্যপদ খারিজ করা হবে। সেখানে উপ-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে। তারপরই বসবে নতুন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন। এখানেই শেষ নয়। যে-সংবিধান রচনার জন্যে জাতীয় পরিষদ গঠিত হয়েছিল, এখন কিন্তু সে সংবিধান ইয়াহিয়া খানই বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা প্রণয়ন করবেন। জাতীয় পরিষদ কেবল তা অনুমোদন করবেন। তারপর নতুন সরকার গঠিত হবে এবং তা সামরিক আইনের ছত্রচ্ছায়ায় কাজ করবে।

সুতরাং এখন বিশ্ববাসীর কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে, বাংলাদেশে ইয়াহিয়া কি ধরনের রাজনৈতিক সমাধান করতে চান। লোভ দেখিয়ে তিনি আওয়ামী লীগের কিছু দলত্যাগী সদস্য নিয়ে একটি সরকার গঠনের দুরাশা করেছেন।

সম্প্রতি এক বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে আলোচনার সময় ইয়াহিয়া জানান, শীগ্‌গিরই নাকি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করা হবে একটি বিশেষ সামরিক আদালতে। বিচার চলবে গোপনে এবং শেখ মুজিব কোন বিদেশী আইনজ্ঞের সাহায্য নিতে পারবেন না। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সর্বোচ্চ শাস্তি নাকি মৃত্যুদণ্ড।

তবে দণ্ড পুনরায় বিবেচনা করার ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের থাকবে। এ থেকে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, ইসলামাবাদ সরকার বঙ্গবন্ধুর বিচারের একটি প্রহসন করবেন। অবশ্য তাদের পূর্ব ঘোষণার যৌক্তিকতা প্রমাণের জন্যে এটা করতেই হবে। তারপর তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। তবে প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমতাবলে তা কার্যকর হবে না। কারণ ইয়াহিয়া আসলে ভালো ভাবেই জানেন, শেখ মুজিব ছাড়া বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে না। তিনি এখন নিজের জালেই আটকা পড়েছেন।

এর পরও ইয়াহিয়ার কাছ থেকে কেউ কোন সমাধান নিশ্চয়ই প্রত্যাশা করবেন না। আর বাংলাদেশের মানুষের কাছে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাড়া আর কোন রাজনৈতিক সমাধানই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ বাঙালী হত্যা, অগণিত মা-বোনের উপর অত্যাচার, লুণ্ঠন আর ধ্বংসের বিভীষিকা বাংলার মানুষ ভুলবে কি করে?

স্বীকৃতির প্রশ্নে ভারতের ভূমিকা

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে ভারতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিবিধ কারণে ভারতকেই এ ব্যাপারে অগ্রণী হতে হবে। ইয়াহিয়ার কাছে যা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, ভারতের কাছে তা এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জঙ্গী বাহিনীর বর্বর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সত্তর লক্ষ শরণার্থী এ পর্যন্ত ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আরও আসছেন। মানবিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত এসব ছিন্নমূল নরনারীকে আশ্রয় দেবার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এদিক দিয়ে ভারত বাংলাদেশের সমস্যার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের মানুষকে গত ২৪ বছর ধরে অন্যায় ভাবে যে-শোষণ করেছে, নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে ভারত তার সাক্ষী।

আর গত চার মাস ধরে বাংলাদেশে যে-গণহত্যা চলেছে সত্তর লক্ষ শরণার্থীর অভিজ্ঞতার আলোকে ভারত বিশ্বের অন্য যে-কোন দেশের চেয়ে সে সব ঘটনার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। বাংলাদেশ-সম্পর্কিত সব তথ্যই আজ ভারতের জানা। সুতরাং তাকেই তো প্রথম স্বীকৃতি জানাতে হবে নির্যাতিত বাঙালীর মুক্তিসংগ্রামের মুখপাত্র বাংলাদেশ সরকারকে।

অবশ্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের পক্ষে ভারতে যে-জনমত গড়ে উঠেছে অন্য কোন দেশে স্বাভাবিক কারণেই তা হয় নি।

ভারতের প্রায় সব রাজনৈতিক দল বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্যে ভারত সরকারের কাছে দাবী জানিয়েছেন। দেশের প্রায় সব বিধানসভায় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার জন্যে সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ হয়েছে। ভারত সরকার অবশ্য স্বীকৃতি দেয়া ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার প্রশ্ন সবসময়েই বিবেচনাধীন রয়েছে। উপযুক্ত সময়েই তা দেয়া হবে।

ভারত সরকার কি ভাবছেন তা আমাদের জানা নেই। সবার আগে ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে পশ্চিম পাকিস্তান অপপ্রচারের একটা সুযোগ পাবে—এর উপর নিশ্চয়ই ভারত সরকার কোন গুরুত্ব দেন না। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়া-সত্ত্বেও পাকিস্তান কি ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে না?

পাকিস্তান তো সমানে বলেই চলেছে, মুক্তিযোদ্ধারা আর কেউ নয়—সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী। বাংলাদেশ ভারতেরই একটা চাল মাত্র ইত্যাদি। সুতরাং স্বীকৃতি দিলে পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে আর বেশী কিই বা বলবে ?

তাহলে কি যুদ্ধের ভয় ? অনেকেই মনে করেন ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেই পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। কিন্তু এ বিশ্বাস ঠিক নয়। পাক-ভারত যুদ্ধ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া না দেয়ার উপর নির্ভর করছে না। পাকিস্তান যদি আত্মঘাতী হ'তে চায় তবেই সে যুদ্ধের উন্মাদনায় মেতে উঠবে। পাকিস্তান এসময়ে ভারত আক্রমণ করলে একদিকে মুক্তিফৌজের দুর্বার আক্রমণে এবং অপরদিকে ভারতের বিরাট সশস্ত্র বাহিনীর চাপে পিষ্ট হয়ে যাবে। ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধলে 'আমরা একা নয়' বলে ইয়াহিয়ার হুমকি আস্ফালন ছাড়া আর কিছুই নয়। যখন বাংলাদেশের জনগণ ভারতকে সর্বতোভাবে সহায়তা করবে তখন ইয়াহিয়া খান সে 'শত্রুকে' পরাজিত করবেন কি করে ?

যতই দিন যাচ্ছে, ভারতের লোকসানের অঙ্ক ততই বেড়ে চলেছে। সত্তর লক্ষ শরণার্থীর আশ্রয় ও অন্ন যোগাবার জন্য ভারতকে দৈনিক এক কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে। এ বিরাট অঙ্ক ভারতের পক্ষে একা দীর্ঘ দিন ধরে বহন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এর ফলে কোন উন্নয়ন কাজই করা সম্ভব হচ্ছে না। তার উপর আছে আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন। সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলায় শরণার্থীর সংখ্যা সেখানকার অধিবাসীদের চেয়ে অনেক বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাভাবিক কারণে সেখানে আইনশৃঙ্খলা ব্যাহত হচ্ছে। অনেক স্থানেই প্রশাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। সরকারী কর্মচারীরা তাঁদের নির্দিষ্ট কোন কাজই করতে পারছেন না। শরণার্থী সমস্যার মোকাবেলা করতেই সরকারের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হচ্ছে।

সত্তর লক্ষ শরণার্থীকে ভারত সরকার ও ভারতবাসী সহৃদয়তার সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই। তবে সব জায়গায়ই যে স্থানীয় জনসাধারণ হাসিমুখে তাঁদের গ্রহণ করেছেন এমন নয়। সঙ্গত কারণেই তা হয় নি। স্থানীয় জনসংখ্যার অধিক শরণার্থী হঠাৎ কোথাও এসে পড়লে নানা সমস্যার উদ্ভব হয়। জিনিস-পত্রের দাম ভীষণভাবে বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষ তার জন্যে যখন শরণার্থীদের

দায়ী করেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁরা অন্যায় করেন না। কতদিন তাঁরা এ অবস্থা সহ্য করবেন ? ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে।

শরণার্থী-আগমনে ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হিন্দু নিধন অভিযানের ফলে ভারতে আরেকটি গুরুতর সমস্যার সম্ভাবনা সবসময়েই রয়েছে। পাকিস্তান এখন মরীয়া হয়ে ভারতে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করছে। এর জন্য তারা নানা কৌশল অবলম্বন করেছে। এ সুযোগে যদি ভারতে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে তবে তা হবে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আর প্রভূত রক্তক্ষয়ী। কিন্তু এতসব উস্কানির মুখেও ভারতের জনগণ যে অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়।

এসব কারণে ভারতের পক্ষে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে আর বিলম্ব করা সমীচীন হবে না। এতে বরং ভারত এবং বাংলাদেশ উভয়েরই ক্ষতি হবে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম যত তাড়াতাড়ি সাফল্য লাভ করে ভারতের পক্ষে ততই মঙ্গল।

অনেকেই বিশ্বাস করেন, ভারত স্বীকৃতি দিলেই, বিশ্বের কয়েকটি রাষ্ট্র সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। এটা নেহাৎ অমূলক নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। সে দেশের গণতন্ত্রের এক গৌরবোজ্জ্বল উত্তরাধিকার রয়েছে। আমেরিকার স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সে দেশের মানুষের সংগ্রাম বিশ্বের অন্যান্য গণতন্ত্রকামী দেশগুলিকে প্রেরণা যুগিয়েছে।

শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন স্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমান সরকার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত একমাত্র বৈধ সরকার। গত নির্বাচনে প্রদত্ত মোট ভোটের ৮০% ভোট লাভ করেছিলেন শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ। নির্বাচনে এত বিপুল ভোটাধিক্যে এ দলের বিজয় তাঁদের উপর জনগণের পূর্ণ আস্থারই পরিচায়ক। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ৯৯·৭% প্রতিনিধিও এই আওয়ামী লীগ দলেরই। ৩১৩ সদস্যবিশিষ্ট পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৬৭টি আসন লাভ করেছিল এই আওয়ামী লীগ।

তবু সেই আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বীকার করেন নি ইয়াহিয়া খান। তাঁদের জাতীয় পরিষদে বসতে দেন নি। বাংলাদেশের মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হ'ল। যে-শেখ মুজিবকে কয়েকদিন আগে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলে ইয়াহিয়া খান অভিহিত করেছিলেন, সেই শেখ মুজিবকেই দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে গ্রেফতার করলেন। শতকরা ৮০ জন বাঙালীর সমর্থন-পুষ্ট আওয়ামী লীগকে তিনি বে-আইনী ঘোষণা করলেন।

গণতন্ত্র হত্যার এমন নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত বোধহয় দুনিয়ার ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইয়াহিয়া খান প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্রতিভূ। যদি ইয়াহিয়া বাঙালীর গণতান্ত্রিক অধিকার চূর্ণ করার বর্তমান অভিযানে সাফল্য লাভ করেন, তবে বিশ্বে একটি নজির স্থাপিত হবে, এতে প্রতিক্রিয়ার হাত জোরদার হবে। আগামী দিনে তারা উৎসাহিত হবে। গণতান্ত্রিক অধিকার কি করে অস্বীকার করতে হয় ইয়াহিয়ার কাছ থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

পৃথিবীর কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই চাইবে না বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকার করা হোক্, দুনিয়ার গণতান্ত্রিক ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় রচিত হোক্। তাই সকল গণতান্ত্রিক শক্তির দায়িত্ব বাংলাদেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সর্বাগ্রে এগিয়ে আসা। এতে করে পৃথিবীতে আর কোন অশুভ শক্তি এ ধরনের কাজে কোন দিন উদ্যত হবে না।

বাংলাদেশে পাকসেনা-কর্তৃক গণহত্যার পরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করছে। এতে বাংলাদেশের মানুষ গভীরভাবে ব্যথিত হয়েছেন। বিশ্বের শান্তিকামী জনগণ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদিও বলেছেন, বর্তমান অস্ত্রসম্ভার পূর্ব চুক্তি অনুযায়ীই দেয়া হয়েছে, তবু তাঁদের বোঝা উচিত যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এ অস্ত্র বাংলাদেশে অ-সামরিক জনগণ হত্যার কাজেই লাগাবে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ

বাংলাদেশের বর্তমান সংগ্রাম জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে বিচার করলে বর্তমান সংগ্রাম-যে বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ তাতে কোন দ্বিধা থাকবার কথা নয়। বর্তমান সংগ্রামের মূলে রয়েছে

দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদীদের বাংলাদেশ-শোষণ। অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে বাংলাদেশের মানুষের মনে অসন্তোষের চাপা আগুন প্রজ্বলিত হতে থাকে। অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলনই আজ পর্যবসিত হয়েছে সার্বিক মুক্তির আন্দোলনে।

বর্তমান মুক্তি আন্দোলনের নায়ক বাংলাদেশের বীর জনতা। ইয়াহিয়া বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের সংগঠিত করেছেন। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত না বাংলার মানুষের সামাজিক মুক্তি না আসবে, ততদিন পর্যন্ত এ আন্দোলনের শেষ নেই। এ আন্দোলন বাংলাদেশকে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সেখানেই বাংলার মানুষের যথার্থ মুক্তি।

বিশ্বের সব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশের বর্তমান আন্দোলনের এই গতিধারা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পেরেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের কর্তব্য বিশ্বের যে-কোন প্রান্তে মুক্তি আন্দোলনকে সমর্থন জানানো। তারপরই প্রয়োজন সক্রিয় সহায়তার। এতে করেই কেবল তাদের নীতির প্রতি যথার্থ সম্মান দেখানো হবে। বাংলাদেশের মানুষ এখন প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের বিরুদ্ধে লড়ছে। স্বাভাবিক কারণেই সমাজতান্ত্রিক দেশ থেকেই বাংলার মানুষ সক্রিয় সমর্থন প্রত্যাশা করে।

সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকা বাংলাদেশের সংগ্রামী জনসাধারণের মনে উৎসাহ যুগিয়েছে। বাংলাদেশের ঘটনাবলীতে উদ্বেগ প্রকাশ করে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী প্রথম দিকেই ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। বাংলাদেশের মানুষের ইচ্ছানুসারে সেখানকার সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধানের প্রয়োজনীয়তার কথাও তিনি পাক প্রেসিডেন্টকে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এতদিনে তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝেছেন পাক প্রেসিডেন্ট তা বোঝবার পাত্র নন। সুতরাং এখন তাঁদের সামনে একটি পথই খোলা—বাংলাদেশকে সরাসরি সমর্থন ও স্বীকৃতি জানানো।

বর্তমান পরিস্থিতিতে চীনের ভূমিকা বাংলাদেশের জনগণকে সবচেয়ে বিস্মিত করেছে। যে-চীন দুনিয়ার সব মুক্তি-আন্দোলনকে পূর্বে সমর্থন দিয়েছে, সে চীন আজ বাংলাদেশে মুক্তি-আন্দোলনকে দমন করার জন্যে পাক সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা করছে। 'শত্রুর বন্ধুও শত্রু'—এ নীতি নিয়ে জেদই করা যায়, মুক্তির পথে পা বাড়ানো যায় না। চীনকে বুঝতে হবে বাংলাদেশের মুক্তি-

সংগ্রাম কোন বিছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়। পাকিস্তান-নামক সেই রাষ্ট্রের আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই। এ প্রসঙ্গে কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিচেল শার্পের মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কানাডার দু'টি সংবাদপত্রে গত ১০ই জুলাই প্রকাশিত এক পত্রে তিনি বলেছেন : পাকিস্তান বিভাজনের সুপারিশ করাটা দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক হবে। কিন্তু সম্ভবত সেটাই সমাধানের একমাত্র পথ।

দুনিয়ার সব নির্যাতিত, নিপীড়িত জনগণের স্বার্থে বিশ্বের সব সমাজতান্ত্রিক দেশকে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন জানাতে হবে। সর্বতো-ভাবে সহায়তা করে তাদের জয়যুক্ত করতে হবে।

জাতিসংঘ

মানবাধিকারের উপর জাতিসংঘের সনদে বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্য সব দেশে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সব মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার যেন বজায় থাকে তার প্রতি লক্ষ রাখাও জাতিসংঘের দায়িত্ব।

বাংলাদেশে জঙ্গী ইয়াহিয়া সরকার নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ অসামরিক লোক বিনা কারণে হত্যা করেছে। বাংলাদেশের যুদ্ধ প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল এক অসম যুদ্ধ। একদিকে সশস্ত্র পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী, অন্যদিকে নিরস্ত্র জনসাধারণ।

বাংলাদেশে এতো রক্তপাতের পরও জাতিসংঘের অর্থপূর্ণ নীরবতা, বাংলা-দেশের মানুষকে হতবাক্ করেছে। বাংলাদেশে ইয়াহিয়া সরকার গণহত্যা চালিয়ে যাবে। আর জাতিসংঘ কি দিনের পর দিন নীরবই থাকবে? জাতি-সংঘের কি কোন দায়িত্ব নেই?

ইয়াহিয়া সরকার আজ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করছে। এ ব্যাপারে জাতিসংঘ কি নীরব দর্শকের ভূমিকাই কেবল গ্রহণ করবে? সত্তর লক্ষ ছিন্নমূল নরনারীর দুর্দশার প্রতি জাতিসংঘ এরকম উদাসীনই থাকবে? জাতিসংঘের কাছে হতবাক্ বাঙালীর প্রশ্ন, জাতিসংঘ কি তার সঠিক ভূমিকা পালন করছেন?

স্বীকৃতিতে সংগ্রাম সহজতর হবে

• বাংলাদেশের ঘটনাবলীর সত্যতা বিশ্ববাসীর কাছে যতই প্রচারিত হবে,

স্বীকৃতি দানের পথ ততই সুগম হবে। সব দেশেই বাংলাদেশের সপক্ষে জনমত প্রবলতর হচ্ছে। বাংলাদেশের এ সংগ্রাম—সত্যের সংগ্রাম। ন্যায়ের সংগ্রাম। সুতরাং তা বিশ্বের সমর্থন লাভ করবেই।

বাংলাদেশের মানুষ ভালো করেই জানে স্বাধীনতার তরণী আসবে রক্তের নদী বেয়ে। তবে অনেক তো রক্ত ঝরেছে। গত ১৬ই এপ্রিলের New Statesman পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে :

If blood is the price of a people's right of indepndence, Bangla Desh has overpaid......

তবু বাংলাদেশের মানুষ লড়বে। স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে আজ তারা যে-কোন মূল্য দিতে প্রস্তুত। বিশ্বের অন্যান্য দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে সংগ্রামী মানুষ নতুন প্রেরণা লাভ করবে। সক্রিয় সহযোগিতা করলে সংগ্রামে বিজয়ের পথ সহজতর হবে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে দেরী করলে শত্রুমুক্ত করার সংগ্রাম দীর্ঘতর হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্য অর্জিত হবেই হবে। স্বাধীন বাংলাদেশের জয় অবশ্যম্ভাবী। জয় বাংলা।

বাংলাদেশ পরিস্থিতি ঃ একটি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

—বুলবন ওসমান

বিপ্লব, বিবর্তন বা সামাজিক পরিবর্তনের আছে একটি পরিস্থিতি ও ঘটনাক্রম। ন্যায়সঙ্গত ভাবে প্রথম ঘটনার অনুপস্থিতি ; দ্বিতীয়, পরিবেশের সৃষ্টি, বীজবপন এবং ক্রমশ পরিণতির দিকে যাত্রা। বাংলাদেশ-পরিস্থিতি ও তার উদ্ভবের তেমনি একটা ইতিহাস আছে। এর বীজবপন এবং ক্রমশ জন্মলগ্নের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আমরা প্রথম এর বীজের দিকে নজর দিই। বাংলাদেশ পরিস্থিতি উদ্ভবের মূলকে খুঁজে বের করি।

॥ এক ॥

প্রথম ধরা যাক ভারত-বিভাগ।

ভারত-বিভাগের প্রয়োজন ছিল কি ছিল না সে প্রসঙ্গ এখন নিষ্প্রয়োজন, কারণ ব্যাপারটা ঘটে গেছে এবং তা ইতিহাসের সম্পত্তি। কিন্তু বিভাগের কারণটা-সম্পর্কে দু'কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাতে পুরো প্রেক্ষিতটা পাওয়া যায়।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ অংশে ভারতবর্ষ মুসলিম অধিকারে যায়। বাইরের বিজেতা, বহিরাগত মুসলমান এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত ভারতবাসী, ভারতে একটি নতুন সম্প্রদায়ের জন্ম দেয়। ভারত-বিভাগের পূর্ব মুহূর্তে মুসলমান অনুপাতে ছিল প্রায় এক-চতুর্থাংশ। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত ভারতের শাসনক্ষমতা ছিল মুসলিম শাসকদের হাতে। যদিও সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর জন্যে রাজা মহারাজারা একেবারে উৎখাত হয়ে যায় নি।

ভারতবর্ষ মুসলিম শাসন থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে পড়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। শাসন-ক্ষমতার এই হস্তান্তর পরিপ্রেক্ষিত দেয় পাল্টে। সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর বিরোধী-ক্ষমতা ব্যবসায়ী শ্রেণী ভারতবর্ষেও ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠছিল এবং বৃটিশ বেনিয়াদের সংস্পর্শে ক্রমশ তাদের সখ্য লাভ করে। এদিকে মুসলিম সম্প্রদায় বৃটিশ-বিরোধী ভূমিকা নেয়। বিদেশী ভাব-ভাষা

পরিহার করে আত্মকেন্দ্রিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলে। অন্যদিকে শিক্ষা ও কারিগরি বিস্তার সুযোগ নেয় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তাই সংস্কৃতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে মুসলমানরা ক্রমশ পিছু হটতে থাকে। এক শ' বছরের মধ্যেই এই পার্থক্য প্রকট আকার ধারণ করে। ১৮৫৭-য় হিন্দু-মুসলিম মিলিত প্রচেষ্টা বৃটিশ বিতাড়নে হয় ব্যর্থ। সমগ্র ভারত বৃটিশ সাম্রাজ্যের সরাসরি শাসিত অঞ্চলে রূপান্তরিত হয়। তখনো ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন ঘটে নি। সম্প্রদায় ছিল, ছিল না সাম্প্রদায়িকতা।

সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানেরা-যে অনেক পিছে পড়ে গেছে তা প্রথম নজরে আসে স্যর সৈয়দ আহমদের। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে বলেন। এবং মুসলিম সম্প্রদায় যাতে ইংরেজের নেক-নজরে পড়ে তার জন্য বৃটিশকে প্রচুর তৈল প্রদান ও মুসলমানদের পক্ষে ওকালতি করেন। কিন্তু এক শ' বছর পিছিয়ে যাওয়া মনোবৃত্তিকে অত সহজে টেনে তোলা যায় না। তা সময়সাপেক্ষ। এদিকে ভারতবর্ষে নব্য শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত-সমাজ জে. এস. মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, অগস্ট কঁৎ ইত্যাদি চিন্তাবিদ্‌দের আলোকে নিজেদের কূপমণ্ডুক ভাবধারা ঝেড়ে ফেলে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকে। বৃটিশ এই নতুন ক্ষমতাকে ভয় করতে শুরু করে এবং কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা নীতি গ্রহণ করে। হিন্দু-মুসলিম বিভেদ নীতির সৃষ্টি হয় এবং মুসলমান সম্প্রদায় ক্রমশ ইংরেজের ঘুঁটিতে পরিণত হয়ে পড়ে। যার শেষ পরিণতি ভারত-বিভাগ।

স্বয়ং মোহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌-ও প্রথমে ভারত বিভাগ চান নি। তিনি ছিলেন ঘোর কংগ্রেসী। কিন্তু জিন্নাহ্‌ নেতা ও ব্যারিস্টার হিসেবে নিজের আসন স্থায়ী করে নিতে পারেন ; এদিকে মহাত্মা গান্ধীর নিরাভরণ প্রতিকৃতি, তাঁর হরিজন আন্দোলন, ভারতের সমাজ কাঠামোর মূলে গিয়ে আঘাত করে। সুতরাং তাঁর জনপ্রিয়তা সর্বগ্রাসী হয়ে পড়ে। মুসলিম-বুর্জোয়া-প্রতিভূ-দল মুসলিম লীগের খপ্পরে গিয়ে জিন্নাহ্‌র পড়াটা যেন ইতিহাসের অন্তর্লীন ক্ষমতার জোরেই সাধিত হয়। ইতিহাসের ছকটা বৃটিশ কূটনীতির দূরদৃষ্টির ফলে পুরোপুরি সাফল্য লাভ করে। ভারত-বিভাগ ঘটে। আগের তুলনায় দুর্বল ভারত। কালনেমির লঙ্কা ভাগ সফল। পাক-ভারত সংঘর্ষ ও রেষারেষি নিশ্চয় বৃটিশ জাতির আত্মপ্রসাদের একটা বিরাট খোরাক।

নিম্নশ্রেণীর প্রতি মমতাবোধে পরিচালিত গান্ধীর ভারত, প্যারিস থেকে ছাঁটা স্যুট-পরিহিত জিন্নাহ্-র অভিপ্রায় নয়। তাই পৃথক হোমল্যাণ্ডের প্রয়োজন, যেখানে রাজা সাজা যাবে। মূলতঃ ভারত-বিভাগ ঘটে মুসলিম বুর্জোয়াদের আর্থনীতিক নিরাপত্তার পত্তনির জন্যে। কিন্তু আন্দোলনটা পরিচালিত হয় ভিন্ন সীমান্ত ধরে। ধর্ম বা সম্প্রদায় ভিত্তিতে। তাই মূলত বিরোধটা আর্থনীতিক হলেও সম্প্রদায়গত সত্তা একটা বাস্তব উপাদান হিসেবে ভূমিকা নিয়েছে।

॥ দুই ॥

সম্প্রদায়গত উপাদান কখন কি ভাবে কাজে লাগে এবং তার গুরুত্ব কতটুকু এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ ভারত-বিভাগ। প্রতিটি সমাজে উচু-নীচু, ছোট-বড়, অভিজাত-নিম্নজাত ইত্যাদি বিভাগ বা উপাদান সমাজতত্ত্বের একটি উল্লেখযোগ্য পাঠ্য বিষয়। সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্যে যার পরিভাষা : সামাজিক স্তরবিন্যাস। এই স্তরবিন্যাসের আলোচনা পাক-ভারত বিভাগের মূলকে খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। স্তরবিন্যাসের প্রথম বিভাগে আসে উচু-নীচু সম্পর্ক। এই কোঠায় পড়ে বিভিন্ন শ্রেণী ও বর্ণবিভাগ। এখানে সম্পর্ক উল্লম্ব চরিত্রের। আরো সহজ ভাবে বলতে গেলে উচ্চ-, মধ্য- ও নিম্ন-বিত্তের বিভাগ। ভারতীয় সমাজের চতুর্বর্ণ বিভাগও আসছে এই পর্যায়ে, যদিও এই দুই বিভাগের চরিত্রগত কিছু পার্থক্য বিদ্যমান : যেমন এক শ্রেণীর লোক আর এক শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে পারে, কিন্তু বর্ণের ক্ষেত্রে তা খাটে না। আনুষঙ্গিক আরো পার্থক্য আছে, তবে সে আলোচনা এখানে অপ্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় বিভাগ, সম্পর্ক যেখানে পাশাপাশি, উচু-নীচু নয় : এটা অনুভূমিক বিভাগ। এই পর্যায়ে পড়ে অঞ্চল, ধর্ম, ভাষা ও জাতিভিত্তিক বিভেদ।

পাক-ভারতীয় সমাজের ক্ষেত্রে :

১। ধর্মভিত্তিক বিভাগ : হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ…

২। ভাষাভিত্তিক বিভাগ : বাঙালী, পাঞ্জাবী…

৩। অঞ্চলভিত্তিক জাতিগত বিভাগ : বাঙালী, বিহারী, মাদ্রাজী ইত্যাদি বিভাগ।

উপরি-উক্ত বিভাগ পরস্পর পরস্পরকে অতিক্রম করে যায়। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে করে না। তবু এই অনুভূমিক বিভাগ সমাজের মূল ছবি তুলে ধরে না। কারণ সমাজের কেন্দ্রবিন্দু এই বিভাগের উপর পুরো নির্ভরশীল নয়। যদিও প্রভাব যথেষ্ট।

এই অনুভূমিক বিভাগকে সমাজতত্ত্বে এক সময় মূল উপাদান হিসেবে গণ্য করা হোত। এই বিভাগকে দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থান দেন কার্ল মার্ক্স। তিনিই প্রথম, যিনি সামাজিক প্রক্রিয়ায় উচু-নীচু সম্পর্ককে মূল হিসেবে বর্ণিত করেন : যার অর্থ, ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস। এই প্রথম মানব-সমাজে ইতিহাসের বিশ্লেষণের একটা সার্বজনীন মূল সূত্র লাভ ঘটে। দেশে দেশে যার চরিত্র-ভেদ নেই। শ্রেণী-বিভাগে দেশ- বা ধর্ম-ভেদে কিছু এসে যায় না। যেমন, বাঙালী মধ্যবিত্ত ও বিহারী মধ্যবিত্তে চরিত্রগত পার্থক্য খুব সামান্যই। তেমনি বাঙালী মধ্যবিত্ত মুসলমান ও বাঙালী মধ্যবিত্ত হিন্দুতে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। কাঠামোয় পার্থক্য নেই, পার্থক্য অতিকাঠামোয়ে। ভাষায় শব্দের ব্যবহারে কিছু পার্থক্য, বিবাহ প্রথায় পার্থক্য…এমনি কয়েকটি রীতি-প্রথায় বিভেদ। কিন্তু সমাজের মূল কাঠামো, অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক। কারণ উভয় সম্প্রদায় একই সামাজিক কাঠামোর বাসিন্দা। এক অর্থে অবশ্য অনুভূমিক বিভাগেও সব শ্রেণী পড়ে। যেমন : মুসলিম সম্প্রদায়ে নিম্ন-উচ্চ-মধ্যবিত্ত সব শ্রেণী পড়ছে। কিন্তু এখানে অন্য ধর্মাবলম্বীদের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে না। তাই ন্যায়সঙ্গত ভাবে শ্রেণীবিন্যাস অনুভূমিক বিন্যাসের চেয়ে অনেক বড়। অবশ্য অনুভূমিক বিভাগ ক্ষুদ্র হলেও সমাজে তার প্রভাব-যে কম নয় তার প্রমাণ ভারত-বিভাগ। সমাজের উপরতলার ব্যক্তিরা নিজ স্বার্থ-পূরণে এই উপাদানকে সব সময় কাজে লাগিয়েছে। এবং এ-ব্যাপারে সফল হবার পেছনে সুষ্ঠু শিক্ষার অভাব যথেষ্ট দায়ী। তা-ছাড়া মানুষের স্বাভাবিক আনুগত্য দলগত, সম্প্রদায়গত বা অনুভূমিক বিভাগের দিকে বেশী। মানুষ খুব সহজে স্বদল বা স্বসম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া করে। সেক্ষেত্রে উচু-নীচু সম্পর্ক-মূলক বিন্যাস বুঝতে হয় সচেতন ভাবে। দলগত আনুগত্যের উর্ধ্বে উঠতে হয়, তাই কষ্টসাধ্য এবং ধীরগতি। তা-ছাড়া এই সচেতন প্রয়াসকে বানচাল করার জন্যে কায়েমি স্বার্থবাদীরা প্রচুর গবেষণা ও অর্থ ছিটিয়ে চলেছে, যাতে মানুষ এই সচেতন প্রয়াসের খপ্পরে গিয়ে না পড়ে। যার অবশ্যম্ভাবী ফল, সামাজিক বিপ্লব।

ভারত যখন বিভক্ত হয়ে স্বাধীন হয় তখন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন ততটা গভীরে গিয়ে পৌঁছয় নি, যা এই বিভাগকে রোধ করতে পারত। আমরা আগেই মুসলিম সম্প্রদায়ের পশ্চাৎপদ হবার কারণ বিশ্লেষণ করেছি। এই পিছিয়ে পড়াটাকে মুসলিম বুর্জোয়ারা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। আর সহজেই পায় সাড়া। এদিকে ইংরেজও তাই চাচ্ছিল। সব দিক দিয়ে সোনায় সোহাগা হয়ে দাঁড়ায়। ঘটে ভারত-বিভাগ। অর্থাৎ ভারতের দুই অঞ্চলে মুসলিম বুর্জোয়ারা মুসলমানদের শোষণের এখতিয়ার লাভ করে। যার নাম পাকিস্তান।

॥ তিন ॥

১৯৪৭-এ ভারত বিভাগ ঘটে, কিন্তু পাকিস্তান আন্দোলন শুরু হয় ১৯০৬-এ ঢাকায় মুসলিম লীগের জন্মের সাথে। অর্থাৎ মুসলিম লীগের জন্ম যেন কালকেতুর জন্মলগ্নের মত। যদিও মুসলিম লীগের জন্ম মুসলিম সম্প্রদায়ের অধিকার আদায়ের মুখপাত্র হিসেবে, কিন্তু এর মাঝেই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের বীজ, সুপ্ত। ১৯০৫ সালে বঙ্গবিভাগ বাংলার মুসলমানদের মনে আরো মোহ সঞ্চার করে। ১৯১১-য় বঙ্গ পুনরায় এক হয়ে গেলে পূর্ববঙ্গীয় মুসলমানরা নিশ্চয় হতাশা বোধ করে এবং নিজেদের পরাজয় বলে মনে করে। বাঙালী মুসলমানের জীবনের আজকের বিয়োগান্ত পরিণতির ক্ষেত্র তৈরীর জন্যে ঐতিহাসিক এই ঘটনাগুলো কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পাকিস্তান আন্দোলনকে যদিও কবির কল্পনা বলে আখ্যা দেওয়া হয়, মূলত ইহা অনুভূমিক সমাজ-বিন্যাসের পরিণতি : এবং কবি ইকবাল সেই অনুভূমিক বিন্যাসেরই শিকার হন। দর্শনের ডক্টর, রুগ্ণ পরিবেশকেই স্বাস্থ্য উদ্ধারের উপায় বলে মনে করেন। যদিও কাব্যে কবি ইকবাল মুসলিম হ্যায় হাম, ওয়াতান হ্যায় সারা জাহাঁ...ওঠো, দুনিয়াকো গরীবোঁ কো জাগা দো, সেই কবিকে শিখণ্ডী দাঁড় করিয়ে মুসলিম নেতারা জনসাধারণকে ধোঁকা দেবার সুযোগকে আরো দৃঢ়মূল করে।

পাকিস্তানের চেহারা কি রূপ নেবে তার পরিষ্কার ছবি ফুটে ওঠে ১৯৪০-এর ২৩-এ মার্চের লাহোর প্রস্তাবে। ভারতের মুসলিম-প্রধান অঞ্চল একটি মিত্রজোটের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করবে। লাহোর প্রস্তাব বাঙালী

মুসলমানদের আরো দৃঢ় ভাবে উদ্দীপ্ত করে। স্বয়ং ফজলুল হক এই প্রস্তাব আনয়ন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে তা পাস হয়। লাহোর প্রস্তাবের যেমন বলিষ্ঠ দিক ছিল তেমন ছিল দুর্বলতা। মিত্রজোট নিঃসন্দেহে বলিষ্ঠ দিক, কিন্তু ভারতের টুকরো টুকরো অংশ নিয়ে রাষ্ট্র সৃষ্টি এবং যে-টুকরো একটা আর একটা থেকে হাজার মাইল তফাতে, তা কেমন করে সংগঠন করা যাবে এ নিয়ে কেন-যে বড় বড় নেতাদের মনে কোন সন্দেহ জাগে নি, সেটাই পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য। মিত্রজোটের পক্ষে এজন্যেই বলা যায় সে-ক্ষেত্রে অঙ্গগুলো মূলত স্বাধীন থাকছে। কিন্তু পাকিস্তান যখন জন্মলাভ করে তা মিত্রজোটের ধার কাছ দিয়েও যায় নি : দাঁড়ায় ফেডারেশ্যানে। যেখানে প্রদেশগুলোর নিজস্ব কোন স্বাধীনতা থাকে নি। কেন্দ্রের ক্ষমতা সর্বেসর্বা। এর বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন-যে ওঠে নি তা নয়, কিন্তু শিশু রাষ্ট্রের ধুয়ো তুলে এ প্রশ্নকে বার বার ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। আর পশ্চিমা গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার্থে ক্রমশ ঔপনিবেশিক কাঠামো দানের জন্যে কেন্দ্রকে দৃঢ়তা দেওয়া হয়। নামমাত্র সেনা নেওয়া হয় বাংলাদেশ থেকে। সেনাবাহিনীর প্রতিটি কেন্দ্র স্থাপিত হয় পশ্চিম অংশে। এ-ছাড়া রাজধানী তো আছেই। ঠিক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পূর্বাঞ্চলে যদি রাজধানী হোত এবং অন্যান্য উন্নয়নে যদি পূর্বাঞ্চল পশ্চিমকে দাবানর পরিকল্পনা নিত তাহলে পাকিস্তানের ইতিহাস হয়তো আজ ভিন্ন রূপ নিত। পূর্বের জায়গায় পশ্চিম অংশ রুখে দাঁড়াত। বাস্তবে ইংরেজ উপনিবেশবাদ ও তথাকথিত হিন্দু প্রাধান্যের বদলে বাংলাদেশের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী উপনিবেশবাদ দানা বাঁধতে থাকে। তাই পূর্ব বাংলা স্বাধীনতা পেয়েও স্বাধীন হয় নি। ঘটে উপনিবেশবাদের হস্তান্তর।

॥ চার ॥

পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠনগত কাঠামোয় ফাঁক দ্বিবিধ। প্রথম, ভৌগোলিক দূরত্ব, মিত্রজোট যখন সংঘটিত হয় নি। দ্বিতীয়, দুই অঞ্চলের সামাজিক কাঠামোর বিভেদ। বাংলাদেশ মূলত কৃষিপ্রধান। শিল্পায়ন যেখানে সুপরিকল্পিত ভাবে অনুপস্থিত রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে যেহেতু বাঙালী শিল্পপতির অভাব, তাই সে স্থান পূরণ করেছে আদমজি, বাওয়ানি, দাউদ ইত্যাদি পশ্চিম

পাকিস্তানী শিল্পপতিরা। যাদের মূল ঘাঁটি বাংলাদেশ নয়। সুতরাং সম্পদ পাচার নির্বিচারে চলেছে। সুলতান মাহ্‌মুদের ভারত-আক্রমণের মত। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারত লুণ্ঠন করে গজনীকে গড়ে তোলা। পশ্চিমা শিল্পপতিরা তাই ব্যবসা করে বাংলাদেশে, লভ্যাংশ যায় পশ্চিমাঞ্চলে। গড়ে ওঠে করাচী, লাহোর, পিণ্ডি-ইসলামাবাদ।

১৯৫১ সালে বাংলাদেশে ল্যাণ্ড টেনান্সি এ্যাক্ট পাস হয়। তাতে নির্ধারিত হয় মাথা-পিছু দশ বিঘা জমির বেশী কেউ রাখতে পারবে না। এই এ্যাক্ট কার্যকরী হয় ১৯৫৮ সালে। ফলে বাংলাদেশে না জমিদার না বিপুল শিল্পপতির প্রভাব। এর ফলে মধ্যবিত্তের একটা সহজ সম্প্রসারণ ঘটে। এ-দিকে সামগ্রিক ভাবে উন্নয়ন ন্যূন হওয়ায় সমগ্র কাঠামোর বিরুদ্ধে একটা অসন্তোষ জনসাধারণের মনে দানা বেঁধে ওঠে। যার ফলে একদিকে আঞ্চলিক শোষণ রোধ ও অন্যদিকে সমাজতান্ত্রিক আর্থনীতিক পরিকল্পনা গ্রহণ বাংলাদেশের একমাত্র বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক যে-কারণে আওয়ামি লীগ বিপুল জন-সমর্থন লাভ করে। একদিকে ছয় দফা-ভিত্তিক আঞ্চলিক শোষণ বন্ধ করা, অন্যদিকে পূর্বের সম্পদ পশ্চিমে না যাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ। মনোপলি ও কার্টেল পদ্ধতির বিলোপ সাধন এবং অর্থনীতির মূল ভাগগুলোর জাতীয়করণ। এই ভাবে বাংলাদেশের আর্থনীতিক বদ্ধতা কাটানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর মাঝে ধনতান্ত্রিক উন্নয়ন প্রায় সমান্তরাল ভাবে জায়গা করে নেয়। বাংলাদেশকে বাজার পাওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানের বাড়-বাড়ন্ত অবস্থা। পশ্চিমেও শ্রেণীশোষণ সমানে চলছে, তবে বাংলাদেশের সম্পদ ওখানে পাচার হওয়ায় ওখানকার সাধারণ লোককে মূল কাঠামো ও শ্রেণী শোষণ মুক্ত হবার চিন্তা থেকে দূরে রাখা এখনো সম্ভব হয়েছে। ভুট্টোর ইসলামি (! ?) সমাজতন্ত্রী (! ?) দল বেশী ভোট পাওয়ায় বোঝা যায়, পরিবর্তন একটা তারাও চায়, কিন্তু অনুভূমিক বিন্যাসের প্রভাবে সাধারণ লোকের বাঙালী-বিদ্বেষী হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ বাংলা শোষণের কিছু কড়ি তারাও পেয়েছে। যদিও এই সংকটে তাদের রুখে দাঁড়ান উচিত ছিল। কারণ সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ বাঙালীদের মতই শোষিত ঃ এবং পাকিস্তানের মোট সম্পদের অর্ধেক জমা হয়েছে পাঞ্জাব প্রদেশে।

সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার জন্যে তথাকথিত সমাজতন্ত্রী দল ভুট্টোর ম্যানিফেস্টো থেকে একটা তথ্য দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেখানে সরকার থেকে বাংলাদেশে নির্ধারিত জমি মাথাপিছু দশ বিঘা সেখানে ভুট্টোর ম্যানিফেস্টো দিয়েছে মাথাপিছু পাঁচ শ' বিঘা। এ-থেকেই দু' অংশের কাঠামো-গত পার্থক্যের একটা হদিস মেলে। আর সামন্ত-তান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন শাসক- ও শোষক-গোষ্ঠী সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা সামরিক শাসনের বাইরে জনগণতান্ত্রিক নীতিকেও বরদাস্ত করতে চাইবে না। তার অবধারিত ফলাফল তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। বাংলাদেশে স্বায়ত্তশাসন, গণতান্ত্রিক সরকার গঠন, কেন্দ্রে বাঙালীর শাসন: পশ্চিমা শাসক-শোষকগোষ্ঠীর আত্মহত্যার আর বাকী থাকে কি?

॥ পাঁচ ॥

পাকিস্তানের সামরিক সংগঠনের বিন্যাস ও কাঠামো হচ্ছে অন্যতম প্রধান উপাদান যা বাংলাদেশ পরিস্থিতি উদ্ভবের জন্যে বিশেষভাবে দায়ী। পাকিস্তানের সামরিক বিভাগে পাঞ্জাবী অফিসারদের প্রাধান্য। এরও একটা ঐতিহাসিক কারণ আছে। ১৮৫৭-র সিপাহী বিপ্লবের সময় একমাত্র পাঞ্জাবী সেনা ও অফিসাররা ইংরেজের পক্ষে প্রচুর প্রভুভক্তির পরিচয় দেয়। তাই পুরস্কার-স্বরূপ উচ্চ পদে তাদের অধিষ্ঠান ঘটতে থাকে। ঐতিহাসিক এই প্রেক্ষিত থেকে বিচার করলে বোঝা যাবে পাকিস্তানে সামরিক কাঠামোর মূল অংশ কি-ভাবে পাঞ্জাবী অফিসারদের হাতে গিয়ে পড়ে। এই সুবিধা নিতে তারা ছাড়েও নি। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের সামরিক অফিসার পাঞ্জাবী অফিসারদের অনুপাতে ন্যূন। আর বাঙালীর অবস্থা? সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী যারা? তাদের সংখ্যা ভীষণ ভাবে কম। অফিসার? সর্বোচ্চ পদ দেওয়া হয়েছে একজনকে, ব্রিগেডিয়ার। বর্তমানে অন্তরীণ, মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষমাণ। অথচ মানব সমাজের উন্নয়নের খবর সম্বন্ধে যাদের সামান্য জ্ঞান আছে তারাও জানে আদিবাসীরা গোষ্ঠীগত সংগঠনে প্রতিটি ভ্রাতৃত্ব (phratry) ও গণের (gens) স্বাধীনতা মেনে চলত। এবং এর সার্থক প্রকাশ ছিল সেনাবিভাগের বিন্যাসে। প্রতিটি গণের নিজস্ব সেনা থাকত এবং তারা গণ-পতাকা বহন

করত। এমন কি পৃথক পৃথক গণের সেনাদের পোশাকও ছিল ভিন্ন। তাই গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে এক অংশ অন্য অংশের ভাগ আত্মসাৎ করতে পারত না। এদিকে বাঙালী সেনা মোট সেনার এক-চতুর্থাংশও নয়। আর বাঙালী সেনাদের রাখা হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে এবং বাংলাদেশে অবাঙালী সেনা। যাতে বাঙালী সেনারা কোন ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না গ্রহণ করতে পারে। এ-ছাড়া চারটি সামরিক প্রধানের কম পক্ষে দু'টি ছিল বাঙালীর প্রাপ্য। এ-সব কাকস্য পরিবেদনা। সেনাবিভাগ যদি ন্যায়সঙ্গত ভাবে বিন্যস্ত হোত তাহলে পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে হায়েনার মত পশ্চিমা সেনারা নিরীহ ঘুমন্ত নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারত না। তা-ছাড়া প্রভু বৃটিশের বিভেদ-নীতি পাঞ্জাবী শাসক-চক্র খুব ভাল ভাবেই রপ্ত করেছে। যুদ্ধ শুরু করার পর বেলুচি-সিন্ধি ও পাঠান সেনাদের দিয়েছে অগ্রভাগে। এক ঢিলে দু' পাখি মারা হচ্ছে। বাঙালীরা যাতে বেলুচি-সিন্ধি ও পাঠানদের প্রতি বিরূপ হয়, এতে পশ্চিম পাকিস্তানে জনসাধারণের একতা বাড়বে। দ্বিতীয়তঃ উপরি-উক্ত অনুন্নত প্রদেশগুলো যাতে বাঙালীদের দেখাদেখি বিদ্রোহ না করে বসে। তাই ঐ সব অঞ্চলের সেনাদের অগ্রভাগে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হচ্ছে।

এটা গেল সেনাবিভাগের বিন্যাসের দিক। এর আর একটি দিক আছে ঃ পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাদের আধিপত্য। পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই সেনারা একটা মূল ভূমিকা নিয়েছে। প্রথম দিকে নেপথ্যে থাকলেও ১৯৫৮-র অক্টোবরে প্রথম সামরিক শাসন জারির পর থেকে পাকিস্তানের রাজনীতি সামরিক রীতির নাগপাশে আবদ্ধ হয়। প্রগতিপন্থী রাজনীতিক দল ও ব্যক্তিদের কাজ হয় নেপথ্যবাসী। আর যারা ছিল কালোবাজারের বিবরে তারা সামরিক ছত্রচ্ছায়ায় আসে প্রকাশ্য দিবালোকে। এবং পাকিস্তানের রাজনীতিক নিয়ন্তা হিসেবে বেশ বড় একটা অংশ দখল করে বসে। এদের বুদ্ধি নিয়ে সামরিক জান্টা দেশ শাসন করতে থাকে। আর এই দলের লোকদের শ্রেণী-চরিত্র দেখলেই বোঝা যাবে পাকিস্তানের রাজনীতি ও সমাজের কী রূপ দাঁড়াবে। আয়ুব আমলের গভর্ণর মোনেম খাঁ এ ব্যাপারে কিংবদন্তীর নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সেনাবিভাগ যখনি প্রকাশ্যে সাধারণের সাথে যুক্ত হয় তখন অসামরিক জীবনের যত রকম পাপাচার তাদের মাঝে সংক্রামিত হয়। আর পাকিস্তানে

হয়েছেও তাই। উৎকোচ দিয়ে যে-কোন অপরাধ খণ্ডান যায়। কালোবাজারি, ধর্ষণ বা খুন যা-ই হোক। পাকিস্তানে তাই একমাত্র শিষ্টেরই সাজা হয়। 'এ-যেন সেই ইস্কাবনের দেশ, যেথায় রাজা খেয়ে ঢেকুর তোলে, প্রজা বলে খেলাম।'

পৃথিবীর ইতিহাস এ-সাক্ষ্যই দেয়, যেথায় একবার সমরনেতারা শাসন-ভার গ্রহণ করে, পিটিয়ে না তাড়ান পর্যন্ত তারা ক্ষমতা হস্তান্তর করে না। আয়ুবের ভাগ্যে সেই ঘটনা ঘটে। ইতিহাস ইয়াহিয়া খাঁর ভাগ্যে কী লিখেছে দেখা যাক। ইতিহাসের লেখন অবশ্য অন্যথা হবার নয়।

আমরা আগেই অনুভূমিক বিন্যাসের কথা বলেছি। এ-ও বলেছি, অনুভূমিক বিন্যাস সমাজের মূল চরিত্র তুলে না ধরলেও এর প্রভাব প্রবল এবং অবচেতন ভাবেই এর প্রভাবে প্রতিক্রিয়া করে। হয়তো এখানে ইউলিসিসের সেই বিখ্যাত উক্তি, 'আই এ্যাম দ্য পার্ট অব অল হ্যাট আই হ্যাভ মেড' প্রযোজ্য —একজন একটা ভাষাগত, ধর্মগত, অঞ্চলগত ও অন্যান্য আরো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের মধ্যে জন্ম লাভ করে। সুতরাং এই সব উপাদানের প্রতি তার একাত্মতা স্বাভাবিক। এসব কিছু ছাড়িয়ে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ বেশ শ্রমসাপেক্ষ। তাই ইতিহাসে অনুভূমিক উপাদান বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টির পথ আকীর্ণ করে রেখেছে। কখন তা সাদা-কালোর ঝগড়া, কখন ক্রিসেণ্ট-ক্রসের লড়াই, কখন ক্যাথলিক-প্রোটেস্ট্যাণ্ট বিবাদ···এর অন্ত নেই। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় কম বেশী আমরা সবাই ভুক্তভোগী। এই প্রেক্ষিতে দেখলে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক মধুর হবার কোন কারণ নেই। প্রথমত হাজার মাইলের পার্থক্য। মিলটা কেবল ধর্মে। কিন্তু প্রশ্নটা সহজে উত্থাপিত হবে, ধর্মে আমাদের সঙ্গে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে অন্য অনেক দেশের মিল। উদাহরণত পার্শ্ববর্তী দেশ ইরান, আফগানিস্তান—এরা পাকিস্তান নয় কেন? ধর্ম এখানে কেন বন্ধন আনতে পারছে না? কারণটা আর কিছু নয়, ধর্ম সামাজিক বন্ধনের অন্যতম উপাদান, একমাত্র উপাদান নয়। ধর্মের বাইরেও আছে সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা ইত্যাদি মৌল উপাদান।

পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের নেই ভাষার অন্বয়, নেই সংস্কৃতি ও

ঐতিহ্যগত কোন মিল। যেটা যোগাযোগের সূত্র ছিল তা হ'ল একই ভারতের দুই অংশ হওয়া। কিন্তু মাঝের ভারত যখন পৃথক রাষ্ট্র, তখন যোগাযোগের বন্ধন আর থাকে কেমন করে! দুই অংশ দুই প্রান্তবিন্দুতে। এই সম্পর্ক কেবল ঔপনিবেশিক সম্পর্কেই টিকে থাকে। যেখানে একটি নেয় ধাত্রীর ভূমিকা, অপরটি হয় লালিত। পশ্চিম পাকিস্তান প্রথম থেকেই সেই ধাত্রীর ভূমিকা গ্রহণ করে। রাজধানী সেখানে, সেনাবিভাগের মূলঘাঁটি তাদের হাতে: সুতরাং বাংলাদেশ একটি শিশুর মত লালিত হতে থাকে। তাকে যৌবন-প্রাপ্তির কোন অবকাশ দেওয়া হয় নি। ভিখিরী সংস্থা যেমন শিশুকে হাঁড়িতে বসিয়ে রেখে পঙ্গু করে তোলে, তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাংলাদেশকে করে রেখেছে পঙ্গু; যাকে স্বাভাবিক ভাবে বাড়তে দেওয়া হয় নি।

পশ্চিমের ঐতিহ্য যেখানে ইকবাল, শাহ আবদুল লতিফ ভিটাই, হাল···বাংলাদেশে রবীন্দ্র-নজরুল, সুকান্ত-শরৎচন্দ্র···পশ্চিমের ভাষা, উর্দু, সিন্ধি, বেলুচি, পুশতু ও পাঞ্জাবী, এদিকে বাংলা। একদল শুকনো দেশের মানুষ, পাহাড়ী অঞ্চলের লোক, অন্য দিকে নদী-বিধৌত শ্যামল প্রান্তরের বাসিন্দা। অনুভূতি, চাল-চলন, মানসিকতা ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক উপাদান বিশেষভাবে পৃথক। এই সব পার্থক্যের সাথে যুক্ত হয়েছে আর্থনীতিক শোষণ: সুতরাং স্বভাবতই একটা মৈত্রী-বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। আর যার শেষ প্রকাশ বৈরিতায়। পাকিস্তানের শোষক শ্রেণী প্রথম থেকেই এ-সব বুঝেছিল এবং তা অতিক্রম করার জন্যে নানা প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই সব প্রক্রিয়া কতটা ভুল পথে চালিত হয় সে-সম্বন্ধে তারা তেমন সজাগ ছিল না। তাই শেষ আশ্রয় গায়ের জোর, অস্ত্র-প্রয়োগ।

ইতিহাসের প্রেক্ষিত, কাঠামো-গত বৈশিষ্ট্য ও মানসগত পার্থক্যের আলোচনা করা হয়েছে, এবার আমরা দেখি এ-সব বিভেদকে ঘোচাতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কী পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তার পরিণতি কী দাঁড়ায়।

॥ সাত ॥

বাংলাদেশের সংস্কৃতি যাতে তার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠতে না পারে এবং যাতে তা পশ্চিমের সংস্কৃতির অনুকূলে যায়, তাই প্রথম প্রচেষ্টা

আসে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেবার প্রয়াস। এখানে ব্যাপারটা কত অযৌক্তিক, বিশেষ করে সমাজকে যেখানে গণতান্ত্রিক বলে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, তা একটি পরিসংখ্যানের মাধ্যমে স্পষ্ট করা যাবে।

পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা, যদি ধরা হয় ১০০ :

এক ॥	বাংলা-ভাষী	৫৬%
দুই ॥	পাঞ্জাবী „	২৮%
তিন ॥	পুশতু „	৮%
চার ॥	বেলুচি „	৩%
পাঁচ ॥	উর্দু „	৫%

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হলে পাকিস্তানীদের রাষ্ট্রভাষা এবং একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বাংলা। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়ায় কিম্ভূতকিমাকার হয়ে। পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর ভাষ্য, "পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং এর রাষ্ট্রভাষা হবে মুসলমান জাতির ভাষা। ...একটি জাতির পক্ষে একটি জাতীয় ভাষার প্রয়োজন এবং সেই ভাষা হতে পারে শুধুমাত্র উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়।" এখানে প্রথম প্রশ্ন, উর্দু কি শুধুই মুসলমানদের ভাষা? দ্বিতীয় প্রশ্ন, বাংলাদেশে যে-সব মুসলমান পাকিস্তান আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে পাকিস্তান হাসিল করে তারা শুধু বাংলায় কথা বলে বলেই কি মুসলমান নয়? তৃতীয় প্রশ্ন, গণতান্ত্রিক নীতিতে বিশ্বাসী হলে শতকরা ছাপ্পান্নর ভাষা অগ্রাধিকার পাবে, না, শতকরা পাঁচের ভাষা?

এ-সব প্রশ্নের জবাব এক। বাংলাদেশকে তার সংস্কৃতি কাঠামো থেকে বিচ্যুত করা। তার স্বজাতিকেন্দ্রিকতা থেকে দূরে ঠেলা, পশ্চিমা সংস্কৃতি-মুখী করা।

শুধু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নয়, তার 'জনক'ও ঢাকার বুকে গর্জে ওঠার স্পর্ধা দেখায়, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা গর্জে ওঠে, সমস্বরে, 'না'।

শুরু হয়ে গেল ফ্যাশিস্ট সরকারের সঙ্গে জনসাধারণের লড়াই। ১৯৫২ সালে উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষারূপে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হলো। আর চেষ্টা চলে উর্দু লিপিতে বাংলা লেখার।

বাঙালীর পাকিস্তানের মোহ কিছুটা ছিল, তাই বলে কোন বড় অন্যায় সে

বরদাস্ত করে নি। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে গোটা দেশ ফেটে পড়ে। বিশেষ করে ছাত্রসমাজ এই আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান লয়। সরকারও তার বর্বর পুলিশ ও সেনাবাহিনী নিয়ে এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৫২-র ২১-এ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় পুলিশ ও সেনাদের গুলিতে ছাব্বিশ জন হন শহীদ। তাতে আন্দোলন আরো দুর্বার হয়ে ওঠে। সেক্রেটারিয়েট থেকে আমলারাও প্রতিবাদে বেরিয়ে আসে। বাংলার জয়। উর্দুর পাশে বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃত হয়। এই দিনটি তাই বাংলাদেশের ইতিহাসে রক্ত আখরে লেখা থাকবে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের পাশে অবস্থিত শহীদ মিনারটি তাই এ যুগের তীর্থস্থান। বাংলাদেশের সর্বশ্রেণীর সর্ব ধর্মের মানুষ এখানে এসে দীক্ষা গ্রহণ করে। সংগ্রামের মন্ত্র গ্রহণ করে।

বাংলা ভাষার উপর শুধু এই একটি বার আক্রমণ চলে নি, স্থুল ও সূক্ষ্ম ভাবে সব সময় চলেছে ধ্বংসের পরিকল্পনা। ভাষায় উর্দু, আরবী, ফার্সী শব্দকে জোর করে প্রবেশ করাবার প্রচেষ্টা। রোমান হরফে বাংলা লেখার জন্যে রীতিমত গবেষণা চলে। বাংলাভাষা তার মূল স্রোত যাতে বজায় রাখতে না পারে, যাতে ক্রমশ পঙ্গু হয়ে পড়ে, সে মতলবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাংলা বই আমদানি হয় নিষিদ্ধ।

উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টার মত বাঙালী জাতিকে তার জাতীয়তা ভুলিয়ে দেবার জন্যে জিন্নাহ্‌র আর একটি উক্তি স্মরণীয়। পাকিস্তান-সৃষ্টির পর জিন্নাহ্‌ তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন, 'আমরা এখন আর হিন্দু-মুসলমান নই, বেলুচি পাঞ্জাবী বাঙ্গালী নই, আমরা পাকিস্তানী।' অনেক প্রগতিবাদী বাঙালী চিন্তাবিদ এই উক্তিটি বার বার তাঁদের রচনায় ব্যবহার করেছেন এই হিসেবে যে, কায়েদে আযম মহম্মদ আলী জিন্নাহ্‌ বলে গেছেন সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত সমাজের কথা। কিন্তু প্রশ্ন সেটা নয়। মূল বিষয় হিসেবে প্রশ্ন দাঁড়াবে, এসব যদি ভুলেই যাব তাহলে অখণ্ড ভারতে বাস করার অসুবিধাটা ছিল কোথায়? আর উদ্দেশ্যের মূলটা বুঝতেও অসুবিধা নেই : যাতে বাঙালীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে না পারে। বাঙালীর অহং না জেগে ওঠে। যে-উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের সৃষ্টি তা যেন ব্যাহত না হয়। আর তা ব্যাহত করতে পারে একমাত্র বাঙালীরা। এদের সংস্কৃতি পৃথক, দূরত্বে এক হাজার মাইল, রীতিনীতি সব আলাদা, ইতিহাসগত ভাবে মুক্ত বুদ্ধির দিকে এদের যাত্রা, হিন্দু-বিদ্বেষ ও ভারত-বিদ্বেষ তেমন প্রবল নয়, তাই এদের পাকিস্তানের কাঠামোয় বাঁধতে গেলে ভুলিয়ে দিতে

হবে এরা বাঙালী। যে-ভাষায় নোবেল পুরস্কার লাভ ঘটে, তেমন একটা সমৃদ্ধ ভাষা-ভাষী জাতিকে দাবিয়ে রাখতে গেলে প্রথম ধ্বংস করতে হবে এর সংস্কৃতির মেরুদণ্ড ভাষা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সাংস্কৃতিক উপাদান।

ভাষার প্রশ্নে পরাজিত হয়ে শাসকগোষ্ঠী রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতই সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও বাধা এনেছিল : যেমন বর্ষবরণ বা নববর্ষ উৎসব। আয়ুবের পোষ্য মোনেম খাঁ যখন বর্ষবরণ উৎসবকে হিন্দুদের উৎসব বলে বর্ণনা করে, তখন বাঙালীদের সুপ্ত জাতীয়তা-বোধ যেন আরো দুর্বার হয়ে ওঠে। সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে ১লা বৈশাখের অনুষ্ঠান। এই সঙ্গে বসন্ত উৎসব। বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণ মেয়েদের বাসন্তী শাড়িতে ঝলমলিয়ে ওঠে। এ-ছাড়া বর্ষাবরণ। শারদোৎসবও ঋতু-ভিত্তিক অনুষ্ঠান। এর সাথে বাঙালীর মৃতপ্রায় আনন্দোৎসব নবান্ন উৎসব। কৃষিপ্রধান বাংলার নবান্ন একটি বিরাট আয়োজনের ব্যাপার। সবার ঘরে ফসল, তাই আনন্দ। সাংস্কৃতিক এই পুনর্জাগরণ যেন সরকারের বাধা পেয়েই আরো দুর্জয় রূপ ধারণ করে। বিশেষ করে রবীন্দ্র-জয়ন্তী এমন একটা উত্তাল তরঙ্গের মত বাংলাদেশের লোককে ভাসিয়ে নেয় তা চোখে না দেখলে অবিশ্বাস্য মনে হবে।

বাঙালীর আর্থনীতিক বর্ষ ছিল বৈশাখ থেকে চৈত্র। এই ব্যবস্থাকে ভাঙার জন্যে আয়ুব আমলে একে নিয়ে যাওয়া হয় জুলাই-জুনে। এভাবে যত বাধা এসেছে বাঙালীর ঘুমন্ত জাতীয়তা-বোধ আরো প্রবল রূপ নেয়। এ সবকে বাংলাদেশের সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ বললে অত্যুক্তি হবে না। এবং এ-সব কিছুর মূলে একজন মনীষীর কীর্তি সর্বাগ্রে স্থান পায় : রবীন্দ্রনাথ। সরকার এদিকে নতুন পথ অবলম্বন করে। যেহেতু দুই পাকিস্তানের একমাত্র যোগাযোগ ইসলামী মোহ, তাই সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ইসলামের জোয়ার বহানোর চেষ্টা। ইসলামিক অ্যাকাডেমি প্রতিষ্ঠা, নজরুলের ইসলামী গানের প্রতিষ্ঠান নজরুল অ্যাকাডেমি স্থাপন, জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার জন্মদান ইত্যাদি ফ্রন্ট খোলা হয়, যাদের কাজ বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে ইসলামাইজ করা, মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করে বুদ্ধি-জীবীদের মাথা কেনা এবং সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে পাকিস্তানের শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যারা কাজ করছে তাদের খোঁজ-খবর রাখা : মোদ্দা কথা গোয়েন্দাগিরি।

সব-শেষে এই প্রচেষ্টা প্রকাশ্যে জেহাদ ঘোষণা করে। পাকিস্তান সরকারের প্রচার-কেন্দ্র টি. ভি. ও বেতারে রবীন্দ্রসঙ্গীত চলবে না। অতুল-দ্বিজেন-

রজনীকান্তের গান বহু আগেই সংস্কৃতি ক্ষেত্র থেকে উৎখাত হয়। আবার বুদ্ধিজীবী মহল রুখে দাঁড়ায় এবং সরকার নিজের ফেলে দেওয়া থুথু চেটে নিতে বাধ্য হয়। আর আজ রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলার জাতীয় সঙ্গীত। বাধা দিলেই লড়াই বাধে। তাই পাক-সরকার যত বাংলাদেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বজ্র-আঁটুনিতে বাঁধতে চেয়েছে সেই সমগ্র চাপ গিয়ে পড়েছে গেরোর দিকে এবং শেষপর্যন্ত যা ফসকে যেতে বাধ্য হল। বাঁধন-বিহীন সেই যে-বাঁধন সেই মানবিক বাঁধনের দিকে পাক-সরকার কোন দিন নজর দেয় নি। তাই বাঙালীর যৌথ অনুভূতি বার বার হয়েছে পদদলিত এবং ভেতরে প্রতিরোধ-স্পৃহা সংগ্রহ করেছে। পাক-সরকারের প্রতিটি পদক্ষেপ বাঙালীদের মনে করিয়ে দিয়েছে তারা একটা ভিন্ন ও উচ্চ সংস্কৃতি-সম্পন্ন জাতি।

॥ আট ॥

সাংস্কৃতিক বৈষম্যকে পাল্লা দিয়ে গেছে আর্থনীতিক শোষণ। বাংলাদেশের আর্থনীতিকে কেন্দ্রীয় সরকার কখনো শক্ত বুনিয়াদ দেবার চেষ্টা করে নি। কারণ স্পষ্ট: যাতে পশ্চিমের শিল্পায়ন ব্যাহত না হয় এবং তার বাজার হিসেবে বাংলাদেশে কেনে প্রতিদ্বন্দ্বী গড়ে না ওঠে। বছর বছর যে-বিভেদ জমেছে তার চার্ট তৈরী না করে বরং মোট খরচের অনুপাতটা পেলেই জিনিসটা স্পষ্ট হয়।

তেইশ বছরে পাকিস্তানের মোট রাজস্ব-খাতে ব্যয় হয়েছে সাড়ে ছ' হাজার কোটি। তার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের খাতে পাঁচ হাজার কোটি, আর পূর্ব বাংলার ভাগে দেড় হাজার কোটি। ঠিক ঐ একই সময়ে উন্নয়ন খাতে পশ্চিম পাকিস্তান পেয়েছে মোট খরচের দুই-তৃতীয়াংশ। পশ্চিম পাকিস্তানে জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার জন্যে বাঁধ হয়েছে তিনটি, সেখানে বাংলাদেশে একটি।

মাথাপিছু আয়: বাংলাদেশে ১৯৪৯ থেকে ১৯৬৫-র মধ্যে মাথাপিছু আয় ৩০৫ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৩২৭ টাকা—অর্থাৎ বাইশ টাকা বেড়েছে ষোল বছরে। ঠিক ঐ একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু আয় ৩৩০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪৬৪ টাকার মত। অর্থাৎ বেড়েছে ষোল বছরে ১৩৪ টাকার মত। পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ লোক-যে খুব একটা রাজা-উজীর হয়ে গেছে তা নয়। তবে বাংলাদেশের তুলনায় তাদের অবস্থা কিছুটা ভালো। যানবাহন ও রাস্তাঘাটের উন্নয়নের দরুন তারা কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে।

১৯৪৯-৫০ থেকে ১৯৫৮-৫৯ পর্যন্ত এই দশ বছরে পূর্ব বাংলার জীবনযাত্রার মান বাড়া দূরে থাক, কমেছে শতকরা ০'৬ ভাগ। ঐ একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বেড়েছে ১'২ ভাগ। ১৯৫৯-৬০ থেকে ১৯৬৩-৬৪ এই পাঁচ বছরে বাংলাদেশে মাথাপিছু উন্নতির হার ২'৬% ভাগ। ঐ সময়ে পশ্চিমে উন্নতির হার শতকরা ৪'৪ ভাগ।

শিল্প-ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতার প্রমাণ পাওয়া খুবই সহজ। বাংলাদেশে মোট আয়ের শতকরা ষাট ভাগ আসে কৃষি থেকে। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে কৃষি-ক্ষেত্রের আয় মোট আয়ের শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ।

পাকিস্তানের বৈদেশিক রপ্তানির মূল ভিত্তি বাংলাদেশের পাট ও চা এবং চামড়া। শতকরা রপ্তানি আয়ের শতকরা ষাট ভাগ আসে বাংলাদেশের পণ্যে। এদিকে বিদেশ থেকে যখন শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি হয় তার শতকরা পঁচিশ থেকে ত্রিশ মাত্র বাংলাদেশের ভাগে আসে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬২ পর্যন্ত এই পনের বছরে বাংলাদেশ বৈদেশিক বাণিজ্য করেছে তের শ' আট কোটি টাকার, এদিকে পশ্চিম পাকিস্তান করেছে নয় শ' নব্বুই কোটি টাকার। বিদেশী ঋণের শতকরা আশি ভাগ থেকে যায় পশ্চিম পাকিস্তানে। বিদেশ থেকে আমদানি-কৃত জিনিসের দামও পাকিস্তানের দুই অংশে দুই রকম। বলা বাহুল্য বাংলাদেশে দামটা বেশী।

এ-ছাড়া আরো একটা জিনিস লক্ষণীয় : পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে-মূল্যের জিনিস যায়, পূর্ব থেকে সে মূল্যের জিনিস নেওয়া হয় না। ১৯৬২-৬৩ সালের হিসেবটা নিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। ঐ বছর পশ্চিম থেকে বাংলাদেশে পণ্য পাঠান হল নয় শ' সতের কোটি টাকার। আর বাংলাদেশের কাছ থেকে কিনল মাত্র চারশ' ছেচল্লিশ টাকার জিনিস। এই এক বছরের হিসেব থেকেই চিত্রটা কারো বুঝে নিতে অসুবিধা হবার কথা নয়।

পাকিস্তানের মাত্র চব্বিশটি সংস্থা সর্ব মোট ব্যক্তিগত শিল্প-সম্পদের প্রায় অর্ধেকের নিয়ন্ত্রক। ব্যাঙ্ক ও বীমা কারবারের মোট শেয়ারের তিন-চতুর্থাংশের মালিক মাত্র পনেরটি পরিবার। ফলে নতুন শিল্পে টাকা লগ্নীর ক্ষেত্রে এরা অন্যদের চেয়ে সরাসরি এগিয়ে থাকছে। এই অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পাশে রয়েছে বড়ো বড়ো চাকরী, সরকারী দপ্তরে, সেনাবিভাগে, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এদের নিজেদের দলীয় লোক। এমন কি রাজনীতিক নেতাদেরও এরা পোষণ করে।

পশ্চিম পাকিস্তানের এই বিত্তশালী গোষ্ঠীর হাতেই রয়েছে দেশের শতকরা পঁচাশি ভাগ কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরী এবং শতকরা নব্বুই ভাগ সমর-বিভাগের চাকরী। তাই এদের লোক বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত মূল সংস্থাগুলির প্রধান হিসেবে কাজ চালিয়ে এই গোষ্ঠীদের স্বার্থ স্থায়ী ও দৃঢ় করার চেষ্টা করেছে।

এই আর্থনীতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাংলাদেশের সংগ্রামের মূল চরিত্র ধরা পড়ে। এটা মূলত শ্রেণীসংগ্রামের এক ধাপ এবং উল্লম্ব লড়াই। যদিও তাৎক্ষণিক অনুভূতি একে যথেষ্ট ভাবে ক্ষমতা জুগিয়ে চলেছে।

আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে গরিষ্ঠ দল হয়েও গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবনের জন্যে ক্ষমতা পেল না। এজন্যে কি আমরা গণতন্ত্র দেশগুলির সাড়া পেতে পারতাম না? বিশেষ করে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে? বাঙালীরা পাকিস্তান ভেঙে ভূগোলকের এই অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট করতে চায় নি, চেয়েছিল সহনীয় একটা পরিবেশ, যার ফলে একত্র বাসটা সুখকর হয়, হয় দৃঢ়। কিন্তু তার বদলে এল বুলেট, বেয়নেট, কামান, ট্যাঙ্ক, মর্টার, বিমান থেকে বোমা। অন্ততঃ পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে দৃঢ় ভূমিকা নিতে পারত। সামরিক জান্টাকে চাপ দিয়ে বাধ্য করতে পারত দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে, কিন্তু বদলে জাহাজের পর জাহাজ অস্ত্র বোঝাই হয়ে আসছে বাঙালী-নিধনে। কেন এই বঞ্চনা? গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বৃটেন-আমেরিকা শক্তিমান এবং তাদের সরকারী যন্ত্র ছাড়া বাকী বিরোধী দলের সদস্যরা প্রায় একবাক্যে বাঙালীদের পক্ষ নিতে বলছেন। আমরা এখনো আশা করি তাঁরা সমস্ত ব্যাপারটার গুরুত্ব- ও কর্তব্য-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবেন এবং নেবেন সুস্থ ভূমিকা।

সমাজতন্ত্রী দেশ রাশিয়া একবার মাত্র দপ করে জ্বলে উঠল বিশ্ব-বিবেকের রূপ নিয়ে। কিন্তু ক্রমশঃ সেই দীপশিখা মিইয়ে গেল। যে-শিখা জ্বলল তা দাবানলের রূপ নিল না। আর চীন সরাসরি পাকিস্তান সরকারকে সাহায্য করছে। তাহলে আমরা কি মনে করব বিশ্ব-বিবেক বলে কোন মূল্যবোধ নেই? না তা আজ বিশ শতকের শেষপাদে এসে কম্পিউটারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে?

সমাজতন্ত্র-সম্বন্ধে লেনিন এবং মাও সে তুং সব নেতাই বলেছেন বিশ্বে সমাজতন্ত্রী ক্ষমতা যারা কায়েম করতে যাচ্ছে বা জনগণ যেখানে সাম্রাজ্যবাদী ক্ষমতা থেকে মুক্তির জন্য লড়ছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে তাদের সাহায্য

করা। আমাদের বর্তমান আন্দোলন জাতীয় মুক্তির আন্দোলন হলেও অদূর ভবিষ্যতে তার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। আওয়ামী লীগও তার ম্যানিফেস্টোতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছে। ব্যাঙ্ক-বীমা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণের মাধ্যমে, ঠিক যে-কারণে বা যে-ভয়ে পাকিস্তানের শাসক-শোষক গোষ্ঠী বাঙালীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদের আসল ভয় বাঙালীকে নয়, সমাজতন্ত্রকে এবং বাঙালীরা সে রাস্তায় অনেকটা এগিয়ে গেছে —তাই বাঙালীদের উপর হিংস্র নেকড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্র। এটার আরো প্রমাণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাই আজো পাকিস্তানকে সামরিক দিক দিয়ে প্রত্যক্ষ সাহায্য করছে। আমাদের আজকের স্বাধীনতা সংগ্রাম আগামী সমাজতন্ত্রী সংগ্রামের একটি ধাপ। তাই আমরা শুধু আশা করি না, দাবী করি, চীন, রাশিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশ আমাদের দাবীর সমর্থনে এগিয়ে আসবে।

মধ্য-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম দেশগুলির কাছ থেকেও আমরা সাহায্য পাব আশা করেছিলাম। কারণ বাংলাদেশ মুসলিম-অধ্যুষিত অঞ্চল। একদিকে মুসলিম-কর্তৃক মুসলিম নিধন নিশ্চয় তারা বরদাস্ত করবে না। অন্য দিকে ইয়াহিয়া খাঁকে বাধ্য করবে নিরীহ হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিধন-যজ্ঞ বন্ধ করতে। আপাততঃ সে ক্ষেত্রেও আমরা নিরাশ হয়েছি, অথচ ইসলামের শুভ-বুদ্ধির কাছে সব সময় আমাদের অনেক আশা।

বাংলাদেশের পরম বন্ধুর কাজ করেছে ভারত। ভারত যদি গোটা বিশ্বে ব্যাপারটা প্রচার না করত, বিশ্ববাসী জানতই না পৃথিবীতে হিটলারকে ছাড়িয়ে যাবার মত অত্যাচারের ঘটনাও ঘটেছে। ইতিমধ্যে সত্তর লক্ষ শরণার্থী এসেছে ভারতে। বিশেষজ্ঞদের মতে তা এক কোটি বিশ লক্ষে গিয়ে দাঁড়াবে। এই বিপুল-সংখ্যক বাংলাদেশবাসীকে ভরণ-পোষণ দিয়ে, পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ ভারত, বিশ্ব-বিবেক জাগ্রত করার জন্যে যা করেছে, তা অতুলনীয়।

॥ দশ ॥

বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত আর জাতীয় কবিকে সম্বল করে বাংলার মুক্তিবাহিনীর যৌবন আজ দুর্জয়, দুর্বার। তাদের সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হোক

তাদের প্রিয় কবির গান, 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে।' বা শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণে সেই ভবিষ্যৎ বাণীর মত উক্তি : আমি যদি না থাকি, আমার বন্ধুরা যদি না থাকেন, আপনারা নিজেরাই আপনাদের অধিকার আদায় করে নেবেন।

বাংলাদেশের মানুষ আজ তাই নিজের অধিকার আদায়ের ভার নিজের হাতেই তুলে নিয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রচ্ছদপট : সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম

—সন্তোষ গুপ্ত

"President Yahya Khan looks gloomy. It seems that he has invaded his own country."

হানাদার পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হওয়ার পর ইয়াহিয়ার সাংবাদিক সাক্ষাৎকার শেষে এ উক্তি করেন নি কোন সাংবাদিক।

গত ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশে ১০ লক্ষাধিক লোকের প্রাণহানির পর দেশ-বিদেশে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়, তখন ইসলামাবাদের গদী ছেড়ে ইয়াহিয়া বাংলাদেশে তশরিফ আনেন।

বিমানবন্দর সেদিন এমন কি বিদেশী সাংবাদিকদের নিকট ছিল নিষিদ্ধ এলাকা। বিমানবন্দরের বাইরে দাঁড়িয়ে B. B. C.-এর সংবাদদাতা খবর পাঠালেন লণ্ডনে। তখনই এ উক্তি করেছিলেন তিনি।

আজ নরঘাতক ইয়াহিয়া বাংলাদেশের উপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ নরনারী। ৭০ লক্ষ লোক আজ দেশ থেকে বিতাড়িত। জল্লাদ ইয়াহিয়া আজ মরীয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ দেশকে সেদিনও সে নিজের দেশ মনে করে নি। আজও নয়। সেদিন বন্যা-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ-সম্পর্কে বিদেশী অপর একজন সংবাদদাতা খবর পাঠাতে গিয়ে বলেছেন : "I accuse Pakistan Government of the deliberate murdering of 1·2 million people." কেউ কী নিজের দেশের লোককে এভাবে মরতে দিতে পারে ?

এই ছিল বন্যাবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রতি ইয়াহিয়া চক্রের মনোভাব। বিদেশী সাংবাদিকদের চোখে সেদিন যা উলঙ্গভাবে ধরা পড়েছিল—তা আমাদের চোখে কি ধরা পড়ে নি? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে আমাদের দেশে সংবাদপত্র কতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করে তার মধ্যে।

বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস—সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্ম এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাস। জাতীয় চেতনাকে শাণিত করার এই অস্ত্রটিকে দখলে আনার জন্ম পাকিস্তান সরকারের চেষ্টার অবধি ছিল না। এ দেশ বৃটিশ শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার পর আমরা আবার দ্বৈরথ সমরের মুখোমুখি হলাম—এক ফেরাউনী শাসনের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শেষ যবনিকা উত্তোলিত হ'ল। মৃত্যু-ঠেকানো দুয়ারে পিঠ দিয়ে এখন অতীতকে আমরা স্বচ্ছ চোখে দেখতে পারি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রাম ধীরে ধীরে আজকের মুক্তিযুদ্ধের প্রচ্ছদপটে তুলি বুলিয়েছে কখনো আলতো ভাবে; কখনো গভীর বলিষ্ঠ ছিল এই তুলির টান।

॥ ১ ॥

একটা দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কতখানি বাস্তবে কার্যকরী হচ্ছে, তার মাপকাঠি হ'ল সংবাদপত্র কতটুকু স্বাধীনতা ভোগ করছে তা। যেহেতু, বাধানিষেধমুক্ত সংবাদপত্রই হচ্ছে জনমতের স্বচ্ছ দর্পণ, তাই গণসংযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাহন সংবাদপত্র দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম তা নির্ণীত হয় একটা দেশে ব্যক্তিস্বাধীনতার নিরিখে। দেশের রাজনৈতিক জীবনে ব্যক্তিস্বাধীনতা অর্থাৎ বাক্-স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নটি জড়িত।

এখন দেখা যাক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সেখানে বিশেষভাবে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশে গত ২৪ বছরে সংবাদপত্রের অবস্থা কী ছিল। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, মুসলিমদের পৃথক বাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের দু' অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে-পার্থক্য রয়েছে, পাকিস্তানের শাসকশ্রেণী তা গায়ের জোরে অস্বীকার করতে চায়। বাংলার সংস্কৃতি ও সামাজিক কাঠামোর এই বৈশিষ্ট্যের অন্যতম কারণ এই যে, দেশবিভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রচণ্ড দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্য দিয়ে যে-সামাজিক পুনর্বিন্যাস ঘটে, তাতে সেখানে ইসলামকে শাসকদের স্বার্থে ব্যবহার যতটা সহজ হয়ে ওঠে, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ

বাংলাদেশে দেশবিভাগের পর সামাজিক কাঠামো মূলগতভাবে অপরিবর্তিত থেকে যাওয়ার দরুন ধর্মের দোহাই পেড়ে কার্য হাসিলের পথ ততটা সহজ হয়ে দাঁড়ায় নি।

সুতরাং বাংলাদেশে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করার জন্য পাকিস্তানী শাসকবর্গ প্রথমাবধি চক্রান্তে লিপ্ত হয় এবং যে-কোন ধরনের আন্দোলনকে পাকিস্তান ধ্বংস করার জন্য ভারতীয় চরদের চক্রান্ত বলে অপপ্রচার চালাতে শুরু করেন। অপরদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন কারণে ভারতদ্বেষিতা জনগণের মধ্যে প্রবল থাকায় সেখানে সরকার-বিরোধী তেমন কোন মনোভাব যেমন প্রবল হয় নি, তেমনি পাকিস্তান-ধ্বংসের জন্য ভারতীয় চর আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দেয় নি। এককথায় পশ্চিম পাকিস্তানে দেশপ্রেম ও ভারতদ্বেষিতা ছিল সমার্থ-বাচক। পাকিস্তানে সাম্প্রদায়িকতা রাষ্ট্রনীতির মূলস্তম্ভ। একটি উদাহরণই আমার এ বক্তব্যের সমর্থনে যথেষ্ট। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও গভর্ণর জেনারেল মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকায় এসে ছাত্র-নেতৃবৃন্দকে এক বৈঠকে ডাকেন। রাষ্ট্রভাষা-সম্পর্কে এই আলোচনায় বিভিন্ন ছাত্রাবাসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, মিঃ জিন্নাহ্ মামুলী দু'একটা কথা বলা ব্যতীত মূল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন নি। ছাত্র-নেতৃবৃন্দ বের হয়ে আসার পর পূর্ব বাংলার তৎকালীন চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদ ছাত্রনেতা জনাব তোয়াহা এবং অন্য একজন ছাত্রনেতাকে বলেন যে, কায়েদে আজম তাদের সাথে কী একটা বিষয়ে আলাপ করতে চান। এরা ভিতরে গেলে মিঃ জিন্নাহ্ বিরক্তি প্রকাশ করে বলেন যে, হিন্দু ছাত্রদের সাথে এনেছেন কেন? জবাবে জনাব তোয়াহা জানালেন যে, তারা জগন্নাথ হল ছাত্রাবাসের প্রতিনিধি। মিঃ জিন্নাহ্ বিরক্ত হয়ে বললেন যে, আমি শুধু মুসলিম ছাত্র-নেতাদের সাথে দেখা করতে চেয়েছি। স্পষ্টতঃই তিনি হিন্দু ছাত্রনেতাদের সামনে ভাষা সমস্যা নিয়ে আলোচনায় অনিচ্ছুক ছিলেন এবং এজন্য-যে সেদিন কোন আলোচনা হয় নি তাও জানাতে তিনি এই সাক্ষাৎকারে দ্বিধা করেন নি। সুতরাং পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার পর 'হিন্দু আর হিন্দু নয়, মুসলমান আর মুসলমান নয়' —মিঃ জিন্নাহ্র এই উক্তি-যে নেহাৎ একটা স্তোকবাক্য, কার্যত সাম্প্রদায়িকতাই-যে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় চেতনাকে প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছে তা শাসকবর্গের প্রতিটি কার্যকলাপে ও কথাবার্তায় প্রকাশ পেয়েছে।

এই পটভূমিকাতেই বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সাংবাদিকদের সংগ্রামকে বুঝতে হবে এবং এই সংগ্রামের পথ কত দুরূহ ছিল তা সহজেই অনুমেয়।

দেশভাগের পর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের রাজধানী ঢাকায় প্রথমে কলকাতা থেকে 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকা চলে আসে। বছর খানেক পর বাংলা 'দৈনিক আজাদ' কলকাতা থেকে এখানে উঠে আসে। এভাবে ঢাকায় প্রথমে সংবাদপত্র শিল্প গড়ে ওঠে। প্রাথমিক অবস্থায় সাংবাদিকরা তাদের পেশাদারী কর্তব্যের মধ্যেই নিজেদের কাজ সীমিত রাখেন। এই দু'টি কাগজই ছিল কার্যত সরকারী মুখপত্র।

এর পর ১৯৪৮ সালে প্রথম ইংরাজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভার' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হ'ল। আইনজীবী জনাব হামিদুল হক চৌধুরীর এই ইংরাজী দৈনিকটি প্রথম সংবাদপত্র যেখানে মৃদু হলেও সরকারী কাজকর্মের সমালোচনা শুরু হয়। ধীরে ধীরে কর্মরত সাংবাদিকরাও সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেন। পাকিস্তান সরকার কিন্তু সামান্যতম সমালোচনা সহ্য করতে রাজী ছিলেন না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নটি সরকারের কাছে অবান্তর ছিল। শিশুরাষ্ট্র এই অজুহাতে সামান্যতম সমালোচনায় কর্তৃপক্ষ সর্বদা সর্বত্র পাকিস্তান-ধ্বংসের চেষ্টা বলে দমন করতে তৎপর ছিলেন। সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের মধ্যে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির সমালোচনা-প্রসঙ্গে এ সময়ে 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এ এক সম্পাদকীয় মন্তব্যে খলিফা ওসমানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়। আর যায় কোথায়। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মনে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে সরকার পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ করে দিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর এই বোধ হয় পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার পর প্রথম আঘাত নেমে আসে। আশ্চর্যের বিষয় হিট্টির লিখিত *History of Islam* গ্রন্থে খলিফাদের সমালোচনা করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও ইসলামী ইতিহাস পঠন-পাঠন-প্রসঙ্গে আব্বাসীয় ও উমাইয়া খলিফাদের শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য-সম্পর্কে যে-আলোচনা পাঠ্যপুস্তকে দেখতে পাওয়া যায়, নিঃসন্দেহে 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য তার চেয়ে কঠোর ছিল না। কিন্তু কোনরূপ বিরুদ্ধতাই সরকারের কাম্য ছিল না। ১৯৫১ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীনের পত্রিকা 'সংবাদ' প্রকাশিত হয়। এর আগে 'দৈনিক আজাদ'ই ছিল একমাত্র বাংলা দৈনিক।

'আজাদ' পত্রিকা এই সহযোগী বাংলা দৈনিকটিকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারে নি। কেন পত্রিকাটির নাম বাংলায় রাখা হ'ল তা নিয়ে 'আজাদ' পত্রিকার পৃষ্ঠায় তুমুল ঝড় বয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে 'আজাদ'-এ সরকারী মনোভাবের প্রতিফলনই এ-থেকে আমরা পাই। প্রথমাবধি বাংলা সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষের বিরুদ্ধে সরকারী প্রশাসন-যন্ত্র আঁটঘাঁট বাঁধতে লেগে যায়। ১৯৪৯ সালে প্রথম সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ১৯৫১ সালে সংবাদপত্রের কর্মরত সাংবাদিকদের ইউনিয়ন গঠিত হয়। প্রথমে 'সংবাদ' পত্রিকার সাংবাদিকদের নিয়ে এই ইউনিয়নের ইউনিট গঠন করা হয়। সাংবাদিকদের পেশাগত স্বার্থরক্ষা ছাড়াও সাংবাদিকতার আদর্শ তথা বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন এবং সমাজের একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সাংবাদিকের দায়িত্ব-পালনের বিষয়টি ইউনিয়নের তৎপরতার অন্তর্গত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রামের পদক্ষেপ এখান থেকেই শুরু।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের সময় তৎকালীন নুরুল আমীন সরকার 'সংবাদ' পত্রিকায় পুলিশ পাহারা বসান এবং এই ভাষা আন্দোলন-যে ভারতের চরদের এবং কমিউনিস্টদের কারসাজি এরূপ লিখতে সাংবাদিকদের বাধ্য করার চেষ্টা করা হয়। উল্লেখযোগ্য এই যে, এ পত্রিকাটির মালিক ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন স্বয়ং। সাংবাদিকগণ সরকারী ভাষ্য-অনুযায়ী খবর পরিবেশন অপেক্ষা তাঁদের পক্ষে কার্যত্যাগ বাঞ্ছনীয় বলে হুমকি দেন। বাধ্য হয়ে মুসলিম লীগ সরকারকে পশ্চাদপসরণ করতে হয়। অপরদিকে ভাষা আন্দোলন-সম্পর্কে 'মর্নিং নিউজ'-এ লেখা হ'ল, এটা ভারতীয় চরদের কারসাজি এবং পাকিস্তানী হিন্দুদের সঙ্গে তাদের যোগসাজস রয়েছে। স্পষ্টতই এ পত্রিকায় মন্তব্য করা হ'ল 'Dhuties are roaming in the street.' এই কুৎসা প্রচার ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতা রুখে দাঁড়াল এবং 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকা অফিসে উত্তেজিত জনতা আগুন লাগিয়ে দেয়। দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকায় সাংবাদিকদের সেদিনের দৃঢ়তা পাকিস্তানে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকাটিও দৈনিকে পরিণত হয়। এছাড়া তখন প্রখ্যাত সাংবাদিক মোদ্দাব্বের হোসেনের সম্পাদনায় দৈনিক 'মিল্লাত' এবং প্রাচীন ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাংবাদিক

কাজী ইদরিসের সম্পাদনায় দৈনিক 'ইত্তেহাদ' পত্রিকা প্রকাশিত হত ঢাকা থেকে।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) তৎকালে সংবাদপত্রের বিকাশের বিষয়টি এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা যেতে পারে। কারণ আমাদের দেশে সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশের ধারাটির সাথে সাংবাদিকদের সংগ্রামী ভূমিকা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

প্রথমতঃ, পাকিস্তান আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে 'আজাদ' ও 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ এবং স্বাধীনতা-উত্তর কালে তাদের ভূমিকা সর্বক্ষেত্রে ও সর্বদা না হলেও প্রথম দিকে সরকারের নীতির সঙ্গে একাত্ম ছিল।

দ্বিতীয়তঃ, দেশের শিল্পবিকাশের উপরে সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশ ও সমৃদ্ধি নির্ভরশীল। প্রথমদিকে, তাই দেখা যায় কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা আত্মপ্রকাশের কিছুদিন পরই বন্ধ হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ দেশবিভাগের পর ঢাকায় প্রকাশিত দৈনিক 'ইনসাফ' কিঞ্চিদধিক এক বছর পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫৬ সালে দৈনিক 'মিল্লাত' এবং ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে দৈনিক 'ইত্তেহাদ'-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়।

তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত সংবাদপত্র ব্যক্তিবিশেষের সাময়িক সুযোগ-সুবিধার অবকাশে আত্মপ্রকাশ করেছে। সরকারী পদমর্যাদা ও প্রশাসনযন্ত্র থেকে তাদের বিদায়ের পর এদের মালিকাধীন পত্রিকা বন্ধ হয়ে গেছে। নতুবা ক্রমাগত আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে, এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ দৈনিক 'জেহাদ'।

জনাব এ. টি. এম. মোস্তফা আয়ুব আমলে মন্ত্রীপদে আসীন থাকাকালে তদীয় ভ্রাতা জনাব তাহা-র মালিকাধীনে প্রকাশিত দৈনিক 'জেহাদ' প্রকাশের মাত্র ছয় মাসের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়। মোহন মিঞার পত্রিকা 'মিল্লাত'-এরও বন্ধ হওয়ার মূলে এটির পরিচালনার ক্ষেত্রে পরবর্তী সময়ে তাঁর অনাগ্রহ। এভাবে নুরুল আমীনের পত্রিকা দৈনিক 'সংবাদ'ও মালিকানা পরিবর্তনের পর আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। এছাড়া বামপন্থী পত্রিকা হিসেবে 'সংবাদ'-এর উপর সরকারের বিরাগ ছিল সবচেয়ে বেশি। গভর্নর মোনায়েম খাঁর পত্রিকা দৈনিক 'পয়গাম' তাঁর পতনের পর কোনমতে প্রকাশনা চালু রাখা হয়েছে।

চতুর্থতঃ, অথবা সর্বশেষ, পরবর্তী সময়ে সংবাদপত্র শিল্পে একচেটিয়া পুঁজির আবির্ভাবে বিভিন্ন সংবাদপত্রের উপর পরোক্ষভাবে সরকারী প্রভাবের বৃদ্ধি।

পাকিস্তানের বিশেষভাবে বাংলাদেশে সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে উপরি-উক্ত বৈশিষ্ট্য সাংবাদিকদের সংগ্রামী ভূমিকার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। বলতে গেলে বাংলাদেশে সংবাদপত্র শিল্পের বিকাশের পশ্চাতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রভাব প্রত্যক্ষ ছিল। 'ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট' সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকা সর্বাবস্থায় সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা এবং স্পষ্টভাবে বলতে গেলে পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতি ও ভূস্বামী শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের মুখপত্র হিসেবে কাজ করেছে। পাকিস্তান আন্দোলনের প্রধান মুখপত্র 'দৈনিক আজাদ' বিভিন্ন সময়ে মূলনীতি থেকে বিচ্যুত না হয়েও বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে।

॥ ২ ॥

উপরে সংক্ষেপে বাংলাদেশের সংবাদপত্রশিল্প বিকাশের প্রথম পর্বের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হ'ল। আয়ুব সরকারের আমলে 'ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট' সৃষ্টির পর 'মর্নিং নিউজ' উক্ত ট্রাস্টে যোগ দেয় এবং ট্রাস্টের বাংলা পত্রিকা 'দৈনিক পাকিস্তান' প্রকাশিত হয়। একমাত্র 'ডন' পত্রিকা ব্যতীত পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলো প্রধান দৈনিক পত্রিকা ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান-ব্যাপী সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে ১৯৭০ সালে জমাতে ইসলামী দলের মুখপত্র 'দৈনিক সংগ্রাম' আত্মপ্রকাশ করে। সংবাদপত্র শিল্পের এই দ্বিতীয় পর্বটি সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতার সংগ্রামের ধারাটা যেমন তীব্র ও বেগবান করেছে তেমনি সংবাদপত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণও ক্রমশ কঠোর হয়ে ওঠে। এ ছাড়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার মূলে-যে একজাতি, একরাষ্ট্র ও একধর্মের আদর্শ কাজ করেছে তা কার্যত ব্যক্তিস্বাধীনতা-বিকাশের বিরোধী। সুতরাং পাকিস্তান সরকার প্রথমাবধি ব্যক্তিস্বাধীনতা দমন তথা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করবে তা বলা বাহুল্য। পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করার অপর একটি হেতু হিসেবে কাজ করেছে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রামের সাথে আমাদের জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রাম—যার প্রথম উন্মেষ ও প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়—তা কার্যত পাকিস্তানের আদর্শ হিসেবে উপরে বর্ণিত ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। একথা মানতে হবে যে, আমাদের এই সংগ্রাম যেমন সর্বত্র ও সর্বক্ষেত্রে একটা স্পষ্ট চেতনার হাত ধরে অগ্রসর হয় নি, পাকিস্তানের শাসক-চক্রের চক্রান্ত যেমন স্পষ্টভাবে সর্বত্র জনসমক্ষে ধরা পড়ে নি। এই সংগ্রামের ধারা সর্বদা বেগবান ছিল না, কখনো তা ছিল অন্তঃশীলা ফল্গুস্রোতের মতো; একমাত্র গণ-আন্দোলনের প্রচণ্ড বিস্ফোরণোন্মুখ পরিবেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রাম নতুন স্তরে প্রবেশ করেছে, জনমত সৃষ্টি ও জনমতের বিশ্বস্ত বাহন হিসেবে সংবাদপত্রকে জনতার সামনে উপস্থাপিত করার কাজে সাংবাদিকগণ কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। তাই দেখা যায় যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে নিবেদিত-প্রাণ সাংবাদিকগণ বারংবার কারাবরণ করেছেন ও স্বৈরাচারী শাসকের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের পূর্বে কার্যতঃ সংবাদপত্র ন্যূনতম স্বাধীনতার অধিকারী ছিল না। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় একবার পুলিশ ধর্মঘট হয়। জেল, লাঠি ও গুলীর মুখে এই আন্দোলন কঠোরভাবে দমন করা হয়। এ সময়ে ঢাকার কোন সংবাদপত্র এই ধর্মঘটের খবরটি পর্যন্ত ছাপে নি। কারণ, সরকারী মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত পত্রিকা দু'টি অর্থাৎ 'আজাদ' ও 'মর্নিং নিউজ' বিশ্বস্ত-ভাবে সরকারের স্বৈরাচারী ভূমিকাকে সমর্থন করেছে। এ দুটো পত্রিকায় কার্যরত সাংবাদিকদের পক্ষে তৎকালে কোনরূপ বস্তুনিষ্ঠ খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিকূলতা করার মতো শক্তি অর্জন করা সম্ভব হয় নি এবং তাঁদের কোন সংগঠনও ছিল না। ইংরাজী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-ও এ ব্যাপারে সরকারী নীতির সমর্থক ছিল। কারণ এই পত্রিকার মালিকও তখন প্রাদেশিক সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রীর পদে অসীন ছিলেন।

প্রথম জাতীয় আন্দোলন হিসেবে বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনের ব্যাপকতার জন্য তৎকালে সংবাদপত্রসমূহের প্রতিক্রিয়া গণমুখীন হয়। 'আজাদ' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন পুলিশের গুলীবর্ষণ ও ছাত্র-হত্যার প্রতিবাদে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য হওয়া-সত্ত্বেও তাঁর এই ভূমিকা এবং 'আজাদ' পত্রিকা

ভাষা আন্দোলনের প্রশ্নে সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ায় ও রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষাকে স্বীকৃতিদানের জন্য ছাত্রদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানালে পাকিস্তানে সংবাদপত্রের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ খবর প্রকাশের প্রশ্নে দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার সাংবাদিকদের ভূমিকার কথা প্রথমেই বলা হ'ল। বস্তুত ভাষা আন্দোলনের সময় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার মূল সংগ্রামে সাংবাদিকগণ প্রথম প্রত্যক্ষভাবে অবতীর্ণ হন। প্রসঙ্গত একথা মনে রাখা দরকার, ভাষা আন্দোলন ছিল পাকিস্তানের ঘোষিত আদর্শের প্রতি একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। সঙ্গে সঙ্গে একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, বাক্‌স্বাধীনতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার মৌলিক অধিকারকে গুলীর মুখে স্তব্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের প্রচেষ্টা স্বাধীনতা-উত্তর যুগে বাংলাদেশের (সাবেক পূর্ব পাকিস্তান) আচ্ছন্ন ও আড়ষ্ট চেতনাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে। পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্রনীতিতে গণতন্ত্রের কখনই কোন স্থান ছিল না অর্থাৎ গণতন্ত্র-যে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে একটি "বিজাতীয়" উপাদান এটা পরবর্তী সময়ে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কৃষকদের বিভিন্ন আন্দোলন যথা টঙ্ক, নানকার প্রথার আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারী দমননীতি, চট্টগ্রামের মাদরশায় কৃষকদের ভুখা মিছিলের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ, (যার ফলে প্রায় দুই শত কৃষক নিহত হয়) এবং নাচোলের কৃষক আন্দোলন দমনে সরকারের বর্বরতা ও নৃশংসতার খবর সেদিন ঢাকায় কোন সংবাদ পত্রে সসংকোচে স্থান করে নিয়েছে। ১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এই পাথরচাপা উৎস মুখটা খুলে দিয়েছিল।

১৯৫৪ সালে প্রদেশে সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের শোচনীয় পরাজয়ের পর প্রাসাদ-চক্রান্তের ফলে নবগঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্বেই আদমজীতে শ্রমিকদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। প্রদেশে অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার অজুহাতে এবং যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হকের কলিকাতা সফরকালে ভাষণকে যুক্ত বাংলার সপক্ষে চক্রান্ত বলে আখ্যা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশে ৯২-ক ধারা জারী করেন ও প্রায় দু'হাজার রাজনৈতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ নাগরিককে গ্রেফতার করেন। সাংবাদিকগণও এই গ্রেফতারের হাত থেকে রেহাই পান নি। দৈনিক

'ইত্তেফাক'-এর সহকারী সম্পাদক জনাব আলী আকসাদ এবং 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এর রিপোর্টার জনাব জাহেদী গ্রেফতার হলেন। খ্যাতনামা সাংবাদিক কে. জি. মুস্তফাকে আত্মগোপন করতে হ'ল। ৫ই জুলাই পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হ'ল। প্রকারান্তরে সংবাদ-পত্রগুলোর কণ্ঠ রোধ করা হয়। তৎকালীন বাংলাদেশ কীভাবে ৯২-ক ধারাকে গ্রহণ করেছে তার কোন নজীর সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সেদিন পাওয়া যাবে না। যে-জনসাধারণ মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টকে নির্বাচনে জয়ী করেছে, তারা-যে ৯২-ক ধারার বিরোধী এরূপ কোন খবর সংবাদপত্রের পাতায় সেদিন প্রকাশিত হয় নি। সংবাদপত্রের উপর এই সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফাঁস অলক্ষ্য ভাবে কাজ করেছে। এ সময়ে প্রচণ্ড দমননীতির মুখেও সাংবাদিকগণ যেরূপ নির্ভীক ভাবে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা ও মনোভাব তুলে ধরার সংগ্রামে নিজেদের যুক্ত রেখেছেন তা প্রশংসনীয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তে এরপর যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। রাজনীতির কলকাঠি ক্রমশ আমলাতন্ত্রের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে। প্রধান মন্ত্রী পদ থেকে খাজা নাজিমুদ্দিনকে অগণতান্ত্রিক ভাবে অপসারণের পর থেকে পাকিস্তানের রাজ-নীতিতে সামরিক চক্র ও আমলাতন্ত্রের প্রভাব ও শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইস্কান্দার মির্জার আমলে বাংলাদেশে জনতার সংগ্রামী মোর্চা এভাবে ভেঙে গেল। জনগণের মৌলিক অধিকারের সাথে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার প্রশ্নটি জড়িত। আলোচ্য সময়ে সাংবাদিকগণ খুব বেশি সামনে এসেছেন একথা বলা যায় না। এসময়ে তাঁদের সংগ্রাম ইউনিয়নগত কার্যকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবুও সীমিত শক্তি নিয়ে তাঁরা সেদিন জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তার প্রতিবাদের ভাষা তুলে ধরতে চেয়েছেন। পেশাগত দায়িত্বের চৌহদ্দির বাইরে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তাঁদের তৎপরতার জন্যই বিরোধী দলীয় মুখপত্রসমূহ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ারও বাহন হয়ে উঠেছিল। এক কথায় বিভিন্ন বাধাবিঘ্নের মুখেও 'ইত্তেফাক', 'সংবাদ', 'মিল্লাত' প্রভৃতি সংবাদপত্র দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও মতামতকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে যে-ভূমিকা সেদিন নিয়েছিল, পরোক্ষ ভাবে তা সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে বহদূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। এসময়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে আমলাতন্ত্রের ও সামরিক অফিসারদের প্রভাব-সত্ত্বেও পার্লামেন্টারি কাঠামোর

খোলসটা বজায় ছিল। সুতরাং সংবাদপত্র পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ সামরিক শাসনের আমল শুরু হওয়ার পর যেভাবে বারংবার সরকারী রোষের সম্মুখীন হয়েছে তা থেকে আপেক্ষিকভাবে মুক্ত ছিল। এসময়ে সংবাদপত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কখনো প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূত হয় নি।

১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র রচিত ও গৃহীত হওয়ার পর পাকিস্তানের রাজনীতিতে দ্রুত পটপরিবর্তন শুরু হয়। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার ইঙ্গিতে গঠিত রিপাবলিকান পার্টির নেতা বাদশা খান আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) আইন পরিষদের স্পীকার শাহেদ আলী পরিষদ ভবনের অভ্যন্তরে আহত হয়ে একদিন পর হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার সময় প্রদেশের নিরাপত্তা আইন বাতিল করা হয় কিন্তু অতঃপর সীমান্ত চোরাচালান বন্ধের নামে সৈন্যবাহিনীকে বিভিন্ন জেলায় মোতায়েন করা হয়। এটা close door operation নামে অভিহিত। এ সময়ে চোরাচালানের অজুহাতে কিছু বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। এঁদের মধ্যে সাংবাদিক আলী আফসাদ, শহীদুল্লা কায়সার ও রণেশ মৈত্র ছিলেন। কোনরূপ সাক্ষ্য প্রমাণ দাঁড় করাতে না পেরে এবং প্রবল জনমতের চাপে প্রাদেশিক সরকার এঁদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

এর পর ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক সরকার কায়েম হয়। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার নেতৃত্বে এই সামরিক অভ্যুত্থানের সময় প্রাদেশিক নিরাপত্তা আইনের অস্তিত্ব ছিল না। ১৩ই অক্টোবর নিরাপত্তা আইন পুনরায় এক অর্ডিন্যান্সবলে চালু করা হয়। ঐদিন রাত্রেই ঢাকা সহ প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ৩৫ জন রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। ইতিপূর্বে শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা ভাসানীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সামরিক সরকার কায়েমের পর পত্রিকার উপর সেন্সারশিপ আরোপ করা হয় এবং রাজনৈতিক দলগুলো বে-আইনী ঘোষণা করা হয়। সংবাদপত্র নামমাত্র যেটুকু স্বাধীনতা ভোগ করত তা সামরিক শাসন জারীর সাথে সাথে মার্শাল ল রেগুলেশনে একটি ধারা বলে রহিত করা হয়। উপরে উল্লিখিত গ্রেফতার-কৃত ৩৫ জনের মধ্যে ঢাকায় ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তার মধ্যে সাংবাদিক শহীদুল্লা কায়সার ও আলী আকসাদ ছিলেন। পাবনায় 'সংবাদ' পত্রিকার

সংবাদ গণেশ মিত্রও একই সময় গ্রেফতার হন। কিন্তু গ্রেফতারের খবর সেদিন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় নি। সরকার থেকে জানানো হ'ল যে, বেতারে এই গ্রেফতারের খবর ঘোষণার পূর্বে গ্রেফতার-সংক্রান্ত কোন খবর প্রকাশ করা যাবে না। গ্রেফতারের ৭।৮ দিন পর গ্রেফতার-কৃত রাজনৈতিক কর্মী ও সাংবাদিকদের নাম খবরের কাগজে প্রকাশ করা হয়। এরপর প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে যে-ধর-পাকড় চলতে থাকে তার খবরও সরকারী প্রেসনোট অনুযায়ী পত্রিকায় ছাপতে হ'ত। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর এরূপ নগ্ন হামলার বিরুদ্ধে সাংবাদিকদের সম্মুখে তখন কোনরূপ প্রতিবাদের পথ ছিল না। ২৭-এ অক্টোবর দ্বিতীয় 'কু' মারফৎ আয়ুব খান ক্ষমতায় এলেন। ইস্কান্দার মির্জাকে দেশ থেকে সরিয়ে দেওয়া হ'ল। ১৯৫৮ সালের ৩১-এ ডিসেম্বর আমাকে নিরাপত্তা আইনে 'সংবাদ' অফিস থেকে গ্রেফতার করা হ'ল। ১৯৫৯ সালের মে মাসে 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এর রিপোর্টার ফয়েজ আহমদকে গ্রেফতার করা হয়।

আয়ুবশাহী আমলে গণ-আন্দোলনকে সামরিক আইনের বিধি বিধান জারী করে যেমন স্তব্ধ করা যায় নি তেমনি সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করাও সম্ভবপর হয় নি। সংবাদপত্রসমূহ স্বাধীনভাবে মতামত ব্যক্ত করার দুঃসাহস দেখাতে থাকে, সাংবাদিকগণ গ্রেফতার ও শাস্তির ঝুঁকি নিয়েও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রামে এগিয়ে আসেন। চতুর আয়ুব সরকার সাংবাদিকদের জন্য বেতন বোর্ড গঠন করে তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য মালিককে বাধ্য করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল এক ঢিলে দু'টো পাখিই মারা। প্রথমত সংবাদ-পত্রের মালিক সাংবাদিকদের বেতন বোর্ড-অনুযায়ী বর্ধিত বেতন দানে গড়িমসি করবেন এবং অপর দিকে সাংবাদিকগণ পূর্বের তুলনায় অধিক বেতন পাওয়ার জন্য আয়ুবশাহীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। কিন্তু আয়ুব সরকারের এ চাল ব্যর্থ হ'ল। সেদিন সাংবাদিকদের দৃঢ়তা ও সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন নীতি আয়ুবের কুচক্রান্তের জাল ছিন্ন করেছে। ১৯৬০ সালে সাংবাদিকদের বেতন বোর্ড গঠিত হয়। তার কিছুদিন পরই সংবাদপত্রসমূহ সরকারী নির্দেশ যথাযথ পালন না করার জন্য অর্থাৎ সরকারের সমালোচনা করার জন্য আয়ুব সরকার দৈনিক 'ইত্তেফাক', দৈনিক 'সংবাদ' ও 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-কে কালো তালিকাভুক্ত (black-listed) করেন। এর ফলে এসব কাগজে সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ হ'ল। 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকায় এসময় (১৯৬১) ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতার

জন্য ১৪ জন সাংবাদিক কর্মচ্যুত হন। একদিকে চাকুরীর নিরাপত্তা ও অন্যদিকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সাংবাদিকদের সংগ্রাম এ সময়ে তীব্র আকার ধারণ করে। কার্যত এ সময়ে বাংলাদেশের স্বার্থের প্রশ্নে সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে উপরি-উক্ত তিনটি পত্রিকা এগিয়ে আসে। এর সঙ্গে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম যুক্ত হয়। সরকারী অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে তিনটি পত্রিকার প্রতিরোধ প্রকাশ পায় তাদের এক সিদ্ধান্তে। তা হ'ল এই যে, অতঃপর এসব পত্রিকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের কোন ছবি ছাপা হবে না। ১৯৬২ সালের শেষ ভাগে (সেপ্টেম্বর) মোনায়েম খানকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপদ থেকে সরিয়ে প্রদেশের গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। কনভেনশন লীগ ও কাউন্সিল লীগের মধ্যে 'আজাদ' কার্যত কাউন্সিল মুসলিম লীগ অথবা সঠিক ভাবে বলতে গেলে খাজা নাজিমুদ্দিন ও মোসাম্মাৎ ফাতেমা জিন্নাকে সমর্থন করত। সুতরাং কালো তালিকাভুক্ত না হওয়া-সত্ত্বেও এই পত্রিকাটিতেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মোনায়েম খানের ছবি ছাপা হ'ত না। এভাবে বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রাম এক নতুন স্তরে প্রবেশ করে। ১৯৬১ সালে সমস্ত বিরোধী দলের সমন্বয়ে ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট বা এন. ডি. এফ. গঠিত হয়।

এসময়ে আরও একটি ঘটনা ঘটে। ১৯৬১ সালে সমগ্র বিশ্বে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী পালিত হয়। স্বাভাবিক ভাবে বাংলাদেশের জনগণ রবীন্দ্রশতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আয়ুব সরকার বাংলাদেশের এই সাংস্কৃতিক তৎপরতাকে অঙ্কুরেই ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লাগে। ভারতীয় চক্রান্তের অঙ্গ হিসেবে এই রবীন্দ্রশতবার্ষিকী পালন করার উদ্যোগ আয়োজন চলছে এ ধরনের হুমকি সরকারের তরফ থেকে আসে। বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপর আয়ুব সরকার আঘাত হানলেন। 'আজাদ' পত্রিকার বেশ কিছু-সংখ্যক সাংবাদিক নিজেদের চাকুরী যাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও রবীন্দ্র-বিরোধী প্রচারণায় অংশগ্রহণে সরাসারি অস্বীকার করেন। এখানে স্মর্তব্য যে, 'আজাদ'-এ সাংবাদিক ইউনিয়ন এসময়ে ভেঙে দেওয়া হয় এবং পশ্চিমা পুঁজিপতিগোষ্ঠীর মুখপত্র 'মর্নিং নিউজ'-এর সাথে এক-যোগে 'আজাদ' রবীন্দ্র-বিরোধী প্রচার জোরে চালাতে থাকে। বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপর এই আঘাতের বিরুদ্ধে অপরাপর বুদ্ধিজীবীদের সাথে সাংবাদিকগণও এগিয়ে আসেন। আয়ুব সরকার রবীন্দ্রশতবার্ষিকী পালনের উদ্যোক্তাদের মধ্য থেকে প্রবীণ সাংবাদিক কে. জি. মোস্তফা

এবং রণেশ দাশগুপ্তকে গ্রেফতার করেন। এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বাংলাভাষাকে "হিন্দু" সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য সরকার বাংলাভাষায় শতকরা ৪০ ভাগ শব্দ আরবী ফার্সী ব্যবহারের জন্য একটি সার্কুলার দিয়েছিলেন। রেডিও পাকিস্তান (ঢাকা কেন্দ্র) এবং 'আজাদ' পত্রিকা ও সরকারী মুখপত্র সাপ্তাহিক 'জমহুরিয়ত' এবং 'মাহে নও' মাসিক পত্রিকা (কেন্দ্রীয় সরকারের প্রচার দফতরের পত্রিকা) ব্যতীত কোন সংবাদপত্র এই নির্দেশ পালনে আগ্রহ দেখায় নি। ফলে, সরকারী প্রচেষ্টা কার্যত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এভাবে সরকার ধাপে ধাপে বাংলাদেশের সংস্কৃতির উপর আঘাত হানতে থাকে। প্রতিবারই জনগণের সঙ্গে সাংবাদিক-গণ সরকারের এই সাংস্কৃতিক হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন। কারা-নির্যাতনের ভয় কিংবা চাকুরীর মোহ এবং সরকারী টোপ তাঁদেরকে সংকল্প-চ্যুত করতে পারে নি। রবীন্দ্র-বিরোধী অভিযান এবং বিদ্রোহী কবি নজরুলের কবিতার ভাষার শুদ্ধি অভিযানের বিরুদ্ধে সাংবাদিকগণ অক্লান্ত ভাবে মুখর ছিলেন। বস্তুত এসময়ে দৈনিক 'সংবাদ' ও 'ইত্তেফাক' সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুখপত্রে পরিণত হয়। সরকারের দমননীতি ও আর্থিক ভাবে পত্রিকাগুলোকে পঙ্গু করার জন্য বিজ্ঞাপন বন্ধ করার নীতি সংবাদপত্রসেবীদের সংকল্প-চ্যুত করতে পারে নি। আয়ুবশাহী সেদিন এদেশের সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্যে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের ইঙ্গিত দেখেছিলেন। আর এই জাতীয়তাবাদ-যে পাকিস্তানের দেউলিয়া আদর্শের ভিত্তিকে একদিন ধসিয়ে দেবে তাও আয়ুবশাহীর অজানা ছিল না।

১৯৬২ সালের মে মাসে এন. ডি. এফ.-এর নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দিকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময়ে 'ইত্তেফাক' পত্রিকার সম্পাদক মানিক ভাইকেও (জনাব তফাজ্জল হোসেন) গ্রেফতার করা হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামরত সাংবাদিকদের উপর পাকিস্তান সরকারের হামলার এহেন নজীর খুব কম চোখে পড়ে। অপর দিকে ১৯৫৯ সালে লাহোরে 'পাকিস্তান টাইমস্' পত্রিকাকে সরকার এক হুকুমনামার বলে দখল করেন। এই পত্রিকার মালিক মিয়া ইফতেখার উদ্দিন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে বরাবরই সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল নীতির তীব্র সমালোচনা করতেন। সুতরাং সামরিক সরকার প্রথম সুযোগেই পত্রিকাটিকে কুক্ষিগত করবেন এতে আশ্চর্য হবার কিছু

ছিল না। এই সম্পত্তি দখলের জন্য পাকিস্তান সরকার কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেন নি। কোন সরকার কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি আত্মসাতের এরূপ নজীর বিশ্বের ইতিহাসে বিরল। সকলরকম প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও রাজনীতিকে স্তব্ধ করে দেওয়াই ছিল আয়ুবশাহীর একমাত্র নীতি। পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন একটি পত্রিকাকে এভাবে কুক্ষিগত করার বিরুদ্ধে সেদিন জোর প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং সাংবাদিকগণ সর্বদাই এই পত্রিকাটিকে প্রকৃত মালিকের নিকট প্রত্যর্পণের জন্য দাবী জানিয়ে এসেছেন।

বাংলাদেশে একদল স্তাবক বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আয়ুব সরকার লেখক-সংঘ, ব্যুরো অব ন্যাশনাল রিকনস্ট্রাকশন (বি. এন. আর.) অর্থাৎ জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা এবং বাংলা উন্নয়ন বোর্ড স্থাপন করেন। সেদিন আয়ুবশাহীর এ টোপ বৃথা যায় নি; পরবর্তী ঘটনাবলী এর প্রমাণ। বেতন বোর্ডের জন্য সাংবাদিকগণ আয়ুবশাহীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন এরকম দুরাশা ব্যর্থ হওয়ার পর ১৯৬৩ সালে আয়ুব প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস্ অর্ডিন্যান্স জারী করলেন। পরাধীনতার যুগে বৃটিশ সরকারের প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস্ এ্যাক্টটি সংশোধন করে এবং একে আরও কঠোর ভাবে প্রয়োগের জন্য আয়ুবশাহী সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য এই কালাকানুন জারী করেন। এর একটি ধারায় সমস্ত সরকারী হ্যাণ্ড আউট ও প্রেসনোট হুবহু ছাপা আবশ্যিক বলে ঘোষণা করা হ'ল। এছাড়া অপর একটি ধারায় কারোর বিরুদ্ধে কোন প্রকাশিত খবর ব্ল্যাকমেইলিং-এর (ভীতি প্রদর্শনের) উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে হ'লে কঠোর দণ্ড দানের ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হ'ল। সরকারের দাবী-অনুযায়ী রিপোর্টের সূত্র প্রকাশ করাও একটি ধারায় সন্নিবেশিত হ'ল। আর্থিক অসচ্ছলতা কিংবা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার অজুহাতে সংবাদপত্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সরকারী হস্তক্ষেপ একটি ধারায় বৈধ করা হ'ল। সংবাদপত্রের সীমিত পরিসরে সংবাদগত মূল্য থাক বা না থাক প্রতিটি সরকারী বিবৃতির ও প্রচারপত্রের পূর্ণ বিবরণ প্রকাশের জন্য ধারাটির একমাত্র লক্ষ্য ছিল সরকারী প্রচারণা ছাড়া অন্য কোন খবর যেন পত্রিকায় প্রকাশের সুযোগ না থাকে।

এই কালাকানুনের প্রতিবাদে পাকিস্তানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সাংবাদিকগণ প্রতিবাদের ঝড় আনলেন। পাকিস্তান ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন যে-কোন মূল্যে সংবাদপত্র কণ্ঠরোধের জন্য সরকারের এই প্রচেষ্টা নস্যাৎ

করার নিমিত্ত আহ্বান জানাল। সরকার কোনপ্রকার যুক্তিতে কর্ণপাত করতে রাজী হলেন না। শুরু হ'ল সংগ্রাম। সরকারী হ্যাণ্ড আউটের হুবহু কপি ছেপে সেদিন সংবাদপত্রে সাংবাদিকগণ সরকারী এই নির্দেশকে পরিহাসের বস্তু করে তুললেন। পত্রিকাতে "জনসংযোগ বিভাগের অভিবাদনসহ" এই বক্তব্য থেকে টাইপকারীর নাম ও তারিখও বাদ গেল না। এ ছাড়া বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানে সর্বত্র মিছিল আর প্রতিবাদ সভা বার করলেন সাংবাদিকগণ। সরকারী পৃষ্ঠপোষিত তিনটি সংস্থা যেমন লেখকসংঘ, বি. এন. আর. ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের বুদ্ধিজীবীরা নীরব রইলেন। বাক্‌স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতার জন্য তাঁরা সাংবাদিকদের পাশে এসে দাঁড়ান নি সেদিন। "পাকিস্তানের আদর্শের" প্রতি তাঁদের প্রীতি ছিল সেদিন এমনই গভীর। কী এই 'পাকিস্তানী আদর্শ!' তা হ'ল আয়ুবশাহীর কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি করা। এক কথায়, এই তিনটি সংস্থা তথ্য দফতরের সেক্রেটারি আলতাফ গওহরের নির্দেশে সেদিন হিজ মাস্টারস্ ভয়েস-এ পরিণত হয়েছিল।

আয়ুব খানের 'প্রভু নয়, বন্ধু'-নামক পুস্তকের প্রশংসায় এ সব ভাড়াটে লেখকেরা সেদিন গদ্‌গদ হয়ে উঠলেন। কিন্তু একমাত্র 'ট্রাস্ট' পত্রিকার পাতায় ছাড়া এই প্রভুর গুণ কীর্তন কোন সংবাদপত্র ছাপে নি সেদিন। আয়ুবশাহী ভেবেছিল 'ট্রাস্ট' পত্রিকার জোরে কুখ্যাত সংবাদপত্র দলন অর্ডিন্যান্সকে কার্যকর করা সম্ভব হবে। কিন্তু ইউনিয়নের নির্দেশে সকল সাংবাদিকই এগিয়ে এলেন। কাগজকে কুক্ষিগত করা গেলেও সাংবাদিকদের তো বশ করা যায় নি। অর্ডিন্যান্স বাতিল না করা পর্যন্ত সাংবাদিকরা কালো ব্যাজ ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। ঢাকার রাজপথে নব্বুই বছরের বৃদ্ধ প্রখ্যাত সাংবাদিক মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সেদিন সাংবাদিকদের প্রতিবাদের মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন। সে দিন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রামে তরুণদের পাশাপাশি অসুস্থ ও প্রায় চলৎ-শক্তিহীন প্রবীণ সাংবাদিক ও 'আজাদ' পত্রিকার সম্পাদকের এই সংগ্রামের দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে নবতর গৌরবে ও মহিমায় ভাস্বর করেছে। সাংবাদিক ইউনিয়নের ডাকে পাকিস্তানের প্রতিটি সংবাদপত্রে একদিন প্রতীক ধর্মঘট পালন করা হয়। প্রতিটি সরকারী অনুষ্ঠানে সাংবাদিকগণ কালো ব্যাজ সহ উপস্থিত থাকতেন। প্রেসিডেন্ট আয়ুবের এক সাংবাদিক সম্মেলনেও সাংবাদিকগণ কালো ব্যাজ ধারণ করেই যোগ দেন। স্বভাবতই প্রেসিডেন্টের কাছে এটা

প্রীতিকর ছিল না। তিনি এটা পছন্দ করেন না এটা জানাতেই সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে ত্বরিত জবাব এল, প্রেসিডেন্টকে খুশী করা না করা তাঁদের কর্তব্যের অঙ্গ নয়, কিংবা প্রেসিডেন্টের মেজাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সেদিনকার এই সংগ্রাম ছিল একটা দেশের জনসাধারণের বাক্‌স্বাধীনতার ও চিন্তার স্বাধীনতার স্বীকৃতির সংগ্রাম। এই গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম যদি ব্যর্থ হ'ত তবে দেশবাসীকে সরকারী নির্যাতন ও নিপীড়ন-সম্পর্কে অন্তত ওয়াকিবহাল রাখার কোন পন্থাই সংবাদপত্রের সামনে খোলা থাকত না। সাংবাদিকদের জঙ্গী আন্দোলনের মুখে আয়ুব সরকারকে সেদিন পিছু হটতে হয়েছিল। সাংবাদিকদের এই আংশিক বিজয় থেকে তাঁদের সংগ্রাম আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছে। প্রতিবারই দেখা গেছে যে, সমাজের সচেতন নাগরিক হিসেবে তাঁরা প্রতিটি গণ-আন্দোলনের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন, শুধু নিস্পৃহভাবে নিজেদেরকে পেশাগত দায়িত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। তাই, রাজনৈতিক কর্মীদের মত বারংবার তাঁরা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, হাসিমুখে কারাযন্ত্রণা বরণ করে নিয়েছেন।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতি শ্রেণীর ষড়যন্ত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। লক্ষ করলে দেখা যাবে যে, নরসিংদী থেকে লাঙ্গলবন্দ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তাঁত শিল্প এলাকাই ছিল দাঙ্গার লক্ষ্য কেন্দ্র। আদমজী প্রকাশ্যেই দাঙ্গা করার জন্য তার শ্রমিকদের লেলিয়ে দেয়, ইসলাম বিপন্নের ধুয়া তুলে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সাংবাদিকগণ সেদিন অপরাপর শিল্পী সাহিত্যিকদের সঙ্গে একযোগে শান্তি মিছিল বার করেন ও দাঙ্গা-প্রতিরোধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। বস্তুত জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় পুষ্ট বাঙ্গালীর ধর্মনিরপেক্ষ চেতনাকে পুনরায় সরকারের সাম্প্রদায়িক নীতির লেজুড়ে পরিণত করার অপচেষ্টাও এর মধ্যে মূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু 'পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাঁড়াও' এই শ্লোগান দিয়ে বাংলাদেশের সকল সংবাদপত্র এই ঘৃণ্য দাঙ্গার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ তোলেন। দাঙ্গার দুই দিন পূর্বে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ এক আবেদনে দাঙ্গার বিরুদ্ধে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানান। এভাবে সাংবাদিকগণ আর একবার এগিয়ে এলেন জাতির প্রতি তাঁদের গুরু দায়িত্ব পালনে। 'পূর্ব বাংলা রুখিয়া দাড়াও' এই শ্লোগানে রুষ্ট শাসন-কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পত্রিকার বেশ কিছু-সংখ্যক

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। সরকারের যুক্তি তাঁরাই নাকি এ ধরনের সংবাদ পরিবেশন ও সম্পাদকীয়ের মধ্য দিয়ে এক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অপর শ্রেণীকে লেলিয়ে দেওয়ার মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সাংবাদিকদের চরমপত্রে ভীত মোনায়েম সরকার শেষপর্যন্ত দাঙ্গা বন্ধের জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। আর একবার সংগ্রামী জনতা প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ও তার সমর্থক পশ্চিমা পুঁজিপতিদের হীন চক্রান্ত ফাঁস করে দেয়। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করার জন্য এই দাঙ্গার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ বিভ্রান্তির পাঁকে নিমজ্জিত না হয়ে বরং আরও সংহত হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সম্পাদকদের বিবৃতি একমাত্র 'আজাদ' পত্রিকার প্রবীণ ও বৃদ্ধ সাংবাদিক মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের দায়িত্ব সরকারের। সম্পাদক হিসেবে এটা তাঁর দায়িত্বের অঙ্গ নয়। অথচ সেদিন 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকার ঢাকাস্থ সম্পাদক এই আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন, কিন্তু সেদিন 'আজাদ'-এর সাংবাদিকগণ পত্রিকাটিকে দাঙ্গা-বিরোধী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য করান। এর পর ১৯৬৪ সালের মে মাসে 'আজাদ'-এর তদানীন্তন বার্তা সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আবার বাংলাদেশের সাংবাদিকদের উপর নিপীড়নের স্টীম রোলার নেমে আসে। রণেশ দাশগুপ্ত, সত্যেন সেন, রণেশ মৈত্র-প্রমুখ সাংবাদিকদেরকে দেশরক্ষা আইনে পুনরায় গ্রেফতার করা হয়। সাংবাদিকগণ এই গ্রেফতারের প্রতিবাদ করেন। এবং যুদ্ধের সময়ই এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারের সাম্প্রদায়িক প্রচারণার কঠোর সমালোচনা করেন। নিঃসন্দেহে সেদিন দেশরক্ষা আইনের মুখে সাংবাদিকগণ এক দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন।

এর পর ১৯৬৬ সালের ২০-এ এপ্রিল পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবী পেশ করেন, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও স্বায়ত্তশাসন ছিল এর মূল লক্ষ্য। মে মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হ'ল। আয়ুব সরকার ছয় দফার বিরুদ্ধে 'অস্ত্রের ভাষা' প্রয়োগের হুমকি দিলেন। ছয় দফার সমর্থনে ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন এক সাধারণ ধর্মঘট আওয়ামী লীগ আহ্বান করে। ধর্মঘট ব্যর্থ করার জন্য সরকার প্রচণ্ড দমননীতির আশ্রয়

নেয়। সেদিন কমপক্ষে ১৫ ব্যক্তি পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন। বহু ব্যক্তি আহত হন এবং অনেকে গ্রেফতার হলেন। সরকার সংবাদপত্রের উপর এই ঘটনাবলীর প্রকাশ নিষেধ করে এক আদেশ জারী করেন এবং জারীকৃত আদেশটিও প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপক জনসাধারণ যেন সরকারী দমননীতি-সম্পর্কে কোন খবর না পায় এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হ'ল জনতা থেকে সংগ্রামী সাংবাদিকদের বিচ্ছিন্ন করা এবং উভয়ের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি। এছাড়া আয়ুবী শাসনের দশ বছরে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করার জন্য এক অভিনব পন্থা গ্রহণ করা হয়। টেলিফোনে সরকারের জনসংযোগ দফতরে থেকে কোন্ খবর দেওয়া যাবে বা কোন্ খবর দেওয়া যাবে না তজ্জন্য হামেশাই অনুরোধ জানান। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল কোন্ খবরকে সরকারের ইচ্ছামত তাদের ভাষ্য অনুযায়ী সরকারী স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে পরিবেশন, কার্যত গোটা সামরিক শাসনকালে সংবাদপত্রের উপর এক অদৃশ্য অলিখিত সেন্সরশিপ আরোপ করা হয়েছিল। ১৬ই জুলাই (১৯৬৬) মোনায়েম সরকার এক আদেশ-বলে নিউ নেশন প্রেস বাজেয়াপ্ত করেন এবং তার একদিন পূর্বে 'ইত্তেফাক'-এর সম্পাদক মানিক ভাইকে গ্রেফতার করা হ'ল। অতঃপর 'ইত্তেফাক' পত্রিকা অপর একটি প্রেস থেকে কোনমতে ২।১ দিন প্রকাশ করা হয়। কিন্তু পরবর্তী এক সরকারী নির্দেশে তাও বন্ধ হ'ল। 'ইত্তেফাক' প্রকাশনা বন্ধের বিরুদ্ধে মামলায় জয়ী হওয়া সত্ত্বেও সরকার অপর একটি অর্ডিন্যান্স জারী করে 'ইত্তেফাক' প্রকাশনা বন্ধ করে দেন।

এ-ছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংবাদপত্রের উপর জামানত ধার্য ছিল আয়ুবশাহীর নিত্য-নৈমিত্তিক কীর্তি। ১৯৬৩ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক 'জনতা' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আনোয়ার জাহিদকে গ্রেফতার করা হয় এবং পত্রিকার উপর জামানত ধার্য করা হয়। ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষাদিবসে ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণের বার্ষিকী উপলক্ষে 'জনতা' পত্রিকায় একটা জিজ্ঞাসা ছাপা হয়েছিল রিপোর্ট আকারে, "আগামী কাল কত ছাত্রকে প্রাণ দিতে হইবে?" সরকার এর মধ্যে হিংসাত্মক কাজে উত্তেজনা দেওয়ার উদ্দেশ্য আবিষ্কার করলেন। এভাবে 'ইত্তেফাক' ও 'সংবাদ'-এর উপর পাঁচবার, 'দৈনিক আজাদ'-এর উপর এক বার জামানত দাবী করা হয়। 'দৈনিক আজাদ'-এও ১৯৬৬ সালের মে-মাসে শেখ মুজিবুর রহমানের সাংবাদিক সম্মেলনের যে-বিবরণ ছাপা হয় তার শিরোনামা দেওয়া হয়েছিল "গুণ্ডারা লাটভবনে

আশ্রয় লইয়াছে।" শেখ মুজিবের এই উক্তি পত্রিকাটিতে প্রকাশের জন্য সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। সুতরাং আর যায় কোথায়—কেন জামানত তলব করা হবে না কারণ দর্শাও বলে 'আজাদ'-এর উপর নোটিশ জারী করা হ'ল।

সে যা হোক 'ইত্তেফাক' পত্রিকা প্রকাশনা সরকার বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে সাংবাদিকগণ গর্জে উঠলেন। একদিন প্রতিবাদ মিছিল বের হ'ল, আর একদিন প্রতীক ধর্মঘট পালন করা হ'ল। প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস্ এ্যাক্ট পুরোপুরি বাতিল ও বন্দী সাংবাদিকদের মুক্তি দাবী করা হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর (তখন এক ইউনিট চালু ছিল) কালাবাগের নবাব মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দেন। এভাবে সুকৌশলে সরকার দেশব্যাপী সাংবাদিক ধর্মঘটের হুমকির হাত এড়ালেও, তাদের টালবাহানা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে।

এসময়ে উক্ত অর্ডিন্যান্স বলে মোনায়েম সরকার কোনরূপ পত্রিকা এমন কি সাময়িকী প্রকাশের অনুমতি দেন নেই। বারংবার এ নিয়ে আন্দোলন-সত্ত্বেও সরকার স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। অথচ মোনায়েম খানের নিজস্ব পত্রিকা 'পয়গাম' এসময় প্রকাশিত হয়। এভাবে স্বজনপ্রীতি চলে আর সংবাদপত্রের সামান্য স্বাধীনতাকে পদে পদে খর্ব করা হতে থাকে। যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়ায় হুমকি ড্যামোক্লেসের তরবারির মতো সকল সংবাদ-পত্রের উপর ঝুলতে থাকে।

পাকিস্তানের মতো গণতন্ত্রবিহীন একটি দেশে সংবাদপত্রকে প্রতিপদে লড়তে হয়েছে বাক্‌স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে দায়িত্ব যথাযথ পালনের জন্য। কিন্তু একথা মানতে হবে, সরকারী দমননীতি, কথায় কথায় নিরাপত্তা আইনের প্রয়োগ, রাষ্ট্রনীতির অন্যতম স্তম্ভ ভারতদ্বেষিতার মধ্যে সাংবাদিকগণ এক দুরূহ পথ বেছে নিয়েছিলেন—সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য, দেশের জনমতকে পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রতিফলিত করতে এবং সুস্থ জনমত সৃষ্টিতে সংবাদপত্রের ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য। প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস্ অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে সংবাদিকদের ঐতিহাসিক সংগ্রামের যেটুকু সাফল্য লাভ হ'ল তাকে নস্যাৎ করার জন্য ১৯৬৪ সালে 'ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট' গঠন করা হ'ল। বাংলা দেশে 'মর্নিং নিউজ' ব্যতীত আর কোন পত্রিকার মালিককে এতে যোগদানে বাধ্য করা সম্ভব হ'ল না। তাই নিরুপায় হয়ে সরকার প্রেস ট্রাস্টের বাংলা মুখপত্র

'দৈনিক পাকিস্তান' প্রকাশ করলেন। এই প্রেস ট্রাস্ট গঠনের উদ্দেশ্য ছিল জনমত সৃষ্টির সমস্ত উৎস এবং গণসংযোগের প্রচার মাধ্যমকে পুরোপুরি সরকারী মুঠোয় নিয়ে আসা। রেডিও তো সরকারের নির্দেশমত পদে পদে চলে। এখন সংবাদপত্রকে তেমনি পর্যায়ে নামিয়ে আনা। সাংবাদিক ইউনিয়ন সরকারের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, প্রেস ট্রাস্ট বাতিল করার জন্য বারংবার দাবী জানিয়েছে। সভা করে, মিছিল করে, স্মারকলিপি পেশ করে, সরকারের কাছে ডেপুটেশন পাঠিয়ে তাঁরা তাঁদের মনোভাব তুলে ধরেছেন। প্রতিটি গণ-আন্দোলন ও দাবী দাওয়ার আন্দোলনে ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবিগণ ও ট্রেড ইউনিয়ন প্রেস ট্রাস্টের বাতিলের দাবীতে মুখর হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে সকল বড় বড় সংবাদপত্র (একমাত্র 'ডন' ব্যতীত) প্রেস ট্রাস্টে যোগ দেয়। ইফতেখার উদ্দিনের কাছ থেকে কেড়ে আনা প্রোগ্রেসিভ পেপার্স লিমিটেডের 'পশ্চিম পাকিস্তান টাইমস্' (ইংরেজী) ও 'ইমরোজ' (উর্দু) এই ট্রাস্টের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অপর দিকে ১৯৬৩ সালে সরকার এক আইন মারফৎ সমস্ত বিদেশী সংবাদ সরবরাহ সংস্থাকে দেশী সংবাদ সরবরাহ সংস্থার মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশনের নির্দেশ দেন। তাদের সরাসরি সংবাদ পরিবেশন বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইতিপূর্বে আয়ুব সরকার আর্থিক অসচ্ছলতার অভিযোগে পাকিস্তানের একমাত্র বার্তা সরবরাহ সংস্থা এ. পি. পি. কুক্ষিগত করেন। বে-সরকারী বার্তা সরবরাহ সংস্থা পি. পি. আই. পশ্চিম পাকিস্তানী ধনিকগোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত। সুতরাং এভাবে সংবাদ সরবরাহের উৎস নিয়ন্ত্রণ বিদেশী সংবাদ সরবরাহ সংস্থার প্রতি নির্দেশের ফলে পুরো হ'ল। একমাত্র মার্কিন সরবরাহ সংস্থা ইউ. পি. আই. রাজী হয় নি। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস থেকে এ. পি. পি.র সঙ্গে ইউ. পি. আই.র সংবাদবিনিময় সম্পর্কে চুক্তি হয় এবং তখন থেকে ইউ. পি. আই., এ.পি. পি.-র মাধ্যমে পাকিস্তান ও অধিকৃত বাংলাদেশে সংবাদ সরবরাহ করতে থাকে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে এভাবে আয়ুবশাহী সপ্তরথী দিয়ে ঘিরে ফেলে। অপর শক্তিশালী প্রচার মাধ্যমে টেলিভিশনও স্বাভাবিকভাবে রেডিও পাকিস্তানের মতই সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন। সুতরাং সংবাদ সরবরাহের উৎসের উপর কর্তৃত্ব, ন্যাশনাল প্রেস ট্রাস্ট গঠন, প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস্ অর্ডিন্যান্স, সরকারী নির্দেশ মত খবর পরিবেশন ও সরকারী নীতির সমালোচনায় সামান্যতম দুঃসাহস দেখালে পত্রিকাকে ব্ল্যাকলিস্টভুক্ত করে সরকারী বিজ্ঞাপন থেকে

বঞ্চিত করার নীতি—অক্টোপাশের মত সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে চারদিক থেঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলে। ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় আয়ুবের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মিস ফাতেমা জিন্নাহ্‌কে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি পত্রিকা সমর্থন করে। সরকারী ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে সংবাদপত্রের এই ভূমিকা গ্রহণের পেছনে রয়েছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সাংবাদিকদের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম এবং এসময়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের ব্যাপক আন্দোলন।

॥ ৩ ॥

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্য প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস্‌ অর্ডিন্যান্সের কিছুটা সংশোধন সেদিন সাংবাদিকদের জঙ্গী আন্দোলনের মুখে করতে বাধ্য হ'লেও সরকার কখনও চুপ করে ছিলেন না। সম্পাদকদের সঙ্গে এক বৈঠকে (মালিক পক্ষও ছিলেন) সরকার তথাকথিত সংবাদপত্রের নীতিমালা ঘোষণা করলেন। সংবাদপত্রের এই নীতিমালা প্রকৃতপক্ষে সংবাদপত্রের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের পৃষ্ঠে ছুরিকাঘাতের সামিল। সংবাদপত্রের উপর সরকারী হামলার বিরুদ্ধে সাংবাদিক ইউনিয়ন থেকে সংবাদপত্র মালিকদের সঙ্গে সংগ্রাম চালাবার কথা বার বার ঘোষণা করা হয়েছে। এমন কি, এই নীতিমালা প্রবর্তনের জন্য সরকারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে পেশাদার সাংবাদিকগণ একক ঝুঁকি নিতেও রাজী ছিলেন। কিন্তু সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ উক্ত নীতিমালা গ্রহণের ফলে টেলিফোনে সরকারী নির্দেশ জারী করার ক্ষেত্রে সরকারের সাহস বেড়ে যায়। এবং পরোক্ষভাবে অলিখিত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা অধিকতর সহজ হয়। একটা উদাহরণ দিলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। সরকারী প্রচার দফতরের সঙ্গে এক বৈঠকে সম্পাদকগণ সিদ্ধান্ত নেন যে, সাধারণ ধর্মঘটের সময়ে যানবাহন শূন্য রাস্তা কিংবা তালাবদ্ধ দোকানের ছবি প্রকাশ করা যাবে না। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, সম্পূর্ণ সার্থক হরতাল-সম্বন্ধেও রেডিও পাকিস্তান যেখানে সাধারণ ধর্মঘট হয় নি, মাত্র কয়েকটি দোকান বন্ধ ছিল এধরনের প্রচার করতে কখনই কসুর করে নি, সেখানে তালাবদ্ধ দোকানের সারি এবং যানবাহন-শূন্য রাজপথের চিত্র সফল ধর্মঘটের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য বহন করে থাকে। কার্যত সংবাদ প্রকাশের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপের এটি নির্লজ্জ ও অভিনব পন্থা। যা হোক,

সংবাদপত্রের এই নীতিমালা যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য একজন বিচারপতি এবং সম্পাদকদের নিয়ে গঠিত একটি কোর্ট অব অনারের উপর ভার দেওয়া হ'ল। দেখা গেছে যেখানে পত্রিকার মালিকদের ব্যবসাগত ও অপরাপর স্বার্থ (সংবাদ-প্রকাশের স্বাধীনতা ব্যতীত) রয়েছে সেরকম গুরুত্বহীন বিষয় নিয়েই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কোর্ট অব অনার বসেছে। অথচ সরকারী রোষ থেকে কোন সংবাদপত্রকে রক্ষা করতে এই কোর্ট অব অনার একান্ত অক্ষম ছিল।

এরকম অবস্থার মধ্যে ১৯৬৭ সালে দৈনিক 'সংবাদ' পত্রিকার প্রকাশকের নাম পরিবর্তন করে। প্রেস অর্ডিন্যান্সের ধারায় ঠিকানা পরিবর্তনও ছিল নিয়মিত সরকারের অনুমোদন-সাপেক্ষ। এই অনুমোদন শুধু বাঁধা নিয়মের অঙ্গ ছিল না। ইচ্ছে করলে সরকার এই ঠিকানা পরিবর্তনের অজুহাতে একটি পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। দৈনিক 'সংবাদ'-এর উপর মোনায়েম খানের রাগ ছিল প্রচণ্ড। এ সুযোগ তাই তিনি হেলায় হারান নি। ২৩-এ মে (১৯৬৭) এক আদেশবলে তিনি সংবাদের প্রকাশনা বন্ধ করে দিলেন। প্রকাশক পরিবর্তনের অজুহাতকে তিনি অলঙ্ঘনীয় অপরাধ বলে গণ্য করলেন। হাই কোর্ট মামলার রায়ে ২০-এ জুন 'সংবাদ' পুনরায় প্রকাশ হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাংবাদিকগণ প্রতিবাদ সভা ও মিছিল করেন। একে একে ট্রাস্ট-বহির্ভূত পত্রিকা বন্ধ করার জন্য সরকারী চক্রান্ত-সম্পর্কে তাঁরা দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করে দেন। এই একটি মাত্র ঘটনায়ই স্বাধীন সংবাদপত্র-সম্পর্কে আয়ুবশাহীর মনোভাব প্রকাশ পায়। সরকারী নির্দেশেই তাসখন্দ চুক্তি বার্ষিকী সম্পর্কে বাংলাদেশের পত্রিকায় কোনরূপ ফলাও প্রচার সম্ভব হয় নি। অথচ তাসখন্দ চুক্তির পশ্চাতে বাংলাদেশের সমর্থন ছিল। আর পাক-ভারত যুদ্ধের শেষে ১৯৬৬ সালের ১০ই জানুয়ারিতে সম্পাদিত তাসখন্দ চুক্তি এই উপমহাদেশকে এক ব্যাপক যুদ্ধাগ্নির কবল থেকে রক্ষা করে শান্তির পথ উন্মুক্ত করেছিল। সে কথা ইসলামাবাদের শাসকগোষ্ঠী সেদিন স্বীকার করলেও পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মনোভাবকে তাঁরা প্রকাশের সুযোগ দিতেও সম্মত ছিলেন না।

১৯৬৭ সালে আবার নতুন করে সরকার রবীন্দ্র-বিরোধী অভিযানে অবতীর্ণ হন। বাংলাদেশের ভাড়াটে ৪০ জন বুদ্ধিজীবী রবীন্দ্রনাথকে সাম্প্রদায়িক, হিন্দু সংস্কৃতির উপাসক ইত্যাদি বলে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়ে সরকারের রবীন্দ্র-বিরোধী

অভিযানে শক্তি যোগাতে এগিয়ে এলেন। লেখকসংঘ, বি. এন. আর.*এবং বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের দৌলতে প্রাপ্য সরকারী অর্থের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এ সুযোগ তাঁরা ছাড়েন নি। এঁরাই এসময়ে বাংলা বর্ণমালার সংস্কারের জন্য নতুনভাবে আন্দোলন শুরু করলেন। বাংলা উন্নয়ন বোর্ড-এর নেতৃত্বে এই ঢেঁড়স বুদ্ধিজীবীরা তথাকথিত 'বৈজ্ঞানিক' যুক্তি হাজির করলেন। দেশের নিরক্ষরতার জন্য সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা নয়, বাংলা বর্ণমালা দায়ী বলে তাঁরা 'মূল্যবান' প্রবন্ধ রচনা করতে লাগলেন। ১৯৬৭-৬৮ সালে এভাবে বাংলা সংস্কৃতির উপর সুপরিকল্পিত আঘাত হানতে এগিয়ে এসেছে সরকারী আশীর্বাদপুষ্ট ও উচ্ছিষ্টভোজী একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী। দেখা যাবে যে-পরবর্তী সময়ে এসব বুদ্ধিজীবীই ইয়াহিয়া সরকারের ছাত্র শিক্ষক হত্যার পক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন।

শিখণ্ডী বুদ্ধিজীবী-পরিবৃত সরকারের এই বাংলা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযানের প্রতিবাদে আবার সাংবাদিকগণ এগিয়ে এলেন। ১৯৬৮ সালে 'আজাদ'-এ সরকারের পদলেহী এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে এবং তাদের প্রতিটি যুক্তি অকাট্যভাবে খণ্ডন করে খ্যাতনামা সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী বাংলা 'বর্ণমালা সংস্কার না সংহার'-শীর্ষক কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। পাকিস্তান আন্দোলনের মুখপত্র 'আজাদ'-এর এই ভূমিকায় স্বৈরাচারী সরকারও রুষ্ট হ'ল। সরকার 'আজাদ'-এ মালিকানা বিরোধের সুযোগ নেওয়ার জন্য এগিয়ে এলেন। ১৯৬৮ সালের ৭ই ডিসেম্বর মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে লাটভবনের সম্মুখে প্রচণ্ড বিক্ষোভ হ'ল। মোনায়েম খাঁ গভর্নর হয়ে লাটভবনের সামনে বে-সরকারী যানচলাচল ও কোনরূপ মিছিল করা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এই প্রথমবার তাঁর আদেশ অমান্য হতে দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে পত্রিকা অফিসসমূহে টেলিফোনে নির্দেশ দেওয়া হ'ল লাটভবনের সামনে বিক্ষোভের কোন ছবি পত্রিকায় ছাপা চলবে না। 'আজাদ' পত্রিকার মালিক এখানে আশ্চর্য দৃঢ়তা দেখালেন। তিনি সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়ালেন। ফলে সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে লাটভবনের সামনে প্রচণ্ড বিক্ষোভের ছবি 'আজাদ'-এ ছাপা হ'ল। লাটভবন থেকে গুণ্ডা দিয়ে পত্রিকাভবন পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হ'ল; বলা হ'ল, যে, মালিককে অচিরেই বাড়ি-ছাড়া করা হবে। 'আজাদ' পত্রিকায় তৎকালীন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন মওলানা আকরম খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র কামরুল আনাম

খাঁ। এর আগে ১৯৬৮ সালের মাঝামাঝি আয়ুব সরকার বাঙ্গালীদের চিরতরে দমন করার জন্য কয়েকজন বাঙ্গালী সামরিক অফিসার ও পদস্থ কর্মচারীকে জড়িয়ে কুখ্যাত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দাঁড় করান। ২৮ জন ব্যক্তিকে এই মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছিল। কয়েকদিন পর ২৯তম ব্যক্তি হিসেবে কারারুদ্ধ আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে এতে জড়ানো হয় এবং জেলখানা থেকে ক্যান্টনমেণ্টে স্থানান্তরিত করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের চর এ রকম প্রচারণা তাঁর ঐতিহাসিক ৬-দফা পেশের পর সরকার থেকে নানাভাবে নানাছলে প্রচার করে আসা হচ্ছিল। কিন্তু দেশবাসীকে এই মিথ্যা গলাধঃকরণে সরকার সক্ষম হন নি। তাই আগরতলা মামলার সূচনা করা হ'ল। সারা দেশে সরকারের এই ষড়যন্ত্রমূলক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠল। 'আজাদ' পত্রিকায় আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত একজন "আসামীর" উপর অমানুষিক দৈহিক নির্যাতন-সম্পর্কে তাঁর স্ত্রীর একটি বিবৃতি ছাপা হ'ল। এই খবরের ভিত্তিতে বিষয়টি হাই কোর্টে উঠল। সুতরাং 'আজাদ' পত্রিকাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য গভর্নর মোনায়েম খাঁ আসরে নামবেন তা বিচিত্র নয়। ১৯৬৮ সালের ৩১-এ ডিসেম্বর তিনি 'আজাদ'-এর মালিকানা বিরোধে একটা পক্ষ নিয়ে ক্ষমতাসীন ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের উপর গুণ্ডাদের লেলিয়ে দেন। এদিকে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকতে নির্দেশ দেওয়া হ'ল। 'আজাদ'-এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বদরুল আনাম খাঁ (মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর পুত্র) অপহৃত হলেন এবং কামরুল আনাম খাঁকেও অপহরণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা ব্যর্থ হওয়ায় মোনায়েম খাঁর চক্রান্ত সফল হয় নি। এ সময়ে দেশব্যাপী আয়ুব-বিরোধী আন্দোলন প্রচণ্ড রূপ নেয়। আগরতলা মামলার কাহিনী প্রকাশের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের নির্ভীক ভূমিকা আর একবার প্রমাণ করল যে, তাঁরা দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি উদাসীন থাকেন নি। আগরতলা মামলার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড জনমত গড়তে নিঃসন্দেহে সংবাদপত্রের ভূমিকা ছিল অনন্য। যদি সেদিন সংবাদপত্রসমূহ তাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে দেশাত্মবোধের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হত তবে আগরতলা মামলার প্রহসনের মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ যবনিকাপাত হ'ত না। জনসাধারণ সরকার নিয়ন্ত্রিত 'ট্রাস্ট' পত্রিকার ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয় 'মর্নিং নিউজ' ও 'দৈনিক পাকিস্তান' পুড়িয়ে দেয়। 'ট্রাস্ট' বাতিলের দাবীতে জনমত প্রচণ্ড আকার ধারণ করে।

এবার ফিরে আসা যাক্, 'আজাদ' পত্রিকা কব্জা করার জন্য সরকারের ঘৃণ্য ভূমিকার প্রসঙ্গে। ৩১-এ ডিসেম্বরের (১৯৬৮) চাল ব্যর্থ হ'লেও, মোনায়েম খাঁ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ৫ই ফেব্রুয়ারি (১৯৭১) মোনায়েম খানের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় 'আজাদ'-এর মালিকানা বদল হ'ল। হাঙ্গামার সময়ে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ-র জ্যেষ্ঠপুত্র সদরুল আনাম খাঁ-র দ্বিতীয় পুত্র পিয়ারু গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এখানে পরিষ্কার ভাবে একটা কথা স্মরণযোগ্য যে, সাংবাদিক ইউনিয়ন এই মালিকানা বদলের ক্ষেত্রে কোন পক্ষ গ্রহণ নীতিগতভাবে বর্জনীয় বলে বারংবার অভিমত ব্যক্ত করেন কিন্তু একটি পত্রিকার নীতি পরিবর্তনের জন্য এই সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তাঁরা বলিষ্ঠ ভাষায় প্রতিবাদ করেছেন।

১৯৬৯ সালের প্রচণ্ড গণ-আন্দোলনে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এর আলোকচিত্র-শিল্পী মোজাম্মেল হক পুলিশের লাঠিতে গুরুতররূপে আহত হন। পুলিশের এই লাঠি চার্জ আকস্মিক ছিল না। উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে সাংবাদিকদের লাঞ্ছনা করাই সেদিন সরকারের লক্ষ্য ছিল। অভূতপূর্ব গণ-আন্দোলনের মুখে আয়ুবশাহীর পতন হয়। ইতিপূর্বে আয়ুব খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। মামলার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিশ্ববাসীর কাছে ফাঁস হয়ে পড়ে।

১৯৬৯ সালের ২৫-এ মার্চ আয়ুব পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। পাকিস্তানের ইতিহাসে আর একটি প্রাসাদ-চক্রান্ত অলক্ষ্যে অভিনীত হ'ল এবং জেনারেল ইয়াহিয়া খান আবার সামরিক শাসন প্রবর্তন করলেন। আয়ুবের শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করা হ'ল। ইয়াহিয়া পার্লামেন্টারি সরকার গঠন, প্রাপ্তবয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু এসব প্রতিশ্রুতি-সত্ত্বেও সামরিক আইনে রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষ্ক্রিয় করা হ'ল এবং সংবাদপত্রে গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে যেটুকু সংবাদ পরিবেশনের স্বাধীনতা পাওয়া গিয়েছিল তা অপহৃত হ'ল। প্রেস ট্রাস্ট বাতিলের জন্য তাঁর কাছে দাবী জানানো হলে সাংবাদিকদের তিনি বললেন যে, উক্ত আইন বাতিলের ক্ষমতা তাঁর নেই। যে-ব্যক্তি সামরিক বিধিবলে কলমের এক খোঁচায় শাসনতন্ত্র বাতিল করতে পারেন, মন্ত্রিসভা বাতিল করতে পারেন, তাঁর প্রেস ট্রাস্ট-সংক্রান্ত আইন বাতিলের ক্ষমতা নেই, এটা নেহাৎ ছেলেভুলানো কথা। আর একথায় প্রমাণিত হয় যে,

যে-২৪টি পরিবার পাকিস্তান শাসন করেন, তাঁদের একচেটিয়া পুঁজির তিনি থবরদারী করেন মাত্র। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্ম সামরিক জান্টা ও আমলাতন্ত্র এক পবিত্র প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ এটা আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের চরম মুহূর্তে স্পষ্টই প্রতিভাত হচ্ছে। ১৯৭০ সালের সাংবাদিক ধর্মঘটের সময় এটা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে (১৪ই এপ্রিল) দ্বিতীয় বেতন বোর্ড-অনুযায়ী বেতনের নয়া হার ধার্য সাপেক্ষে অন্তর্বর্তী-কালীন সাহায্যের দাবীতে সমগ্র পাকিস্তানে প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে সাংবাদিকগণ ধর্মঘট করেন। ১০ দিন যাবৎ এই ধর্মঘটের কালে রেডিও পাকিস্তান একথা একবারও স্বীকার করেন নি যে, পাকিস্তানে সংবাদপত্রর ধর্মঘট চলছে। সংবাদপত্রের উপর একচেটিয়া পুঁজি ও ট্রাস্টের ভূমিকা সরকারের হস্তকে শক্তিশালী করলেও সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কাছে পত্রিকার মালিকদের নতি স্বীকার করতে হয়েছে। ইতিপূর্বে ২৩-এ ফেব্রুয়ারি (১৯৭০) সংবাদপত্র প্রেস-কর্মচারিগণ ২২ দফা দাবীতে ধর্মঘট করেছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্ম সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই দুটো ধর্মঘটের গুরুত্ব অপরিসীম। পত্রিকার মালিকদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে সরকারের সঙ্গে মালিকের বিশেষ ভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আঁতাত জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এই সংগ্রাম সংবাদপত্র শিল্পে নিযুক্ত সকল শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ করেছে। তাই পরবর্তী সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের সময় সাংবাদিকদের সামরিক বিধি অমান্য করা অধিকতর সহজ হয়েছিল।

সরকারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে এবং জনগণের আন্দোলনে সাংবাদিকগণ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। একটি গণতন্ত্রহীন দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্ম এভাবে সাংবাদিকদের এগিয়ে যাওয়াই ছিল একমাত্র পথ।

১৯৭০ সালের ১৩ই মে ঢাকার শহরতলী পোস্তগোলায় একটি কারখানায় (Jahangir Iron and Metal Works) পুলিশের গুলীবর্ষণে ১০ জন শ্রমিক নিহত হন; আহত হন শতাধিক। বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে একজন ডি. এস. পি. মারা যান ঘটনাস্থলে। পুলিশ গাড়িতে করে কিছু-সংখ্যক হতাহতদের ঢাকা কমিশনার অফিস প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়। এদের হাসপাতালে পাঠানোর পরিবর্তে উক্ত অফিস প্রাঙ্গণেই পুলিশ আহতদের উপর পুনরায় লাঠি চার্জ এবং

মারধোর করতে থাকে। 'দৈনিক আজাদ'-এর আলোকচিত্র-শিল্পী মোহাম্মদ ইস্তেখাব আলম ও 'পূর্বদেশ'-এর মান্নু মুন্সী এই নৃশংসতার ছবি তুলতে এগিয়ে যান। আলমের ক্যামেরাটি পুলিশ কেড়ে নিয়ে ভেঙে ফেলে এবং তাঁকে বেদম ভাবে প্রহার করে। লাঠি চার্জের ফলে আলম সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন, মান্নু মুন্সীকে কিছুক্ষণ আটক রাখা হয় এবং তাঁর ক্যামেরার ফিল্ম নষ্ট করে ফেলা হয়। উদ্দেশ্য সরকারের এই দমননীতির প্রামাণ্য দলিল যেন জনগণের সমক্ষে উদ্ঘাটিত না হয়।

পোস্তগোলায় শ্রমিক হত্যাকাণ্ডের খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ সাংবাদিকগণ অমান্য করেন। এ সম্পর্কে সরকারী ভাষ্যের ও শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে সাংবাদিকগণ এক বিক্ষোভ মিছিল বাইর করেন এবং একদল সাংবাদিক প্রতিনিধি দল তৎকালীন গভর্ণর ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এর প্রতিবিধান দাবী করেন। এভাবে সেদিন সাংবাদিকগণ সক্রিয় ভাবে মেহনতী জনতার আন্দোলনে সামিল হন। উপরের ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও একটি স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর সংগ্রামের মধ্যে কোনরূপ সুস্পষ্ট সীমারেখা টানা চলে না। এরা পরস্পর সম্পৃক্ত।

বাংলাদেশের সাংবাদিকদের ভূমিকাকে খর্ব করার জন্য ৬০ নং সামরিক বিধি ইয়াহিয়া সরকার ১৯৭০ সালে জারী করেন। এই নির্দেশে মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্-সম্পর্কে কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ ও পাকিস্তানের সংহতি-বিরোধী কোন খবর প্রকাশ ও মন্তব্য কঠোর ভাবে দণ্ডনীয় বলে নির্দেশ করা হয়েছে। কার্যত সংবাদপত্রসমূহ যে-নগণ্য স্বাধীনতা ভোগ করত তা এভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

সরকারের বিধি-নিষেধ ও টেলিফোনে অনুরোধ (প্রকারান্তরে আদেশ) উপেক্ষা করেছেন সাংবাদিকগণ বারংবার। ১২ই নভেম্বরের ভয়াবহ সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড়-সম্পর্কে খবর পরিবেশন ও মন্তব্য প্রকাশ কালে সাংবাদিকগণ সরকারী নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন বারংবার। সাংবাদিক সম্মেলন করে সরকারের প্রচার দফতরের কর্মকর্তাগণ এভাবে ছবি ও খবর প্রকাশ প্রচ্ছন্নভাবে নিষেধ করেন এবং পাকিস্তানের বন্ধুদের সম্পর্কে সংযতবাক হওয়ার উপদেশ দেন।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সরকারী প্রচার দফতর-কর্তৃক আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের একথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় অথবা সঠিক ভাবে বলতে গেলে হুমকি দেওয়া হয় যে, দেশে সামরিক শাসন রয়েছে একথা যেন তাঁরা ভুলে না যান।

নির্বাচনোত্তর কালে ইয়াহিয়া ভুট্টো চক্রের গণপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে অসহযোগ আন্দোলনকালে (১ লা মার্চ—২৫-এ মার্চ, ১৯৭১) সাংবাদিকগণ দ্বিধাহীনচিত্তে নির্ভীক ভাবে সাড়া দিয়েছেন। সরকারী ভ্রূকুটি আর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেছেন তাঁরা। বাংলার সাংস্কৃতিক স্বাধিকার অর্জন ও মুক্তিসংগ্রামে সর্বশ্রেণীর জনতার উত্তাল আন্দোলন নিঃসন্দেহে সাংবাদিকদের এই ভূমিকা-গ্রহণকে সহজ করেছে। কিন্তু বিভিন্ন সংবাদপত্রের পৃথক পৃথক নীতি-সত্ত্বেও সাংবাদিকগণ এ সংগ্রামের সঙ্গে ঐকাত্ম্য ঘোষণা করে নিজেদের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পেশাদার ভূমিকা পালন ছাড়াও তাঁরা-যে সংগ্রামী জনতার অবিচ্ছেদ অংশ তার প্রমাণ দিয়েছেন।

২৫-এ মার্চ রাত্রির অন্ধকারে ইয়াহিয়ার হুন বাহিনী নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল। নিরস্ত্র ঘুমন্ত বাংলার বুকে শুরু হ'ল হত্যা, ধ্বংসের তাণ্ডব লীলা। বর্বর বাহিনী আগুন দিল স্কুল ঘরে বস্তিতে প্রাসাদে আর কুটিরে। তাদের প্রথম লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে নির্মূল করা। তাই ছাত্র আর শিক্ষকদের হত্যা করা হ'ল প্রথম রাত্রিতেই।

পরদিন ২৬-এ মার্চ। মিছিলের নগরী, প্রতিবাদের নগরী, শতসংগ্রামে অভিজ্ঞ গর্বিত নগরী ঢাকা জ্বলছে দাউ দাউ করে। বিকাল তিনটার দিকে গোলা-বর্ষণ করে পাক-সৈন্য ধ্বংস করল 'ইত্তেফাক' অফিস। পঁচিশ তারিখ রাত্রেই তারা পুড়িয়ে দিয়েছে ইংরাজী দৈনিক 'দি পিপল্‌স্'। মারা গেলেন কয়েকজন সাংবাদিক আর সংবাদপত্রের কর্মচারী। 'আজাদ' পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার হেলালুর রহমান চিশ্‌তি ইকবাল হলে প্রাণ দিলেন পাক বর্বর বাহিনীর গুলীতে রাত ১১টার দিকে। প্রেস ক্লাবের লাউঞ্জ বর্বর বাহিনীর মর্টারের গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত হয়। প্রবীণ সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ আহত হলেন।

৩০-এ মার্চ দৈনিক 'সংবাদ' পাক-বাহিনীর গোলায় বিধ্বস্ত হ'ল। প্রাণ

দিলেন প্রবীণ সাংবাদিক শহীদ সাবের। বহুদিন যাবৎ তিনি মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগে ভুগছিলেন।

এভাবে সংবাদপত্র জ্বালিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে ইয়াহিয়াশাহীর স্বরূপ ধরা পড়ল সমগ্র বাঙ্গালীর কাছে। এত করেও জঙ্গীশাহী স্তব্ধ করতে পারে নি বাঙ্গালীর কণ্ঠ। কবির ভাষায় বলা চলে :

"জিহ্বা তো দিয়েছি
শৃঙ্খলের প্রতিটি আংটায়।"

২৬-এ মার্চ সংবাদপত্রের উপর প্রি-সেন্সরশিপ আরোপ করা হ'ল। সংবাদপত্রগুলো আজ সরকারী প্রেস নোটে পরিণত। 'পাকিস্তান অবজার্ভার'-এর মালিক হামিদুল হক চৌধুরী শেখ মুজিবুর ইয়াহিয়া বৈঠকের সময় (১৬ই মার্চ থেকে ২১-এ মার্চ) গোপনে ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করেন। এভাবে একটি বাঙ্গালী মালিকানাধীন সংবাদপত্র আজ স্বেচ্ছায় ইয়াহিয়ার গণহত্যার সমর্থনে এগিয়ে এসেছে। সামরিক বাহিনীর গোলার আঘাতে বিধ্বস্ত দৈনিক 'ইত্তেফাক' আজ তাদেরই কৃপালাভে নিজেকে ধন্য মনে করছে। এভাবে সংবাদপত্রের মালিকগণ বন্দুকের নলের মুখে নয়—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নিজেরাই জঙ্গীশাহীর গুণকীর্তনে এগিয়ে এসেছেন। সংবাদপত্রের নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকারের কাজে পত্রিকা মালিকদের আত্মসমর্পণের পিচ্ছিল পথে অগ্রসর হওয়ার পরিণতি আজ চরমে পৌঁছেছে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পেশাদারী কর্তব্য পালন করেই অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের জন্য সংগ্রাম করেই সাংবাদিকদের দায়িত্ব শেষ হয় না। আর তা যে শেষ হয় নি তার প্রমাণ এই সংগ্রামের ক্ষেত্রে একজন সৈনিকের মতই সাংবাদিকগণ নিজেদের স্থান বেছে নিয়েছেন সাড়ে সাত কোটি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাঙ্গালীর পাশে। আরামের শয্যাতল ছেড়ে তাঁরা বেরিয়ে এসেছেন। দগ্ধতাম্র দিগন্তের হাতছানি তাঁদের শঙ্কিত করে নি। আজ লক্ষ লক্ষ ঘরছাড়া মানুষের কাফেলায় এসে তাঁরা অনিশ্চিত জীবনকে বরণ করে নিয়েছেন। বিশ্বের বিবেকের কাছে সংগ্রামী বাংলার, রক্তস্নাত বাংলার আশা আর আর্তনাদকে তুলে ধরেছেন। জল্লাদ ইয়াহিয়ার বর্বরতার কাহিনী প্রকাশ করতে এগিয়ে এসেছেন কর্তব্যের ডাকে—শুধুমাত্র পেশাগত দায়িত্ব পালনের চরিতার্থতা অর্জনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে নয়।

মুক্তিযুদ্ধের প্রচ্ছদপট : সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম

অতীতে ঔপনিবেশিক শাসনের আমলে,—স্বাধীনতা সংগ্রামে এই উপমহাদেশে জাতীয় সংবাদপত্রগুলো যে-ভূমিকা পালন করেছে আজকে মুক্তিসংগ্রামে লিপ্ত বাংলাদেশের সাংবাদিকগণ পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন আর শোষণের বিরুদ্ধে, নির্মম গণহত্যার বিরুদ্ধে তাঁদের সেই সংগ্রামী ভূমিকা অব্যাহত রেখেছেন। একটি স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক দেশ ব্যতীত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অর্থহীন। একথা সাংবাদিকরা শিখেছেন তাঁদের সংগ্রামী অভিজ্ঞতা থেকে।

বাংলাদেশে সাংবাদিকগণ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য যে-সংগ্রাম চালিয়েছেন তা যেমন গণ-আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, তেমনি গণসংগ্রাম আর জাতীয় গণ-অভ্যুত্থান সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সংগ্রামকে বার বার পথ দেখিয়েছে। আন্দোলনের এই দু'টি ধারা কখনও সমান্তরাল চলেছে, কখনও বা একটি অবিচ্ছিন্ন বেগবতী ধারায় পরিণত হয়েছে। আজ এই প্রবাহ এসে মিশেছে উদ্বেলিত মুক্তিসাগরের মোহনায়।

বাংলাদেশ ঃ অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত

—মতিলাল পাল

॥ ১ ॥

বাংলাদেশের মুক্তি-আন্দোলনের পটভূমিকা পর্যালোচনা করতে গেলে তার সামগ্রিক রূপটি তুলে ধরাই বাঞ্ছনীয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা ও সংস্কৃতি—এইসব পরস্পর-আশ্রয়ী উপাদানগুলির সম্মিলিত ফলশ্রুতি আজকের এই আন্দোলন। এই সঙ্কলনের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দিকগুলি বিশ্লেষণ করে পূর্ণ সঙ্কলনটিতে সেই সামগ্রিক চিত্রটি দেখাবারই প্রয়াস হয়েছে। বর্তমান নিবন্ধের আলোচ্য অর্থনৈতিক পটভূমিকা। কিন্তু অন্যান্য উপাদানগুলি অর্থনীতিকে প্রভাবিত করেছে এবং একই সময়ে প্রভাবিত হয়েছে, সে-সত্যটি স্মরণ রাখতে হবে।

অর্থনৈতিক দিকটি বিশেষভাবে বিবেচ্য, তার কারণ, বাংলার মানুষের বিক্ষোভ যে-কয়টি মূল কারণে দানা বেঁধে উঠেছে, অর্থনৈতিক বৈষম্য তার মধ্যে অন্যতম, হয়তো প্রধানতম। গূঢ় তত্ত্বগত আলোচনা সাধারণ মানুষ গ্রহণ করে না, কিন্তু কয়েকটি সহজ তথ্য এবং তার উপরে ভিত্তি করে সুবোধ্য তত্ত্ব সাধারণ মানুষকে উজ্জীবিত করে। অর্থনীতিবিদ্ তাদেরকে পরিবেশন করেছে সেই সহজ তথ্যগুলি এবং সহজবোধ্য ভাষায় বুঝিয়েছে বৈষম্যের মূল কথাটি। এতদিন সাধারণ মানুষ যা উপলব্ধি করেছে নিজেদের অভিজ্ঞতায়; অনুভব করেছে নিজেদের মনে, তারই মূলসূত্রটি স্পষ্ট করে তুলে ধরেছে অর্থনীতিবিদ্। ফলে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের রূপ দেবার পথ হয়েছে সুগম।

বাংলার পাটচাষী তুলে দিয়েছে তার সোনালী আঁশ অবাঙ্গালী ব্যবসায়ীর প্রতিনিধির হাতে। একটা মূল্য সে পেয়েছে, কিন্তু তার আশা থেকে যেতো, আরো একটু বেশী যদি সে পেতো। যখন অর্থনীতিবিদ্ জানালো সেই বেশীটা সত্যি সত্যি আয় হচ্ছে তার ফলানো পাট থেকে, কিন্তু সেটা পাচ্ছে অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী অথবা অবাঙ্গালী শিল্পপতি, তখন পাটচাষী বিক্ষুব্ধ হয়েছে। পূর্ব

বাংলার মানুষ তার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলি কিনেছে চড়া দামে এবং দিনের পর দিন সে দাম বেড়েই চলেছে, সে ক্ষুব্ধ হয়েছে। অর্থনীতিবিদ যখন তাকে জানালো চড়া দামের পেছনে লুকানো রয়েছে কার চড়া লাভের অংশ, তখন তার ক্ষোভকে পরিচালিত করা গেছে সংগ্রামের পথে। সে হয়তো কোনদিন চোখে দেখে নি তার শোষককে, কিন্তু সে জেনে গেছে এই শোষণ-মুক্তির জন্যে সংগ্রাম করতে হবে কার বিরুদ্ধে। দরিদ্র দেশের মানুষ তার বিত্তহীনতাকে স্বীকার করে নিয়ে হয়তো ঝিমিয়ে পড়তো, কিন্তু যখন সে দেখলো দরিদ্র দেশেরই মধ্যে একটা গোষ্ঠী, একটা অঞ্চল তার থেকে ভাল খেয়ে-পরে থাকছে এবং দিন-দিন ফারাকটি বেড়েই চলেছে, তখন তার মনে প্রশ্ন জেগেছে, কেন এটা হয়? সরকার সমগ্র দেশেরই সরকার, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্য হবে সমগ্র দেশেরই জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন—এই সাধারণ নৈতিক তত্ত্বটি থেকে বিচ্যুতি কেন ঘটছে সরকারের সেটা প্রশ্ন জেগেছে জনসাধারণের মনে। Social Welfare Function-এ সব মানুষের welfare কেন সমান weightage পাবে না, একটি গোষ্ঠী বা একটি অঞ্চল কেন সরকারের পক্ষপাতে পাল্লা ভারী করে থাকবে, সে প্রশ্ন বাংলার মানুষকে পীড়া দিয়েছে। এমনও যদি হোত যে, যে-অঞ্চলটি পাল্লা ভারী করছে সে-অঞ্চলটি তার নিজস্ব বিত্ত-বলেই তা করছে, তাহলেও নৈতিক প্রশ্ন জাগে, একই জাতিভুক্ত একই দেশের অংশ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অঞ্চলটি কি সেই বিত্তের ভাগ দাবী করতে পারে না? অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলগুলি কি চিরকালই পিছিয়ে থাকবে? জাতীয় সম্পদ কথাটিই তাহলে ভিত্তিহীন—আঞ্চলিক সম্পদ যদি কেবল আঞ্চলিক আয় বৃদ্ধির উপায় হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

এর পরে যখন জানা যায়, যে-সম্পদের বলে অঞ্চলটির এত বাড়, তার বেশ কিছুটা প্রকৃতপক্ষে অন্য অঞ্চলটি থেকে লুটে আনা, তখন সমগ্র ব্যাপারটি ধরা দেয় অন্য আলোকে। বঞ্চিত অঞ্চল তখন প্রশ্ন করে—আমাদের সম্পদ তোমাদের কাছে ছেড়ে দেব কেন? এর একটা অর্থনৈতিক উত্তর খাড়া করা যায় এবং সে উত্তরে সন্তুষ্ট হয়েছে পশ্চিমের (পাকিস্তান এবং বিশ্বের) ধামাধরা একদল বিশেষজ্ঞ: তোমাদের সম্পদ আমরা তোমাদের চাইতেও সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগাতে পারবো এবং এতে আজকের ও আগামী দিনের জাতীয় আয় বাড়তে থাকবে বর্ধিত হারে। বঞ্চিত অঞ্চল দাবী করে—আজকের

বর্ধিত জাতীয় আয় থেকে আমাদের কিছু দাও, এটা তো আমাদেরই প্রাপ্য। উত্তর আসে : বর্ধিত অংশটুকু যদি তোমরা ভোগ করেই ফেল তাহলে আগামী দিনের বাড়তি আয় আসবে কোথা থেকে ? তার চাইতে ভবিষ্যতে যেন আরো বেশী আয় হয় সেজন্যে কাজে লাগাবো আমরা এই আয়কে, আর জানোই তো, তোমাদের চাইতে আমরা সুষ্ঠুতরভাবে কাজে লাগাতে পারি অর্থনৈতিক সম্পদ, অতএব ভবিষ্যতের খাতিরে এই আয়টুকু আমাদের কাছেই থাক।

বাংলার মানুষ সেই ভবিষ্যতের জন্যে অপেক্ষা করেছে অনেক বৎসর। দীর্ঘ তেইশ বছর কালে নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছে ভবিষ্যতের সোনালী ছবি দেখে দেখে। ধীরে ধীরে তারা জানতে পারলো, সব ভুয়ো। ভবিষ্যতের সেই সোনালী দিনটি আসবে না কখনই ; শুধু তাই নয়, 'তোমাদের চাইতে আমরা সম্পদ কাজে লাগাতে পারি সুষ্ঠুতরভাবে (marginal productivity of capital is higher in West Pakistan)', সেটা পুরোপুরি সত্যি নয়, 'আজকের আয়কে আমরা ভবিষ্যতের আয়ের জন্যে কাজে লাগাবো বেশী (saving propensity is higher in the richer region, i.e., West Pakistan)' সেটাও মিথ্যে। এমন কি যে-প্রাথমিক বিত্তশালিতার ভিত্তির উপরে এই যুক্তির স্তম্ভটি দাঁড়িয়ে আছে (West Pakistan utilizes resources more efficiently because it has a more developed infra-structure), সেটাও লুণ্ঠিত প্রস্তর দিয়ে তৈরী।

এই প্রবঞ্চনার সত্যটি যখন উদ্ঘাটিত হোল, তখন অন্য কোন লাভের আফিম খাইয়ে বাঙ্গালীকে আর ঘুম পাড়িয়ে রাখা গেল না। অর্থের প্রশ্নটি যখন সামনে এসে দাঁড়ালো, ধর্মের বাঁধন তখন গেল টুটে, 'এক জাতি, এক প্রাণ, একতা'র মোহটাকে ভেঙে নব-জাতীয়তায় মোক্ষ সন্ধান করলো বাঙ্গালী। উদ্দীপ্ত হোল বাংলার মুক্তি-আন্দোলন।

॥ ২ ॥

অর্থনৈতিক বৈষম্যের সুস্পষ্ট চিত্রটি ফুটে ওঠে মাথাপিছু আয়ের অঙ্কে। পাকিস্তান-সৃষ্টির সময়কার কোন তথ্য সুপ্রাপ্য নয়। তবুও পরোক্ষ তথ্যাদি বিচার করলে মনে হয়, সে সময়ে পাকিস্তানের দুই অংশের মাথাপিছু আয়ে তেমন পার্থক্য ছিল না। ১৯৪৯-৫০ সনেও মাত্র পঁচিশ টাকা বেশী ছিল

পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়। কিন্তু তার পরের কাহিনী শোচনীয়। ১৯৫৯-৬০ পর্যন্ত বাংলাদেশের মাথাপিছু আয়ের absolute level-ই কমে গেছে। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে তা উত্তরোত্তর বেড়েছে। পাকিস্তান-সৃষ্টি হবার ১৩ বছর পরে তার স্বাধীন দেশে, তার নিজের দেশে একজন সাধারণ বাঙ্গালী বছরে গড়পড়তা যা আয় করতো, ইংরেজের শোষণের যন্ত্রে পিষ্ট হয়েও ১৯৪৭ সনে তার চেয়ে বেশী আয় করতো সে। ১৯৬৪-৬৫-তে absolute level অবশ্যি বেড়েছে, কিন্তু দিন দিন পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে তফাৎটা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাধীনতার সময়ে দু'টি অঞ্চলের সাধারণ মানুষ আয়ের দিক থেকে ছিল প্রায় সমান, সরকারী উদ্যোগে একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পার হয়ে যাবার পর বাংলাদেশ পিছিয়ে রইলো শতকরা ২৩ ভাগ, দু'টি পরিকল্পনার পরে সে ফারাক দাঁড়ালো শতকরা ৩০ ভাগ, আর তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ দিকে আরো বেড়ে গিয়ে হোল শতকরা ৩৪ ভাগ। তিন তিনটে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলে যাবার পরেও বৈষম্য কমা তো দূরে থাক, বরং বাড়তে থাকলো ; তখন একজাতীয়তার বুলিগুলি একটু ফাঁকা শোনায় না কি? নীচের Table-এ বিভিন্ন বৎসরে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ দেয়া হোল ১৯৫৯-৬০ সনের মূল্য-সূচকের (price-index) ভিত্তিতে।

মাথাপিছু আয়

সাল	বাংলাদেশ (টাকা)	পশ্চিম পাকিস্তান (টাকা)	বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কত পিছিয়ে রইল %
১৯৪৯-৫০	৩০৫	৩৩০	৯
১৯৫৪-৫৫	২৯৮	৩৫৬	১৭
১৯৫৯-৬০	২৮৮	৩৭৩	২৩
১৯৬৪-৬৫	৩২৭	৪৬৪	৩০
১৯৬৭-৬৮	৩৫২	৫৩০	৩৪

Source : Gustav *Papanek Pakistan's Development, Social Goals & Private Incentives,* Harvard University Press, Cambridge, Mass., Appendix Table 5A.
Economic Survey of Pakistan 1968-69. Ministry of Economic Affairs, Government of Pakistan.

॥ ৩ ॥

আয়ের বৈষম্য এভাবে গড়ে উঠেছিল দিন দিন, তার কারণ সম্পদের (resource endowment) বৈষম্য নয়। বরং এটা গড়ে তোলা হয়েছিল বাংলাদেশকে তার প্রাপ্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে, বাংলাদেশের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করে। এই প্রবঞ্চনার নায়ক একদিকে সরকার, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলি।

অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিতে সরকারের ভূমিকার হদিস মেলে উন্নয়ন খাতে সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ থেকে। পাকিস্তান মূলধনের দিক দিয়ে দরিদ্র। তার নিজস্ব সঞ্চয় সামান্য। বৈদেশিক সাহায্য যোগ দিয়েও পাকিস্তানের বিনিয়োগ-যোগ্য সম্পদ স্বল্প। সেই স্বল্প সম্পদের প্রাপ্য অংশ থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করে পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নে সরকার দেখিয়েছে নিদারুণ পক্ষপাতিত্ব। জনসংখ্যায় গরিষ্ঠ হয়েও (শতকরা ৫৫ ভাগ) বাংলাদেশ উন্নয়ন খাতে পেয়েছে অর্ধেকেরও অনেক কম অংশ। ১৯৫০-৫১ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সনে সে অংশ ছিল সব চাইতে কম—শতকরা মাত্র ২০ ভাগ। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৩৬ ভাগে। বৈষম্য দূরীকরণের জন্যে বেশী অংশ তো দূরে থাক্ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্য অংশও আসে নি বাংলাদেশের ভাগ্যে—তিন তিনটে পরিকল্পনা পার হয়ে যাবার পরেও। সরকারী বিনিয়োগের হার অবশ্যি বেড়েছে—১৯৫০-৫৫-তে ছিল শতকরা ২৫ ভাগ, ১৯৬৫-৭০-এ তা হয়েছে শতকরা ৪৫ ভাগ। কিন্তু এগুলি হোল কাগজে-কলমে বরাদ্দ করা। সত্যিকারের কাজে লেগেছে এর চাইতেও কম অংশ। কেননা, দেড় হাজার মাইল দূরের কেন্দ্রীয় সরকারের সহস্র বাধানিষেধের বেড়া ডিঙিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে টাকা খাটানো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। আর সে বাধানিষেধগুলি যখন বিশেষ করে একটি অঞ্চলের ক্ষেত্রে কঠোরতর ভাবে প্রয়োগ করা হয়। কাগজে-কলমে পরিমাণ বেশী না দেখালে জনসাধারণ সহজে জেনে যাবে সরকারী পক্ষপাতিত্বের কথা এবং বিক্ষোভ বেড়ে উঠবে, এমন কি সাহায্যদানকারী দেশগুলিও চোখ রাঙাবে। কাগজের বরাদ্দ বাস্তবে আটকে দিতে কতক্ষণ! টাকা আনবার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের অনুমতির মুখ চেয়ে থাকতে হয় প্রাদেশিক সরকারকে। আর পাকিস্তান সরকারের তেইশ বছরের আমলে একজন বাঙালীও আসীন হয় নি অর্থমন্ত্রী বা অর্থ দপ্তরের Secretary-র পদে। কাগজে-কলমে

বরাদ্দ দেখিয়ে সাপও মরলো, লাঠিও ভাঙলো না। জনসাধারণ এবং বিদেশীরা চুপ রইলো, ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে যা টাকা ঢালবার তাও নির্বিঘ্নে ঢালা গেল। আরো কারচুপি আছে এইসব অঙ্কের খেলায়। Indus Basin Replacement Works নামে এক ময়দানবী উদ্যোগ সরকার নিয়েছেন পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে। সিন্ধুনদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ব্যাপ্ত করে অনেকগুলি সেচ, বিদ্যুৎ, বন্যানিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা রয়েছে এর ভেতরে। পুরো ব্যাপারটাই ঘটছে পশ্চিম পাকিস্তানে। তবুও জাতীয় আয় বাড়বে এ ধরনের এক অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়ে সরকার বললেন—এ খাতে যে-ব্যয় হবে সেটা ঠিক পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় বলা চলে না, এটা সমগ্র পাকিস্তানের ব্যাপার। অতএব আঞ্চলিক বিনিয়োগের কাগুজে অঙ্কগুলি থেকেও একে বাদ দেওয়া হোল। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে না চাপিয়ে যদি ঠিকমত গণনা করা যায় তাহলে পূর্বোল্লিখিত শতকরা ভাগগুলি নেমে যাবে আরো নীচে (আমাদের পর পৃষ্ঠার Table-এর অঙ্কগুলি অবশ্য Indus Basin Project-এর ব্যয়ের অর্ধেক পশ্চিম পাকিস্তানে ধরে করা হয়েছে)।

অন্যদিকে বেসরকারী বিনিয়োগের চিত্রটি তো আরো করুণ। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কালেও শতকরা মাত্র ২৫ ভাগের বেশী আসে নি বাংলাদেশের অংশে। পর পৃষ্ঠার Table-এ দুই অঞ্চলে উন্নয়নখাতে ব্যয়ের হিসেব দেওয়া হোল।

বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নয়নখাতে ব্যয়

(কোটি টাকায়)

সাল	মোট পরিকল্পনাধীন ব্যয় মোট	সরকারী	বেসরকারী	পরিকল্পনার বাইরে ব্যয়	মোট উন্নয়ন খাতে ব্যয়	মোট ব্যয়	সমগ্র পাকিস্তানে উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের শতকরা অংশ
বাংলাদেশ							
১৯৫০-৫১/১৯৫৪-৫৫	১০০	৭০	৩০		১০০	২৭১	২০
১৯৫৫-৫৬/১৯৫৯-৬০	২৭০	১৯৭	৭৩		২৭০	৫২৪	২৬
১৯৬০-৬১/১৯৬৪-৬৫	৯২৫	৬২৫	৩০০	৪৫	৯৭০	১৪০৪	৩২
১৯৬৫-৬৬/১৯৬৯-৭০	১৬৫৬	১১০৬	৫৫০		১৬৫৬	২১৪১	৩৬
পশ্চিম পাকিস্তান							
১৯৫০-৫১/১৯৫৪-৫৫	৪০০	২০০	২০০		৪০০	১১২৯	৮০
১৯৫৫-৫৬/১৯৫৯-৬০	৭৫৭	৪৬৪	২৯৩		৭৫৭	১৬৫৫	৭৪
১৯৬০-৬১/১৯৬৪-৬৫	১৮৪০	৭৭০	১০৭০	২৩১	২০৭১	৩৩৫৫	৬৮
১৯৬৫-৬৬/১৯৬৯-৭০	২৮১০	১২১০	১৬০০	৩৬০	৩১৭০	৫৩৯৫	৬৪

Source: Report of Advisory Panels for the Fourth Five-Year Plan, Volume I, Planning Commission, Government of Pakistan, July, 1971.

সরকারী ব্যয়ের ব্যাপারটা আরো একটু তলিয়ে দেখা যাক। বিভিন্ন কর বাবদ সরকার জনসাধারণ থেকে যে-অর্থ তুলে নেয়, তা ব্যয়িত হবার কথা জনসাধারণেরই মঙ্গল-উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেখানে লক্ষ করবার বিষয় হোল কোথাকার জল কোথায় গিয়ে গড়ায়। কোন্ অঞ্চল থেকে কত অর্থ সংগৃহীত হচ্ছে এবং কোন্ অঞ্চলে কত অর্থ ব্যয়িত হচ্ছে, তার হিসেব থেকেই স্পষ্ট হবে সরকারী বাজেটের পথ ধরে অপসৃত হচ্ছে কত সম্পদ কোন্ অঞ্চল থেকে। নীচের Table-টিতে ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত দেশের দুই অংশের রাজস্ব খাতে আয় ও ব্যয়ের তথ্য দেওয়া হচ্ছে।

রাজস্ব খাতে আয়-ব্যয় (কোটি টাকায়)

	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
ক. **আয় :**		
১। কেন্দ্রীয় সরকারের কর বাবদ	৪৭০.৫	১৩০৪.৪
২। প্রাদেশিক সরকারের কর বাবদ	২৫৮.০	৪৭৭.৩
৩। মোট	৭২৮.৫	১৭৮১.৭
খ. **ব্যয় :**		
১। রাজস্ব খাতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মিলিত ব্যয়	৪৮৪.৯	১৬৫৯.৫

Source : Rehman Sobhan, *The Balance Sheet of Disparity,* The Forum, 14 Nov., 1970.

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, বৈদেশিক বাণিজ্য শুল্ক, আবগারী শুল্ক, বিক্রয় কর এবং আয় কর প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের কর বাবদ এবং প্রাদেশিক সরকারের রাজস্ব খাতে বাংলাদেশ জমা দিয়েছে ৭২৮ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশে ব্যয় করবার জন্যে পেয়েছে ৪৮৫ কোটি টাকা কেন্দ্র এবং প্রদেশের সরকার থেকে। বাকী ২৪৩ কোটি টাকা রয়ে গেল সরকারের হাতে। সে টাকাটার কি হোল, পরে আসছি সে প্রসঙ্গে। রাজস্ব খাতে যে-ব্যয় করা হয়, তাতে জনসাধারণের আয়ের পথ খোলা হয় এবং তার থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে। বাংলাদেশের যা সাধ্য ছিল, তার চাইতে অনেক কম হয়েছে আয় এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সংবিধান।

সরকারী ব্যয়ের অন্য অংশটি হোল উন্নয়ন খাতে। একই সময়ে উন্নয়ন খাতে বাংলাদেশে ব্যয়িত হয়েছে ৮৫১ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১১০৮

কোটি টাকা। রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে সরকারের মিলিত ব্যয় হয়েছে ১৩৩৬ কোটি টাকা বাংলাদেশে এবং ২৭৬৭ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে। অতএব বাংলাদেশের ঘাটতি দাঁড়ালো ৬০৮ কোটি টাকা। পশ্চিম পাকিস্তানের ঘাটতির পরিমাণ ৯৮৫ কোটি টাকা।

এই ঘাটতি পূরণ হয়েছে প্রধানত বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে এবং মুদ্রাস্ফীতিজনিত আয় (inflationary finance) থেকে। ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৮-৬৯ এর মধ্যে পাকিস্তান বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছে প্রায় ১২৯৫ কোটি টাকা। মোট ১৫৯৩ কোটি টাকা ঘাটতির বাকীটুকু পূর্ণ হয়েছে মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে।

সরকারী ও বেসরকারী সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে জানা যায়, বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ পড়েছে বাংলাদেশের ভাগ্যে। সে হিসেবে বাংলাদেশের ৬০৮ কোটি টাকা ঘাটতির মধ্যে ৩৮৮ কোটি টাকা এসেছে বৈদেশিক সাহায্য থেকে, বাকী ২১৮ কোটি টাকা বা ঘাটতির ৩৬% পুরিয়ে দিতে হয়েছে মুদ্রাস্ফীতির ভার বহন করে। পশ্চিম পাকিস্তান কিন্তু ৯০৬ কোটি টাকা বা ঘাটতির ৯২% ভাগ পূর্ণ করেছে বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে। ঘাটতির মাত্র শতকরা ৮ ভাগ বহন করেছে ঐ অঞ্চল মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে।

নীচের Table-এ এই তথ্যগুলি পরিবেশিত হোল।

আয়-ব্যয়ের হিসাব (১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৮-৬৯)

(কোটি টাকায়)

	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
ক. রাজস্বখাতে আয়	৭২৮'৫	১৭৮১'৭
খ. ব্যয়		
১। রাজস্ব খাতে	৪৮৪'৯	১৬৫৯'৫
২। উন্নয়ন খাতে	৮৫১'৩	১১০৭'৬
৩। মোট ব্যয়	১৩৩৬'২	২৭৬৭'১
গ. ঘাটতি	৬০৭'৭	৯৮৫'৪
ঘ. ঘাটতি পূরণ		
১। বৈদেশিক সাহায্য	৩৮৮'৫	৯০৬'৫
২। মুদ্রাস্ফীতি	২১৮'২	৭৮'৯

Source : Rehman Sobhan. *Op. Cit.*

অতএব রাজস্ব খাতে আয়-ব্যয়ের যে-আংশিক চিত্রটি পূর্বে তুলে ধরা হয়েছিল, তার থেকে এগিয়ে যদি আয়-ব্যয়ের দিকটায় সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করি, তাহলে দেখতে পাই দেশের দু অঞ্চলেই আয় থেকে ব্যয়ের পরিমাণ বেশী, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের বেলায় ঘাটতির পরিমাণ অধিকতর। সে বাড়তি ঘাটতির রসদ জুগিয়েছে বাংলাদেশ দুভাবে—বৈদেশিক সাহায্য থেকে তার যা প্রাপ্য অংশ ছিল, তার থেকে বেশ কিছুটা পশ্চিম পাকিস্তানকে দান করেছে বাংলাদেশ ; উপরন্তু মুদ্রাস্ফীতিজনিত চাপও সহ্য করেছে বেশী। ১৯৬৪-৬৫ থেকে ১৯৬৮-৬৯-এর মধ্যে বাংলাদেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩০ ভাগ, পশ্চিম পাকিস্তানে মাত্র ১৬ ভাগ। দেশের শতকরা ৫৫ ভাগ জনসংখ্যা যে-অঞ্চলটিতে, সে অঞ্চল বৈদেশিক সাহায্যের অংশ পেয়েছে মাত্র শতকরা ৩০ ভাগের।

সরকার প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশকে তার প্রাপ্য অংশ থেকে কিভাবে বঞ্চিত করেছে এবং বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দিয়েছে দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির ভার, তার চিত্রটি দেখা গেল। সরকারী নীতির ফলে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ কিভাবে লুণ্ঠিত হয়েছে তার কথায় আসা যাক।

পাকিস্তানের আর্থনীতিক কাঠামো সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের সমন্বয়ে গঠিত। দেশের অর্থনীতিকে অগ্রসরতার পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সরকার প্রণয়ন করেছে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি। ১৯৪৭ সনে পাকিস্তান যখন তার রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক জীবন শুরু করে, পাকিস্তানে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্প ছিল না এবং শিল্পের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগও ছিল সামান্য। প্রাথমিক এই অনগ্রসরতার দরুন বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এবং তখন থেকেই সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা বজায় রেখে আসছিল। সরকারী উদ্যোগে শিল্প-প্রতিষ্ঠা তো হয়েছিলই, তা ছাড়াও রাস্তা-ঘাট তৈরী, বিদ্যুৎসরবরাহ, আরো নানা ধরনের উদ্যোগ যাতে অর্থনীতির infra-structure গড়ে ওঠে, সে ধরনের উদ্যোগগুলি সরকারই হাতে নেয়। তদুপরি, যে-সব ক্ষেত্রে বেসরকারী entrepreneurship কাজ করতে থাকে, সে-সব ক্ষেত্রেও সরকার বিভিন্ন ধরনের নীতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করে। শিল্পের ক্ষেত্রে industrial licensing নীতি এগুলির অন্যতম। ১৯৫৯ সনে এবং তার পরে ১৯৬৭ সনে Industrial Investment Policy

ঘোষণা করে সরকারী নিয়ন্ত্রণ-নীতিগুলি সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ প্রবাহিত হবে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাধীনে পাঁচ বৎসরে কতখানি বিনিয়োগ করা যাবে সে-সব ক্ষেত্রে, কোন্ কোন্ শিল্পপতিকে সুযোগ দেওয়া হবে শিল্পপ্রতিষ্ঠার, বিদেশ থেকে কি পরিমাণে কলকব্জা ও কাঁচা মাল তারা আমদানি করতে পারবে—ইত্যাদি সবই ধার্য করে দেওয়া হয় সে নিয়ন্ত্রণ-নীতিগুলির মাধ্যমে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরো বেশী বিস্তারিত। ১৯৫৫ সন পর্যন্ত পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল অবাধ। ১৯৫২-৫৪-এ কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে যে-অর্থনৈতিক boom দেখা গিয়েছিল, পাকিস্তান তাতে অবাধ বাণিজ্যের ফলে প্রচুর লাভবান হয় এবং প্রচুর বাড়তি বৈদেশিক মুদ্রা পাকিস্তানের হাতে জমে। ১৯৫৫ সনে হঠাৎ-করে depression আসে এবং পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার আয় খুব কমে যায়। এদিকে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে সবেমাত্র। বৈদেশিক পণ্যের তখন দারুণ চাহিদা দেশের বাজারে। ফলে পাকিস্তানের balance of payment-এ বিরাট ঘাটতি দেখা দেয়। সেই ঘাটতি সামলাবার জন্য পাকিস্তান এক বিস্তারিত বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ-প্রথা চালু করে। আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা আর সরবরাহের টানাপোড়েনে পাকিস্তানী মুদ্রার মান নীচে নেমে আসার কথা। কিন্তু তাহলে পাকিস্তানের রপ্তানি-দ্রব্যের দাম যাবে পড়ে, অন্যদিকে আমদানি-দ্রব্যের দাম বেড়ে যাবে। সেটাকে এড়াবার জন্যে পাকিস্তানী মুদ্রার মান আগের পর্যায়ে রেখে পূর্বোক্ত নিয়ন্ত্রণ-প্রথার মাধ্যমে balance of payment-এ সমতা রাখার চেষ্টা করে পাকিস্তান। এই নিয়ন্ত্রণের মূল ব্যাপারটি হোল এই-রকম—রপ্তানি-কারকরা তাদের রপ্তানি থেকে যে-বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে তার পুরোটা জমা দেয় স্টেট ব্যাঙ্কে। স্টেট ব্যাঙ্ক একটা নির্ধারিত হারে তাদের পাকিস্তানী মুদ্রা দেয় তার বদলে। বলা বাহুল্য, সে হারটি equilibrium হারের চাইতে কম। রপ্তানির মাধ্যমে সঞ্চিত এবং বৈদেশিক সাহায্য থেকে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা তারপর বণ্টন করা হয় আমদানি-কারকদের মধ্যে। আমদানিকারীদের কে কতটুকু বৈদেশিক মুদ্রা পাবে তা ধার্য হয় licence-এর দ্বারা। বিদেশের বাজারে যে-হারে বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে হোত তার চাইতে কম হারে আমদানিকারীরা পাচ্ছে স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে। অতএব দেখা যাচ্ছে,

রপ্তানিকারীরা তাদের রপ্তানির জন্যে যত পাকিস্তানী মুদ্রা পেতে পারতো তার চাইতে অনেক কম পাচ্ছে। অন্যদিকে আমদানি দ্রব্যের জন্য যে-পরিমাণ পাকিস্তানী মুদ্রা খরচ করতে হোত তার চাইতে অনেক কম খরচে আমদানি পণ্যগুলি পাচ্ছে আমদানিকারীরা।

এখন দেখা যাক, পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য কাদের হাতে। পাকিস্তানের জন্মকালে বৈদেশিক বাণিজ্যে ছিল বিদেশীদের আধিপত্য—বেশীর ভাগ রপ্তানি-কারক ছিল ইংরেজ। কিছু কিছু মাড়োয়ারীও ছিল এ ব্যবসায়ে। আমদানির ক্ষেত্রেও অনুরূপ। স্বাধীনতা ঘোষণার পরে ইংরেজরা ব্যবসা গুটিয়ে পাড়ি জমালো স্বদেশে। মাড়োয়ারীরাও প্রায় সবাই পাততাড়ি গুটিয়ে ভারতে আশ্রয় নিল। বৈদেশিক বাণিজ্যে তখন আধিপত্য বিস্তার করলো একটি নতুন গোষ্ঠী যাদের হাতে ছিল কাঁচা পয়সা, যারা সেই ফাঁকা মাঠে আসর জমিয়ে বসলো। কাঁচা পয়সাওয়ালা সেই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রধানতম হোল ভারত থেকে চলে-আসা একদল অবাঙ্গালী মুসলমান ব্যবসায়ী। তারা স্বাধীনতার আগে থেকেই ব্যবসায় করছিল ভারতে। তা থেকে তাদের লাভের অংশে জমে জমে মূলধন গড়ে উঠেছিল। কৃষিপ্রধান বাংলাদেশে মুসলমানরা ব্যবসায়ে নামে নি তেমন, কৃষিই ছিল প্রায় সবাইর জীবিকানির্বাহের উপায়। অল্পসংখ্যক মুসলমান ছিলেন চাকুরীর ক্ষেত্রে। তাঁদের হাতে মূলধন জমবার প্রশ্নই ওঠে না। তাই ইচ্ছে থাকলেও মূলধনের অভাবে বাঙ্গালী মুসলমানরা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবতরণ করতে পারে নি। আর একটা বড় দল হোল পশ্চিম পাকিস্তানী জমিদাররা। পশ্চিম পাকিস্তানে বেশ কিছু বড় জমিদার বিপুল পরিমাণে জমির মালিক ছিল। জমির আয় থেকে তাদের বিলাসের জন্য ব্যয়িত হবার পরেও কিছু মূলধন তাদের হাতে জমে উঠেছিল। পূর্ববঙ্গের জমিদাররা বেশীর ভাগই ছিল হিন্দু। স্বাধীনতার পর তারাও দেশান্তরিত হয়েছিল। এ ছাড়াও, যে-কয়টি ব্যাঙ্ক ছিল তারও সবকটাই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের স্বত্বাধীনে। পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যাঙ্ক স্বভাবতই পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদেরকেই বাণিজ্যিক ঋণ দিত। এ-সব কারণে দেখা গেল, বৈদেশিক বাণিজ্য ধীরে ধীরে মূলধনধারী অবাঙ্গালীদের হাতে চলে গেল।

বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ-নীতির ফলে বাংলাদেশের সম্পদ কিভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে তা একটা ছোট উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে। বাংলাদেশের চাষী এক মণ পাট বিক্রী করলো পশ্চিম পাকিস্তানী

রপ্তানি ব্যবসায়ীর কাছে। ব্যবসায়ীর কাছ থেকে সে পেল ক পরিমাণ টাকা। রপ্তানি ব্যবসায়ী অন্তত ২০% লাভ রেখে বিদেশের বাজারে সে পাট বিক্রী করলো ১'২ক টাকায়। এক ডলারের বিনিময়-মান হোল ৪'৭৬ টাকা। এক মণ পাটের জন্যে স্টেট ব্যাঙ্কে জমা হোল $\frac{\text{১'২ক}}{\text{৪'৭৬}}$ ডলার। অর্থাৎ এক মণ পাট যখন বিদেশে $\frac{\text{১'২ক}}{\text{৪'৭৬}}$ ডলারে বিক্রী হয়, তখন রপ্তানি ব্যবসায়ী তার লভ্যাংশ কেটে পাটচাষীকে দেবে ক টাকা। স্টেট ব্যাঙ্ক সেই বৈদেশিক মুদ্রা বণ্টন করে পশ্চিম পাকিস্তানী আমদানি ব্যবসায়ীর হাতে দিল। ধরা যাক, আমদানিকারী বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে একটা মেশিন কিনলো। আমদানি পণ্যের চাহিদার আধিক্য বলে সেই মেশিনটি পাকিস্তানী বাজারে প্রায় ৬০% লাভ আহরণ করে। বাংলাদেশের কেউ যদি সেই মেশিনটা কেনে আমদানি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে, তাকে দিতে হবে ১'২ক × ১'৬ টাকা বা ১'৯২ক টাকা। অর্থাৎ এক মণ পাট ক টাকায় বিক্রী করে তার পরিবর্তে যে-জিনিসটা আমদানি করা হোল সেটা কেনা হোল ১'৯২ক টাকায়। শুধু পণ্যের কথা যদি ভাবি, তাহলে এক মণ পাট দিয়ে একটা মেশিন এল। মাঝখানে কেবলমাত্র দুটো লাইসেন্সের জোরে বৈদেশিক বাণিজ্য চালিয়ে নেপো মেরে নিল '৯২ক টাকার দই। অন্যভাবে দেখলে দেখা যায়, সরকারী লাইসেন্সের বেড়াজাল না থাকলে বাঙ্গালী শিল্পপতি বাঙ্গালী চাষীর এক মণ পাট দিয়ে একটা মেশিন আনাতে পারতো। লাইসেন্সের বেড়াজালে তাকে রেখে আসতে হোল ১· ১'৯২ক অর্থাৎ শতকরা ৪২ ভাগ পাট; সরকারী নিয়ন্ত্রণ-প্রথার বদৌলতে পশ্চিম পাকিস্তানীরা লুটে নিল এক মণ পাটের শতকরা ৪২ ভাগ। টাকার হিসেবে দেখলে ব্যাপারটা তেমন স্পষ্ট হয় না। পণ্যের হিসেব যখন নেওয়া হয় তখন ধরা পড়ে এক মণ পাট রপ্তানি করে বাংলাদেশ বিনিময়ে পাচ্ছে মাত্র '৫৮ মণ পাটের মূল্য।

পাকিস্তানের রপ্তানি-আয়ের শতকরা ৫০ ভাগের বেশী এসেছে বাংলাদেশজাত পণ্য রপ্তানি করে। কোন কোন বছর শতকরা ৭০ ভাগও এসেছে বাংলাদেশ থেকে। অন্যদিকে বাংলাদেশে আমদানির অংশ পেয়েছে মাত্র শতকরা ৩০ ভাগের।

নীচে পাকিস্তানের রপ্তানি-আমদানিতে বাংলাদেশের অংশের তথ্য দেওয়া হোল :

পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য

(কোটি টাকায়)

সাল	বিদেশ থেকে আমদানি			বিদেশে রপ্তানি		
	বাংলাদেশ	পাকিস্তান	বাংলাদেশের অংশ (%)	বাংলাদেশ	পাকিস্তান	বাংলাদেশের অংশ (%)
১৯৫৫-৫৬	৩৬	১৩২	২৭	১০৪	১৭৮	৫৮
১৯৫৬-৫৭	৮২	২৩৪	৩৫	৯১	১৬১	৫৬
১৯৫৭-৫৮	৭৪	২০৫	৩৬	৯৯	১৪২	৭০
১৯৫৮-৫৯	৫৫	১৫৮	৩৫	৮৮	১৩২	৬৬
১৯৫৯-৬০	৬৬	২৪৬	২৭	১০৮	১৮৪	৫৯
১৯৬০-৬১	১০১	৩১৯	৩২	১২৬	১৮০	৭০
১৯৬১-৬২	৮৭	৩১১	২৮	১৩০	১৮৪	৭০
১৯৬২-৬৩	১০২	৩৮২	২৭	১২৫	২২৫	৫৬
১৯৬৩-৬৪	১৪৯	৪৪৩	৩৪	১২২	২৩০	৫৩
১৯৬৪-৬৫	১৭০	৫৩৮	৩২	১২৭	২৪১	৫৩
১৯৬৫-৬৬						
থেকে						
১৯৬৯-৭০	৭৮৮	২৪০৫	৩৩	৭৭৯	১৫৬২	৫০

Source : Monthly Statistical Bulletin, Various Issues. Central Statistical Office, Government of Pakistan.

আমদানির উপরি-উক্ত অঙ্কগুলি সরকারী বিনিময় হারের (official exchange rate) ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের আমদানি-বাণিজ্যের একটা বড় অংশ আবার পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের হাতে। বাংলাদেশের গ্রাহকরা যখন পশ্চিম পাকিস্তানী আমদানি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে পণ্য কেনে তখন তাদের লাভের ভাগটা চুকিয়ে তারপর কিনতে হয়। সেই লাভের ভাগটা, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, প্রায় শতকরা ৬০%। সেটা হস্তগত হয় পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের।

পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবশ্যই ঘাটতি রয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ কেনে শিল্পজাত দ্রব্য। পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়নের ফলে বাংলাদেশকে শিল্পজাত দ্রব্যের জন্যে মুখ চেয়ে থাকতে হয় ঐ অঞ্চলের প্রতি। বাণিজ্য-শুল্ক এবং quota-র ফলে পাকিস্তানে শিল্পজাত দ্রব্যের protected বাজার সৃষ্টি হয়েছে। এইসব নিয়ন্ত্রণবিধির ফলে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিরা বৈদেশিক উৎপাদকের প্রতিযোগিতা থেকে রক্ষা পায় এবং প্রতিযোগিতার অনুপস্থিতিতে চড়া দামে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য দেশের বাজারে বিক্রী করতে পারে। আমদানিকৃত পণ্যের উপর যদি শতকরা ৬০% লাভ থাকে, সেইসব পণ্যের বিকল্প (import-substitute commodities) উৎপাদন করে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিরা সে-ধরনের লাভ রাখতে পারে। বাংলাদেশ সেই বিকল্পগুলি না কেনে যদি সোজাসুজি বিদেশ থেকে আমদানি করতে পারতো এই লাভের অঙ্কটা তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের কোষবদ্ধ হোত না। তার চাইতেও বড় কথা, আমদানিকৃত কলকব্জা ও কাঁচা মাল বাংলাদেশের শিল্পায়নে কাজে লাগতে পারতো। বাংলাদেশের শিল্পকে অনুন্নত রেখে বাংলারই রপ্তানির বিনিময়ে আমদানি-করা মালমসলা নিজের শিল্পোন্নয়নে কাজে লাগিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান তার শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার করে রাখলো বাংলাদেশকে। সাম্প্রতিক কালে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট রপ্তানির শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ এসেছে বাংলাদেশে। এবং এর উপরে পশ্চিম পাকিস্তানীরা আয় করেছে চড়া দরের লাভ। পর পৃষ্ঠার Table-টিতে বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের বাণিজ্যের পরিমাণ দেওয়া হোল।

পশ্চিম পাকিস্তানের রপ্তানি

(বিদেশে এবং বাংলাদেশে)

(কোটি টাকায়)

সাল	বাংলাদেশে রপ্তানি	বিদেশে রপ্তানি	মোট রপ্তানি	মোট রপ্তানির অংশ হিসেবে বাংলাদেশে রপ্তানির পরিমাণ (%)
১৯৫৫–৫৬	৩২	৭৪	১০৬	৩০
১৯৫৬–৫৭	৫১	৭০	১২১	৪১
১৯৫৭–৫৮	৬৯	৪৩	১১২	৬১
১৯৫৮–৫৯	৬৬	৪৪	১১০	৬০
১৯৫৯–৬০	৫৪	৭৬	১৩০	৪২
১৯৬০–৬১	৮০	৫৪	১৩৪	৬০
১৯৬১–৬২	৮৩	৫৪	১৩৭	৬১
১৯৬২–৬৩	৯২	১০০	১৯২	৪৮
১৯৬৩–৬৪	৮৪	১০৮	১৯২	৪৪
১৯৬৪–৬৫	৮৬	১১৫	২০১	৪৩
১৯৬৫–৬৬	১১৯	১২০	২৩৯	৫০
১৯৬৬–৬৭	১৩০	১৩৪	২৬৪	৫০
১৯৬৭–৬৮	১২২	১৮৬	৩০৮	৪০
১৯৬৮–৬৯	১৩৪	১৭৬	৩১০	৪৩

Source : Monthly Statistical Bulletin, Various Issues. Central Statistical Office, Government of Pakistan.

পশ্চিম পাকিস্তান বাংলাদেশের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে সম্ভাব্য সব প্রক্রিয়াতেই। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বহু পথ দিয়ে অপস্থত হয়েছে বাংলার সম্পদ। বাংলার জনসাধারণের ব্যক্তিগত সময়ের মোটা অংশ গচ্ছিত রয়েছে ব্যাঙ্কগুলিতে। ব্যাঙ্কগুলির মালিক পশ্চিম পাকিস্তানী, তাদের হেড অফিস করাচীতে। সেই গচ্ছিত সঞ্চয়ের ভিত্তিতে যে-সব ঋণ দেওয়া হয়েছে তার অধিকাংশ গেছে পশ্চিম পাকিস্তানী ঋণগ্রহীতাদের হাতে। বাংলার সাধারণ মানুষ তাদের গায়ের-রক্ত-জল-করা আয় থেকে যে-সামান্য অংশ সঞ্চয় করে জমা রেখেছে ব্যাঙ্কে, তা ব্যবসায়ে খাটিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানীরা। বাংলাদেশে ব্যাঙ্কগুলির যে-সব শাখা রয়েছে, ১৯৬২ সনের আগে পর্যন্ত প্রতি বছরই সেগুলিতে advance-deposit অনুপাত ছিল '৬-এর কাছাকাছি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাখাগুলিতে সেই অনুপাত ছিল ১'১। অর্থাৎ বাংলাদেশের শাখাগুলিতে গচ্ছিত টাকার মাত্র ৬০ ভাগ ঋণ দেওয়া হোত ব্যবসায়ীদের। আর পশ্চিম পাকিস্তানের শাখাগুলি তাদের গচ্ছিত অর্থের চাইতেও শতকরা ১০ ভাগ বেশী ঋণ দিয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে বাংলাদেশের শাখাগুলির জমা টাকা হেড অফিসের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেতে বলে। ১৯৬২ সনের পরে বাংলাদেশের শাখাগুলিতে advance-deposit-এর অনুপাত ১-এর বেশী দাঁড়িয়েছে। এতে বোঝা যায়, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বাংলার সম্পদ অপসারণের পথটা বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশে যে-সব advance দেওয়া হোত, তার বেশীর ভাগই আবার পেত বাংলায় ব্যবসা করছে যে-সব পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতি তারা। তার প্রমাণ, পাকিস্তানের সমগ্র ব্যাঙ্ক deposit-এর শতকরা ৮৫ ভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে—১৫০০ কোটি টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে আর মাত্র ২৫০ কোটি টাকা বাংলাদেশে। এ ছাড়া ব্যাঙ্ক advance-এর শতকরা ৮২ ভাগ জমেছিল ৩% account-এ এবং সে ৩% account যাদের নামে তারা হোল পশ্চিম পাকিস্তানের বাইশটি পরিবারের লোক।

এই বাইশটি পরিবার কিভাবে একাধিপত্য বিস্তার করেছিল পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, তার চাঞ্চল্যকর তথ্য আংশিকভাবে প্রথম প্রকাশ করেছিলেন এক বিদেশী অর্থনীতিবিদ্। পরে এ নিয়ে গবেষণা করেছিলেন খোদ মাহবুবুল হক সাহেবের স্ত্রী। মাহবুবুল হক সাহেবের পরিচয়টা দেওয়া দরকার। ইনি

একজন বিদেশী ডিগ্রী-প্রাপ্ত সুদর্শন এবং পটুভাষী পাঞ্জাবী অর্থনীতিবিদ। পাকিস্তানের যোজনা পরিষদের একটি শাখার মাথা ছিলেন পূর্বে, পরে পরিষদের **Joint Chief Economist** হয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থ নৈতিক আধিপত্যের তাত্ত্বিক কর্ণধার ছিলেন তিনি—বৈষম্যের বিষয়টিকে অর্থ নৈতিক তত্ত্বের ধূম্রজাল দিয়ে যাঁরা ধোঁয়াটে করে তুলেছিলেন, তিনি তাঁদের নেতা। তাঁর পটুভাষিতাকে তত্ত্বগত বিতর্কে কাজে লাগিয়ে তিনি বিদেশী অর্থনীতিবিদদের এবং সাহায্যদানকারী রাষ্ট্রগুলির কাছে অস্পষ্ট করে রেখেছিলেন বৈষম্যের মূল কথাটি। তারই বাঙ্গালিনী স্ত্রী শ্রীমতী বাণী হক তথ্যাদি পরিবেশন করলেন বাইশটি পরিবার সম্পর্কে—যাঁদের সবাই হলেন পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী।' এই বাইশটি পরিবারের হাতে স্তূপীকৃত ছিল সমগ্র পাকিস্তানের বেসরকারী বিনিয়োগের শতকরা ৮৭ ভাগ, শিল্প-সম্পদের শতকরা ৬০ ভাগ, ব্যাঙ্কের সম্পদের শতকরা ৮০ ভাগ আর বীমা-সম্পদের শতকরা ৭৫ ভাগ।

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সঞ্চয় পশ্চিম পাকিস্তানে খাটানো, সরকারী বাজেট নীতির মাধ্যমে রাজস্ব খাতে বাংলাদেশের সঞ্চয় অপসারণ, বৈদেশিক সাহায্যের প্রাপ্য অংশ থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত রাখা, বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের আয় লুণ্ঠন—এইসব প্রক্রিয়ায় পশ্চিম পাকিস্তান দখল করেছে বাংলার সম্পদ। মুদ্রাস্ফীতির হারের পার্থক্য, শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি আরো অনেক পথ বেয়ে বাংলার সম্পদ জমেছে পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উপদেষ্টা পরিষদের estimate-অনুসারে উপরিলিখিত বিভিন্ন পদ্ধতিতে ১৯৪৮-৪৯ থেকে ১৯৬৮-৬৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে মোট ৩১০০ কোটি টাকা চলে গেছে পশ্চিম পাকিস্তানে।

॥ ৪ ॥

এ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করেছি, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে অর্থ নৈতিক বৈষম্য গড়ে উঠেছিল কতখানি এবং কোন্ কোন্ পথে বাংলাদেশের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করে পার্থক্যটাকে দিন দিন বাড়িয়ে তোলা হয়েছিল। কেন এ ধরনের একটা ব্যাপার ঘটতে পেরেছিল, তার ইঙ্গিত

এখানে-ওখানে আমরা দিয়েছি, এবারে এই কারণগুলি একটু বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা যাক।

দেশবিভাগের সময়ে পাকিস্তানে বড় ও মাঝারি শিল্পে যে-সামান্য পরিমাণ বিনিয়োগ ছিল তার প্রায় অর্ধেক ছিল পূর্বাঞ্চলে। কৃষিক্ষেত্রে উন্নয়নের বিরাট সম্ভাবনা ছিল এ অঞ্চলের। তার কারণ, বাঁধ বা সেচ-প্রণালীর সাহায্য ছাড়াই দুটি এমন কি তিনটি ফসল ফলানোর জল-সম্পদ ছিল এখানে। শিক্ষিতের হার বেশী ছিল এ অঞ্চলে। পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশ উদ্বাস্তু সমস্যায় পীড়িত হয় নি তেমন। হিন্দু জমিদাররা দেশছাড়া হয়ে যাবার ফলে ভূমি-সংস্কারের সমস্যাও অনেকটা হাল্কা হয়ে এসেছিল। এতগুলি সুবিধা-সত্ত্বেও এ অঞ্চল দিন দিন পিছিয়ে পড়ল।

ওদিকে পশ্চিমাঞ্চল এগিয়ে গেল দ্রুতগতিতে। পঞ্চাশের দশকের মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে উঠল সুষ্ঠু পরিবহণ-ব্যবস্থা, সুসংবদ্ধ বিদ্যুৎ সরবরাহ-প্রণালী আর একটি বিরাট industrial sector. পূর্বাঞ্চল রয়ে গেল গ্রামীণ অর্থনীতি হিসেবে—পরিবহণ-ব্যবস্থা অনুন্নত, বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বল্প আর শিল্প নামমাত্র।

কৃষিতে মাথাপিছু উৎপাদনের হার পূর্বাঞ্চলেই ছিল বেশী। পঞ্চাশের দশকের মধ্যে সেখানেও হার হোল তার। শিল্পের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা তো পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে—নির্মাণকার্য, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য, পৌর অর্থনীতির সুযোগ-সুবিধা এবং সরকারী services-এর সহায়তায় পশ্চিমের সঙ্গে পূর্বের পার্থক্য বেড়েই চলল বছর বছর।

জমান মূলধন ও entrepreneural skill ছিল যে-গোষ্ঠীগুলির, দেশ-বিভাগের সময়ে তারা বাংলাদেশ ছেড়ে গেল, সেটা উল্লেখ করেছি আগেই। তার জায়গায় বাঙ্গালী মুসলমানদের কেউ আসে নি কেন, সেটাও আলোচিত হয়েছে। অন্যদিকে অবিভক্ত ভারতে যে-সব মুসলমান ব্যবসা-ক্ষেত্রে উন্নতি করেছিল, তাদের বেশীর ভাগেরই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ছিল বোম্বাইয়ে। উত্তর প্রদেশ, গুজরাট এবং পশ্চিম এলাকার অধিবাসী তারা। দেশবিভাগের পর এরা যখন ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে এল, তখন স্বভারতই ভাষা, আচার-ব্যবহার, কৃষ্টি ইত্যাদি সামাজিক কারণে ও ভৌগোলিক সান্নিধ্যের জন্যে তারা বসতি করলো পশ্চিম পাকিস্তানে, সঙ্গে নিয়ে এল তাদের জমান মূলধন আর ব্যবসায়বুদ্ধি এবং এদের থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ী, আমদানিকারী এবং শিল্পপতি

গোষ্ঠীগুলি গড়ে উঠলো। করাচীই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নততম শহর এবং একমাত্র বন্দর। তাই করাচী এবং তার চারপাশেই নতুন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, নতুন শিল্প গড়ে তুললো এই নতুন পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলি।

করাচীর আরও আকর্ষণ ছিল ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কাছে। জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বাধীনে এবং পশ্চিমাঞ্চলের ধনিক ও অভিজাত গোষ্ঠীর পরিপোষকতায় চালিত মুসলিম লীগ পশ্চিমাঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কীভাবে বলিষ্ঠ করে তুলেছে, এ সঙ্কলনের অন্য নিবন্ধে তার বিবরণ আমরা পেয়েছি। রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্বার্থের খাতিরে করাচীতেই প্রতিষ্ঠিত হোল পাকিস্তানের রাজধানী এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তর। রাজধানীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে পরিবহণ-ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রণালী ও নানাবিধ নাগরিক সুযোগ-সুবিধা। সরকারী উদ্যোগে প্রদত্ত এইসব সুযোগ করাচীকে বেসরকারী পুঁজিপতিদের কাছে চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে শিল্প-স্থাপনের কেন্দ্র হিসেবে। দরিদ্র দেশের দুষ্প্রাপ্য সম্পদ সবই নিয়ন্ত্রণ করতো সরকার। বেসরকারী পুঁজিপতিদের পক্ষে সে-সব নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল ডিঙ্গিয়ে তবে সম্ভব হোত শিল্প-প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা। নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রস্থল করাচীতে অবস্থান করলে সহজতর হোত সরকারী অনুগ্রহলাভ। সরকারী দপ্তরের সহস্র বাধানিষেধের গণ্ডী পেরোতে হলে কাছাকাছি থেকেই প্রচেষ্টা চালান ছিল অনেক সুবিধাজনক।

ভৌগোলিক দূরত্ব ছাড়াও অন্যান্য অনেক প্রশাসনিক কারণে বাংলাদেশ শিল্পগঠনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শিল্প-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য বেসরকারী উদ্যোগীকে (private entrepreneurs) মানতে হোত শত শত সরকারী নীতি, প্রতিটি ক্ষেত্রে এগুতে হোত লাইসেন্সের উপর ভর দিয়ে—শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্যে চাই লাইসেন্স, কাঁচা মাল আমদানির জন্যে চাই লাইসেন্স, পণ্য রপ্তানির জন্যে চাই লাইসেন্স।

লাইসেন্স দেবার মালিক হলেন সরকারী দপ্তরের অধিকর্তারা। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নেকনজরে পড়তে পারে যারা তাদেরই কপালে জোটে লাইসেন্সের অনুগ্রহ। সরকারী দপ্তরের উপরওয়ালাদের স্বভাবতই পক্ষপাতিত্ব থাকবে তাদের অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের প্রতি, তাদের ভাষাভাষী, তাদের কৃষ্টি-অনুসারী ব্যক্তিদের প্রতি। দেশবিভাগের সময়ে বাংলাদেশের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে-কয়জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, তাঁদের সবাই দেশ ছেড়ে গেছেন।

পশ্চিমাঞ্চলে যাঁরা ছিলেন এবং যাঁরা ভারত থেকে এলেন তাঁদের নিয়েই প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে উঠলো প্রথমে। এর পরে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে দৃঢ়ীভূত করার জন্যে পশ্চিমী শাসকরা নতুন কর্মচারী নিয়োগ করলেন বেশীর ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান থেকেই। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যি চালু করা হয়েছিল পরে। কিন্তু সেটা একটা প্রহসন—আঞ্চলিক quota না থাকার ফলে এবং পরীক্ষকদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানীর সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকার ফলে পূর্বাঞ্চল সরকারী চাকুরীতে তার ন্যায্য প্রাপ্য কখনই পায় নি। তার উপরে পদোন্নতির বেলায় সহস্র বাধা তো রয়েছেই। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ১৯৬৮–৬৯ সন পর্যন্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের শতকরা কত ভাগ পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চল থেকে এসেছে তার হিসেব দেওয়া হোল নীচে।

কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী

(১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬৮–৬৯)

পদ	বাঙ্গালী (%)	পশ্চিম পাকিস্তানী (%)
সেক্রেটারি	১৪	৮৬
জয়েন্ট সেক্রেটারি	২০	৮০
ডেপুটি সেক্রেটারি	৬	৯৪
অন্যান্য পদস্থ কর্মচারী	১৮	৮২

Source : Bangladesh, Vol. 1 No. 3, External Publicity Division, Bangladesh Mission, Government of People's Republic of Bangladesh, Calcutta.

যে-অর্থনৈতিক কাঠামোতে সরকারের একটা বিরাট প্রত্যক্ষ ভূমিকা রয়েছে এবং পরোক্ষভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণ রয়েছে পুরো কাঠামোটার উপরে, সেখানে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি। সরকারী দপ্তরে পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রাধান্য সে অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রাধান্যেরও অন্যতম মূল কারণ। স্বীয় অঞ্চলের উন্নতির জন্য স্বভাবতই সচেষ্ট হয়েছে সে অঞ্চলের প্রশাসনিক অধিকর্তারা। এই পক্ষপাতিত্বের কথা নিজেরাই স্বীকার করেছে তারা। মুনীর আহমদ তাঁর *The Civil Servant of Pakistan* (Oxford University Press, Oxford.

১964) গ্রন্থে সরকারী কর্মচারীদের একটি সমীক্ষা করে জেনেছেন—পশ্চিম পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারীদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ স্বীকার করেন যে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবার কালে আঞ্চলিকতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন তাঁরা। সরকারী কর্মচারীদের আঞ্চলিকতার ভিত্তির উপর পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের সৌধ গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে।

বৈদেশিক বাণিজ্য-নীতির ভূমিকা সম্পর্কে আগে খানিকটা আলোচনা করা হয়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানীরা প্রথম থেকেই প্রাধান্য লাভ করেছিল। কোরীয় যুদ্ধকালীন boom-এ বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রচুর লাভ হয়েছিল এবং সে লাভ ব্যবসায়ীদের হাতে মূলধন হিসেবে জমছিল। এর পরে বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হোল; আগে থেকেই যারা আমদানি-ব্যবসায়ে নিয়োজিত ছিল নতুন ব্যবস্থায় তারাই হোল লাইসেন্সের অধিকারী। আমদানি পণ্যের সরবরাহের চাইতে চাহিদা বেশী হবার ফলে একদিকে যেমন আমদানি-ব্যবসায়ীদের হাতে লাভের টাকা জমে উঠতে থাকলো, অন্যদিকে আমদানির বিকল্প পণ্যের লাভজনক বাজারও গড়ে উঠলো পাকিস্তানে। কোরীয় যুদ্ধের boom-এর সময়কার জমানো লাভ আর লাইসেন্সের বদৌলতে পাওয়া লাভ তখন কাজে লাগলো শিল্প-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে। বলা বাহুল্য, লাভ থেকে জমানো মূলধনের মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীরা; কারণ আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায় ছিল তাদেরই হাতে। করাচীর চারধারে শিল্প-প্রতিষ্ঠার ভিত্তি-স্বরূপ infra-structure গড়ে উঠেছিল প্রথম থেকেই। অতএব ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত পাকিস্তান শিল্পায়নে যে-উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখিয়েছে (উন্নয়নের হার শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ—অ-কম্যুনিস্ট অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে উন্নয়ন-প্রচেষ্টায় অন্যতম সফল দেশ হিসেবে পাকিস্তানকে বাহবা দিয়েছে পাশ্চাত্যের বিশেষজ্ঞরা) তার বেশীর ভাগটাই হয়েছে করাচীর আশে-পাশে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের স্বত্বাধীনে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি তত্ত্ব হোল এই যে, প্রাথমিক প্রয়াস যদি সফল হয়, তাহলে ধীরে ধীরে শিল্পায়ন-সহযোগী একটা আবহাওয়া গড়ে ওঠে এবং শিল্পায়ন আপন গতিতেই এগুতে থাকে। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান পার্থক্যটির সমর্থনে এ-ধরনের তত্ত্বের দোহাই দিয়েছিলেন অনেকে। অর্থনৈতিক তত্ত্বগত আলোচনার খানিকটা প্রয়োজন। কারণ,

শেষদিকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকরা তাদের কৃতকর্মের পাপস্খালনের জন্য তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং জনসাধারণ ও সাহায্যদানকারী দেশগুলির কাছে তত্ত্বের দোহাই দিয়ে রেহাই পেতে চেয়েছিলেন।

একটি তত্ত্ব হোল, পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগ বেশী হওয়া অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন কাজে লাগানো হয় সুষ্ঠুতরভাবে —মূলধন যেহেতু আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্যতম সম্পদ, সেহেতু যে অঞ্চলে মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতা বেশী, সে অঞ্চলে মূলধন বিনিয়োগ করা শ্রেয়ঃ। দাবী করা হোল, এক একক মূলধন খাটালে পশ্চিম পাকিস্তানে যত আয় হয়, বাংলাদেশে হয় তার চাইতে কম। বাঙ্গালীরা দুটি প্রশ্ন তুলল এর যাথার্থ্য-সম্পর্কে। সত্যিই কি output-capital অনুপাত পশ্চিম পাকিস্তানে বেশী, আর যদি তা হয়েই থাকে, তবে কেন? তথ্য থেকে প্রথম প্রশ্নের সঠিক উত্তর মিললো না। বস্তুত, তথ্যগত কোন সমর্থনই তুলে ধরতে পারলেন না পশ্চিম পাকিস্তানীরা। পরোক্ষ প্রমাণ থেকে দেখা যায়, Indus Basin Replacement Works-এর output-capital অনুপাতের চাইতে অনেক বড় অনুপাত পাওয়া যেতে পারতো বাংলাদেশের বহু প্রকল্পে। পশ্চিম পাকিস্তানে নল-কূপ প্রকল্পে মূলধন খাটিয়ে যে-পরিমাণ উৎপাদন হয়েছে, বাংলাদেশে পাম্পে মূলধন খাটিয়ে তার চাইতে অনেক বেশী উৎপাদন হয়েছে। তাছাড়া দুজন মার্কিন অর্থনীতিবিদ্ দেখিয়েছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানি-বিকল্প শিল্পগুলির মধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে—এক একক উৎপাদিত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে যা দাম, সে পণ্য তৈরী করতে যে-সব কাঁচা মাল ব্যবহার করেছে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিরা তাদের দাম তার চাইতে বেশী (R. Soligo and J. J. Stern, "Some comments on the Export Bonus, Export Promotion and Investment Criteria" *Pakistan Development Review*, Spring 1966)। অর্থাৎ এ সব শিল্পে যে-মূলধন খাটানো হয়েছিল, তার থেকে কোন আয় পাওয়া দূরের কথা বরং সে-মূলধনের খানিকটা অংশ নষ্ট হয়েছে। সুষ্ঠুতরভাবে মূলধন কাজে লাগানোর এই তো নমুনা!

অন্যদিকে, প্রাথমিক পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধনের উৎপাদন-ক্ষমতা হয়তো বেশী ছিল। কিন্তু সেটার মূলে রয়েছে অপেক্ষাকৃত উন্নত infrastructure: যে-অঞ্চলে ভাল পরিবহণ-ব্যবস্থা থাকে, বিদ্যুৎ প্রভৃতি শক্তির

সরবরাহ হয় সুষ্ঠুভাবে, জল-সরবরাহ, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত থাকে, সে অঞ্চলে শিল্প-প্রতিষ্ঠা অনেক লাভজনক। সরকারী পক্ষপাতিত্বে infrastructure-এর এই সব সুযোগ-সুবিধা কী করে গড়ে উঠেচে পশ্চিম পাকিস্তানে সেটা আমরা দেখেছি।

আরও একটি তত্ত্বও প্রায়ই তুলে ধরা হোত—যে-অঞ্চল অধিকতর ধনী, সে অঞ্চলের সঞ্চয়ের হার অধিকতর ; সঞ্চয় থেকে মূলধন আসবে, অতএব মূলধন-সংগ্রহের খাতিরে সে-অঞ্চলের হাতেই তুলে দেওয়া উচিত আয়ের বেশীর ভাগ অংশ। আয়ের ভাগে পশ্চিম পাকিস্তানের দাবী তাই বেশী। বস্তুত অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসেবেই এর তেমন স্বীকৃতি নেই। সঞ্চয়-সম্পর্কিত বহু তত্ত্বই রয়েছে এর বিপক্ষে—Friedman এবং Duessenbury-র তত্ত্বের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য এ-প্রসঙ্গে। আর তথ্যের ধোপে তো মোটেই টেঁকে-না যুক্তিটি। একজন স্ক্যাণ্ডিনেভীয় অর্থনীতিবিদ্ গ্রামাঞ্চলের ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, বাংলাদেশের পল্লীবাসী দরিদ্রতর হওয়া সত্ত্বেও তাদের saving propensity পশ্চিম পাকিস্তানী পল্লীবাসীদের চাইতে বেশী। আয়ের শতকরা ১২ ভাগ সঞ্চয় করে বাংলার গ্রামবাসী আর পশ্চিম পাকিস্তানীরা করে মাত্র ৯ ভাগ (A. Bergan, "Personal Income Distribution and Personal Savings in Pakistan, 1963-64", Pakistan Development Review, Summer 1967).

অতএব দেখা যাচ্ছে, বিনিয়োগ-যোগ্য সম্পদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের তত্ত্বগত দাবীগুলির তেমন কোন ভিত্তি নেই। বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ্‌রা এ নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং গবেষণার ফল হিসেবে দাঁড়িয়েছে পাল্টা যুক্তিগুলি। বিদেশী অর্থনীতিবিদ্‌রাও পরীক্ষা করে দেখেছেন দাবীগুলি—তাঁদের গবেষণাও সাক্ষ্য দেয় পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। তত্ত্বের জাল তথ্যের শাণিত অস্ত্র দিয়ে ছিন্ন করে ফেলার পরে বেরিয়ে পড়েছে পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণের নগ্ন রূপ।

॥ ৫ ॥

অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মিলনের সেতুটির কোন অর্থনৈতিক ভিত্তিই ছিল না। ভৌগোলিক, সামাজিক

ও সাংস্কৃতিক দূরত্বকে কমানোর ক্ষেত্রে সে সেতু কোন কাজে আসে নি, উৎপাদনের উপাদানের আদান-প্রদানেও কোন সুবিধে হয় নি তার মাধ্যমে। বরং সে সেতুটির উপর দিয়েই বাংলার সম্পদ পাচার করে বাংলাকে নিঃস্ব করেছে পশ্চিমের লুণ্ঠনকারীরা। বাংলার মুক্তিসংগ্রামীরা আজ তাই সেতু ভাঙছে—সঙ্গে গুড়িয়ে পড়ছে সেতুর স্তম্ভগুলি। ধর্মান্ধতা তার একটি কারণ। অর্থনৈতিক পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে বলেই এ সংগ্রাম জন্ম দিতে পেরেছে নতুন মূল্যবোধের—ধর্মনিরপেক্ষতার, গণতান্ত্রিক সাম্যের; টেনে আনতে পেরেছে সর্বস্তরের মানুষকে—কৃষককে, শ্রমিককে, ছাত্রকে, বুদ্ধিজীবীকে, ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে।

অর্থনৈতিক চেতনা আজকের সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করেছে। এই চেতনার পরিপক্কতা কি আমরা দেখতে পাব না স্বাধীন বাংলার অর্থনীতিতে? আয়-বণ্টনে শ্রেণীগত বৈষম্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না বাংলাদেশে। আঞ্চলিক বৈষম্যের ব্যাপকতার ভারে চাপা পড়ে ছিল তা, বাংলার প্রতিটি শ্রেণীই পরস্পরের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছে শোষণ-মুক্তির সংগ্রামে বৈষম্যের ফলে, শোষণের ফলে আজকের সংগ্রামের জন্ম। শুধুমাত্র শোষকদের, লুণ্ঠনকারীদের তাড়িয়ে দিয়েই এর শেষ নয়। শ্রেণীগত পার্থক্য ভুলে সর্বস্তরের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছে যে-সংগ্রামে, বৈষম্য আর শোষণের মূল-উৎপাটন করে তবেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে সে সংগ্রাম।

ওদের ফেলে চলে এলাম

—সত্যেন সেন

শেষ রাত্রির দিকে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ কে-জানে কেন চমকে গিয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলাম। উঠে বসতেই গতরাত্রির সেই বিভীষিকার কথা মনে পড়ে গেল—সেই ঘনঘন কামান-গর্জন আর প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ, এদিকে-ওদিকে মেসিনগানের আওয়াজ নৈশপ্রকৃতির স্তব্ধতাকে ভেঙেচুরে খানখান করে দিয়ে চলেছে, সারা শহরটা যেন ভূমিকম্পের তাণ্ডবে দুলে দুলে উঠছিল আর থেকে থেকে কেঁপে উঠছিল আমাদের এই জরাজীর্ণ বাড়িটা। আচমকা ঘুম ভেঙে আমরা ঘর ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলাম, ওঃ, সে কী দৃশ্য! শহরের এ-প্রান্তে ও-প্রান্তে লেলিহান অগ্নিশিখা রাত্রির আকাশকে উজ্জ্বল আর ভয়াল করে তুলেছিল। রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা কোনোদিন ছিল না, মারণাস্ত্রের এমন তীব্র ও হিংস্র গর্জন আগে কোনোদিন শুনি নি। এক বিরাট ধ্বংস-দানব, যেন প্রচণ্ড গর্জন তুলে শতবাহু প্রসারিত করে ছুটে আসছে। আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলাম ক'জনা, আমাদের কারো মুখে কোনো কথা নেই। আমরা যেন কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

কিন্তু এই ঘটনা কি সত্যসত্যই ঘটেছিল, না সবই আমার স্বপ্ন? এমন কত স্বপ্নই তো আমরা দেখে থাকি! শান্ত প্রকৃতি, ঝিরঝির করে বাতাস বইছে, মনে হয় যেন শহর রোজকার মতোই শান্ত হয়ে ঘুমিয়ে আছে। এর মধ্যে সেই মহা বিপর্যয় ও ধ্বংসযজ্ঞের কথা কি কল্পনা করা যায়? বোধ হয় স্বপ্ন। স্বপ্নই যেন হয়। কিন্তু পরমুহূর্তে এ-দিকে ও-দিকে পর পর কয়েকবার মেসিনগান গর্জন করে উঠল। এবার স্পষ্ট করেই বুঝলাম, যা দেখেছিলাম তা স্বপ্ন নয়, কঠিন সত্য। ইয়াহিয়ার নিশাচর বাহিনী স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকুও রক্তের বন্যায় ভাসিয়ে দেওয়ার সঙ্কল্প নিয়ে কাজে নেমেছে।

রোজকার মতো আজও রাত্রির অন্ধকার কেটে গিয়ে সকালবেলার আলো ফুটে উঠল। কিন্তু আজকে এই প্রভাত কোনো পাখির কাকলিতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল না। একটা কাক-পাখির ডাকও শুনতে পাচ্ছি না। ওরাও যেন ভয় পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। একটু একটু করে বেলা বাড়তে লাগল, শুনলাম শহরে

কারফিউ জারী করা হয়েছে, কেউ ঘর থেকে বাইরে বেরোতে পারবে না, পথে বেরুলেই মেসিনগানের শিকার হতে হবে। কিন্তু মানুষ তার অধীর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছিল না। কি হয়েছে আর কি হচ্ছে দেখবার জন্যে, জানবার জন্যে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও কেউ কেউ বেরিয়ে পড়েছে পথে, ঘরের মধ্যে বসেও তা অনুভব করতে পারছিলাম। একটু বাদে-বাদেই এ-পথে ও-পথে মেসিনগানের অর্থপূর্ণ একটানা আওয়াজ। ওরা মানুষের সস্তা প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

আমরা যে-পাড়ার বাসিন্দা সেখানে ভেতরকার খোলা দরজা দিয়ে স্বচ্ছন্দে এ-বাড়ি ও-বাড়ি যাওয়া-আসা চলে। এখানকার বাসিন্দারা সবাই মুসলমান, কিন্তু পাড়ার ছেলেমেয়েরা, এমন কি বৌ-ঝিরা পর্যন্ত অন্তঃপুরের পর্দা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে আমাদের এ-বাড়িতে যাতায়াত করে। মেয়েপুরুষ অনেকেই আমাদের এখানে এসে জড়ো হয়েছে। তারা জানে, আমি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তা ছাড়া সংবাদপত্রের লোক। এই সঙ্কটমুহূর্তে তারা আমার কাছ থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা করে। এরা এক পাড়ার লোক হলেও সবাই এক মতের লোক নয়। গণ-নির্বাচনের সময় এদের মধ্যে অধিকাংশই আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দিয়েছে, কিছু কিছু লোক ভোট দিয়েছে ন্যাপ-এর পক্ষে। আবার মুসলিম লীগের পক্ষে ভোট দিয়েছে এমন লোকও যে নেই তা নয়। কিন্তু আজ এই সর্বধ্বংসী বিপদের মুখে দলমত-নির্বিশেষে সবাই যেন এক হয়ে গিয়েছে। এবার কি হবে, সকলের মুখেই এই এক প্রশ্ন। তারা সবাই আমার কাছ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পেতে চায়, এই উত্তর পাবার জন্যে দাবী করে। কিন্তু এর কি উত্তর দেবো আমি? আমার সামনেও তো এই একই প্রশ্ন—এবার কি হবে? এখন আমাদের কর্তব্য কি?

ছোট্ট মেয়ে মিলি ক্লাস এইটের ছাত্রী। মাস কয়েক আগে ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দিয়েছে, সভা-সমিতিতে যায়, মিছিল করে, শ্লোগান দেয় আর উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসে। কিছুদিন ধরে ছাত্রীদের দলে প্যারেড করে আসছিল, বাড়ির লোকদের কাছ থেকে বাধা পেয়েছে, কিন্তু বাধা মানে নি মিলি। সে ওদের চোখ এড়িয়ে নিঃশব্দে চলে যেত, আর বাড়ি ফিরে এসে নিঃশব্দে গালাগালি হজম করত। মিলির যত গোপন কথা সব আমার সঙ্গে। তার মুখে শুনেছি এবারকার স্বাধীনতা সংগ্রামে শুধু ছেলেরাই নয়, মেয়েরাও নাকি এগিয়ে যাবে। এ-পাড়ার আর কোনো মেয়ে এমন কথা ভাবতেও পারে না,

এমন কথা ভাবার মতো দুঃসাহস তাদের নেই। কিন্তু মিলি তাদের এই পশ্চাৎপদ ও রক্ষণশীল সমাজের বুকে বসেও নতুন যুগের আলোয় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে তাই তার এই দুঃসাহস। পতিত জমির বুকে এই নতুন কচি চারাগাছটি একটু একটু করে পাতা মেলেছে, দেখতে কী-যে ভালো লাগে! তাই আমাদের এই দু'টি অসমবয়সী সাথীর মধ্যে অতি নিভৃতে এসব বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা চলে। সেই মিলি আজ শুকনো মুখে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। আর সকলের মতো তার চোখেমুখেও এক ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। কিন্তু আর সকলের মতো হলেও তার প্রশ্নটা আর সকলের মতো নয়। এক·বার, দু' বার, তিন বার,—বারবার সে আমাকে প্রশ্ন করছে, দাদা, ওরা তো আক্রমণ করেছে, আমরা কি এখনো প্রতিরোধ করব না? কেমন করে প্রতিরোধ করব, আমাদের হাতে-যে অস্ত্র নেই। এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবো, তা আমার জানা নেই, তাই ওর প্রশ্নটা যেন শুনেও শুনতে পাচ্ছি না।

সারা শহর জুড়ে কারফিউ জারী হয়ে গেছে। পথে বেরিয়ে আসার অর্থ জেনেশুনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। কিন্তু শহরে সে-রকম লোকের অভাব নেই, তাই এখানে বসেও একটু বাদে-বাদে মেসিনগানের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। তা ছাড়া পাহাড়ের বুকে পাথরের আড়ালে আড়ালে ক্ষীণ-ধারা ঝরণা যেমন করে বয়ে চলে, তেমনি করে সারা শহরময় লোক-চলাচলের ঝরণাধারা এঁকে-বেঁকে পথ করে চলেছে। তারই মধ্য দিয়ে মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে পড়ছে সারা শহরে। বাতাসের মতো ছড়িয়ে পড়ছে খবর, তাকে কেউ আটকে রাখতে পারছে না।

তাই আমাদের এই ঘরে বসেও একটু বাদে-বাদেই নতুন নতুন খবর শুনতে পাচ্ছি। কোন্ পথ দিয়ে এই সমস্ত খবর আসছে জানি না, তা হলেও খবর কিন্তু আসছেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলি নাকি ভেঙেচুরে শেষ করে দিয়েছে ওরা। এও শুনতে পাচ্ছি, ইকবাল হলটাই নাকি ওদের সবচেয়ে বড় টার্গেট। তা যদি হয়ে থাকে, তা হলে শত শত, নয় হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী মারা গিয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। একথা ভাবতে গিয়ে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ছি। ওদের প্রথম আঘাতেই যদি ঢাকা শহরের ছাত্রশক্তি উন্মূলিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে থাকে, তা হলে আমাদের আর রইল কী! আমাদের প্রতিরোধের অগ্রবাহিনী হবে কারা? স্বাধীনতালাভের পর থেকে এই সেদিন পর্যন্ত বাংলা-দেশের ছাত্ররাই বুকের রক্ত ঢেলে চলার পথকে উজ্জ্বল করে দিয়েছে। তাদের

মুখের দিকে চেয়ে বাংলাদেশের মানুষ অতি দুর্দিনেও ভরসা পেয়েছে, সাহস পেয়েছে। সেই ছাত্রশক্তি ইয়াহিয়া সরকারের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু আমরা কেমন করে এভাবে ওদের হাতের মুঠোর মধ্যে ধরা দিলাম? ঢাকা শহরের প্রাণশক্তি ছাত্ররা এভাবে নির্মূল হয়ে গেছে, এ-কথা ভাবতে গেলেই সামনে এগিয়ে চলবার পথটা যেন ঝাপসা হয়ে আসে।

অব্যক্ত যন্ত্রণায় মনটা যেন জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। নিঃশব্দ হয়ে বসে আছি আমরা ক'জন। নিস্পন্দ দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। এতবড় ক্ষতির কি করে পূরণ হবে! ঘন্টার পর ঘন্টা গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে ভেসে আসছে মেসিনগানের কুৎসিত কর্কশ শব্দ। এইভাবে ২৬-এ মার্চের দিনটা কেটে গেল। নেমে এল রাত্রি। রাত্রি বাড়ার সাথে সাথে মারণাস্ত্রের গর্জন ক্রমশই বেড়ে চলেছে। আমাদের বারান্দায় একের পর এক লোক এসে ভিড় করছে। তাদের ভীতি-মিশ্রিত কাতরোক্তি শুনে বেরিয়ে এলাম বাইরে, বারান্দায় রেলিঙের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। আগুন, আগুন! পশ্চিম দিকে একটা বিরাট এলাকা জুড়ে আগুন জ্বলছে। গত রাত্রির মতোই ঘরবাড়ি জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। না, গত রাত্রির মতো নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি। কারা জ্বালিয়েছে এই আগুন? ক্ষিপ্ত উন্মত্ত জনতা? তারা কি তবে কারফিউর বাধা ভেঙে শৃঙ্খলমুক্ত বাঘের মতো বাইরে বেরিয়ে এসেছে? না, তা নয়। তা যদি হতো তা হলে শত শত মারণাস্ত্র গর্জন করে উঠত। নিঃশব্দ রাত্রি, মেসিনগানের গর্জন থেমে গিয়েছে, একটা বিচ্ছিন্ন রাইফেলের শব্দ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছে না, আমার এপাশে ওপাশে এরা-ওরা বলাবলি করছে এসব নির্ঘাত মিলিটারির কাজ। কোথায় জ্বলছে আগুন? কেউ বলছে টাকিবাজারে, কেউ বলছে নয়াবাজারে, যার যেমন অনুমান তাই বলছে। রাত দুপুর ছাড়িয়ে গেল, আগুন জ্বলছেই, জ্বলছেই। এ-আগুন কি কোনোদিন নিভবে না?

এই ধ্বংসলীলার যবনিকা সরিয়ে ২৭-এ মার্চের আলোকোজ্জ্বল প্রভাত নেমে এল। আলোকোজ্জ্বল প্রভাত, কিন্তু আমাদের সকলের চোখের আলো যেন নিভে গিয়েছে।

বেলা যখন সাতটা, তখন সাইরেনের তীক্ষ্ণ শব্দ শোনা গেল। এর অর্থ

আপাতত কারফিউ তুলে নেওয়া হয়েছে। কারফিউ উঠে গেছে, তবু মাঝে মাঝে মেসিনগানের শব্দ শুনতে পাচ্ছি, খোঁজ নিয়ে জানলাম কারফিউ নেই সত্য কিন্তু ১৪৪ ধারার নিষেধাজ্ঞা তো আছে। মানুষ ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে পড়েছে পথে, এখানে ওখানে ভিড় জমছে, সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরক্ষাকারী সৈন্যরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে। কিন্তু এই বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েও পথের ওপরে জনস্রোত বয়ে চলেছে। যে যার প্রয়োজনে অস্থির হয়ে ছুটে চলেছে. ক্ষীণদৃষ্টি আমি এ-অবস্থায় একা বাইরে বেরিয়ে পড়াটা সঙ্গত বলে মনে করলাম না। তাই আমি আমার এই নির্জন ঘরে চুপ করে বসে আছি।

ঘন্টা তিনেক বাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রফিক দ্রুতপদে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল। সে ব্যস্ত হয়ে আমার খবর নিতে এসেছে। অনেক খবর সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে রফিক, তার মুখ থেকে মস্ত একটা আশ্বাসের বাণী শুনলাম। আমাদের অনেক কিছু গেছে, কিন্তু সব যায় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে যে দুঃসংবাদ শুনেছিলাম তার সবটা ঠিক নয়। ওদের হামলার ফলে কিছু ছাত্র-ছাত্রী মারা গেছে সে-কথা সত্য কিন্তু অধিকাংশই বেঁচে গেছে। এই হিংস্র জঙ্গী বাহিনীর প্রথম ও প্রধান টার্গেট ছিল ছাত্ররা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু একটুর জন্য ওরা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। ওদের আক্রমণের ঘণ্টা কয়েক আগেই খবরটা কোনো কোনো মহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজনৈতিক পার্টিগুলির কাছেও এই সংবাদটা পৌঁছে গিয়েছিল। তাদের কাছ থেকে হুঁশিয়ারী ও নির্দেশ পেয়ে হলের ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষ করে যারা ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিল, ওদের আক্রমণের কিছুটা আগেই তারা হল ছেড়ে বাইরে চলে এসেছিল। তবে যেসব ছাত্র চিরদিনই আন্দোলন থেকে দূরে দূরে থাকে তাদের একটা অংশ হল ছাড়ে নি। তারা ভেবেছিল, হামলা-কারীরা তাদের কিছু বলবে না। তারা জানত না, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্র পূর্ববঙ্গে দলমত-নির্বিশেষে সমস্ত ছাত্রসমাজকেই তাদের চরম শত্রু বলে মনে করে। ফলে যারা হলে ছিল, তাদের সবাইকেই ওদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে।

তা হলে ছাত্র-কর্মীদের মধ্যে সবাই কি বেঁচে গিয়েছে? সবাই নিরাপদে আছে? রফিক বিমর্ষ কণ্ঠে উত্তর দিল, হ্যাঁ, সবাই বেঁচে আছে, শুধু দু'জন বাদে। তারা দু'জনেই আমাদের ছাত্র ইউনিয়নের কর্মী। একজন জগন্নাথ হলের

কালিকারঞ্জন, আর একজন ইকবাল হলের লুৎফর। বারবার হুঁশিয়ারী পাওয়া সত্বেও তারা হল ছেড়ে চলে যায় নি। কথাটাকে তারা ততটা গায়ে মাখে নি। হয়তো ভেবেছিল, যদি সত্যসত্যই আক্রমণ হয় তারা সময় বুঝে সরে পড়বে, কিন্তু সেই সুযোগ ওরা পায় নি।

চমকে উঠলাম আমি। আমার মুখ থেকে একটা অস্পষ্ট কাতরোক্তি বেরিয়ে এল। জগন্নাথ হলের কালিকারঞ্জন! তার কথা তো আমি ভালো করেই জানি। জগন্নাথ হলের ছাত্রদের সকলের প্রিয়পাত্র প্রথম শ্রেণীর ছাত্র নেতা সে। প্রতিটি আন্দোলনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছে। সেই কালিকারঞ্জন আর লুৎফর এমন মারাত্মক ভুল করে বসল!

এসব কথা কেমন করে জানলে তুমি, আমি জানতে চাইলাম। রফিক উত্তর দিল, ২৫-এ মার্চের সেই রাত্রিতে আমি বাড়ি ছেড়ে হাসপাতালে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। সারা শহর জুড়ে যখন ওদের সেই মহাতাণ্ডব চলছে, সে-সময় জগন্নাথ হলের একটি জখমী ছাত্র এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে এসে ভর্তি হল। তার শরীরের দুটো জায়গায় গুলি লেগেছে। তার মুখেই জগন্নাথ হলের সব খবর শুনলাম। সেখানে হলে সবশুদ্ধ অনেক ছাত্র ছিল। সৈন্যরা হলের ভেতর ঢুকে পড়ল। তারপর ঘরে ঘরে ঢুকে যাকে পেল তাকেই নির্বিচারে হত্যা করে চলল। কাউকে কোনো প্রশ্নটুকু পর্যন্ত করল না। যখন সাত-আট জন মাত্র বাকি তখন ওরা থামল। যারা বেঁচেছিল তাদের মৃতদেহগুলিকে বাইরে কবর দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিল। জীবিতদের মধ্যে কালিকারঞ্জনও ছিল। ওদের কথামতো তারা মৃতদেহগুলিকে বয়ে নিয়ে নিচে নেমে গেল। আমি জখম হয়ে এক কোণায় পড়েছিলাম, আমাকে কেউ দেখতে পায় নি, বেশ কিছু সময় বাদে ওরা যখন ওপরে ফিরে এল, তখন সবাই ভীষণ ক্লান্ত, মনে হচ্ছিল ওরা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। ওরা মনে মনে কি ভাবছিল কে জানে! হয়তো আশা করেছিল প্রাণে বেঁচে যাবে। কিন্তু মিলিটারির লোকেরা যখন ওদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে মেসিনগান সাজিয়ে নিয়ে তৈরি হল, তখন ওদের আর বুঝতে বাকি রইল না। উত্তেজনায় আমার বুক কেঁপে উঠল। ওদের লাইনের এক প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল কালিকারঞ্জন। মেসিনগান তার কাজ শুরু করবার আগেই সে তার দু'হাত ঊর্ধ্বে তুলে দৃপ্তকণ্ঠে আওয়াজ তুলল—'জয় শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা'। সঙ্গে সঙ্গে বাকি ক'জন কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে

চিৎকার করে উঠল, 'জয় শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা'। তাদের কণ্ঠস্বরে লেশমাত্র ভয় বা জড়তার আভাস ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন তারা রাজপথে মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে. শ্লোগান তুলছে। নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের এই নির্ভীক কণ্ঠস্বর শুনে অবাক হয়ে গেলাম। কালিকারঞ্জনকে জানি, সে সবসময়ই আন্দোলনের সামনে থাকত। তাকে কোনোদিন ভয় করতে দেখি নি। কিন্তু এরা ? আমার মতোই এরাও তো চিরদিন শান্তশিষ্ট জীবনযাপন করে এসেছে। কিন্তু এই চরম মুহূর্তে কি নির্ভীক ওদের কণ্ঠস্বর। পরপর দু'বার ওরা আওয়াজ তুলল, 'জয় শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা'। কিন্তু তৃতীয়বার আওয়াজ তোলবার সময় পেল না। বৃষ্টিধারার মত মেসিনগানের গুলি ছুঁড়ছে। ওরা ভূমিশয্যায় লুটিয়ে পড়ল। আমি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পেলাম ওদের রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে।

একটু বাদেই সৈন্যরা তাদের কাজ শেষ করে নেমে গেল। ওরা চলে যাবার পরেই আমি অনেক কষ্টে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর পাইপ বেয়ে ওপর থেকে নিচে নেমে এলাম। সৈন্যরা এদিকে ওদিকে টহল দিচ্ছিল। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে ওরা আমাকে লক্ষ্য করতে পারে নি। তারপর এই শরীরটাকে টানতে টানতে কি করে হাসপাতালে চলে এলাম তা নিজেও আমি জানি না।

রফিকের মুখে এই কাহিনী শোনার পর এত দুঃখের মধ্যেও আমার মন গর্বে ও গৌরবে ভরে উঠল। ছাত্রনেতা কালিকারঞ্জন আর তার এই ক'টি সাথীকে সেই হিংস্র জল্লাদদের হাতে জীবন দিতে হয়েছে, কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও তারা ভয়ে কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে পড়ে নি, বীরের মতই মৃত্যুকে গ্রহণ করেছে, আর যাবার সময় দেশমাতৃকার জয়ধ্বনি করে গেছে। এই কথাটা জানবার সুযোগ ক'জনই বা পেয়েছে। আমি এই কাহিনীর মধ্য দিয়ে সেই মৃত্যুপথের যাত্রীদের এই মৃত্যুহীন ঘোষণাকে তুলে ধরতে চাইছি। তাদের কথা স্মরণ করে সারা বাংলাদেশের মানুষের মন সংগ্রামী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক।

রফিকের মুখে আরও অনেক খবর পেলাম। শুনলাম পঁচিশে মার্চ রাত্রির প্রথম হামলার মুখেই ওরা "দৈনিক ইত্তেফাক্" আর "পিপল্স্" পত্রিকার অফিস কামানের গোলায় উড়িয়ে দিয়েছে।

"দৈনিক ইত্তেফাক্" মাত্র কিছুকাল আগে রাজরোষের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত

হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে নতুন প্রেস কিনেছিল, আজ তার সব গেছে। কিন্তু সবকিছু হারিয়েও নিঃশেষ হয়ে যায় নি 'ইত্তেফাক'। বাংলাদেশের মানুষের মনে তার আসন আর মর্যাদা অটুট হয়ে আছে।

শুনলাম এই নৃশংস কসাইদের হাতে বহু প্রখ্যাত অধ্যাপক, লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী নিহত হয়েছেন। ওরা নাকি বেছে বেছে তাঁদের হত্যা করেছে যাতে বাঙালীর সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধের প্রেরণা চিরদিনের মত নিঃশেষ হয়ে যায়। এমন অনেক নাম লোকের মুখে মুখে ফিরছে। এদের মধ্যে কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই।

রফিকের হাতে অনেক কাজ, অনেক জায়গায় তাকে যেতে হবে, এখানে বসে বেশী ক্ষণ গল্প করার সময় নেই। আমাকে এই খবরগুলি শুনিয়েই সে দ্রুত বাইরে চলে গেল। এরপর একজন দু'জন করে আরও লোক আসতে লাগল। তারা দুঃসংবাদের পর দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে আসছে—গণহত্যা, গৃহদাহ আর লুণ্ঠনের নির্মম কাহিনী। সূত্রাপুর থেকে এক বন্ধু এই মর্মান্তিক বার্তা বহন করে নিয়ে এল, আমরা আমাদের মালাকরটোলার বিশিষ্ট কর্মী দুলালকে হারিয়েছি।

দুলালের কর্মজীবন খুব বেশী দিনের নয়, কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই সে তার উদ্যোগ আর নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে আমাদের মন জয় করে নিয়েছিল। দুলাল একাই নয়, একই সঙ্গে তার আরও কয়েকটি কাজের সাথী মারা গেছে। গত নির্বাচন-আন্দোলনের সময় ওরা এই অঞ্চলের সবার কাছেই পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। হামলাকারী পাক-সৈন্যরা যখন এসে সূত্রাপুর থানা দখল করল তখন কয়েকজন অবাঙালী এক এক করে এই কর্মীদের নাম আর তাদের বাড়িগুলি দেখিয়ে দিল। তখন মিলিটারি লোকেরা সেই নিশুতি রাত্রিতে বাড়ি বাড়ি ঢুকে বেছে বেছে ওদের দশ-বারো জনকে বাইরে টেনে নিয়ে এল। তারপর তাদের লোহারপুলের সামনে সারি বেঁধে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। এবার গর্জে উঠল মেসিনগান। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুলাল আর তার সেই কর্মী ভাইয়েরা লুটিয়ে পড়ল ধূলায়, আর উঠল না। লোহারপুলের সামনে পথের মাটি তাদের রক্তে ভিজে কাদা-কাদা হয়ে গেল। ওদের মৃতদেহগুলি সারাদিন সেখানে পড়ে ছিল।

বিকালবেলায় লতিফ সরদার ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর চোখমুখ বসে গিয়েছে, দেখেই বোঝা যাচ্ছে তাঁর শরীরের উপর দিয়ে অনেক ধকল গিয়েছে।

লতিফ সরদার আজকের দিনের লোক নন, বহু দিনের পুরানো কর্মী। দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থাকবার ফলে তাঁকে বহু দুঃখ পেতে হয়েছে, দিনের পর দিন অভাবের চাকার তলায় পিষ্ট হতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর উজ্জ্বল হাসিখুশী মুখটিকে কোন দিন ম্লান হতে দেখি নি। অতি বড় দুঃখের সময়ও আমরা তাঁর মুখ দেখে প্রেরণা পেয়ে থাকি। সে লতিফ ভাই আজ নিষ্প্রভ, অবসন্ন; মনে হয় তাঁর বয়স যেন অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। লতিফ ভাই গ্রামাঞ্চলে থাকেন, কৃষক সমিতির কাজ করেন। মাঝে মাঝে শহরে আসেন। মাত্র ক'দিন আগে তিনি এখানে এসেছিলেন। ঢাকা শহরের এই মর্মান্তিক দৃশ্য স্বচক্ষে দেখাবার জন্যই বুঝি তাঁর ভাগ্য তাঁকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছিল।

লতিফ ভাইয়ের মুখে শুনলাম, আজ সকাল থেকে সারাদিন তিনি শহরের নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সারা অঞ্চলটা তন্ন তন্ন করে ঘুরে দেখেছেন তিনি। যেখানে গেছেন সেখানেই হত্যার বিভীষিকা। হল-গুলির এপাশে ওপাশে ইতস্ততঃ ছড়ানো কতগুলি মৃতদেহ এখনও পড়ে আছে। মেয়েদের রোকেয়া হলের সামনেও সেই একই দৃশ্য। কিন্তু তার চেয়েও বীভৎস আর দুঃসহ ছবি জগন্নাথ হলের সামনে। এই হলের যে-সব ছাত্রদের তারা হত্যা করেছিল, তাদের এক জায়গায় কবর দেওয়া হয়েছে কিন্তু এমন অযত্নে অবহেলার সঙ্গে তাদের কবর দেওয়া হয়েছে যে, তাদের অনেকের হাত পা বাইরে বেরিয়ে আছে। এই দৃশ্য লোকে কি কোনদিন ভুলতে পারবে? জীবনের ঝুঁকি নিয়েও লতিফ ভাই এইসব নিদারুণ দৃশ্য ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। মাঝে মাঝে এখানে ওখানে টহলদার পাক-সৈন্যদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়েছে। লতিফ ভাই লক্ষ করে দেখেছেন, ওদের চোখে কি বন্য আর বর্বর দৃষ্টি, মনুষ্যত্বের চিহ্ন মাত্র নেই। খেয়ালের বশে যে-কোন সময় ওরা তাঁকে মেরে ফেলতে পারতো, নেহাৎ ভাগ্যক্রমেই তিনি বেঁচে গেছেন।

এসব দেখে সাধ করে দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর কোন লাভ নেই। তবু লতিফ ভাই সারাটা দিন ঘুরে ঘুরে এই ছবি দেখেছেন, না দেখে পারেন নি, কে যেন তাঁকে পেছন থেকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছিল। আর এখানে বসে আমি লতিফ ভাইয়ের চোখ দিয়ে সেই সমস্ত দৃশ্য দেখছি। সারা নগরী বধ্যভূমিতে পরিণত হয়ে গেছে। রাস্তায় স্তূপীকৃত জঞ্জালের মত শত শত, নয় হাজার হাজার মৃতদেহ ছড়িয়ে পড়ে আছে। তাদের সামনে রক্তের এক পুরু আস্তরণ, রক্তগুলি

দলা বেঁধে জমে আছে। এসব সরিয়ে ফেলে রাস্তা পরিষ্কার করবার জন্য কোনো উদ্যোগ নেই। ইচ্ছা করেই ওরা তা করছে না, ওরা চাইছে, শহরবাসী স্বচক্ষে এসব দেখুক, আর দেখে ভয়ে শিউরে উঠুক। এইভাবে তাদের প্রতি-হিংসামূলক শিক্ষা দিয়ে ওরা ওদের নারকীয় প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে চাইছে।

সবচেয়ে বড় আঘাত পড়েছে সমাজের নীচের তলার লোকের উপর। শহরের যে-সমস্ত নিরাশ্রয় মানুষ খোলা আকাশের নিচে পথের উপর রাত্রি যাপন করে, তাদের মধ্যে খুব কম লোকই ওদের হামলার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। সাধারণ মেহনতী মানুষ যে-সমস্ত বস্তী অঞ্চলে বাস করে, সেগুলিকে সুপরিকল্পিত ভাবে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে। এইভাবে ভস্মস্তূপে পরিণত হয়েছে শাঁখারীবাজার, নয়াবাজার, ইংলিশ রোড এবং অন্যান্য বস্তী অঞ্চলগুলি। পুরানো রেল লাইনের দু'ধারে হাজার হাজার বাস্তহারা মনুষ্যনামধারী প্রাণী অস্থায়ী কুঁড়েঘর তুলে দিনপাত করছিল, তারাও ওদের হাত থেকে রেহাই পায় নি।

একটা জিনিস লক্ষ করবার বিষয়, শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর পরেই এই গরীব মেহনতী মানুষরা ওদের আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবারকার আন্দোলনে এদের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল, সম্ভবত এটা ওদের দৃষ্টি এড়ায় নি।

কামানের গোলার আঘাতে ওরা আমাদের শহীদ মিনারকে ভেঙে দিয়েছে। শহীদ মিনারের উপর ওদের এই আক্রমণমূলক মনোভাবের কারণটা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। শহীদ মিনার আমাদের বাংলাদেশের গণ-আন্দোলনের পীঠস্থান, সকল আন্দোলনের প্রেরণার উৎস। আমাদের বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন পার্টি, মতবাদ ও কর্মপন্থা অনুসরণ করে বহুধা বিচ্ছিন্ন হলেও এই শহীদ মিনার আমাদের সকলের চিত্তকে একসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছে। বহু নদনদী যেমন এক মহাসাগরে এসে বিলীন হয়ে যায়, তেমনি দলমত-নির্বিশেষে গণ-আন্দোলন ও শ্রেণী আন্দোলনের সমস্ত সৈনিকরা এই শহীদ মিনারের বেদীমূলে এসে জমায়েত হয় এবং তাদের সংগ্রামী শপথ গ্রহণ করে। সেই কারণেই শহীদ মিনার ওদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই কারণেই ওরা তাকে ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু সমগ্র জাতির অন্তরের ভিত্তির উপর যে-শহীদ মিনার অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে কেউ ভেঙে ফেলতে পারবে কি!

লতিফ ভাই শাঁখারীবাজারে গিয়েছিলেন। এখানে বসেও শুনতে পাচ্ছি শাঁখারীবাজারে পরপর দু'দিন ধরে ওদের হামলা চল্‌ছে। নানাকারণে শাঁখারীবাজার ও তাঁতীবাজার এই দুটো অঞ্চলের উপর ওদের জাতক্রোধ, ওদের আক্রোশ যেন আর মিটতে চায় না। ওরা রোজই রাত্রিতে কারফিউ নির্দেশ জারী হবার পর এখানে এসে হামলা করে, বাড়িতে আগুন লাগিয়ে মজা দেখে, আর যারা প্রাণ বাঁচাবার জন্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে, কারফিউ আইন-ভঙ্গের অভিযোগে তাদের ওপর গুলি চালায়। শাঁখারীবাজারে একটা ঘরের সামনে লোকের ভিড় জমেছে। লতিফ ভাই ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গিয়ে যে-দৃশ্য দেখলেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ঘরের মধ্যে এগারোটি মৃতদেহ পাশাপাশি পড়ে আছে। জিজ্ঞেস করে জানলেন, গতকাল এদের একসঙ্গে জড়ো করে মেসিনগানের গুলিতে হত্যা করা হয়েছে। সেই থেকে এরা এমনিভাবে পড়ে আছে। শাঁখারীবাজার আর তাঁতীবাজার এই দুটো অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখলে এরকম দৃশ্য নাকি আরও চোখে পড়বে। শাঁখারীবাজারের মোড়ে কতগুলো ভস্মাবশেষ মানুষের হাড় পড়ে আছে। এখানে একদল লোককে একসঙ্গে পেট্রোল দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

লতিফ ভাইয়ের পা চলতে চায় না, তবু চলে এলেন সদরঘাটের টার্মিনালে। লোকমুখে শুনেছেন এখানে নাকি বহু লোককে হত্যা করা হয়েছে। বুড়ীগঙ্গার তীরে লঞ্চ-এর টার্মিনালের এলাকায় পা দিতেই শিউরে উঠলেন লতিফ ভাই। থমকে গিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়লেন, আর এগোতে পারলেন না। টার্মিনালের বিস্তৃত প্রাঙ্গণের উপর রক্তের পুরু গালিচা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন রাত্রিবেলা বহু ঘরছাড়া মানুষ এখানে এসে আশ্রয় নিয়ে থাকে। গভীর রাত্রিতে সেদিনও তারা নিঃশঙ্ক চিত্তে ঘুমিয়েছিল, আচমকা মেসিনগানের আওয়াজে জেগে উঠল। তাদের মধ্যে ক'জন পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পেরেছিল কে জানে! এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, শত শত লোককে এখানে প্রাণ দিতে হয়েছিল। এই রক্তের কাদা সেই নৃশংস হত্যার স্মারক হয়ে আছে। তাদের মৃতদেহগুলিকে ওরা নাকি বুড়ীগঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

লতিফ ভাই সদরঘাট থেকে সোজা আমার এখানে চলে এসেছেন। সারাদিনের একটানা পথচলার ক্লান্তির ফলে এবং তার চেয়েও বেশী এই সমস্ত মর্মান্তিক দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবার ফলে এমন শক্ত মানুষ লতিফ ভাই তিনিও যেন কেমন

অবসন্ন আর আচ্ছন্নের মতো হয়ে এসেছেন। তাঁর সারাদিনের অভিজ্ঞতার কাহিনী শেষ করে তিনি ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন, আমি আজ আর বাইরে কোথাও যেতে পারব না, আপনার সঙ্গে এইখানেই থেকে যাব।

তারপর পরপর আরও তিনটা দিন কেটে গেল। দিনগুলি একই ভাবে কেটে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বাইরে এদিক ওদিক থেকে রাইফেল আর মেসিন-গানের আওয়াজ ভেসে আসে। অসহায় মানুষের জীবন নিয়ে ওরা শিকারের আনন্দে মেতে আছে। রোজই রাত্রিতে ওদের অগ্ন্যুৎসব চলে, তার লেলিহান শিখায় রাত্রির আকাশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একদিন সকালবেলা শুনতে পেলাম আমাদের সংবাদ অফিস আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। শেষ রাত্রিতে আগুন লাগিয়েছিল। এখনও জ্বলছে। দৈনিক "সংবাদ" গত দুই দশক ধরে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী ও প্রগতিশীল আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আসছিল। এইখানেই কি তার ইতি? এই ভাবেই কি তার দুর্গম ও বন্ধুর পথচলার পরিসমাপ্তি ঘটল?

শুনতে পাচ্ছি ওরা ঘরে ঘরে ঢুকে লোকদের বাইরে টেনে নিয়ে হত্যা করছে।

গেণ্ডেরিয়ায় সাধনা ঔষধালয়ের মালিক অশীতিপর বৃদ্ধ অধ্যক্ষ যোগেশ ঘোষকে প্রকাশ্য দিবালোকে রাস্তায় টেনে নিয়ে এসে সঙ্গীন দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরেছে। তাঁতীবাজার থেকে খবর এসেছে ঢাকা শহরের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার শৈলেন সেনকে এমনি ভাবে গুলি-বিদ্ধ করে মারা হয়েছে। এভাবে আরও কত লোককে মেরেছে তার হিসেব কে রাখে? দিনের পর দিন এইভাবে ওদের হত্যালীলা চল্‌তে থাকবে। ওরা সুপরিকল্পিত ভাবে একাজে নেমেছে। ওদের দালালরা শিকারী কুকুরের মত গন্ধ শুঁকে শুঁকে বেড়াচ্ছে। বেশ জানি, দু'দিন আগেই হোক আর পরেই হোক ওরা আমাদের এই ঘরেও এসে হানা দেবে। বুঝতে পারছি, মৃত্যু পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। আত্মরক্ষা করতে হলে অবিলম্বে এই জায়গা ছেড়ে অন্যত্র কোন নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়া দরকার। কিন্তু আমি যেন কেমন উদাসীন আর স্থবিরের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছি। মনে হচ্ছে যা হবার তা হয়ে যাক। দৃষ্টিহীন আমি, পরের সাহায্য ছাড়া চলতে পারি না, এই দুঃসময়ে পরের বোঝা হয়ে এই অকর্মণ্য শরীরটাকে টেনে টেনে বয়ে নিয়ে চলার লাঞ্ছনা সহ্য হবে না। তার চেয়ে যা হবার তা হয়ে যাক।

৩০ তারিখ পর্যন্ত এভাবে কাটল। পরদিন বন্ধুদের কাছ থেকে জরুরী নির্দেশ এল, আমার পক্ষে এই শহরে থাকা নাকি নিরাপদ নয়, অবিলম্বে শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে চলে যেতে হবে। সেই নির্দেশের এমন সুর যে, তাকে অমান্য করবার উপায় নেই। তা ছাড়া আমি যে-পরিবারের সঙ্গে আছি, আমার জন্য তাদেরও বিপন্ন হতে হবে। শেষপর্যন্ত এই নির্দেশ মাথা পেতে নিতে হল।

সেই দিনই শহর ছাড়লাম। আমাদের বহু পুরানো দিনের এক সহকর্মী শ্রমিক বন্ধু আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এল বুড়ীগঙ্গার ওপারে তার আস্তানায়। সেখানে একটা দিন তার সঙ্গে কাটাতে হবে। তার পরদিন আর কেউ সেখান থেকে আমাকে গ্রামাঞ্চলে নিয়ে যাবে। কোথায়, কতদূরে কোন্ গ্রামাঞ্চলে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেব সেটা এখনও স্থির হয় নি। কে স্থির করবে? সেটা নিজেদের স্থির করে নিতে হবে।

২৫-এ মার্চের কালরাত্রির অবসানের পর থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার শহরবাসী প্রাণ বাঁচাবার জন্যে শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। শহর থেকে বেরোবার পথ প্রধানত দুটো। একটা ডেমরার পথ ধরে এগিয়ে গিয়ে শীতলক্ষ্যা নদী পার হয়ে নরসিংদীর দিকে, অপরটা বুড়ীগঙ্গা নদী পার হয়ে দক্ষিণ দিকে। এই ভাবে ওরা বাংলাদেশের নানা জেলার গ্রামে গ্রামে গিয়ে মাথা বাঁচাবার আশ্রয় খুঁজছে। গ্রামে যাদের নিজেদের বাড়িঘর আছে অথবা আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ি আছে, তারা সেই দিক লক্ষ্য করে চলেছে। আবার এমন অনেক লোক আছে তাদের সংখ্যা বড় কম নয়, যাদের কোন লক্ষ্য নেই, তারা যে-কোন জায়গায় আশ্রয় পাওয়ার জন্য নিরুদ্দেশের পথে এগিয়ে চলেছে। আপাতত আমার অবস্থা তাদেরই মত। মুসাফির, বেরিয়ে পড়ো পথে, তারপর পথই তোমাকে পথ দেখাবে।

বুড়ীগঙ্গা নদী পার হতে হলে বিপদের আশঙ্কা আছে, খুবই হুঁশিয়ার হয়ে চলতে হয়। মিলিটারির লোক সদরঘাটের পথ আটকে দাঁড়িয়ে আছে, সে পথ দিয়ে ওরা কাউকে যেতে দেয় না, কাজেই সদরঘাটকে এড়িয়ে, বেশ কিছুটা নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করে ডাইনে বাঁয়ে নদী পাড়ি দিতে হয়। কিন্তু মিলিটারি নদীর ধার দিয়ে টহল দিয়ে ফিরছে। মাঝে মাঝে তাদের শিকারের শখ জাগে, তখন তারা ওপার-গামী যাত্রীবাহী নৌকাগুলিকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তাদের এই শিকারের সাধ মেটাবার জন্য অনেক নৌকাডুবি ঘটেছে। কিছু কিছু

লোক মারাও গেছে, তবুও দলের পর দল প্রাণ বাঁচাবার জন্ত প্রাণের মায়া ছেড়ে নদী পাড়ি দিয়ে চলেছে। স্থির হয়েছে আমরা ফরিদাবাদের ঘাট দিয়ে নদী পার হয়ে ওপারে যাব। আমাদের এ পাড়ার মজিদ নামে ছেলেটি রিক্সা চালায়। সে-ই আমাদের রিক্সা চালিয়ে ফরিদাবাদের ঘাটে নিয়ে যাবে। সময় বড় খারাপ, পথে পথে মিলিটারির লোকেরা ঘোরাফেরা করছে, তারা খেয়াল হলে যা কিছু তাই করে বসতে পারে। তাই রিক্সাওয়ালাদের মধ্যে অনেকেই পথে বেরোতে সাহস করে না। কিন্তু মজিদ এক কথায় রাজী হয়ে গেল। এই কঠিন সঙ্কটের মুখে, সর্বগ্রাসী ধ্বংস ও হত্যালীলার মাঝখানে ওর ভেতর থেকে একটা নতুন রূপ বেরিয়ে আসছে, ওর কাছ থেকে এটা একেবারেই আশা করি নি।

মজিদের বয়স বছর কুড়ি। দু'এক বছর বেশীও হতে পারে। বছর খানেক ধরে রিক্সা চালিয়ে আসছে। কিন্তু একাজে ওর মন বসে না, কাজের চেয়ে ফাঁকিই দেয় বেশী। ওর মন পড়ে থাকে জুয়া খেলার দিকে। দু'চার ঘণ্টা রিক্সা চালিয়ে যা পয়সা পায়, তার বেশীর ভাগই জুয়ার পায়ে জলাঞ্জলি দেয়। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে, এই ছেলের মুখের দিকে তাকিয়েই ওর মা ভবিষ্যতের সুখ-স্বপ্ন দেখে। কিন্তু ছেলের ঘরের দিকে মন নেই, সে বাইরে বাইরে আড্ডা মেরে বেড়ায়। ওর নানী আর মা এই নিয়ে ওকে দিন-রাত বকাঝকা করে কিন্তু ছেলের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই, সে অনায়াসে তা গায়ের ধুলোর মত ঝেড়ে ফেলে দেয়।

এসব কারণে মজিদকে কোনদিনই ভাল চোখে দেখতে পারি নি। কিন্তু আজ মজিদ আর সে মজিদ নেই। মজিদ আজ অবাক করে দিয়েছে আমাকে। আজ এই দুর্দিনে সবাই যখন প্রাণভয়ে জড়সড় হয়ে দিন কাটাচ্ছে, তখন ওর মনে ভয়ডর বলে কিছু আছে তা বোঝার উপায় নেই। এ পাড়ায় যার যখন প্রয়োজন হয় ও তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়; তার পক্ষে যেটুকু সাহায্য করা সম্ভব, তা করতে সে দ্বিধা করে না। এতদিন ওর যৌবনের প্রথম দিনগুলি অকাজে আর কুকাজে কেটে যাচ্ছিল, আর এই দুঃসময়ে সে-ই হয়ে দাঁড়িয়েছে সবচেয়ে নির্ভীক, সবচেয়ে কাজের মানুষ। মজিদ মুগ্ধ করে দিয়েছে আমাকে। আশ্চর্য হয়ে ভাবি, ওর এই রূপটাকে ও এতদিন কেমন করে লুকিয়ে রেখেছিল!

বিদায় লগ্ন এসে গেছে। জোর করে মায়ার বাঁধন কাটিয়ে যাবার জন্ত তৈরী হয়েছি। আমি আর আমার সেই শ্রমিক বন্ধুটি মজিদের রিক্সায় উঠে

বসেছি। আমাদের ঘরের লোকেরা মজিদকে উদ্দেশ্য করে বার বার হুঁশিয়ারি দিয়ে চলেছে, দাদা নৌকায় না উঠা পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে থাকবি, নৌকা ছাড়লে চলে আসবি, তার আগে নয়। মজিদ অন্যদিকে তাকিয়ে যেন ভাবছে, এসব কথা যে ওর কানে গেছে তা দেখে মনে হয় না।

বেলা যখন প্রায় ১০টা তখন আমরা ফরিদাবাদ এসে পৌঁছলাম। পথের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। এপাশে ওপাশে ধ্বংস আর ভস্মাবশেষের চিহ্ন। আমার ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতেও তা ধরা পড়ছে। সমস্ত পরিবেশ আর আবহাওয়া যেন কেমন এক গুরুতর আতঙ্কের ভারে ভারী হয়ে আছে। অনুভব করতে পারছি এখনও পথে চলাটা নিরাপদ নয়। যারা প্রয়োজনের তাগিদে পথ দিয়ে চলাফেরা করছে, তারা যেন নিজেদের প্রাণটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে করে চলেছে। পথেঘাটে মৃত্যুর ছড়াছড়ি। জীবন বড় সুলভ, বড় অস্থির, তার একবিন্দু নিশ্চয়তা নেই। ভাবছিলাম, বিধবার একমাত্র ছেলে, একমাত্র নির্ভরস্থল মজিদকে আবার এই বিপৎসঙ্কুল পথ দিয়ে ফিরে যেতে হবে।

ফরিদাবাদের রাস্তা থেকে নদীর ঘাটটা বেশ কিছুটা দূরে। মজিদকে বিদায় দিয়ে বললাম, তুমি তা হলে এবার যাও, আমরা তো এসেই গেছি। মজিদ আমার উদ্দেশে আদাব জানাল, মুখে কিছু বলল না। তাকে বিদায় দিয়ে কিছুটা পথ চলে আসার পর হঠাৎ নজরে পড়ল, মজিদ আমাদের পিছু পিছু আসছে।

এ কি, তুমি আবার আমাদের সঙ্গে আসছো কেন? যাও, ঘরে ফিরে যাও।

মজিদ মৃদু কণ্ঠে উত্তর দিল, আমাকে ঘাট পর্যন্ত সঙ্গে থাকতে বলেছিল। আপনারা নৌকায় উঠুন, তারপর আমি যাব।

না, না, তোমাকে আর সঙ্গে যেতে হবে না, আমরা দু'জনে একসঙ্গে বলে উঠলাম।

আমাদের কাছ থেকে বাধা পেয়ে দাঁড়িয়ে রইল মজিদ, কোন কথা বলল না। বুঝলাম, অনিচ্ছা-সত্ত্বেও এবার সে ঘরে ফিরে যাবে। কিন্তু ভুল বুঝেছিলাম। আরও কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখি সে তখনও আমাদের পিছু পিছু আসছে, তবে বেশ কিছুটা দূরত্ব রক্ষা করে। না, ওকে ফেরানো যাবে না, ওর কর্তব্য শেষ না করে ও ফিরবে না। আসছে আসুক, বাধা দিলাম না।

নিরাপদে আমরা একটা গুদারা নৌকায় গিয়ে উঠলাম। আরও পাঁচ-সাত জন লোক ছিল নৌকায়। এরাও আমাদের মত শহর থেকে হিজরত করে চলেছে। আমাদের নৌকা বৈঠার ছপাৎ ছপাৎ শব্দ তুলে এগিয়ে চলেছে। মৃদু-মন্দ বাতাসে টলমল করে বুড়ীগঙ্গার জল, ছোট ছোট ঢেউগুলি নৌকার গায়ে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। উপরে শান্ত নীল আকাশ। নীল নীল, ঘন নীল, সেই নীলের কোন শেষ নেই! অপূর্ব। মনে হল যেন বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য-ধারায় স্নান করে উঠলাম। মনে সহস্রতন্ত্রী যেন একই সঙ্গে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পেছনে ফেলে আসা ধ্বংস আর হত্যার লীলাভূমি ঢাকা শহরের কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল কবির সেই আবেগময়ী বিলাপবাণী—What man has made of man!

নিজের চিন্তায় ডুবেছিলাম। শ্রমিক বন্ধুটি আমাকে সচেতন করে দিয়ে বললেন, দাদা, একবার পারের দিকে চেয়ে দেখুন। মুখ ফিরিয়ে ফরিদাবাদ ঘাটের দিকে তাকালাম। তাকিয়ে দেখি, ঘাটের কাছে মজিদ তখনও দাঁড়িয়ে আছে। স্থির অবিচল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে। না, What man has made of man, এই কথাটি একমাত্র সত্য নয়। মানুষ মানুষের জন্য কি করেছে, জীবনের পদে পদে এই গভীর সত্যটিকেও অনুভব করে চলেছি। যে যাই বলুক না কেন, এই সত্যটাকে আমি কিছুতেই ভুলতে পারবো না, অস্বীকার করতে পারবো না। মজিদের উদ্দেশে হাত তুললাম। মজিদও হাত তুলে তার প্রত্যুত্তর জানাল। এক অব্যক্ত বেদনায় আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল। মনে পড়ল আমি মজিদের সঙ্গে একটি দিনের জন্য হাসি মুখে কথা বলি নি, সেই মজিদ আজ কোন কথা না বলেও কত কথা বলে গেল!

ফরিদাবাদ ঘাট থেকে বরাবর নদী পার হয়ে ঢাকা জুট মিলের ঘাটে গিয়ে উঠলাম। আমার শ্রমিক বন্ধুটির নাম বলা হয় নি, তার নাম আবিদ। ঢাকা জুট মিলের শ্রমিক, এখানে একটি ছোটো ঘর ভাড়া নিয়ে বাসা বেঁধে আছে। একাই থাকে। ২৫-এ মার্চের ঘটনার পর থেকে এই ক'দিন পাটকলের সমস্ত শ্রমিক যে যার দেশে চলে গেছে, কারখানা বন্ধ। সবাই চলে গেছে, বাকি আছে শুধু আবিদ। এ অবস্থায় তার কর্তব্য কি সে-সম্পর্কে সে তার দল-নেতাদের কাছ থেকে কোনো নির্দেশ পায় নি। ব্যগ্র হয়ে তাদের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে। এ অবস্থায় আমাকে পেয়ে সে মহাখুশী।

এবার সে তার এতদিনের জমানো সুখ-দুঃখ আর অভাব-অভিযোগের কথা মন খুলে বলবার মতো একটা লোক পেয়েছে।

আবিদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক আজকের নয়। আবিদ বহুদিনের পুরানো কর্মী। স্বাধীনতালাভের আগেই তার ট্রেড ইউনিয়নের কাজে হাতেখড়ি হয়েছিল। স্বাধীনতালাভের পর নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির আদর্শকে নিজের আদর্শ বলে গ্রহণ করল। তারপর বহু দুর্যোগ গেছে, বহু ভাঙা-চোরার মধ্য দিয়ে পথ করে বেরিয়ে আসতে হয়েছে, কিন্তু আবিদ সেদিন সেই যে-লালঝাণ্ডাকে উঁচু করে ধরেছিল, আজো তা নামায় নি। আমার চোখের সামনে দিয়ে কতো কর্মী এল আর গেল, কিন্তু আবিদ যেমন ছিল তেমনিই আছে। এতো ঘা খেয়েও, এতো প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও ওর আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা মরতে চায় না। বহুদিন জেল খেটেছে আবিদ, বছরের পর বছর পলাতক জীবন যাপন করেছে। এই নির্বোধ আর একগুঁয়ে লোকটার সঙ্গে ঘর করতে গিয়ে তার স্ত্রীকে বহু দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে, শেষ পর্যন্ত অভাবের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে তাকে ছেড়ে চলে গেছে। সেজন্য তাকে দোষ দেয় না আবিদ, তার বিরুদ্ধে তার কোনো অভিযোগ নেই। তবে মাঝে মাঝে সে-সব দিনের কথা বলতে বলতে হঠাৎ কেমন যেন ভাষা হারিয়ে ফেলে চুপ করে যায়। আজকের দিনের কর্মী যারা, তাদের মধ্যে খুব কম লোকেই আবিদের এই পেছনে ফেলে আসা দিনগুলির কথা জানে। যারা জানে, তাদের সংখ্যা বড়ই কম। আমি তাদের মধ্যে একজন। কিন্তু আমরা যে-যার নিজ নিজ বাঁধা পথে সঞ্চরণ করে ফিরি, পরস্পর দেখাশোনা কমই হয়। তাই মহা দুর্যোগের দিনে হলেও আমাকে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে সে।

নদীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট এই গ্রামটি। গ্রামটির নাম আমি ভুলে গেছি। বছর কয়েক আগে এখানে শুধু গরীব নমশূদ্র এবং মুসলমানের বাস ছিল। সুখী লোকদের যাতায়াত খুব কমই ছিল। কিন্তু কিছুকাল বাদে এই গ্রামটার দিকে তাদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ল। গড়ে উঠল ঢাকা জুট মিল। অভাবের জ্বালায় এখানকার গরীব বাসিন্দারা ভিটামাটি বিক্রি করতে শুরু করেছিল। ঢাকা শহরবাসী জনৈক ভদ্রলোক এদের কাছ থেকে বিরাট একটা এলাকা কিনে নিয়ে ইটখোলার ব্যবসা ফেঁদে বসলেন। ছিপছিপে পাতলা

লোকটি ইটের ব্যবসায় দেখতে দেখতে ফুলে উঠলেন। এখন তিনি তাঁর সেই ইটখোলার কারবার গুটিয়ে নিয়ে পাটকলের শ্রমিক, কর্মচারী, অন্যান্য ভদ্রলোকদের জন্য অনেকগুলি পাকা ঘরবাড়ি তুলে বাড়িভাড়া বাবদ মোটা হারে মুনাফা লুটছেন। আবিদ তারই একটি কোঠা ভাড়া নিয়ে আছে।

গ্রাম এখন আর সেই গ্রাম নেই, তার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। পাটকল প্রতিষ্ঠার সুযোগ নিয়ে ছোটোখাটো ব্যবসায়ীরা এখানে এসে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। নতুন নতুন দালান উঠছে। কালক্রমে এটা হয়তো ছোটোখাটো বন্দরে পরিণত হয়ে যাবে।

কিন্তু গ্রাম এখনো তার গ্রাম্যতা আর পল্লীশ্রী সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে ফেলে নি। সুবেশ ভদ্রলোকদের পাশাপাশি নোংরা লোকেরাও চোখে পড়ে। দালানগুলি এখানে ওখানে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝেমাঝে অজস্র সবুজের সমারোহ, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, মনটা স্নিগ্ধ হয়ে আসে।

কারখানার লোকেরা কারখানা বন্ধ করে দিয়ে যে-যার ঘরে চলে গেছে, কিন্তু তাই বলে লোকের অভাব নেই। ২৫-এ মার্চের পর থেকে প্রথমে শতে শতে তারপর হাজারে হাজারে লোক শহর ত্যাগ করে এখানে চলে আসছে। লোক আসছেই আসছেই, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার বিরতি নেই। এখান থেকে জিঞ্জিরা পর্যন্ত এই বিস্তৃত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বিপুল জনস্রোত অবিরত প্রবাহে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলেছে।

সবাই যে চলে যাচ্ছে তা নয়, নদীতীরের গ্রামগুলিতে হাজার হাজার লোক অস্থায়ী ভাবে আশ্রয় নিয়ে বসে গেছে। তারা আশা করছে, বিপদের ধাক্কাটা কেটে গেলে আবার তারা শহরে ফিরে যাবে। এই অস্থায়ী আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য কোনো আশ্রয়-শিবির গড়ে ওঠে নি। তারা গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কোনো মতে ঠেলেঠুলে নিজেদের জন্য একটু জায়গা করে নিয়েছে। আমাদের এই ছোট গ্রামটির মধ্যেও আশ্রয়প্রার্থীর অভাব নেই। গ্রামে এমন কোনো বাড়ি নেই যেখানে কোনো শরণার্থী নেই। শুনলাম আমাদের পাশেই এক বাড়িতে পঁয়তাল্লিশ জন লোক এসে আশ্রয় নিয়েছে। বাড়ির মালিকের সঙ্গে আলাপ হল, আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এত যে ঝামেলা, তবু তাঁর বিন্দুমাত্র বিরক্তির লক্ষণ নেই। দরদভরা কণ্ঠে বললেন, আহা, কি করবে বেচারারা।

আবিদের পাশের ঘরে ফরিদাবাদের এক হিন্দু পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছে।

ঘরটার এমন তুরবস্থা যে, কোনো ভদ্রলোক ওখানে বাস করতে পারে না। কিন্তু এই দুর্দিনে এই দুর্গত ভদ্রলোকদের আজ 'অপমানে সবার সমান' হতে হয়েছে। আবিদ কোথায় একটু কাজে বেরিয়েছিল। আমি তার নড়বড়ে খাটটার উপর শুয়ে কর্মরত ভদ্রমহিলাটির স্বগতোক্তি শুনছি। গৃহকর্তা গৃহিণীর উপর রান্নার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে এদিকে ওদিকে আড্ডা মেরে বেড়াচ্ছে, কাঠ নেই, কুটো নেই, বাসন নেই, পত্র নেই, তবু সেই ভদ্রমহিলাকে অন্ন-ব্যঞ্জন রান্না করে স্বামী-পুত্র-কন্যাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। তু'দিনের সংসার; ওরা আশা করছে, ওরা ক'দিন বাদেই আবার ওদের ফরিদাবাদের ঘরে ফিরে যাবে। হায় রে তুরাশা!

সন্ধ্যাবেলায় ভদ্রপাড়ায় রেডিও বেতার সংবাদ শুনবার জন্য আমন্ত্রণ পেলাম। সেই পাড়ায় অনেক চাকুরে, ব্যবসায়ী এমন কি তু'একজন সাংবাদিক পর্যন্ত আশ্রয় নিয়েছেন। শুনলাম অবসর-বিনোদনের জন্য একটু গানবাজনারও আয়োজন করা হয়েছে। অদ্ভুত লাগে ভাবতে। মাঝখানে এই একটি নদী, তার ওপারে চলেছে মৃত্যুর আর্তনাদ, আর এপারে সঙ্গীত। কিন্তু এও বুঝি, এই চিরতুঃখের দেশে শ্মশানের পাশেই প্রমোদশয্যা বিছাতে হয়।

সন্ধ্যার পর একজন লোককে ভারতীয় বেতারের সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে, আমি আর আবিদ ঘর থেকে বেরিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটা গাছপালায় ভর্তি মাঠের সামনে চলে গেলাম। পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবছে, আর শেষ আলোটুকু গাছগুলির মাথায় মাথায় ছড়িয়ে পড়েছে। একটা গাছের তলায় ভদ্রবেশধারী কয়েকজন বসে গল্পগুজব করছে। না, গল্প-গুজব নয়, তাদের মাঝখানে এক ভদ্রলোক পাগলের মতো কান্নাকাটি করছে, আর সবাই মিলে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শুনলাম। ভদ্রলোক-যে শুধু যথাসর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে শহর ছেড়ে চলে এসেছেন তা নয়, সেই নৃশংস দস্যুর দল তার ছেলেটিকেও হত্যা করেছে। এ অবস্থায় যেসব কথা বলতে হয়, তাই বলে সবাই তাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছে। মনটা বিকল হয়ে গেল। পায়ে পায়ে চলে এলাম সেখান থেকে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে নেমে এল, একটু একটু করে রাত্রি বাড়তে লাগল। আমরা তু'জন নির্জন নদীর ধারে বসে কথা বলছি। দিগন্তের বুক থেকে একটা স্বর্ণগোলক একটু একটু করে মাথা তুলছে। চাঁদ উঠেছে। জ্যোৎস্নার মায়াজাল ছড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবীর বুকে। কি বিচিত্র এই মানুষের মন! এই চরম

দুঃসময়েও মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। কেমন যেন আচ্ছন্নের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। আবিদ হঠাৎ আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে সচেতন করে দিল। বলল, দেখুন দেখুন, ওপারে কি হচ্ছে। চমকে উঠে চেয়ে দেখলাম, শহরের দু'-তিন জায়গায় আগুন জ্বলছে, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, আগুনের লকলকে শিখাগুলি আকাশের বুকে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। এ কিসের আগুন তা কি আমি জানি না? ওরা কি সারা শহরটাকে এমনি করে দিনের পর দিন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্মস্তূপে পরিণত করে দেবে?

তার পরের দিনটা সেইখানেই কেটে গেল। আমাকে গ্রামাঞ্চলে পৌঁছে দেবার জন্যে শহর থেকে দু'জন বন্ধু এসেছেন। সবাই মিলে বসে আলোচনা করে স্থির করেছি আপাতত বিক্রমপুরের দিকে যাওয়া যাবে। তারপর দেখা যাক কি হয়। বিক্রমপুর আমার জন্মভূমি। মাঝে মাঝে সভা-সমিতি উপলক্ষে সেখান থেকে ডাক এসেছে। অনেক সময়েই তাদের সেই ডাকে সাড়া দিতে পারি নি। চোখে দেখতে পাই না, শরীর ভালো নেই, কাজ আছে ইত্যাদি নানারকম অজুহাত দেখিয়ে এড়িয়ে গেছি। আজ আর কোনো আমন্ত্রণের প্রয়োজন হল না। নিজের তাগিদেই আজ আমাকে জন্মভূমির বুকে ফিরে যেতে হবে।

রাত্রিবেলা আমার আসার সংবাদ পেয়ে দু'জন স্থানীয় বন্ধু দেখা করতে এলেন। বললেন, আপনাদের এখানে থাকাটা ঠিক হচ্ছে না, দেখেছেন তো, একটা মিলিটারি লঞ্চ বুড়ীগঙ্গার উপর দিয়ে বারবার টহল দিয়ে ফিরছে। লক্ষণ ভালো নয়। এরা যে-কোনো সময় হামলা করতে পারে। আপনারা এখনই এখান থেকে ভেতরের দিকে চলে যান।

বন্ধুদের সৎ পরামর্শ মেনে নিলাম। রাত বাজে ন-টা। খাওয়া-দাওয়া সেরে আমাদের দু'দিনের আশ্রয়স্থল গ্রামটিকে ছেড়ে যাত্রার উদ্যোগ করলাম। বিদায়ের মুহূর্তে এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। আবিদের কথায় উচ্ছ্বাসের মাত্রা একটু বেশি থাকে। কিন্তু তার আবেগের এমন উগ্র প্রকাশ আমি আর কখনো দেখি নি। সে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে আমাকে। বলছে, কমরেড, আমার মনে হচ্ছে এই আমাদের শেষ দেখা, আর কোনোদিন আপনাকে দেখতে পাব না। রুদ্ধ কান্নায় তার কণ্ঠস্বর কাঁপছে। আমি আবেগ প্রকাশে অভ্যস্ত নই। কিন্তু আবিদ আজ অভিভূত করে দিয়েছে আমাকে।

তবু নিজেকে সংযত করে স্থির কণ্ঠে বললাম, না কমরেড, আবার আমাদের দেখা হবে। দিন ফিরবেই, আবার আমরা একসঙ্গে মিলব। আবিদ আমার এই কথাটাকে কিছুতেই মানতে চাইল না। বলল, এ কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। কেন পারছি না শুনবেন? ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের পর, আদমজী জুট মিলে বিহারী আর বাঙালিদের মধ্যে যে-ভীষণ দাঙ্গা হয়েছিল সে-কথা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার।

মনে আছে বৈকি, আমি মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিলাম।

তার আগের দিন থেকেই আমরা এই রকম কিছু একটা ঘটবে বলে আশঙ্কা করেছিলাম। ভেতরে ভেতরে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে সে কথা বুঝতে আমাদের বাকি ছিল না। এ-অবস্থায় কি করা যায় তাই নিয়ে আমরা সহকর্মীরা বসে আলাপ করছিলাম। অনেক রাত্রিতে কমরেড নেপাল নাগ এলেন। এই সঙ্কটমুহূর্তে কি করা উচিত সে সম্পর্কে তিনি আমাদের পরামর্শ দিলেন। সেই রাত্রিতেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আগে থেকেই তাঁর অন্যত্র যাওয়ার কথা ছিল। তাঁর যাওয়ার সময় আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। বেশ মনে পড়ছে, বিদায়ের সময় তাঁর দু'হাত জড়িয়ে ধরে এমনি করেই বলেছিলাম, কমরেড, আমার মনে হচ্ছে এই আমাদের শেষ দেখা। আর কোনো দিন আপনাকে দেখতে পাব না। তিনি আমার কথা শুনে হেসে উঠেছিলেন। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, আমি বলছি, নিশ্চয় আমাদের দেখা হবে। ক'দিন বাদেই দেখা হবে। কিন্তু তাঁর সেই কথা ঠিক হয় নি, আমার কথাই সত্য হয়েছিল। সেটা ছিল ১৯৫৪, আর আজ ১৯৭১, তারপর তার সঙ্গে আমার আর কোনো দিন দেখা হয় নি। কমরেড, আমার ভয় করছে আপনার সঙ্গে হয়তো আর কোনোদিন দেখা হবে না।

এ অবস্থায় যা বলা উচিত তাই বললাম। কিন্তু মনটা কেমন যেন ভারী হয়ে গেল। আমি আর আমার দুই বন্ধু গ্রামের পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। আবিদের সেই শেষ কথাগুলি বুকের মধ্যে কাঁটার মতোই খচখচ করে বিঁধছে। সেই রাত্রিতে তিন মাইল দূরে 'মসজিদ বেড়ার' এক কৃষকের বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় চাইলাম। আমাদের অবস্থা বুঝতে পেরে তিনি আমাদের সাদরে গ্রহণ করলেন। এক ঘুমে রাত্রিটা কেটে গেল। রাত্রি শেষ হয় হয়, এমন সময় আমরা তিন জন একই সঙ্গে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। ঘনঘন কামানের

গর্জন। শব্দটা ঢাকা শহরের দিক থেকেই আসছে। বাড়ির সবাই ছুটে এসে দাঁড়িয়েছে, অনেকেই বলছে, শব্দ শুনে মনে হচ্ছে ওরা জিঞ্জিরার ওপর হামলা করছে।

আমাদের গন্তব্যস্থল বিক্রমপুরের তালতলা। আর বিন্দুমাত্র দেরী না করে আমরা সেই পথ ধরে এগিয়ে চললাম। গ্রামের পর গ্রাম পার হয়ে চলেছি, পেছন দিক থেকে থেকে থেকে কামানের গর্জন ভেসে আসছে।

বন্যাধারার মতো জনস্রোত এগিয়ে চলেছে। কোথাও দলে দলে, কোথাও বা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ভাবে ছোট ছোট উপদলে বিভক্ত হয়ে। এদের মধ্যে বুড়ো-বুড়ী থেকে বাচ্চা পর্যন্ত সবই আছে। এদের মধ্যে অনেকেই নিঃসম্বল, যার যা কিছু ছিল, পেছনে ফেলে রিক্ত হস্তে চলে আসতে হয়েছে।

এই আমাদের বিক্রমপুর। গ্রাম্য কবির ভাষায় 'সোনার বিক্রমপুর'। আমার জন্মভূমি বিক্রমপুর। আমরা তিন বন্ধু সেই একই প্রবাহে গা ভাসিয়ে এগিয়ে চলেছি। এরা দু'জন আমাকে কোন এক আশ্রয়ে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরে যাবে শত্রুপুরী ঢাকা শহরে মৃত্যুর সঙ্গে ভয়াবহ লুকোচুরি খেলা খেলতে। কিন্তু কোথায় মিলবে আশ্রয়, এখন পর্যন্ত তা আমাদের জানা নেই।

বিপরীত দিক থেকে যারা আসছে, তারা আমাদের দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে; ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে, আপনারা ঢাকা থেকে আসছেন বুঝি? অবস্থা কি শহরের? ওরা নাকি একদিক থেকে সব মেরে-কেটে শেষ করছে? আওয়ামী লীগ নেতারা কি করছেন? কি ভাবছেন তাঁরা? শেষপর্যন্ত আমরা ওদের এদেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে পারব তো?

যারা পথের দু'পাশে খেটে কাজ করে, তারাও হাতের কাজ ফেলে রেখে সামনে এগিয়ে এসে সেই সব প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করে। এত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে উঠতে পারি না। তবে ওদের শেষ প্রশ্নটা, যেটা ওরা বিশেষ করে শুনতে চায় তার উত্তর দিয়ে বলি, নিশ্চয়। আজ আমরা সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী এক-মন এক-প্রাণ হয়ে ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। এবার ওদের সাগর পার করে ছাড়ব।

এসব কথা-যে শুধু তাদের মনে উৎসাহ জাগাবার জন্য বলি তা নয়, নিজেও মনে মনে তা বিশ্বাস করি। শেষপর্যন্ত আমরাই জিতব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পৌঁছুতে হলে-যে কত রক্ত ঢালতে

হবে, কত জীবন বলি দিতে হবে, পঁচিশে মার্চের সেই রাত্রির পর থেকে এই কটা দিনে তার কিছুটা আভাস পেয়েছি। বেশ বুঝতে পারছি, আমাদের পথ সহজ পথ নয়, স্বাধীন বাংলাদেশে গিয়ে পৌঁছুতে হলে রক্তের সমুদ্র সাঁতরে পার হতে হবে। এই শান্তিপ্রিয় গ্রামবাসীরা তা কল্পনাও করতে পারছে না।

সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালী-যে এমন করে এক-মন এক-প্রাণ হয়ে উঠতে পারে, একথা কোনদিনই ভাবতে পারি নি। এদেশের সমস্ত মানুষ আমাদের মানুষ, পশ্চিমী শাসকচক্রের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সবাই উন্মুখ। স্বাধীনতার অমোঘ আহ্বান দূর দূরান্তের গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। সেই আহ্বানে সবাই সমস্বরে সাড়া দিয়ে উঠেছে। যতই এগিয়ে চলেছি, এই সত্যটা বেশী করে অনুভব করছি। জঙ্গী বাহিনীর আক্রমণের ফলে যারা আমাদের মতন ঢাকা শহর থেকে সর্বস্ব হারিয়ে রিক্ত, নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসছে তাদের প্রতি এদের দরদের সীমা নেই। পথে আসতে আসতে তাদের এই প্রাণ-ঢালা সহানুভূতির অনেক খবরই আমাদের কানে এসেছে। মুন্সীগঞ্জ, তালতলা, দীঘলি, দীঘিরপাড় এবং আরও অনেক গঞ্জ ও বন্দরের লোকেরা ভিক্ষে করে চাল ডাল তরি-তরকারী তুলে হাজার হাজার শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত যাত্রীদের খাইয়ে-দাইয়ে তাজা করে তুলেছে, মাথা বাঁচাবার মতো আশ্রয়ও যুগিয়েছে। এই সমস্ত যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই বিক্রমপুরের মধ্য দিয়ে নদীপথে ফরিদপুর, বরিশাল এবং অন্যান্য জেলায় চলে গেছে। বিক্রমপুরে অধিকাংশ গ্রামের ঘরে ঘরেই আশ্রয়-প্রার্থীদের ভীড়। অভাব আর অনটনের চাপে যাদের দৈনন্দিন জীবন নিষ্পিষ্ট হয়ে চলেছে, এই নতুন উৎপাতের বোঝা বয়ে চলা তাদের পক্ষে সহজ কথা নয়। কিন্তু এই দুর্বহ বোঝা তারা প্রসন্ন মুখেই বয়ে চলেছে।

যে-সমস্ত যাত্রীরা আমাদের আগেই এখানে এসে পৌঁছে গেছে, তাদের মুখে অনেক কথাই শুনেছি। এই দুর্দিনে সাধারণ গ্রামের মানুষ তাদের প্রতি যে-দরদ দেখিয়েছে তাতে তারা অভিভূত হয়ে গেছে। তারা যে-পথ দিয়ে এসেছে তার দু'দিক থেকে গ্রামবাসীরা না চাইতেই তাদের হাতে ফল-ফলারি এবং নানা রকমের খাওয়ার জিনিস তুলে দিয়েছে। শুধু বড়রাই নয়, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও যে যা পেরেছে তাই নিয়ে তাদের সাহায্য করবার জন্য ছুটে এসেছে। কারু হাতে শশা, কারু হাতে পাকা টমেটো, কারু হাতে পাকা কলা, আরও কত কি। শুধু তাই নয়, শিশুদের জন্য কেউ কেউ বাসন ভরে দুধও নিয়ে এসেছে।

যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছে, আত্মীয় নয়, স্বজন নয়, অজানা আর অচেনা মানুষের জন্য-যে মানুষের প্রাণ এমন করে কাঁদতে পারে, তা আর কখনও দেখি নি।

শহর-ত্যাগী এ সমস্ত যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশ খালি হাতে চলে এলেও কিছু কিছু লোকের হাতে জিনিসপত্রও আছে, বেশ দামী জিনিসও আছে ; পথে চোর, ডাকাত, বদমাশ গুণ্ডারা অনায়াসেই এদের উপর হামলা করে সবকিছু লুটেপুটে নিতে পারত। তাদের হাত থেকে কে এদের রক্ষা করত। কিন্তু তা হয় নি।

অবশ্য এর একটা ব্যতিক্রমও ঘটেছে—সেই কাহিনীটা বলছি। অনেক যাত্রী নারায়ণগঞ্জ শহর ছেড়ে মুন্সীগঞ্জ হয়ে দীঘিরপাড়ে যাবার জন্য পায়ে হেঁটে রওনা হয়েছিল। নারায়ণগঞ্জ মুন্সীগঞ্জের মাঝখানে কয়েকটা বড় বড় চর। তাদের মধ্যে গোবরার চর ডাকাতের জন্য কুখ্যাত। চর অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এই ডাকাতদের ভয়ে টুঁ-শব্দটি করতে সাহস করে না। যাত্রীদের একটা দল গোবরার চরের কাছে আসতেই একদল ডাকাত এসে তাদের উপর হামলা করল এবং তাদের যথাসর্বস্ব লুটে নিল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত চর অঞ্চলে এই খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। এই খবর শুনে চরের মানুষ ক্ষেপে উঠল। মিলিটারির অত্যাচারের ফলে যেই অসহায় মানুষগুলি শহর ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে, এই এলাকায় এসে তাদের এই দুর্গতি ভোগ করতে হবে! দেখতে দেখতে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে বহুলোক এসে জড় হল এবং সেই উত্তেজিত জনতা স্থানীয় চারজন ডাকাতকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলল। অথচ ইতিপূর্বে এই ডাকাতদের দুর্দান্ত প্রতাপে সবাই ভয়ে জড়সড় হয়ে থাকত। এমন অসম্ভব ঘটনা কি করে সম্ভব হল? এর একমাত্র উত্তর, "স্বাধীন বাংলা" প্রেরণায় ও আবেগে চর অঞ্চলের অধিবাসীরাও নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছিল।

কোথায় যাব, কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেব, তার কোন ঠিকঠিকানা ছিল না। অবশেষে আশ্রয় একটা মিলল। এই দূর গ্রামাঞ্চলে এমন প্রাণ-ঢালা ভালবাসা আর সাদর সংবর্ধনা-যে আমার জন্য অপেক্ষা করছে, সেটা ভাবতেই পারি নি। বুড়ীগঙ্গার তীরে আবিদের ঘরে দুপুরবেলার আধো ঘুম আধো জাগ্রত অবস্থায় বহুকাল আগে পেছনে ফেলে আসা একটি স্মৃতি-ছবি মনের মধ্যে ঝলসে উঠেছিল। বহুকাল মানে তিরিশ বছর আগেকার কথা। স্বাধীনতার

সংগ্রামের যুগে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে পলাতক অবস্থায় ছোট্ট একটি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের স্নেহচ্ছায়ার আশ্রয় পেয়েছিলাম। স্বামী, স্ত্রী আর ছোট একটি শিশু এই নিয়ে তাদের সংসার। সংসারের গৃহিণী এই নতুন বউটি ছিল এই সংসারের মধ্যমণি; সেই দুর্যোগের দিনে স্বামী-স্ত্রী যুগলকে আমাদের জন্য বহু দুঃখ-দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। আমার এবং আমাদের দেখাশুনা আর রক্ষণাবেক্ষণের মূল দায়িত্ব ছিল বউটির উপর। তখন তার কতই বা বয়স। আমরা তাকে আদর করে ডাকতাম 'বউমা'।

যারা 'স্বদেশী' করে অর্থাৎ স্বদেশ-সেবার সুযোগে বহু লোকের ঘরকে আপন ঘর বলে দাবী করবার অধিকার পায় এবং দেশসেবক হিসেবে সমাজের দশজনের শ্রদ্ধা ও আদর কুড়িয়ে বেড়ায়, তাদের মতো নিমকহারাম খুঁজে পাওয়া ভার। কথাটা আত্মবিরোধী বলে মনে হতে পারে, তা হলেও কথাটা সত্যি। আমি আমার দেশসেবক বন্ধুদের মধ্যে এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেখেছি। আমি নিজেও তাদেরই একজন।

দেশ স্বাধীন হল। এই নতুন অধ্যায়ে আমার কর্মক্ষেত্র আর পরিবেশ দুটোই গেল বদলে। তারপর কাজ-অকাজের টানা-পোড়েনের মাঝখানে আটকে পড়ে এতকাল সেই 'বউমা'দের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ তিরিশ বছর বাদে নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে সেই হতভাগা-হতভাগিনীদের কথা মনে পড়ে গেল। নিমকহারামী আর কাকে বলে!

তিরিশ বছর বাদে সেই বউমা আজ প্রৌঢ়া গৃহিণী—সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী। ছেলেরা বিয়ে-থা করেছে, ছেলেমেয়েদের বাপ হয়েছে—সংসার কূলে কূলে ভরে উঠেছে। কিন্তু সংসার-চক্রটা এখনও আমাদের সেই বউমাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে চলেছে। ছেলেমেয়েরা জ্ঞান অবস্থায় আমাকে চোখে দেখে নি, কিন্তু ছোটবেলা থেকেই আমার নাম শুনে শুনে আমাকে নিতান্ত আপন জন বলেই জেনে এসেছে। তাদের মনের অবস্থা যেমন ছিল তেমনিই আছে, শুধু আমিই তাদের খোঁজ রাখতাম না। এতদিন বাদে অপ্রত্যাশিত ভাবে আমাকে পেয়ে কর্তা, গৃহিণী আর ছেলেমেয়েরা সানন্দে আর সাগ্রহে আমাকে তাদের মধ্যে টেনে নিল। লজ্জা পেলাম। ভীষণ লজ্জা পেলাম। বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, নিমকহারামদেরও চক্ষুলজ্জা থাকে।

বাপ আর ছেলেরা সবাই রাজনীতির চর্চা করে। সক্রিয় ভাবে কে কি করে

জানি না, তবে বাপ আর ছেলেদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ ও তর্ক-বিতর্ক অষ্টপ্রহর লেগেই আছে। এরা সবাই একমতের নয়। তাই এদের তর্ক-বিতর্ক আর থামতে চায় না। তবে স্বাধীন বাংলা অভিযানে সবাই একমত।

একটা জিনিস লক্ষ করবার মতো। রাজনৈতিক আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের ব্যাপারে একটি উদার গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষিত হয়ে থাকে। তর্কের মুখে ছেলেরা বাপের বা বড় ভাইয়ের বিরুদ্ধে নিজেদের মতামতটা সঙ্কোচ বা সম্ভ্রমের বল্‌গা ছাড়াই প্রকাশ করতে পারে। তর্ক যখন উদ্দাম হয়ে ওঠে তখন তাদের উচ্চ কলরবে সারা বাড়িটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে, সংসারের কর্ত্রী কিন্তু এসমস্ত বাদ-বিতণ্ডা হতে মুক্ত থেকে সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। তাকে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, বউমা, এরা অমন করে ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছে কেন? কর্মরত বউমা একটু মুখ টিপে হেসে উত্তর দিল, কি আর করবে, পেটের ভাত হজম করতে হবে তো।

দিন দুই থেকে পাশের বাড়িতে কান্নার রোল শুনতে পাচ্ছি। কোন এক হতভাগিনী বুক-ফাটা কান্না কেঁদে চলেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, এই বিধবার একমাত্র ছেলে, ১৮ বছর বয়সের রামু জিঞ্জিরায় মিলিটারি হামলার ফলে মারা গিয়েছে। রামু আর তার দুই জন সঙ্গী ঢাকা শহরে পান চালান দেওয়ার জন্য জিঞ্জিরায় গিয়েছিল। হাজার হাজার লোক শহর ছেড়ে জিঞ্জিরায় আশ্রয় নিয়ে দিনপাত করছিল। যে রাত্রিতে আমরা বন্ধুদের হুঁশিয়ারীর ফলে বুড়ী-গঙ্গার তীর ছেড়ে 'মসজিদ বেড়া' গ্রামে চলে এসেছিলাম সেই রাত্রিতে রামুরা জিঞ্জিরাতেই ছিল। রামুর ভাগ্য যেন সুপরিকল্পিত ভাবে তাকে এই মৃত্যুর গহ্বরে টেনে নিয়ে এসেছিল। রাত্রির শেষভাগে সৈন্যের দল ওপার থেকে নদী পার হয়ে এপারে চলে এল। এপারে হাজার হাজার লোক নিঃশঙ্ক চিত্তে ঘুমিয়ে আছে। হিংস্র শ্বাপদের দল অতি সন্তর্পণে সবার অলক্ষ্যে এক বিরাট এলাকাকে ঘিরে ফেলল। রাত্রির অন্ধকার তখনও কেটে যায় নি, এমন সময় ওপার থেকে গর্জে উঠল কামান, সেই সঙ্কেত-ধ্বনির সাথে সাথেই সেই বৃত্তাকার বেষ্টনীর এদিক থেকে ওদিক থেকে একই সঙ্গে কতকগুলি মেসিনগান অবিরল বৃষ্টিধারার মত গুলি বর্ষণ করে চলল। যারা ঘুমিয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘুম ভেঙে উঠে বসবার আগেই চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর সে কি আর্তনাদ আর ছুটোছুটি। অথর্ব বৃদ্ধ থেকে কচি শিশুরা পর্যন্ত প্রাণ বাঁচাবার

জন্য পাগলের মত যে যেদিকে পারে ছুটতে লাগল। বাপ মা, ছেলেমেয়ে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ল। শত শত অসহায় প্রাণীর রক্তে বুড়ীগঙ্গার তীর লাল হয়ে গেল। সেই আধো আলো আধো অন্ধকারে এই মানুষ-শিকারীর দল তাদের শিকারের উৎসবে মেতে উঠল। যারা মারা গেল, রামু তাদেরই একজন। তার দু'জন সঙ্গী কোনমতে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছে। জিঞ্জিরার এই বর্বর হত্যাকাণ্ড আর ধ্বংসলীলার কথা ইতিপূর্বে কানে এসেছিল, কিন্তু এবার শুনলাম স্বয়ং প্রত্যক্ষদর্শী আর ভুক্তভোগীর মুখে।

বিক্রমপুরের গ্রামবাসীদের অবস্থা আর মনোভাব বোঝবার জন্য একজন সাথীকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। যেখানে যাই সেখানেই দেখি প্রতিরোধের প্রস্তুতি চলছে। এরা পশ্চিমা হামলাকারীর হাত থেকে দেশকে মুক্ত করবে। ছোট বড় সকলের একই মনোভাব। পঁচিশে মার্চের আগেকার ঢাকা শহরের মতো এখানেও গ্রামে গ্রামে প্যারেড চলছে।

বেশীর ভাগ জায়গায় খালি হাতেই, নয়তো বড়জোর খেলনার রাইফেল নিয়ে প্যারেড করছে। কোন কোন জায়গায় থানা থেকে ছিনিয়ে আনা আসল বন্দুক বা রাইফেলও আছে। যে-সব গ্রাম বা থানা এলাকায় স্বাধীনতাকামী রাজনৈতিক দলের কর্মীরা আছে সেখানে তাদের উদ্যোগে এসব হচ্ছে। আর যেখানে তারা নেই, সেখানে গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগেই এসব করছে। প্রাক্তন সৈন্য, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর লোকেরা ট্রেনিং দানের দায়িত্ব নিয়েছে। বেশ বুঝতে পারছি, শুধু বিক্রমপুর নয়, সারা বাংলাদেশের যেখানেই যাই না কেন, এই একই ছবি দেখতে পাব।

কিন্তু মাত্র কয়েকটা দিন, তার পরেই অবস্থার মোড় ঘুরতে থাকে। এতদিন ধরে ভারতীয় বেতার বাংলাদেশের জেলায় জেলার মুক্তিফৌজের সাফল্যের বর্ণনায় উদাত্ত হয়ে উঠেছিল। তার সুর একটু একটু করে নেমে আসছে। রাজধানী ঢাকা শহরে বর্বর হামলাকারীর দল অবাধে তাদের পৈশাচিক লীলা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের প্রতিরোধ করবার মতো কেউ নেই। সারা বাংলাদেশের মানুষ যার আহ্বানে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়েছিল, সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আজ সত্য সত্যই কারা-অন্তরালে। কে তাদের পথ দেখাবে, কে তাদের পরিচালনা করবে, কে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেবে? সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে সে কথা সত্য, কিন্তু কি দিয়ে লড়াই করবে তারা, খালি

হাতে তো আর লড়াই করা চলে না। মুখে যে যাই বলুক না কেন, অনুভব করতে পারছি, সাধারণ মানুষের মনে একটা ম্লান হতাশার ছায়া নেমে এসেছে।

বিক্রমপুরের বিভিন্ন কেন্দ্রে আমাদের কর্মীদের সঙ্গে দেখাশুনা আলাপ আলোচনা করেছি। কর্মীরা উৎসাহ হারায় নি, তারা অক্লান্ত ভাবে তাদের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। যে-অবস্থায় থাকি না কেন, সংগ্রাম আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে, এ বিষয়ে তাদের মনে কোনো দ্বিধা নেই, সে কথা সত্য, কিন্তু তাদের মনেও প্রশ্ন আছে। আমি শহর থেকে এসেছি, হয়তো উপরের স্তরের কোনো কোনো খবর আমার জানা থাকতেও পারে। তাই অনেক আশা নিয়েই তারা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, আমরা অস্ত্র কোথায় পাবো? কারা আমাদের ট্রেনিং দেবে? সেজন্য কি ব্যবস্থা হচ্ছে? শুধু আমাদের দলের ছেলেরা নয়, অন্যান্য দলের ছেলেরাও—এমন কি অদলীয় ছেলেরাও আমার আসার খবর পেয়ে আমাকে এসে ঘিরে ধরে। তারাও সেই একই প্রশ্ন করছে। অনেক আশা আর আগ্রহ নিয়ে তারা আমাকে প্রশ্ন করে। কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর আমি কি জানি?

নিত্য নতুন দুঃসংবাদ আসছে। যে-সমস্ত শহর মুক্তিফৌজের অধিকারে ছিল সেগুলি একের পর এক শত্রুপক্ষের দখলে চলে যাচ্ছে। যেখানে ওরা সামান্য মাত্র প্রতিরোধ পেয়েছে, সেখানেই ওরা ওদের নির্মম প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করে চলেছে। শহরগুলিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে, গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে, অকারণে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করছে। সারা পৃথিবীতে এ দৃষ্টান্ত মিলবে না। শহরগুলিকে ওদের আয়ত্তের মধ্যে এনে এখন ওরা গ্রামের দিকে চলে আসছে। ওরা স্থির করেছে, ওরা কাউকে রেহাই দেবে না, বিদ্রোহের অগ্নিকণাগুলিকে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দেবে। ওরা স্থির করেছে, ওরা বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের চিহ্নটুকু নিঃশেষে মুছে ফেলে দেবে। ওরা স্থির করেছে, ওরা আমাদের চিরদিনের মতো গোলাম করে রেখে দেবে।

দুই সপ্তাহ পার হয়ে তৃতীয় সপ্তাহ চলছে ওরা ওদের অক্টোপাশের মতো রক্তচোষা বাহুগুলিকে গ্রামাঞ্চলের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে, বিক্রমপুর তখন ওদের আক্রমণের বাইরে। এখানকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অব্যাহতভাবে বয়ে চলেছে। কৃষক তার ক্ষেতে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কাজ করে চলেছে, মাঝিরা নৌকা

বেয়ে যাচ্ছে, ছেলেরা খেলা করছে, ঘরের বৌ-ঝিরা সংসারের কাজ করছে। কি মারাত্মক বিপদের খড়্গ তাদের মাথার উপর ঝুলছে, তাদের মধ্যে অনেকেই সে কথা জানে না। কিন্তু যারা বুঝতে পারছে তারা অস্থির হয়ে উঠছে। আমাদের কর্মীদের মুখের দিকে তাকালে সে কথা বুঝতে বাকী থাকে না। শুধু আমাদের কর্মীদের কথাই নয়, যে-সকল ছেলে কোনদিন রাজনৈতিক সংস্পর্শে ছিল না, তারাও আজ অস্থির হয়ে উঠেছে। যে-সব ছেলে দিন-রাত আড্ডা মেরে বেড়াত, হাল্‌কা কথা আর হাল্‌কা চিন্তা নিয়ে মত্ত থাকত, এই আসন্ন মহা বিপর্যয়ের মুখে তারা যেন এক নতুন চরিত্র গ্রহণ করতে চলেছে। ওরা বলছে, ওরা আমাদের জানোয়ারের মতো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারবে তা হবে না, যদি মরতেই হয় মরব, কিন্তু মরবার আগে ওদের ভাল করে শিক্ষা দিয়ে যাব। ওদের দেখিয়ে যাব, বাঙ্গালী শুধু মরতে নয়, মারতেও জানে।

এই সমস্ত ছেলের মুখ থেকে যে, এই জাতীয় কথা বেরিয়ে আসতে পারে তা তো কল্পনাও করি নি কোনদিন। কিন্তু এ শুধু কথার কথা নয়, ওরা মুখে যা বলছে কাজের মধ্যে দিয়েও তা প্রমাণ করতে চলেছে। এই তো সেদিন আমার ঘনিষ্ঠ কয়েকটি ছেলে এই দুর্যোগের দিনে ফরিদপুরের দিকে চলে গেছে। শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হলেও ফরিদপুরের কতকগুলি অঞ্চল নাকি এখনও মুক্ত এলাকা। সেই পথ দিয়ে গিয়ে ওরা সীমান্তের ওপারে যাবে। সেখানে নাকি অস্ত্রের অভাব নেই। তারা সেখান থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করে নিয়ে আবার ফিরে আসবে। রাইফেল নয়, ওরা নিয়ে আসবে মেসিনগান। মর্টার আর মেসিন-গানের বিরুদ্ধে রাইফেল দিয়ে যুদ্ধ করা যায় না।

আমি আপত্তি করে বলেছিলাম, ভাল করে না জেনেশুনে তোমাদের যাওয়াটা ঠিক হবে না, আর ওপারে গেলেই অস্ত্র পাবে এর কোন মানে আছে? কী তোমাদের পরিচয়, কে তোমাদের হাতে বিশ্বাস করে অস্ত্র ছেড়ে দেবে? ওরা আমাকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু আজ আমার কথায় কেউ কর্ণপাত করল না, যা বলেছিল তাই করল। কেনই বা করবে না, আমি তো ওদের কোন বিকল্প পথ দেখাতে পারি নি। এরা সবাই আজ অনুভব করতে পারছে যে, এদের গলার ফাঁসটা একটু একটু করে ক্রমশ আঁট হয়ে আসছে। যা করবার এই মুহূর্তেই, নয়তো পরে আর কিছু করবার উপায় থাকবে না। তাই ওরা মরীয়া হয়ে অনিশ্চিতের পথে ছুটে চলেছে। শুধু এরাই নয়, শুনলাম আরও ক'জন চলে

গেছে আগরতলার দিকে। ওরা না কি কার কাছে শুনেছে সেখানে গেলে অস্ত্রও পাওয়া যায়, ট্রেনিংও পাওয়া যায়। আর এই উদ্দেশ্যেই আর দু'টি দুঃসাহসী ছেলে নাকি কোলকাতার দিকে যাত্রা করেছে।

অবস্থা যতই প্রতিকূল হোক না কেন, আমাদের হাতে কিছু থাক আর নাই থাক, আমরা আমাদের প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যাবই। আমাদের কর্মীদের মধ্যে অধিকাংশ মনে মনে এই মন্ত্র জপ করে চলেছে। আমি কি করব? এ অবস্থায় আমার কি ভূমিকা থাকতে পারে? অন্যকে পথ দেখাতে চেষ্টা করি, অথচ নিজে পথ দেখতে পাচ্ছি না। এইসব নানা চিন্তায় মন যখন আচ্ছন্ন, এমন সময় ঢাকা শহরের দু'জন তরুণ কর্মী এসে হাজির। তারা নানা জায়গায় খোঁজ করতে করতে অবশেষে এখানে এসে আমার সন্ধান পেয়েছে। তাদের হাতে এক জরুরী চিঠি। বন্ধুরা নির্দেশ পাঠিয়েছেন অবিলম্বে বর্ডার পার হয়ে আগরতলায় চলে যেতে হবে। চিঠিখানা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। আমার জীবনের এ এক চরম সঙ্কটময় মুহূর্ত। আমার সোনার দেশ আর দেশবাসী যখন এক মহাবিপর্যয়ের মুখে তখন আমি তাদের ছেড়ে এখানকার সমস্ত দায়িত্ব বিসর্জন দিয়ে বর্ডারের ওপারে নিরাপদ আশ্রয়ে স্থান নেব। আর আমার এ-সমস্ত তরুণ ভাইবোনেরা যারা সুদিনে দুর্দিনে আমাকে ঘিরে আছে, যাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আমি আমার জরাজীর্ণ দেহ, আমার হারিয়ে ফেলা তারুণ্যকে ফিরে ফিরে পাই, যাদের উৎসাহ-প্রদীপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আমি নিজে উৎসাহিত হয়ে উঠি, তাদের এই কঠিন বিপদের মুখে ফেলে চলে যাব আমি। অবশ্য বাস্তবমুখী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে এই ভাবালুতার কোনো মানে হয় না। দৃষ্টিশক্তির অভাবে আমি একা চলাচল করতে পারি না, আমার মাথা গুঁজবার মতো আশ্রয়টুকু নেই, এই দুঃসময়ে আমি তাদের কোন কাজে আসব? বরং আমাকে নিয়েই তারা বিব্রত হয়ে উঠবে। এমনিতেই তাদের বহু সমস্যা, আমি তাদের সমস্যার বোঝাটা বাড়িয়ে তুলব মাত্র। কিছুদিন আগে আমার এক সহকর্মী বন্ধু আমার সামনে এই যুক্তিটা তুলেছিল। সেদিন তার কথাটা একেবারেই ভাল লাগে নি, কিন্তু আমি সেদিন তার যুক্তির কোন সদুত্তর দিতে পারি নি। চুপ করে গিয়েছিলাম। আজও আবার সেই যুক্তির সম্মুখীন হয়েছি।

চলে যাব। চলেই যেতে হবে। খবরটা ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে আট-দশটি ছেলে এসে আমাকে ঘিরে ধরেছে, এরা আমাদের কর্মী, এরা

আমাদের রক্তের রক্ত, প্রাণের প্রাণ। এদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা ভবিষ্যতের সোনার স্বপ্ন দেখি। এরা আমাকে বিদায় দিতে এসেছে। এরা শুনে খুশী হয়েছে। বলছে, হ্যাঁ, এই ভাল হয়েছে। আপনি আগে যান, আমরা পরে যাচ্ছি। আমরা যাতে অস্ত্র পেতে পারি, ট্রেনিং পেতে পারি, সেই ব্যবস্থা পাকাপাকি করে তুলুন। এদের চোখে আসন্ন বিচ্ছেদের ব্যথা, কিন্তু মুখে হাসি। কিন্তু কই, আমি তো অমন করে হাসতে পারছি না! একটা দুঃসহ গ্লানি আর অবসাদে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। বিদায়-বেলায় কি কথা বলে যাব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না।

বাংলাদেশ সংগ্রামের সামাজিক পটভূমি

—অনুপম সেন

প্রসিদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক ও অর্থনীতিবিদ গুনার মিরডাল তাঁর 'এশিয়ান ড্রামা' গ্রন্থে এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতে এক বিরাট নাটক সংঘটিত হচ্ছে। এই নাটকের মূল এই অঞ্চলের মানুষের বিরাট আশা-আকাঙ্ক্ষা ও তার ব্যর্থতা। মিরডালের মতে, এই ব্যর্থতার ফলে এই অঞ্চলের দেশ-গুলোতে যে-নাটকীয় সংঘাত রূপপরিগ্রহ করছে, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয়তো ট্র্যাজিক হবে, যদি না, এসব দেশের নেতৃবৃন্দ প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে পারেন, দেশকে সঠিক পথে চালিত করতে পারেন। অন্তত একটি দেশের ক্ষেত্রে তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে, সে দেশের অসংখ্য জনগণের ভাগ্যে নেমে এসেছে বিরাট দুঃখ-দুর্দশা। সে দেশটি হ'ল পাকিস্তান।

রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানের জন্ম হয় ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে। কিন্তু ভবিষ্যতের এই মর্মন্তুদ ট্র্যাজিক নাটকের প্রথম অঙ্কের যবনিকা উন্মোচিত হয়েছিল পলাশীর প্রান্তরে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে বাংলার সুলতানের পরাজয়ে।

এই পরাজয়ের ফলে বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে একটা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে, একটা সমাজব্যবস্থার অবসান হয়। এই সমাজব্যবস্থা যে ভাবে ধ্বংস হয় তার মধ্যে নিহিত ছিল কি ভাবে এই উপমহাদেশে আগামী দিনে দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হবে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির বীজও সুপ্ত ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের ইতিহাসেই।

ইংরেজদের ভারত অধিকারের আগে পর্যন্ত এদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল স্বৈরাচারী এবং তার ভিত্তি ছিল এক অনড় সমাজ-কাঠামো। যে-কোন্ দেশের সমাজ-কাঠামো নির্ভর করে সে দেশের সামাজিক অর্থনীতি বা সামাজিক উৎপাদনপদ্ধতির উপর। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তার সমাজব্যবস্থার স্থিতি-শীলতার কারণ আমরা দেখতে পাই তার অর্থনৈতিক জীবনে চলিষ্ণুতার অভাবের মধ্যে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের উৎপাদনপদ্ধতির প্রধান

উপাদান ছিল ভূমি, কিন্তু তার কৃষিব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক জীবন নির্ভর করত স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজগুলোর উপর। জমির উপর ব্যক্তির ভোগের অধিকার ও মালিকানা স্বীকৃত হলেও জমির প্রকৃত স্বত্ব ছিল গ্রামসমাজেরই। জমি বিক্রী বা হস্তান্তর করতে হলে গ্রামসমাজের অনুমোদনের প্রয়োজন হত। পাশ্চাত্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর মালিকের যে-সার্বভৌমত্ব ছিল, ভারতবর্ষে ব্যক্তির জমি-স্বত্ব সে ধরনের ছিল না। ভারতবর্ষে গ্রামসমাজগুলো ছিল এক একটা ছোট ছোট প্রজাতন্ত্রের মত, তারা গ্রামবাসীদের সব প্রয়োজনই মেটাতে পারত। প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিল রাষ্ট্রের প্রধান অর্থনৈতিক যন্ত্র, দেশের কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রীভূত ছিল এই গ্রামসমাজগুলোতে। কার্ল মার্কস চমৎকার ভাবে এদের গঠন-প্রণালী বর্ণনা করেছেন। তাঁর ভাষায়, "গ্রামসমাজের শাসনতন্ত্র ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের ছিল। ভারতের যে সব জায়গায় এদের গঠন-প্রণালী অত্যন্ত সহজ ও সাধারণ ছিল সেখানে জমি চাষ করা হত যৌথভাবে ও পরে ফসল বণ্টন করে দেওয়া হত সবাইয়ের মধ্যে। প্রত্যেক পরিবারে জীবিকার আরেকটি উপায় ছিল সুতো তৈরী ও কাপড় বোনা। ......এরই পাশাপাশি দেখতে পাই, গ্রামের প্রধান বাসিন্দা, যিনি ছিলেন একাধারে বিচারক, পুলিশ ও করসংগ্রহকারী; হিসাবরক্ষক, যিনি হিসেব রাখতেন কত জমি চাষ করা হয়েছে; সীমান্ত রক্ষক, যিনি গ্রামের চৌহদ্দী পাহারা দিতেন, ওভারশিয়ার, যিনি জলাশয় থেকে জল বণ্টন করতেন সেচের জন্য; শিক্ষক, যিনি ছেলেমেয়েদের লিখতে ও পড়তে শেখাতেন; (এ ছাড়াও ছিল) একজন কর্মকার ও একজন ছুতোর মিস্ত্রী যাঁরা চাষের সমস্ত যন্ত্রপাতি তৈরী ও মেরামত করতেন, কুমোর যিনি গ্রামের সব থালা ঘটি বাটি ইত্যাদি প্রস্তুত করতেন। আরও ছিলেন ধোপা নাপিত ও স্বর্ণকার বা রৌপ্যকার।...... রাজনৈতিক আকাশের ঝড় কোনদিন স্পর্শ করে নি, গ্রামসমাজের এই অর্থনৈতিক কাঠামোকে।"

অর্থনৈতিক কাঠামোর এই অপরিবর্তনীয় অস্তিত্বের ফলে ভারতে বণিক সমাজ কখনো শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেন নি। তাছাড়া জীবিকা জন্ম ও বর্ণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সমাজে তাঁদের আসনও তেমন উচু ছিল না। এসব কারণে ভারতে একটা শক্তিশালী পুঁজিপতি শ্রেণী গড়ে ওঠা সম্ভব হয় নি। এ সম্পর্কে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, পাশ্চাত্যে শহর ও নগরগুলো যেমন

বাণিজ্যকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল ভারতে তেমনটি হয় নি। ভারতে শহর ও নগরগুলো ছিল মুখ্যত প্রশাসনকেন্দ্র ও তীর্থস্থান। এটা অনস্বীকার্য যে, ভারতে প্রস্তুত পণ্যদ্রব্য বিশ্বের বাজারে খ্যাতি অর্জন করেছিল এবং তার চাহিদা ছিল প্রচণ্ড, কিন্তু এসব পণ্যদ্রব্য কেবলমাত্র শহরেই উৎপাদিত হত না। অধিকাংশ পণ্যই তৈরী হত গ্রামে। বিভিন্ন গ্রাম বিভিন্ন শিল্প উৎপাদনে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। তবুও গ্রামসমাজগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। শহরের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বা পণ্য বিনিময়ের প্রয়োজন তাদের খুব সামান্যই ছিল।

বর্ণবৈষম্যের ফলে মানুষের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ছিল না। মানুষে মানুষে গড়ে উঠেছিল ব্যবধান। এটাও আরেকটা কারণ, যার জন্যে পাশ্চাত্য ধরনের নগর ভারতে গড়ে উঠতে পারে নি। পাশ্চাত্যে স্বয়ংশাসিত স্বাধীন নগরগুলোই ছিল বণিক শ্রেণীর ক্ষমতার উৎস। ভারতে সে ধরনের নগরের বিকাশ না হওয়ায় ভারতীয় বণিক শ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। বণিকশ্রেণীর এই দৌর্বল্য, জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার (absolute ownership) অভাব ও তার ফলে সামন্ত শ্রেণীরও শক্তিহীনতা ভারতে রাষ্ট্রক্ষমতাকে করেছিল নিরঙ্কুশ ও স্বেচ্ছাচারী। এবং এটা ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই যে, একটা স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের জনগণ রাষ্ট্রের সঙ্গে কখনো নিজেদের একাত্ম বোধ করতে পারেন না। তাই অশোক, আকবর-প্রমুখ সম্রাটরা যদিও বার বার ভারতকে এক করে একটি রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন, তবুও এদেশের জনগণের মধ্যে কখনো জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয় নি। ভারতে জাতীয়তাবোধের বিকাশ হয় বৃটিশ শাসনের পরোক্ষ ফল হিসেবেই। এটা সম্ভব হয়েছিল বৃটিশরা ভারতের স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামসমাজগুলোকে ধ্বংস করার ফলেই। মার্কস্ বলেছেন, "বৃটিশ শাসন সুতো যে তৈরী করে তাকে ল্যাঙ্কাশায়ারে এবং কাপড় যে বোনে তাকে বাংলাদেশে বিচ্ছিন্ন করে (অর্থাৎ বাংলাদেশের তন্তুবায়দের ল্যাঙ্কাশায়ারে সুতোর উপর নির্ভরশীল করে) অথবা উভয়ের ধ্বংস সাধনের মাধ্যমে এই অর্ধ সভ্য, অর্ধ অসভ্য গ্রামসমাজগুলোর অর্থনৈতিক ভিত্তি উড়িয়ে দেয়, এবং সত্যি বলতে গেলে এর ফলেই এশিয়া মহাদেশের একমাত্র সমাজবিপ্লব সংগঠিত হয়।"

গ্রামসমাজের এই অবক্ষয়ে ব্যক্তির সঙ্গে গ্রামের যে-নিবিড় সম্পর্ক তাতে চিড় ধরে। গ্রামীণ শিল্পগুলো ধ্বংস হওয়ায় বর্ণের বন্ধন থেকে জীবিকাও অনেকখানি মুক্ত হয়ে যায়।

দুই

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে এসেছিলেন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে। তাই তাঁরা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করেন। এই ফ্যাক্টরি-গুলোকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে নতুন নতুন শহর। গ্রামীণ শিল্প ধ্বংস হওয়ায় বহু গ্রামবাসী এসে আশ্রয় নেন ওই শহরগুলোতে। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। বাংলাদেশের মুসলমানরা তখন প্রধানত দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন, কৃষক ও অভিজাত শ্রেণী। অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ছিলেন প্রশাসক, করসংগ্রহ-কারী, জায়গীরদার ও জমিদার, বিচারক, শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারী। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যেই প্রশাসনের বড় বড় পদগুলো থেকে মুসলমানদের অপসৃত হতে হয়, ইংরেজরা এই সব পদে নিজেদের লোকদের অধিষ্ঠিত করেন। অবশ্য মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর স্বার্থে সবচেয়ে বড় আঘাত লাগে ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে যখন লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। আমরা আগেই দেখেছি, বৃটিশ-প্রতিষ্ঠিত নগরগুলোতে যাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। এঁদের অনেকেই কোম্পানীর কর্মচারীদের সহযোগী হিসেবে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস জমির বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করায় এই নব্য ধনীদের অনেকেই জমিদারী কিনে নিয়ে জমিদার হয়ে বসার সুযোগ পান। পুরোনো জমিদারদের মধ্যে অনেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিশেষতঃ সূর্যাস্ত আইনের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারায় জমিদারী হারান। পুরোনো ভূস্বামীদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিলেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে-নতুন জমিদার শ্রেণী উদ্ভূত হ'ল তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। এছাড়া, এই ব্যবস্থায় জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে মধ্যস্বত্ব-উপভোগকারী আরো একটা শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এঁরাও ছিলেন প্রধানত হিন্দু। অনেক সময় কৃষক ও আসল জমিদারের মধ্যে দশ পনের জন মধ্যস্বত্ব-উপভোগকারী থাকতেন। জমির উৎপাদনে এই শ্রেণীর কোন অবদানই ছিল না। এঁরা ছিলেন পরগাছা বিশেষ। এই বিপুল-সংখ্যক পরগাছাদের খাওয়ানো ও তাঁদের ভোগ্যদ্রব্যের অর্থ যোগানোর ভার পড়ে দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের উপর।

১৮৩৫ খৃস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক শিক্ষা ও সরকারী কাজকর্মের মাধ্যম হিসেবে ফার্সীর বদলে ইংরেজী চালু করেন। এই পরিবর্তনও মুসলমান

সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতিকূলে যায়। মুসলমান পেশাজীবী শ্রেণী হঠাৎ এই পরিবর্তনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন।

অভিজাত ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীরা এই পরিবর্তনের ফলে সব রকম জীবিকা ও কর্মক্ষেত্র থেকে বহিষ্কৃত হলেন। এভাবে জীবনের সব ক্ষেত্রে পরাজয়ের ফলে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাঁদের মনে যে-বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ফল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়েছিল। ইংরেজদের সঙ্গে তাঁরা সব ক্ষেত্রেই অসহযোগিতা শুরু করেন। সাধারণ মুসলমানদের পরামর্শ দেওয়া হ'ল, ইংরেজী ভাষা না শিখতে, কারণ এ ভাষা বিধর্মীর ভাষা। এভাবে ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট অভিজাত শ্রেণী ধর্মের নামে সাধারণ মুসলমানদের উত্তেজিত করলেন। কিন্তু এর ফল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য অত্যন্ত অশুভ হয়েছিল। তাঁদের ব্যবহারিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক গভীর অন্ধকার নেমে এল। উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই মুসলমান সম্প্রদায় সব ক্ষেত্রেই ইংরেজী শিক্ষিত হিন্দুদের থেকে পেছিয়ে পড়লেন। সাধারণ মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের কাছে ইংরেজী ও ফার্সী দুটোই ছিল বিদেশী ভাষা। কিন্তু মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর অনেকেরই মাতৃভাষা ছিল ফার্সী। ফার্সীর জন্য তাই স্বভাবতই তাঁদের একটা দুর্বলতা ছিল। এটাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের মুসলমান অভিজাত শ্রেণী এদেশের মাটির মানুষ ছিলেন না। তাঁরা বাংলাদেশে এসেছিলেন দিল্লী থেকে। সেখানেও তাঁদের পূর্বপুরুষেরা এসেছিলেন ইরান, তুরস্ক ও মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে ভাগ্যের অন্বেষণে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এক ইংরেজী-নবীশ হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হয়। এ শ্রেণীতে ছিলেন আইনজীবী, ডাক্তার, ইনজিনিয়ার, শিক্ষক, সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী, অন্যান্য পেশাজীবী ও মধ্যস্বত্ব-ভোগকারীরা। বস্তুত পেশাজীবীরা প্রধানত মধ্যস্বত্ব-ভোগকারী শ্রেণী থেকেই উদ্ভূত হয়েছিলেন। হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নতি মুসলমান সম্প্রদায় বিশেষত অভিজাত শ্রেণীর মনে এক গভীর হতাশার সঞ্চার করে।

মুসলমান নেতাদের মধ্যে উত্তর প্রদেশের স্যর সৈয়দ আহ্মদই প্রথম উপলব্ধি করেন মুসলমান সম্প্রদায়কে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে প্রয়োজন ইংরেজী শিক্ষাকে প্রবর্তন করা। এই উদ্দেশ্যে ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে তিনি আলীগড় মুহামেডান

অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ স্থাপন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, ঐস্লামিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু তাঁর এই উদ্দেশ্য পুরোপুরি সফল হয় নি। এই শিক্ষা সার্বজনীন হয় নি। এই কলেজের অধিকাংশ ছাত্রই ছিল উত্তর প্রদেশের অভিজাত শ্রেণীর সন্তান-সন্ততি। বাংলাদেশ থেকে অতি অল্প-সংখ্যক ছাত্রই এই কলেজে পড়ার সুযোগ পান। কারণ তার আগেই বাংলার মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর অবক্ষয় প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাংলার মুসলমানদের উপর এর একটা পরোক্ষ প্রভাব পড়ে। তাঁরা বুঝতে পারেন হিন্দুদের তুলনায় তাঁরা অনেক পেছিয়ে পড়েছেন। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে বাঙ্গালী মুসলমানরাও তাঁদের সন্তানদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেষ্টা করেন।

এ প্রসঙ্গে এটা স্বীকার করা প্রয়োজন যে, আলীগড় আন্দোলন ছিল একটা প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন, হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিরুদ্ধে মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর আন্দোলন। স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ ভয় করেছিলেন, সব ক্ষেত্রে হিন্দুদের অগ্রগতির ফলে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর কর্তৃত্ব করবে। তাঁর এই ভয় সম্পূর্ণ অমূলক ছিল না। কারণ বৃটিশরা পুরোনো শাসক শ্রেণীর প্রতিভূ হিসেবে মুসলমানদের অপছন্দ করতেন। চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রেই সব সুযোগ-সুবিধা হিন্দুদেরই দেওয়া হয়েছিল। স্যর সৈয়দ আহ্‌মদ নানা ভাবে মুসলমানদের সম্পর্কে বৃটিশ রাজশক্তির অবিশ্বাস দূর করতে ব্রতী হন।

আলীগড় আন্দোলনের প্রায় সমসাময়িক কালেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কয়েক জন ব্যবসায়ী, আইনজীবী ও সরকারী কর্মচারী। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আবেদন করে সরকার থেকে এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বেশী সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। কিন্তু পরবর্তী কালে কংগ্রেস ক্রমশ স্বাধিকার ও স্বয়ংশাসনের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন হিন্দু। বৃটিশ রাজশক্তি এতে হিন্দুদের আনুগত্য-সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেন। ফলে রাজানুগ্রহ তখন থেকে হিন্দুদের বদলে মুসলমানদের উপরই বর্ষিত হতে থাকে।

তিন

সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে একটা শহুরে শিক্ষিত শ্রেণীর উদ্ভবই বৃটিশ শাসনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই শ্রেণীটাকে মোটামুটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণী হিসেবে অভিহিত করা চলে। কিন্তু এই শ্রেণীর বিকাশ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে একই পন্থায় হয় নি। যদিও হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর গঠনে কমবেশী সব শ্রেণীরই অবদান ছিল, মুসলমান বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে উঠেছিল মুখ্যত জমিদার শ্রেণী থেকে। বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশে এই পার্থক্য হওয়ায় জাতীয়তাবাদের বিকাশও ঘটে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন ধারায়। মুসলমান বুদ্ধিজীবী শ্রেণী তাঁদের সামাজিক কৌলীন্য-সম্পর্কে সব সময় খুব বেশী পরিমাণে সজাগ ছিলেন। এর পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যায়, নবাব আবদুল লতিফ বাংলাদেশের মুসলমানদের শিক্ষা-সম্পর্কে যে-অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন তার মধ্যে। তিনি বলেছিলেন, "সংক্ষেপে আমার মত হলো নিম্ন শ্রেণী, জাতিগত ভাবে যারা হিন্দুদের কাছাকাছি তাদের প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত বাংলাভাষা। কিন্তু উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের মাতৃভাষা হবে উর্দু, কারণ এ ভাষাই তাঁরা ব্যবহার করেন তাঁদের সমাজে গ্রামে ও নগরে একইভাবে। এবং কোন মুসলমানই সম্ভ্রান্ত সমাজে সধর্মাদের মধ্যে স্থান পাবেন না যদি তিনি উর্দু না জানেন।" এই বক্তব্য থেকে আমরা সহজে বুঝতে পারি শিক্ষিত মুসলমানের মানসিকতা তখন কি ছিল, তার মন কি ভাবে কাজ করছিল।

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেস যে-উদারনৈতিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন, মুসলমান শিক্ষিত সমাজ সে আন্দোলনে যে যোগ দেন নি তার কারণ নিহিত ছিল এই শ্রেণীর সামাজিক পটভূমিতে। হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণী গড়ে উঠেছিল সব শ্রেণীর লোককে নিয়ে, বস্তুত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বই ছিল এতে সবচেয়ে বেশী। তাই তাঁদের পক্ষে পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ভাবধারা গ্রহণ করতে মোটেই অসুবিধে হয় নি। তাঁরা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন মিল্, কোঁৎ ও বেনথামের চিন্তাধারায়। হিন্দু বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে একটা প্রগতিশীল ও বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হয়। কিন্তু শ্রেণী চরিত্রের জন্য মুসলমান বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থেকে যান রক্ষণশীলে। শিক্ষিত মুসলমানরা আরো ভয় করেছিলেন উদারনৈতিক চিন্তাধারার প্রভাব যদি সাধারণ মুসলমানদের উপর পড়ে,

তাহলে তাঁরা হয়তো তাঁদের নেতৃত্ব আর নাও মানতে পারেন। হয়তো এই কারণেই নবাব আবদুল লতিফের মত শিক্ষাবিদরা সাধারণ মুসলমানদের শিক্ষার জন্য ইংরেজী স্কুলের বদলে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠারই পক্ষপাতী ছিলেন।

চার

কংগ্রেসের সঙ্গে মতৈক্য না হওয়ায় মুসলমান নেতৃবৃন্দ তথা অভিজাত শ্রেণী নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ১৯০৬ খৃস্টাব্দে ঢাকায় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রসঙ্গে অবশ্য এটা মনে রাখা উচিত যে, যদিও কংগ্রেস প্রথমদিকে একটা ধর্ম-নিরপেক্ষ উদারনৈতিক প্রতিষ্ঠান ছিল, তিলক প্রমুখ নেতৃবৃন্দের প্রভাবে এর ধর্মনিরপেক্ষ রূপটা অক্ষুণ্ণ ছিল না। কংগ্রেস ক্রমশ হিন্দু প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হচ্ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে এসে কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে এক নব জাতীয়তা বোধে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। তিনি প্রচার করেন, হিন্দু মুসলমান, খৃস্টান সব ধর্মেরই লক্ষ্য এক, কেবল পথ ভিন্ন।

তুরস্কের খিলাফত আন্দোলনে গান্ধী যে-অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছিলেন তাতে মুসলমান জনসাধারণ বিশেষ ভাবে মুসলমান নেতৃবৃন্দ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। এবং তাঁদের অনেকেই যথা, মৌলানা মহম্মদ আলী, ডাঃ আনসারী, মৌলানা আজাদ-প্রমুখ অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।

কিন্তু খিলাফত আন্দোলন বেশী দিন টেকে নি। কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে ক্ষমতা দখল করে খলিফার পদ বিলোপ করেন। এই আন্দোলনের ব্যর্থতা ভারতীয় মুসলমানদের মনে এক গভীর হতাশার সৃষ্টি করে। এবং তাঁরা ক্রমশ কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যান। আরও একটা কারণে সাধারণ মুসলমান গান্ধীর আন্দোলনকে নিজের আন্দোলন ভাবতে পারেন নি। গান্ধী রামরাজ্য, চরকা-প্রভৃতি যে-সব হিন্দু প্রতীক ব্যবহার করেছিলেন, মুসলমানদের পক্ষে তার মর্ম উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং তাঁরা এই আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন নি। বস্তুত কংগ্রেস মুসলমানদের কাছে একটা হিন্দু প্রতিষ্ঠান রূপেই প্রতিভাত হয়েছিল। তাছাড়া মুসলমান নেতৃবৃন্দ ক্রমশ কংগ্রেসের

উদ্দেশ্য-সম্পর্কেও সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন। কারণ, কংগ্রেস নেহেরু ও অন্যান্য বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবে ধীরে ধীরে চরমপন্থী হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

যাই হোক ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে মুসলিম লীগকে নেতৃত্ব দেওয়ার ভার নেন মহম্মদ আলী জিন্নাহ্। আমরা আগেই দেখেছি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্যর সৈয়দ আহমদ, নবাব আবদুল লতিফ প্রভৃতি নেতারা এক অস্পষ্ট দ্বিজাতি-তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। স্যর সৈয়দ আহমদ বলেছিলেন, "আমি নিশ্চিত যে, এই দুই জাতি কখনও কোন ব্যাপারে আন্তরিকভাবে এক হবে না। বর্তমানে এঁদের মধ্যে প্রকাশ্যে কোন বিরোধ নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে শিক্ষিত সমাজের জন্য এঁদের বিরোধ ক্রমশ বাড়বে।" তাঁর এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যের সৃষ্টি হওয়ায় এই বিরোধ তীব্রতর হয়।

আমরা আগেই দেখেছি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে-মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে—হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী তার চেয়ে অনেক বেশী এগিয়ে ছিলেন। বিভিন্ন পেশা ও চাকরীর ক্ষেত্রে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানরা পেরে উঠছিলেন না। এর ফলে মুসলমান মধ্যবিত্তের মনে হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তাই যখন মুসলমান উচ্চবিত্ত শ্রেণী পাকিস্তান আন্দোলন শুরু করলেন, তখন মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে সেই দাবী সমর্থন করেন। মধ্যবিত্ত মুসলমানরা কল্পনা করেছিলেন পাকিস্তান হলে চাকরী, ব্যবসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে তাঁরা অনেক বেশী সুযোগ সুবিধা পাবেন। নিম্নবিত্তের মুসলমান বিশেষ-ভাবে বাংলাদেশের কৃষকরাও পাকিস্তান আন্দোলনে অকুণ্ঠ সমর্থন যুগিয়েছিলেন। এর পেছনেও অর্থনৈতিক কারণ ছিল। বাংলাদেশের অধিকাংশ জমিদার জোতদার ও ঋণদাতা ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। এঁদের অত্যাচারে নিগৃহীত মুসলমান কৃষক ভেবেছিল স্বাধীন পাকিস্তানে এ অত্যাচারের অবসান হবে। তার উৎপাদিত দ্রব্যের মালিক সে নিজেই হবে।

উত্তর প্রদেশ ও গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে ইতিমধ্যেই অল্প-সংখ্যক মুসলমান পুঁজিপতি আত্মপ্রকাশ করেন। পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব যদিও অভিজাত শ্রেণীই দিয়েছিলেন, তবু এই নবোত্থিত পুঁজিপতি শ্রেণীর অবদানও কম ছিল না। এই পুঁজিপতি শ্রেণী যথার্থই অনুভব করেছিলেন নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে যদি হিন্দু পুঁজির প্রতিদ্বন্দ্বিতা সরিয়ে দেওয়া যায় তাহলে নিজের পুঁজিকে বহুগুণে বাড়ানো যাবে।

এই বিশ্লেষণ থেকে একটা জিনিস আমরা সহজেই উপলব্ধি করি, মুসলমান সম্প্রদায়ের সব শ্রেণীই বিভিন্ন অর্থনৈতিক কারণে পাকিস্তান দাবীকে সমর্থন করেছিলেন। তাই মহম্মদ আলী জিন্নাহ্ যখন ঘোষণা করলেন, হিন্দু ও মুসলমান দুই ভিন্ন জাতি তখন প্রায় সব মুসলমানই এই বক্তব্য বিনা দ্বিধায় মেনে নিলেন। জিন্নাহ্ সাহেব বলেছিলেন, "আমরা দশ কোটি লোকের এক জাতি এবং যা সবচেয়ে বড় কথা আমাদের বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্য,...আচার-ব্যবহার ও দিনপঞ্জী, ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে—সংক্ষেপে জীবনে ও জীবন-সম্পর্কে আমাদের এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি আছে। আন্তর্জাতিক আইনের সমস্ত ধারা-অনুযায়ী আমরা একটা জাতি।" যে-সব ধারণার উপর ভিত্তি করে এই দ্বিজাতি-তত্ত্ব নির্মিত হয়েছিল সে সব ত্রুটি-মুক্ত ছিল না। এই ভুল নির্দেশ করে গান্ধীজী হরিজন পত্রিকায় লেখেন, "আমরা যদি শ্রীজিন্নাহ্‌র বক্তব্য স্বীকার করি তাহলে বাংলাদেশের ও পাঞ্জাবের মুসলমানদেরও দুটো ভিন্ন ও পৃথক জাতি হিসেবে স্বীকার করতে হবে।" কিন্তু মুসলমানরা তখন গান্ধীজীর বক্তব্য শুনতে মোটেই আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা অর্থনৈতিক মুক্তি চেয়েছিলেন এবং তাঁদের কল্পনায় সেই মুক্তির স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছিল স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রে।

অবশ্য এই প্রসঙ্গে এটাও স্মর্তব্য যে, ১৯৪০ খৃস্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ পাকিস্তান সম্পর্কে যে-প্রস্তাব গ্রহণ করে তাতে উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে কয়েকটি স্বাধীন ও সার্বভৌম মুসলমান রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে পাকিস্তান নামে একটি মাত্র মুসলমান রাষ্ট্রেরই জন্ম হ'ল।

পাঁচ

পাকিস্তানের জন্মলগ্নে স্বাভাবিক ভাবে পাকিস্তানের শাসনভার ন্যস্ত হয় মুসলিম লীগের উপর। আমরা আগেই দেখেছি মুসলিম লীগের নেতৃত্বের পদে আসীন ছিলেন প্রধানত ভূস্বামী-গণ ও গুজরাটের পুঁজিপতি শ্রেণী। পাকিস্তান হওয়ার পর এঁরাই পাকিস্তানের শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু যেহেতু জিন্নাহ্ ও লিয়াকত প্রভৃতি মুসলিম লীগ নেতাদের দৈনন্দিন শাসনকার্য-সম্পর্কে তেমন জ্ঞান ছিল না, তাই রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনভার গিয়ে পড়ে আমলাদের উপর। বৃটিশ

শাসনের শেষ দিকে মুসলিম আমলারা পাকিস্তান-আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। অন্যান্যদের মত তাঁরাও ভেবেছিলেন হিন্দু আমলাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় পাকিস্তানে তাঁদের পদোন্নতি হবে দ্রুত, সহজ ও বাধামুক্ত। তাঁদের এ আশা বিফল হয় নি। আরও এক কারণে পাকিস্তানে আমলাদের ক্ষমতা অত্যন্ত বেড়ে যায়। জিন্নাহ্ এক অদ্ভুত মানসিকতার বশবর্তী হয়ে প্রধান মন্ত্রীর পদ লিয়াকত আলীকে অর্পণ করে নিজে রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে বসেন। তাঁর দাম্ভিক মানসিকতায় এ চিন্তা অসহ্য ছিল যে, তাঁর উপরে আর কেউ থাকবে। কিন্তু এই কাজের ফলে পাকিস্তানের সংসদীয় গণতন্ত্রের ঐতিহ্য চিরতরে পঙ্গু হয়ে যায়। প্রধান মন্ত্রীর বদলে রাষ্ট্রপ্রধানের পদই হয় বেশী গুরুত্বপূর্ণ। উপরন্তু জিন্নাহ্ ছিলেন একজন ডিকটেটর। কোন ব্যাপারে তিনি তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন না। রাজনৈতিক সহকর্মীদের প্রতি তাঁর একটা গভীর অবজ্ঞাও ছিল। তাঁর এই অবজ্ঞা আমলাতন্ত্রকে সাহসী করে তোলে। মন্ত্রীদের সঙ্গে কোন প্রকার পরামর্শ না করেই আমলারা অনেক সময় রাষ্ট্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। আমলাতন্ত্রের এই শক্তির উৎস ছিলেন রাষ্ট্রপ্রধান নিজে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বিবর্তনকেও প্রভাবিত করেছিল। দেশবিভাগের সময় পাকিস্তানের অর্থনীতি ছিল প্রধানত সামন্ততান্ত্রিক। পাকিস্তানের অংশে যে-কয়টি ব্যাঙ্ক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পড়ে তার সংখ্যা ছিল নগণ্য। পাঞ্জাবের শতকরা ষাট ভাগ জমির মালিক ছিলেন জমিদার শ্রেণী। সিন্ধুর চাষযোগ্য জমির সবটুকুই কুক্ষিগত করেছিলেন মাত্র শ খানেক ভূস্বামী। পূর্ববঙ্গের জমিদার শ্রেণীর অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। দেশবিভাগের পর এঁদের অনেকেই ভারতে চলে যান। তাছাড়া ১৯৫০-এর ভূমি সংস্কার আইনে পূর্ববঙ্গে জমিদারী প্রথা বিলোপ করা হয়। এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল অবশিষ্ট হিন্দু জমিদারদেরও সম্পত্তিচ্যুত করা। যাই হোক, পূর্ববঙ্গে সামন্ততন্ত্রের অবসান হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে জমিদারদের শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। ভারতের উত্তর প্রদেশ থেকে যে-সব ভূস্বামী ও গুজরাট থেকে যে-সব পুঁজিপতি পশ্চিম পাকিস্তানে চলে আসেন তাঁদের অনেকেই প্রচুর সম্পদ নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই অর্থ বিনিয়োগ করে পাকিস্তানের ব্যবসা বাণিজ্যের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগই তাঁরা হস্তগত করে ফেলেন। এঁদের অনেকেই ছিলেন শাসক শ্রেণীভুক্ত, তাই তাঁদের পক্ষে এ ব্যাপারে রাজনৈতিক ক্ষমতা

অপপ্রয়োগেরও সুবিধা ছিল। উপরন্তু আমলাতন্ত্রও এঁদের সহায়ক হয়েছিলেন। আমলাদের একটা বিরাট অংশই ছিলেন এই শ্রেণীটির সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ অথবা পরিচিত। এখানে একটা তথ্য জেনে রাখা প্রয়োজন যে, পাকিস্তানে ব্যবসা-বাণিজ্য সব সময়ই সরকার-নিয়ন্ত্রিত ছিল। পাকিস্তানে এমন এক অদ্ভুত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিবর্তিত হয়েছিল যে-ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত পুঁজিকে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রিত বাজারের মাধ্যমে প্রচুর সুযোগ সুবিধে দেওয়া হয়েছিল। যে-সব শিল্পে ব্যক্তিগত পুঁজি এগোতে সাহস করত না অথবা সক্ষম ছিল না, সে সব শিল্পকে সরকারী অর্থেই গড়ে তুলে পরে ব্যক্তিগত পুঁজির কাছে হস্তান্তর করা হত। এইসব সুযোগ-সুবিধা বণ্টনের ভার ন্যস্ত ছিল আমলাদের উপর। তাই আমলাতন্ত্র ও পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে এক ঘৃণ্য মৈত্রীর সম্পর্কে গড়ে উঠে।

পাকিস্তানে পুঁজিবাদ বিকাশে আমদানি ও রফতানি নীতিও এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। দেশবিভাগের সময় পাকিস্তানের অর্থনীতি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। তবুও-যে পাকিস্তানের অর্থনীতি ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি অর্জন করেছিল তার কারণ নিহিত ছিল কোরিয়ার যুদ্ধে। কোরিয়ার যুদ্ধের ফলে বিশ্বের বাজারে পূর্ববঙ্গের পাটের চাহিদা অনেক গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু এতে পূর্ববঙ্গের গরীব পাটচাষীদের কোনই উপকার হয় নি। পূর্ববঙ্গের ব্যবসায়ীরাও লভ্যাংশের অতি সামান্যই পেয়েছিলেন। পাট বিক্রী করে যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা হয়, প্রায় তার সম্পূর্ণটাই আত্মসাৎ করেন পশ্চিম পাকিস্তানের বণিক শ্রেণী। আমলা-পরিচালিত সরকারী রফতানি নীতিই এর জন্য দায়ী ছিল। এভাবে পূর্ববঙ্গের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে সঞ্চিত হয়। এবং তা বিনিয়োগ করেই পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়নের সূচনা হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের এই শিল্পোন্নয়নে পূর্ববঙ্গের কোন লাভই হয় নি। সাধারণত কোন দেশের এক অঞ্চলের শিল্পোন্নয়নের ফলে অন্য অঞ্চলের জনসাধারণের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে যে-উপকার হয় পাকিস্তানের ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের মধ্যে এক হাজার মাইল-ব্যাপী ভারত ভূখণ্ডের জন্য সে লাভ সম্ভব ছিল না। অধিকন্তু পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের উৎপাদিত দ্রব্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করা হয়। পূর্ববঙ্গের গরীব জনসাধারণ বাধ্য হয় বিশ্বের খোলা বাজারে যে-জিনিসের দাম এক টাকা তাই

দু'টাকা অথবা তিন টাকায় এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে পাঁচ টাকায় কিনতে। এভাবে পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করা হয়।

ছয়

পাকিস্তানের গণপরিষদ দীর্ঘ নয় বছর সময় নিয়েছিল পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র তৈরী করতে। এর কারণ অনুসন্ধান করলেও আমরা দেখব এরও মূল নিহিত ছিল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সামাজিক চরিত্রে। প্রাক-স্বাধীনতা যুগে মুসলিম লীগ নেতারা পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রামে এত বেশী ব্যাপৃত ছিলেন যে, কোন সামাজিক বা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করার অবকাশ তাঁদের ছিল না। তদুপরি উচ্চবিত্ত শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় স্বভাবতই তাঁরা সামাজিক পরিবর্তনে আগ্রহী ছিলেন না। যদিও সংসদীয় গণতন্ত্র ছাড়া আর কোন ধরনের সরকারের কল্পনা মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের ছিল না তবুও সংসদীয় গণতন্ত্র তাঁদের জনগণের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে, সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের শ্রেণীস্বার্থের অনুকূল ছিল না। তাঁরা জানতেন, দেশকে যদি একটা শাসনতন্ত্র দেওয়া হয় এবং তার ভিত্তিতে যদি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহলে তা হবে তাঁদের নিজেদের অপসারণের পথকেই প্রস্তুত করা। আমলারাও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে বিপদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ ছিলেন।

সুতরাং পাকিস্তানে যে-সংসদীয় গণতন্ত্র ছিল, তা ছিল নামেমাত্রই গণতন্ত্র। আসলে, এই সরকার ছিল মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ, আমলাতন্ত্র ও বড় পুঁজিপতিদের নিয়ে গঠিত এক স্বৈরাচারী সরকার। অন্যভাবে বিচার করলে এই স্বৈরাচার ছিল পূর্ববঙ্গের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচার।

সাধারণ মানুষকে শোষণ করার জন্য এই স্বৈরাচারী সরকার যথেচ্ছভাবে ধর্মকে ব্যবহার করেছিল। পাকিস্তানের জনসংখ্যার শতকরা আশী ভাগ মুসলমান হওয়া-সত্ত্বেও যখনই জনসাধারণের কোন দাবী দুর্বার হয়ে উঠত তখনই সরকার 'ইসলাম বিপন্ন' এই ধুয়া তুলে জনগণের দৃষ্টিকে বিপথগামী করার চেষ্টা করত। এমনকি জনসাধারণের গণতান্ত্রিক দাবীকে স্তব্ধ করার জন্য সরকার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সৃষ্টিতেও কুণ্ঠিত ছিল না। ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের ভিত্তিতে (প্রাদেশিক) পূর্ববঙ্গে যে-গণতান্ত্রিক সরকার

প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধিয়ে সেই সরকারকে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতাচ্যুত করে।

আমরা আগেই দেখেছি বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হয়েছিল এবং এই শ্রেণী সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন।

বাংলাদেশের মুসলমান কৃষকরাও ভেবেছিলেন পাকিস্তানে তাঁরা শোষণমুক্ত হবেন। কিন্তু স্বাধীনতার পরে তাঁরা দেখতে পেলেন, এক প্রভুর বদলে তাঁদের কাঁধে আরেক প্রভু চেপে বসেছে।

১৯৪৪-৪৫ খৃস্টাব্দে প্রাদেশিক নির্বাচনে ভারতের মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে যে-সব মুসলিম লীগ প্রতিনিধি জয়ী হন, তাঁদের ও তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যদের নিয়েই গঠিত হয় পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ। এঁরা একই সঙ্গে প্রাদেশিক পরিষদ, প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভারও সদস্য ছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মাত্র আশিজন লোকের এই দল থেকে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, রাষ্ট্রদূত এবং সব মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছিল।

পূর্ববঙ্গের প্রথম প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন নবাব। পশ্চিম পাকিস্তান তথা কেন্দ্রের শাসকচক্রের মত তিনিও ছিলেন সামন্ত শ্রেণীভুক্ত। পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ধ্যান-ধারণার সঙ্গে তাঁর কোন পরিচয় বা সহানুভূতিই ছিল না। তাঁর সমস্ত চেষ্টা কেন্দ্রীভূত ছিল কি ভাবে পশ্চিমা শাসকচক্রকে সন্তুষ্ট রেখে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকা যায়। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। মোট ৭৯টি আসনের মধ্যে পূর্ববঙ্গের ভাগে ছিল ৪৪টি আসন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধে নাজিমুদ্দিন পূর্ববঙ্গের ছ'টি আসন পশ্চিম পাকিস্তানকে দিয়ে দেন। এভাবে গণপরিষদে পূর্ববঙ্গের সদস্যদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়। কেবলমাত্র গণপরিষদেই নয় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের (Policy making) ক্ষেত্রেও পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিত্ব ছিল নামমাত্র। আমলাদের মধ্যে মাত্র শতকরা ১৫ জন ছিলেন পূর্ববঙ্গের। আবার তাঁদের মধ্যে প্রথম দশকে কেউই কেন্দ্রীয় সরকারের কোন উচ্চপদে আসীন হতে সক্ষম হন নি। এমনকি পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোও পশ্চিম পাকিস্তানী আমলারাই দখল করে রেখেছিলেন।

পূর্ববঙ্গের ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীই প্রথম অনুভব করেন যে, পূর্ববঙ্গের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তান তথা কেন্দ্রের আচরণ ঔপনিবেশিক-সুলভ। এই আচরণের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ খৃস্টাব্দেই প্রতিবাদ-ধ্বনি উঠেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল ছাত্র প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলীর কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের উচু চাকরীতে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাসাম্য দাবী করেন। প্রধান মন্ত্রী এই দাবী প্রাদেশিকতা দোষে দুষ্ট বলে প্রত্যাখ্যান করেন। এই সময় থেকে যখনই কোন দাবী পূর্ববঙ্গ থেকে উত্থিত হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার তখনই তা প্রাদেশিকতা বলে অগ্রাহ্য করেছে।

পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে-অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছিল, ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ভাষা আন্দোলনে তা চূড়ান্ত রূপ নেয়। পাকিস্তানের শাসক-গোষ্ঠী পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে বিপুল ব্যবধানের ফলে এক জাতীয়তাবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে যে-বিরাট অন্তরায় ছিল তা দূরীকরণের জন্য যে-পথ অবলম্বন করলেন, তা ছিল পুরোপুরি কলোনিয়াল বা ঔপনিবেশিক। তাঁরা ক্ষমতার জোরে পূর্ববঙ্গের উপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। ঘোষণা করলেন, পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গ উভয় অঞ্চলেরই রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এই প্রচেষ্টার মধ্যে দু'টি চিন্তা কার্যকরী ছিল। এক, পূর্ববঙ্গের ভাষার মূলে আঘাত করে তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য-ধ্বংসের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতিকে পশ্চিম পাকিস্তানী সংস্কৃতির ছত্রচ্ছায়ায় নিয়ে আসা। দুই, বাঙালীদের জন্য ভাষাগত প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য সরকারী কাজকর্ম ও অন্যান্য পেশায় বেশী সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা। অবশ্য শাসকগোষ্ঠীর প্রকাশ্য বক্তব্য ছিল, বাংলা হিন্দুদের ভাষা। হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থের প্রেরণায় ও হিন্দু লেখকদের দ্বারা এই ভাষা সমৃদ্ধ হয়েছে, সুতরাং এই ভাষা পরিত্যাজ্য। উর্দু মুসলমান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক এবং মুসলমান লেখকদের দ্বারা পরিপুষ্ট, সুতরাং উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা এর উত্তরে জানান ধর্মীয় কারণে যদি রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয়, তবে আরবীকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টার পেছনে আসলে পশ্চিমা শাসকচক্রের যে-অভিসন্ধি সক্রিয় ছিল, বাঙালী বুদ্ধিজীবী সে সম্পর্কে বিদিত ছিলেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ এক প্রবন্ধে লেখেন :

"বাংলাদেশের কোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু বা হিন্দি ভাষা গ্রহণ করা হইলে, ইহা রাজনৈতিক পরাধীনতারই নামান্তর হইবে। ডাঃ জিয়াউদ্দীন আহমদ পাকিস্তানের প্রদেশসমূহের বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন রূপে প্রাদেশিক ভাষার পরিবর্তে উর্দু ভাষার সপক্ষে যে-অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমি একজন শিক্ষাবিদরূপে উহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছি। ইহা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক শিক্ষা- ও নীতি-বিরোধীই নয়, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নীতি বিগর্হিতও বটে।"

ডাঃ কাজী মোতাহার হোসেন আরও পরিষ্কারভাবে বাঙালীদের সতর্ক করে দিয়ে লেখেন :

"ইংরেজের স্থান যেন বৈদেশিক বা অন্য কোনো প্রদেশীয় লোক দখল করে না বসে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। কুচক্রী লোকেরা যাতে শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর দিয়ে, ভাষার বাধা সৃষ্টি করে নানা অজুহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মানসিক বিকাশে বাধা না জন্মাতে পারে, সে বিষয়ে নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণকে সজাগ থাকতে হবে।"

এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস লক্ষণীয় যে, আমলাতন্ত্র রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে প্রকাশ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক চীফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদের বাংলা-বিদ্বেষ কারু অজানা ছিল না। শিক্ষা সেক্রেটারি ফজলে আহমদ ফজলী করিম এক প্রকাশ্য সভায় শিক্ষামন্ত্রী হবিবুল্লাহ বাহারের বাংলাভাষা সমর্থনের বিরোধিতা করেন। এর থেকে বোঝা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট বা প্রতিভূ হিসেবে প্রাদেশিক মন্ত্রীদের থেকে আমলাদের ক্ষমতা বেশী ছিল। বস্তুত পূর্ববঙ্গের প্রথম দুই প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন ও নুরুল আমীন আজীজ আহমদ প্রমুখ পশ্চিমা আমলাদের কথাতেই উঠতেন বসতেন।

যাই হোক, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রসমাজ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য এক সর্বাত্মক আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলন ১৯৪৮ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯৫২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত থেমে থেমে স্থায়ী হয়েছিল। ১৯৫২ খৃস্টাব্দে কয়েকজন ছাত্রও পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। ফলে, এই আন্দোলন পূর্ববঙ্গের সমস্ত জনসাধারণের সহানুভূতি- ও সহযোগিতা-অর্জনে সক্ষম হয়। শেষপর্যন্ত ভাষা আন্দোলন জনগণের আন্দোলনে পরিণত

হওয়ায় পশ্চিমা শাসকচক্র বাংলাভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন।

ভাষা আন্দোলনের সাফল্য পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক অনস্বীকার্য অস্তিত্ব দান করেছিল। দার্শনিক হার্বার্ট মারকিউসা তাঁর 'ওয়ান ডাইমেনশনাল ম্যান' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, বর্তমান সমাজে ছাত্রসমাজই একমাত্র বিপ্লবী সত্তা; কারণ, তাঁরা উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরে রয়েছেন। রাষ্ট্রের সবরকম উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তাঁরাই সংগ্রাম চালাতে সক্ষম। পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজ পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই এই ভূমিকা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছেন। বাঙালীর আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আন্দোলনে তাঁদের অবদানই সবচেয়ে বেশী। কোন রকমের নিপীড়নই ছাত্রদের ভীত বা কুণ্ঠিত করে নি।

পূর্ববঙ্গের ছাত্রসমাজ মুখ্যত মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত বিশেষত কৃষক শ্রেণী থেকেই উদ্ভূত। তাই পাকিস্তানের উচ্চবিত্ত শাসক শ্রেণীর সঙ্গে তাঁদের স্বার্থের কোনরকম ঐক্যই ছিল না।

সাত

আমরা আগেই দেখেছি, পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণী পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করেছিলেন। এই শ্রেণীর একটা অংশ পাকিস্তান হওয়ার পর মুসলিম লীগ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এঁরা বুঝতে পেরেছিলেন মুসলিম লীগ তার শ্রেণীচরিত্রের জন্য ক্রমশ জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। এঁদের নিয়েই পাকিস্তানের প্রথম বিরোধী দল আওয়ামী লীগ গঠিত হয়। জনগণের অর্থনৈতিক জীবনে কোনো পরিবর্তন না আসায়, বস্তুত মানুষের অর্থনৈতিক দুর্ভোগ আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনে ছাত্ররা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সরকারও নিপীড়নের আশ্রয় নেয়, হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্রকে কারারুদ্ধ করা হয়। মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত করেছিলেন প্রধানত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। মুসলিম লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের ভূস্বামী পুঁজিপতি ও আমলা শ্রেণীর সমর্থনপুষ্ট ছিল, আর আওয়ামী লীগ ছিল মুখ্যত পূর্ববঙ্গের মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিয়ে গঠিত। তাই মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে আওয়ামী

লীগের গণবিক্ষোভ পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের আন্দোলনরূপেই প্রথম থেকে প্রতিভাত হয়েছিল।

পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ রাজনীতি সচেতন ছিলেন না, পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রভৃতি অঞ্চলের কৃষকরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ভূমিদাস। তাই রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁদের নিজস্ব কোন মতামত গড়ে ওঠার অবকাশই ছিল না। ভূস্বামীদের মতই ছিল তাঁদের মত। কিন্তু পূর্ববঙ্গের অবস্থা ছিল ভিন্ন। এখানকার জনগণ, কৃষক ও মজুর সব শ্রেণীর মধ্যেই রাজনীতি সম্পর্কে এক তীব্র অনুসন্ধিৎসা ছিল। রাজনীতি যে তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে তাঁদের জ্ঞান ছিল। তাই মুসলিম লীগের কুশাসনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছিলেন। ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রশ্নে বিপুল ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিল, সেই মুসলিম লীগই ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে। ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পেয়েছিল ৩০০টি আসন, মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি। মুসলিম লীগ এই নির্বাচনেও ধর্মের প্রশ্ন তুলেছিল, ইসলাম বিপন্ন ইত্যাদি শ্লোগানের আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু জনসাধারণের কাছে তখন অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নটাই সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, ধর্মের প্রশ্ন নয়।

যুক্তফ্রন্ট আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি ও অন্যান্য কয়েকটি ছোট দল নিয়ে গঠিত হয়েছিল। যদিও ফজলুল হক, ভাসানী ও সুরাওয়ার্দীই এই দলগুলোর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, যুক্তফ্রন্টের প্রকৃত প্রাণশক্তি ছিলেন মুজিবুর রহমান, তাজউদ্দিন, ওলি আহাদ, তোহহা প্রমুখ প্রাক্তন ছাত্রনেতারা। এঁরা ছাত্রদের উদ্দীপ্ত করতে পেরেছিলেন এবং ছাত্ররা এঁদের বাণী বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন জনগণের কাছে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ে কেন্দ্রের তথা পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জনসাধারণের কাছে এক একুশ দফা পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। এই একুশ দফা দাবীর প্রধান দাবী ছিল পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তি। পশ্চিমা শাসকচক্র বুঝতে পারলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থাকলে পূর্ববঙ্গকে শোষণের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার

জন্য চক্রান্ত শুরু হ'ল। ঢাকার আদমজী পাটকলে ও চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনা কাগজের মিলে বিহারী ও বাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে মালিকদের প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো হ'ল। বলা হল, যুক্তফ্রন্ট সরকারই দাঙ্গার মূলে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ আনা হ'ল যে, এঁরা প্রায় সবাই কমিউনিস্ট ও ভারতের এজেন্ট। এই অভিযোগে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে পূর্ববঙ্গে গভর্ণরের শাসন ও সামরিক আইন জারী করা হ'ল। পূর্ববঙ্গে সংসদীয় গণতন্ত্রের অবসান কেন্দ্রেও এর পতন অনিবার্য ও আসন্ন করে তুলল।

কেন্দ্রে এই সময় গভর্ণর জেনারেল ছিলেন একজন পাঞ্জাবী আমলা গোলাম মহম্মদ। তিনি কেন্দ্রীয় গণপরিষদ ও কেন্দ্রীয় সরকার ভেঙে দিলেন। তাঁর আদেশে যে নতুন সরকার গঠন করা হ'ল তার আভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী হলেন জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হলেন সৈন্যবাহিনীর প্রধান জেনারেল আয়ুব খান। এ সবই ছিল অগণতান্ত্রিক কাজ। কিন্তু বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারো ছিল না। কারণ পাকিস্তানের জন্মলগ্নেই তো গণতন্ত্রের সমাধি হয়েছিল।

রাজনীতিবিদ্‌দের অক্ষমতার ফলে সৈন্যবাহিনীর অফিসারাও ধীরে ধীরে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করেছিলেন। তাঁদের এই অনুপ্রবেশের পথ সুগম করে দিয়েছিলেন আমলারাই। মুসলিম লীগের সদস্য ছাড়া অন্য রাজ-নীতিবিদ্‌দের ঠেকিয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য তাঁদের সৈন্যবাহিনীর সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। তাই তাঁরা সৈন্যবাহিনীর অফিসারদের সঙ্গে আঁতাত করে তাঁদের ডেকে এনেছিলেন।

গোলাম মহম্মদের'পর গভর্ণর হন জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা। তিনি তাঁর প্রধান মন্ত্রী হিসেবে নির্বাচন করেন আরেক জন ঝানু আমলা চৌধুরী মহম্মদ আলীকে। চৌধুরী মহম্মদ আলীর পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠন করা হয়, এবং সেই গণপরিষদই পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে। চৌধুরী মহম্মদ আলীর তাড়াহুড়ো করে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করার পেছনে হয়তো এই ভয় ছিল যে, সামরিক অফিসারদের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ আমলাতন্ত্রের ক্ষমতাকে হ্রাস করবে।

নতুন যে শাসনতন্ত্র তৈরী করা হ'ল সেই শাসনতন্ত্রে পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু দাবী মেনে নেওয়া হ'ল। প্রশাসনে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিত্বের

সংখ্যাসাম্য স্বীকার করা হ'ল। ঠিক হ'ল, পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গ থেকে সমান-সংখ্যক অফিসার নিয়োগ করা হবে। পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনও অনেকখানি মেনে নেওয়া হ'ল। কিন্তু এতে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্র ও পুঁজিপতি শ্রেণী ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা ভাবলেন, পাকিস্তানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলে পূর্ববঙ্গের কর্তৃত্ব রোধ করা সম্ভব হবে না। ফলে পূর্ববঙ্গকে শোষণ করাও অত সহজ থাকবে না। পূর্ববঙ্গ তার পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে পাওয়ার চেষ্টা করবে।

পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথকে রুদ্ধ করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকচক্রের ও পুঁজিপতি গোষ্ঠীর এই প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হ'ল সামরিক বাহিনীর অফিসারদের ক্ষমতা-লোলুপতা। আমরা দেখেছি সামরিক অফিসাররা কিভাবে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করছিলেন। সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সামরিক অফিসারদের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছিল। বস্তুত সিয়াটো ও সেন্টো সামরিক শক্তিজোটে পাকিস্তানের যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জেনারেল আয়ুব খান। সামরিক জোটে যোগ দেওয়ার ফলে পকিস্তানের সামরিক বাহিনীর শক্তি অত্যন্ত বেড়ে যায়। কিন্তু এই শক্তি ব্যবহৃত হ'ল বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে নয়, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করতে।

পাকিস্তানের সামরিক শক্তি-যে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে সক্ষম হয়েছিল তার এক সমাজতান্ত্রিক কারণ আছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মত পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলের লোক নিয়ে গঠিত ছিল না। পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী ছিল মুখ্যত এক জাতীয় (monogenous), শতকরা নব্বই জন সৈন্যই ছিল পাঞ্জাবী। পাঞ্জাবের প্রতিটি ঘর থেকেই কেউ না কেউ সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। সুতরাং পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীতে কেবল এক অঞ্চলেরই স্বার্থ জড়িত ছিল, তা হ'ল পাঞ্জাব। সৈন্যবাহিনীর জন্য বাজেটের শতকরা ৭০ ভাগ বৈদেশিক মিলিটারী সাহায্য বাবদ দশ কোটি ডলার প্রতি বছর খরচ করা হত। এই বিপুল অর্থের ভাগীদার ছিল কেবল পাঞ্জাব। পাকিস্তানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হলে পাঞ্জাবের এই স্বার্থে আঘাত লাগার সম্ভাবনা ছিল। কারণ তখন সৈন্যবাহিনীতে বেশী-সংখ্যক বাঙালীকে নেওয়ার দাবী উপেক্ষা করা সম্ভব হত না। তাই ১৯৫৮ খৃস্টাব্দে আয়ুব খান যখন নির্বাচনের অব্যবহিত আগে শাসনতন্ত্র ভেঙে দিয়ে ক্ষমতা দখল করে

সামরিক শাসন চালু করলেন, তখন তিনি পাঞ্জাবী সৈন্যবাহিনীর পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিলেন। বস্তুত পাঞ্জাবের স্বার্থেই গণতন্ত্রকে জন্মাবার আগেই হত্যা করা হ'ল।

আজ থেকে প্রায় তিন শ বছর আগে হল্যাণ্ডে যখন অনেকটা প্রায় একই রকমভাবে সৈন্যবাহিনীর হাতে গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছিল। দার্শনিক স্পিনোজা তার কারণ চিন্তা করে বলেছিলেন, কোন দেশের সেনাবাহিনী যদি কেবলমাত্র কোন বিশেষ শ্রেণী বা কোন বিশেষ অঞ্চল থেকে গড়ে ওঠে, তাহলে সেই দেশে গণতন্ত্র না টেকার সম্ভাবনাই প্রবল। গণতন্ত্রকে স্থায়ী করতে হলে, সব অঞ্চল ও সবশ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব তাতে থাকতে হবে। তিনি আরো বলেছিলেন একজন সশস্ত্র লোক একজন নিরস্ত্র লোকের চেয়ে অনেক বেশী স্বাধীন (An armed man is more free than an unarmed man)। পাকিস্তানের ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, এই দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টির মূল্য আজো কমে নি। পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীতে পাঞ্জাবের শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোন শক্তি না থাকাতেই পাকিস্তানে গণতন্ত্রের ধ্বংস কেউ রোধ করতে পারল না।

আট

সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের ফলে আমলাতন্ত্রের তুলনায় সামরিক অফিসার বা মিলিটারি এ্যারিস্টোক্র্যাসীর গুরুত্ব বেড়ে গেলেও ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণী স্বার্থের খুব বেশী তারতম্য ঘটে নি। নতুন শাসকচক্র পুরোনো শাসকচক্রের মতই বড় বড় পুঁজিপতি, জমিদার, আমলা ও সামরিক বাহিনীর উচু অফিসারদের শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্বই করেছিলেন। এবং এই স্বার্থের জন্য যা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হ'ল দেশের ক্রম-বর্ধমান গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের দাবীকে স্তব্ধ করা। এই দাবী সবচেয়ে বেশী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল পূর্ববঙ্গে। তাই আয়ুব খান পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক কর্মীদের বিরুদ্ধে এক অসহ্য নিপীড়ন চালালেন। হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্রনেতা যাঁরা পূর্ববঙ্গের জন্য স্বায়ত্তশাসন ও সমান সুযোগ-সুবিধা দাবী করেছিলেন তাঁদের বিনাবিচারে জেলে পাঠানো হ'ল। দেশের দৈন্যের জন্য রাজনীতিবিদ্ বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের তরুণ রাজনীতিবিদ্দের দায়ী করা হ'ল।

অনেকের বিরুদ্ধে অসদাচরণের (corruption) অভিযোগ এনে তাঁদের ভবিষ্যতে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা হ'ল। এভাবে সব গণতান্ত্রিক দাবীকে নির্মূল করে আয়ুব খান দেশে মিলিটারি ডিক্টেটরশীপ প্রতিষ্ঠা করলেন।

কিন্তু এই সার্বিক চেষ্টা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের জনগণের গণতান্ত্রিক দাবীকে পুরোপুরি স্তব্ধ করা গেল না। ১৯৬২ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সুরাওয়ার্দীকে গ্রেপ্তার করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন। তাঁরা মানুষের মৌলিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবীতে রাস্তায় নেমে এলেন। তাঁদের এই আন্দোলনে জনগণও যোগ দিয়েছিলেন। এই আন্দোলন ক্রমশ পশ্চিম পাকিস্তানেও ছড়িয়ে পড়তে পারে এই আশঙ্কায় আয়ুব খান ২৩-এ মার্চ (৬২ ইং) দেশে এক নতুন শাসনতন্ত্র চালু করলেন।

এই শাসনতন্ত্রে আয়ুব খান এক অদ্ভুত গণতন্ত্র প্রবর্তন করলেন। তাঁর মতে, পাকিস্তানের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত হওয়ায় পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্র বা সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গণতন্ত্র সাফল্য অর্জন করতে পারে না। এমন এক গণতন্ত্র এখানে চালু করতে হবে যা এদেশের মানুষের প্রকৃতি-সিদ্ধ হয়। সেই গণতন্ত্র হ'ল মৌলিক গণতন্ত্র। তাঁর ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার জন্য উদ্ভাবিত এক অদ্ভুত পন্থা।

মৌলিক গণতন্ত্র প্রথায় জনসাধারণের একমাত্র করণীয় কাজ আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন করা। চল্লিশ হাজার পশ্চিম পাকিস্তান ও চল্লিশ হাজার পূর্ববঙ্গ থেকে। এই আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রীর উপরই নির্বাচনের ভার ছিল প্রেসিডেন্ট, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের। নিজ নিজ অঞ্চলের উন্নয়ন কাজের ভারও এঁদের দেওয়া হয়েছিল 'ওয়ার্কস প্রোগ্রামের' মাধ্যমে। ওয়ার্কস্ প্রোগ্রাম (Works Programme) তৈরী করা হয়েছিল ঘুষ দিয়ে মৌলিক গণতন্ত্রীদের সরকারের আয়ত্তে রাখার এক নজিরবিহীন পরিকল্পনা হিসেবে। বছরে শতাধিক কোটি টাকা খরচ করা হত এই প্রোগ্রামে। বিপুল অঙ্কের এই ব্যয়ের কোন অডিট বা সরকারী হিসেব পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। সরকারের সমর্থকদের থেকে কোন হিসেবই নেওয়া হত না। অবশ্য বিরোধী দলের সদস্যদের জন্য অন্য ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময় তাঁদের কোন টাকাই দেওয়া হত না। আর টাকা দেওয়া হলেও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসেব নেওয়া হত। এভাবে মৌলিক গণতন্ত্র প্রথা ও ওয়ার্কস্ প্রোগ্রামের মাধ্যমে

আয়ুব খান তাঁর ও তাঁর দলের লোকদের ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার বন্দোবস্ত করলেন।

আসলে আয়ুব খানের শাসনতন্ত্র ছিল স্বৈরাচারের এক অদ্ভুত দলিল। এই দলিল-অনুযায়ী প্রেসিডেন্টই ছিলেন রাষ্ট্রের সব ক্ষমতার উৎস। কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক আইনসভার কোন ক্ষমতাই ছিল না। সমস্ত ব্যয়বরাদ্দের মালিক ছিলেন প্রেসিডেন্ট। ব্যয়বরাদ্দ বা বাজেটের উপর আলোচনা করার অধিকার থাকলেও তা নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতাই আইনসভাকে দেওয়া হয় নি। এমন কি আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেও আইনসভার ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সীমিত। প্রেসিডেন্ট যে-কোন বিল বা আইনের প্রস্তাব ভেটো দিয়ে নাকচ করে দিতে পারতেন। সেই ভেটোকে অগ্রাহ্য করতে হলে আইনসভার তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের অনুমোদন আবশ্যক ছিল। এছাড়াও প্রেসিডেন্ট ইচ্ছে করলে আইনসভা ভেঙে দিয়ে দেশকে অধ্যাদেশের (ordinance) মাধ্যমে শাসন করতে পারতেন। প্রেসিডেন্টের মতো গভর্ণররাই ছিলেন প্রাদেশিক সরকারের সব ক্ষমতার উৎস। প্রাদেশিক গভর্ণরদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করার অধিকারীও ছিলেন প্রেসিডেন্ট। ফলে প্রদেশের কোন স্বায়ত্তশাসনই ছিল না। কেন্দ্রের এই অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার ফলে পূর্ববঙ্গেরই ক্ষতি হ'ল। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের। পূর্ববঙ্গকে শোষণ করার পক্ষে তাঁদের আর কোন বিঘ্নই রইল না।

আয়ুব খানের দশ বছরের শাসনের কালে পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে উঠল বাইশটি পুঁজিপতি পরিবার। এঁদের হাতে সঞ্চিত হ'ল পাকিস্তানের মোট সম্পদের আশি শতাংশ। আরও দশ শতাংশের মালিক হলেন পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা। আয়ুব খানের শাসনের আমলে দু'টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়েছিল। গর্ব করে এই দশকের নাম দেওয়া হয়েছিল উন্নয়ন দশক। কিন্তু এই উন্নয়নের প্রায় সবটুকুই হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। দু'টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রায় দশহাজার কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল। এর দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী বিনিয়োগ করা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পরিকল্পনার বাইরেও প্রায় কয়েক শ কোটি টাকা খরচ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু উপত্যকা পরিকল্পনায়। আয়ুব খান কেন্দ্রীয় রাজধানী করাচি থেকে সরিয়ে পাকিস্তানের মিলিটারি হেডকোয়ার্টার রাওয়ালপিণ্ডির কাছে ইসলামাবাদে নিয়ে যান। এই রাজধানী তৈরী করতেও কয়েক শ কোটি টাকা খরচ হয়। আগেই

বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়বরাদ্দের সত্তর শতাংশই ব্যয় হত সামরিক বাহিনীর পেছনে। সামরিক বাহিনীর তিনটি হেড কোয়ার্টারই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। তাছাড়া সেনাবাহিনীর শতকরা পঁচানব্বই জনই ছিলেন সেই অঞ্চলের। ফলে সামরিক বাহিনীর জন্য বরাদ্দকৃত খরচের প্রায় সবটাই পেত পশ্চিম পাকিস্তান। (আমেরিকার দেওয়া প্রায় এক হাজার কোটি টাকার সামরিক সাহায্যের লাভও পেয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান।)

এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য যে-সব ব্যয় হত তাও হত পশ্চিম পাকিস্তানেই, কারণ রাজধানী ছিল সেখানেই। প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় বাজেটের পঁচাশি শতাংশই গ্রাস করত পশ্চিম পাকিস্তান। বৈদেশিক অর্থনৈতিক সাহায্যেরও তিন-চতুর্থাংশ পেয়েছে পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ববঙ্গকে দেওয়া হয়েছে এক-চতুর্থাংশ। এখানেই শেষ নয়, একটিমাত্র ছোট ব্যাঙ্ক ছাড়া সব ব্যাঙ্কই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের। পূর্ববঙ্গের সঞ্চয়ের (savings) বিরাট অংশও তাঁরা এইসব ব্যাঙ্কের মাধ্যমে নিয়ে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বিনিয়োগ করেছেন। পাকিস্তানে সরকার কোনসময়েই কার্টেল রোধ করার চেষ্টা করে নি। ফলে যাঁরা ছিলেন শিল্পপতি তাঁরাই হলেন ব্যাঙ্কার। আগেই দেখেছি, পাকিস্তানের রপ্তানি বাণিজ্যের সত্তর শতাংশ আয় করত পূর্ববঙ্গের পাট। পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পায়ন ও পাটশিল্পের অবহেলার ফলে ষাটের দশকের শেষদিকে রপ্তানি বাণিজ্যে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তানের আয় প্রায় সমান সমান হয়ে দাঁড়ায়। রপ্তানি বাণিজ্যে পূর্ববঙ্গের আয় সব সময় অর্ধেকের বেশী থাকলেও, তার আমদানি কোন বছরই পাকিস্তানের মোট আমদানির এক-তৃতীয়াংশের বেশী ছিল না। এভাবে কেবল পূর্ববঙ্গের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েই শাসকচক্র ক্ষান্ত হলেন না, পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানের তৈরী ভোগ্য দ্রব্যের (consumer goods) বাজারেও পরিণত করা হ'ল।

স্বাধীনতার সময় পূর্ববঙ্গে যে-কয়টা কাপড়ের মিল ছিল তা থেকে পূর্ববঙ্গের কাপড়ের চাহিদা প্রায় মিটে যেত। পশ্চিম পাকিস্তানে কাপড়ের মিল ছিল না বল্লেই চলে। কিন্তু ষাট দশক শেষ হওয়ার আগেই পূর্ববঙ্গের প্রতিষ্ঠিত কাপড়ের মিলগুলোকে শত্রু সম্পত্তি ঘোষণা করে সরকার নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসে ধ্বংস করল। পূর্ববঙ্গকে পশ্চিম পাকিস্তানে নতুন গড়ে ওঠা

বস্ত্র শিল্পের বাজারে পরিণত করার জন্যই সরকার সুচিন্তিতভাবে এটা করেছিল।

এভাবে পূর্ববঙ্গকে শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প গড়ে উঠল, কৃষিক্ষেত্রে হ'ল প্রভূত উন্নতি। আর পূর্ববঙ্গ হ'ল আরো গরীব। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গের মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হ'ল দুস্তর ব্যবধান। অবশ্য, পশ্চিম পাকিস্তানের সব অঞ্চলের উন্নতি সমান হয় নি। পাঞ্জাবের লাভই হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। পাঞ্জাবের সাধারণ লোকের জীবনধারণের মান হ'ল উন্নত। আর আঙুল ফুলে কলাগাছ হ'ল ব্যবসায়ী শিল্পপতি ও সাইগল, আদমজী, দাউদ-প্রমুখ বাইশটি পরিবার। পূর্ববঙ্গকে এভাবে শোষণ করা সম্ভব হয়েছিল কারণ পূর্ববঙ্গের গণতন্ত্রের কণ্ঠকে আগেই রোধ করা হয়েছিল। শাসকচক্রের মধ্যে পূর্ববঙ্গের কোন প্রতিনিধি ছিল না। মোনায়েম খান, সবুর খান, বগুড়ার মহম্মদ আলীরা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে আয়ুব খানের তথা পশ্চিমা শাসকচক্রের ভৃত্য। মিলিটারি ব্যুরোক্রেসীর (অফিসারদের) ছত্রচ্ছায়ায় পূর্ববঙ্গ পরিণত হ'ল পশ্চিমা পুঁজিপতি ও আমলাদের নির্লজ্জ লীলাক্ষেত্রে। মিলিটারি অফিসার ও আমলাদের মধ্যেও অনেকে তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করে পুঁজিপতি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেন। স্বয়ং প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খানের পরিবারই ছিল বাইশ পরিবারের এক পরিবার।

পূর্ববঙ্গের সাধারণ লোক গরীব থেকে গরীবতর হলেও মৌলিক গণতন্ত্র ও ওয়ার্কস্ প্রোগ্রামের কল্যাণে পূর্ববঙ্গের শহরে ও গ্রামে রাজানুগ্রহে একটা শ্রেণী গড়ে উঠল যাদের হাতে ভোগ (ও অপচয়) করার জন্য টাকা ছিল ও মানুষকে উৎপীড়ন করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল। সাধারণ মানুষ অনেক সময় বুঝতে পারে না কিভাবে সে রাষ্ট্রযন্ত্রের দ্বারা শোষিত হচ্ছে, কিন্তু এক্ষেত্রে মৌলিক গণতন্ত্রীদের মাধ্যমে তার কাছে রাষ্ট্রের শোষণের রূপটা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। একই কারণে পশ্চিম পাকিস্তানেও বিশেষভাবে সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আয়ুবের শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। পূর্ববঙ্গে ছাত্র-আন্দোলনগুলো জনসাধারণের কাছে এই শোষণের রূপটা আরো স্পষ্ট করে তুলেছিল।

জনসাধারণের গণতান্ত্রিক দাবী যখনই দানা বেঁধেছে, প্রকাশ-উন্মুখ হয়েছে, তখনই পশ্চিমা শাসকচক্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে তা বিপথগামী করেছে

অথবা কাশ্মীর নিয়ে হৈচৈ করে তার দৃষ্টিকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে। জনগণের বিক্ষোভ আশঙ্কা করেই ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে হজরত বাল ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করা হয়েছিল।

১৯৬৫ খৃস্টাব্দে ঐ একই কারণে কাশ্মীরে মুজাহিদ পাঠিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধের সৃষ্টি করা হয়। আয়ুব খানকে পররাষ্ট্র সচিব ভুট্টো বুঝিয়েছিলেন, যদি কোন-ক্রমে কাশ্মীরকে একবার পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা যায়, তাহলে তিনি জনগণের বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের চিরকৃতজ্ঞতা পাবেন, ক্ষমতায় তাঁর আসন চিরস্থায়ী হবে। আর যদি অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করা নাও হয় তাহলে অত্যন্ত বেশ কিছুদিনের জন্য জনগণের দৃষ্টিকে অন্যত্র নিবদ্ধ রাখা যাবে।

১৯৬৪ খৃ'টাব্দের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অংশ গ্রহণ করেছিল সরকারের নিয়োজিত গুণ্ডারা। জনসাধারণ. বিশেষত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী ও ছাত্র সম্প্রদায় সক্রিয়ভাবে এই দাঙ্গার বিরোধিতা করেছিলেন। দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকায় সমগ্র পূর্ব বাংলাকে দাঙ্গার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য আহ্বান করা হয়েছিল। 'সংবাদ' পত্রিকায়ও এর পেছনে কোন চক্র সক্রিয় সে সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে জনগণকে এই চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিতে অনুরোধ করা হয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান, তাজউদ্দিন আহমদ প্রমুখ নেতারা ও ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই দাঙ্গা রোধ করার জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সরকার এতে এত ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে, শেখ মুজিবুর ও অন্যান্য কয়েকজন নেতার বিরুদ্ধে গভর্ণরকে অপমান করার অছিলায় মামলা দায়ের করতেও কুণ্ঠিত হয় নি। ১৯৬৫ এর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে সম্পূর্ণ অরক্ষিত থাকা-সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গের বিরুদ্ধে ভারত কোন আক্রমণ না চালানোয় পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের কাছে দুটো ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। এক, ভারতের পূর্ববঙ্গের বিরুদ্ধে কোন আক্রমণাত্মক অভিসন্ধি নেই, দুই, পাকিস্তান বলতে পশ্চিম পাকিস্তানকেই বোঝায়। অন্যথা পূর্ববঙ্গের প্রতিরক্ষার জন্য অন্তত কিছু হলেও করা হত। আয়ুব খান যা চেয়েছিলেন তা না হয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের ফলে জন-সাধারণের বিক্ষোভ আরো বেড়ে গেল।

ষাট-দশকের প্রথম থেকেই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় বিশেষত অধ্যাপক ও সাংবাদিকরা পূর্ববঙ্গের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক হামলার রূপটা অত্যন্ত জোরালো ও সহজবোধ্য ভাষায় জনসাধারণের কাছে তুলে

ধরেন। ষাট-দশকের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শ্রেণীর কাছেও পাকিস্তান আন্দোলনের ধর্মীয় দিকটার চেয়ে অর্থনৈতিক দিকটাই অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। তাঁদের কাছে অর্থনৈতিক মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল। তাই পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও খবরদারী তাঁদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাঁদের চিন্তার সংস্পর্শে এসে প্রবীণরাও প্রভাবিত হচ্ছিলেন। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন তাঁদের শত্রু বা উৎপীড়ক হিন্দুরা নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক- ও শোষক-চক্র। এভাবে পূর্ববঙ্গে এক ধর্মনিরপেক্ষ গণ-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

নয়

১৯৬৬ খৃস্টাব্দের জুনমাসে লাহোরে আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক মুক্তি দাবী করে ছ'দফা প্রস্তাব পেশ করেন। ছ'দফার মূল বক্তব্য ছিল, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বাদ দিয়ে আর সব ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসন, সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও পূর্ববঙ্গের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করা। অর্থনৈতিক শোষণ বন্ধ করার জন্য তিনি যেসব প্রস্তাব করে-ছিলেন তার মধ্যে মুখ্য ছিল, পূর্ববঙ্গের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা পূর্ববঙ্গেই থাকবে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটো আলাদা মুদ্রা (currency) অথবা দুটো স্টেট ব্যাঙ্ক চালু করা যাতে পূর্ববঙ্গের টাকা পূর্ববঙ্গেই থাকে। আমরা আগেই দেখেছি কিভাবে পূর্ববঙ্গের টাকা পশ্চিমা ব্যাঙ্কগুলোর মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাচ্ছিল।

মুজিবুর রহমানের ছ'দফা দাবী শাসকচক্রকে শঙ্কিত করে তোলে। লাহোর ও করাচীর পুঁজিপতিরা তাঁদের শোষণের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় চিৎকার শুরু করেন, মুজিবুর রহমান পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছেন। আয়ুব খান হুমকি দিয়ে বলেন, ছ'দফা দাবীর উত্তর তিনি অস্ত্রের ভাষায় দেবেন। মুজিবুর রহমানকে প্রথমে আপত্তিকর বক্তৃতা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়, পরে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ আনা হয় 'আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায়'। ছ'দফা দাবীর মধ্যে পূর্ববঙ্গের

অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন মূর্ত থাকায় এই দাবী শ্রেণীনির্বিশেষে সব বাঙালীর সমর্থন পেয়েছিল। তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে, মৌলিক গণতন্ত্র প্রথার জন্য গ্রামের সাধারণ কৃষকের মনেও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে একটা ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। ১৯৬৮ খৃস্টাব্দের শেষদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আয়ুব খানের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলন ক্রমশ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক ও দুর্বার হয়ে ওঠে। কেবল মুজিবকেই মুক্ত করে আনল না, আয়ুবের শাসনেরও অবসান ঘটাল। এই আন্দোলন পূর্ববঙ্গেই সীমিত রইল না। পশ্চিম পাকিস্তানেও প্রসারিত হ'ল। পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণের মনেও মৌলিক গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল।

১৯৬৯ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে আয়ুব খান বিদায় নিলেন। এলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান, দেশের উপর তিনি আবার চালালেন সামরিক আইন। প্রতিশ্রুতি দিলেন দেশকে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবেন। নির্বাচনও দিলেন। আওয়ামী লীগ ছ'দফার দাবীতে বিপুল ভোট পেয়ে জয়ী হ'ল। গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। কিন্তু ইয়াহিয়া খান তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না। অস্ত্রের জোরে পূর্ববঙ্গের স্বায়ত্তশাসনের দাবী ও অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নকে চিরতরে মুছে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। পূর্ববঙ্গের সাত কোটি লোক নিরুপায় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল দেশকে মুক্ত ও স্বাধীন করতে।

প্রশ্ন হ'ল, কেন ইয়াহিয়া খান এরকম করলেন? আর এই যদি তাঁর ইচ্ছে ছিল, কেন নির্বাচন দিলেন? এর উত্তরে প্রথমেই মনে রাখা উচিত ইয়াহিয়া খান কোন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি নন, তিনি পশ্চিমা শাসকচক্রেরই একজন, যে-শাসকচক্রে আছে মিলিটারি অফিসাররা, পুঁজিপতিরা, জমিদাররা ও আমলারা।' তাঁদের প্রতিভূ হিসেবে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কখনোই তাঁর কাম্য হতে পারে না। পূর্ববঙ্গে শোষণের পথ রুদ্ধ হোক এমন কোন প্রস্তাবেই কখনো তিনি রাজী হতে পারেন না। তবুও তিনি নির্বাচন দিয়েছিলেন এই আশায় যে, পূর্ববঙ্গে অনেকগুলো রাজনৈতিক দল থাকায় কোন একটা দলের পক্ষে গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হবে না। আর তিনিও বিভিন্ন দলের অনৈক্যের সুযোগ নিয়ে আয়ুব খান বা তাঁর পূর্ববর্তী রাজনীতিবিদদের মত দেশের উপর এমন একটা শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেবেন, যা পুরোনো শাসকচক্রের ক্ষমতাকে রাখবে অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিরোধ্য।

কিন্তু তাঁর বা পশ্চিমা শাসকচক্রের এই আশা সফল হ'ল না। পূর্ব বাংলার জনগণ দলমত-নির্বিশেষে অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্নে আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ ভাবে জয়ী করল।

এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে, পাকিস্তান ধ্বংস হওয়ার বীজ পাকিস্তানের জন্মের ইতিহাসেই সুপ্ত ছিল। বাংলাদেশ সংগ্রামের ইতিহাস তার সামাজিক পটভূমিতেই নিহিত আছে। বাংলাদেশের লক্ষ মানুষের পুণ্য শোণিতে দীক্ষিত এই সংগ্রাম সার্থক হবেই তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। বার শত মাইল দূর থেকে এক বিদেশী শাসকচক্র কেবল শক্তির জোরে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দিতে পারে না, এই বিশ্বাস প্রতিটি বাঙালীর আছে। তাদের কাছে তাই আজ জীবনমৃত্যু পায়ের ভৃত্য। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, কেবল স্বাধীন হলেই হয় না, স্বাধীনতার পতাকা বহন করার শক্তিও অর্জন করতে হয়। পাকিস্তান ধ্বংস হচ্ছে কারণ তার সে শক্তি ছিল না। তার গণমানসের মধ্যে সেই পরম ঐক্য সৃষ্টি হয় নি যা একটা রাষ্ট্রকে জাতিতে পরিণত করে। পাকিস্তান সবসময় রাষ্ট্রই থেকে গেছে, কখনো জাতিতে পরিণত হয় নি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পুণ্যলগ্নে আমাদের তাই আজ সজাগ হতে হবে সেরকম কোন ভুলভ্রান্তি বা অকল্পনা যেন আমাদের স্বাধীনতা-উত্তর জীবনকে কন্টকিত না করে। সর্বশ্রেণীর মানুষের ত্যাগ ও তিতিক্ষার ফলে যে পুণ্যভূমির সৃষ্টি হচ্ছে, সেই পুণ্যভূমির কল্যাণেই কেবল নয়, তার প্রাপ্তিতেও যেন সর্বশ্রেণীর মানুষের সম-অধিকার থাকে। বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করাই হবে মুক্তিসংগ্রামের পরম লক্ষ্য।

দ্বিজাতিতত্ত্বের অপঘাত-মৃত্যু

—আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী

উনিশশো একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তান নামে একটি তথাকথিত ধর্মরাষ্ট্রের মৃত্যু ঘটেছে। এটাকে কেবল একটা ধর্মরাষ্ট্রের মৃত্যু বলা হলে ঠিক বলা হবে না, এটা একটা অবাস্তব থিয়োরি বা তত্ত্বেরও অপঘাত-মৃত্যু। অপঘাত-মৃত্যু বললাম এজন্যে যে, এই রাষ্ট্রটির এবং তার ভিত্তি হিসেবে এই অবাস্তব তত্ত্বটিরও স্বাভাবিক পরিণতি ছিল মৃত্যু। কিন্তু এই মৃত্যু স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে আসার আগেই পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট সামরিক জাণ্টার নেতারাই আধুনিক সমরাস্ত্রের প্রয়োগে এই ভুঁইফোঁড় রাষ্ট্রটির দফা নিকেশ করে দিয়েছেন। হিটলারের ইহুদী-নিধন নীতি আর পররাজ্যগ্রাসী অভিযানে ইউরোপের কোটি কোটি ইহুদী ও খৃস্টান নরনারী প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু এই মানবতাদ্রোহী ভূমিকার ফল বুমেরাং হয়েছে জার্মানীর জন্যেই। হিটলারকে আত্মহত্যা করতে হয়েছে। ঐক্যবদ্ধ জার্মান ন্যাশন ও স্টেটের আজ অস্তিত্ব নেই। শুধু দেশ বিভক্ত নয়। বিভক্ত বার্লিন শহর। আর এই বার্লিন শহরের প্রাচীরের লৌহকবাটে মাথা ঠুকে মরেছে ও মরছে কত হাজার হাজার জার্মান তার হিসেব কে রাখে? তবু জার্মান জাতির এই বিভক্তি সাময়িক ব্যাপার। ভূগোল, ভাষা, সংস্কৃতি ও রক্তসম্পর্কের দিক থেকে জার্মানী এক দেশ, এক জাতি। আন্তর্জাতিক শিবির রাজনীতির ফলে আজ বিভক্ত। এই বিভেদের রাজনীতির অবসানে জার্মানীরও দুঃখ রজনীর অবসান ঘটবে। জার্মানীর বেলায় যা সাময়িক ব্যাপার, পাকিস্তানের বেলায় তা-ই স্থায়ী মীমাংসা। ভূগোল, ভাষা, সংস্কৃতি, নৃতত্ত্ব, অর্থনৈতিক কাঠামো ও রক্ত সম্পর্ক কোন দিক থেকেই পাকিস্তানের দু' অঞ্চলের মানুষ এক দেশ এক জাতি নয়। পশ্চিমাঞ্চলের আর্য পাঞ্জাবী বা পাঠানের সঙ্গে বালুচ বা সিন্ধীদের বংশ পরাম্পরাক্রম রক্ত সম্পর্কের ফলে জাতি সম্পর্ক গড়ে ওঠা তবু সম্ভব, কিন্তু অনার্য বাঙালীর সঙ্গে তা একেবারেই অসম্ভব। শুধু ভাষা নয়, এই দু'অঞ্চলের মানুষের খাদ্য, শারীরিক গঠন, মানসিক গঠন, অভ্যেস, রুচি ও সামাজিক সংস্থানেরও কোন মিল নেই। তার উপর অপর রাষ্ট্র দ্বারা খণ্ডিত স্থলপথে দু' হাজার

মাইলের ভৌগোলিক ব্যবধান। অধুনা বিশ্বে ভৌগোলিক দূরত্ব হ্রাসের ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ভাষা, দেশ, সমাজ ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য লোপের কোন মহৌষধ আবিষ্কৃত হয় নি। ধর্মে খৃস্টান এবং কানাডার সন্নিহিত অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও ফরাসী ভাষাভাষী কুইবেক কানাডার অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে চায় না। বরং মাঝে-মাঝেই তার জাতি-স্বাতন্ত্র্য বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই পাকিস্তানে জেনারেল ইয়াহিয়া যেদিন হিটলারের ইহুদী নিধন-নীতির অনুকরণে বাঙালী-নিধন অভিযান পরিচালনার জন্য তরবারি কোষমুক্ত করেছেন, সেদিন ঢাকার রাজপথে প্রথম বাঙালী শহীদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান নামক ধর্মভিত্তিক অবাস্তব রাষ্ট্রাদর্শের অপঘাত-মৃত্যু হয়েছে। রক্ত-সম্পর্কহীন জাতিনিচয়ের স্বাতন্ত্র্য-যে বলপ্রয়োগ দ্বারা ঘোচানো সম্ভব নয়, মূর্খ ইয়াহিয়া তা বোঝেন নি। হিটলারের নীতি জার্মানীর জন্যই বুমেরাং হয়েছিল, যেমন আজ হয়েছে পাকিস্তানে ইয়াহিয়ার নীতি। বাঙালী রক্ত দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু পাকিস্তান আজ রক্তসমুদ্রে ভাসমান একটি শবাধার। এই শবাধারে যে গলিত শবটি রয়েছে, তা ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের। এই তত্ত্বের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানেও বালুচ, সিন্ধী, পাখতুন জাতি নিচয়ের অভ্যুত্থান অবশ্যম্ভাবী। ভাষা, ভূগোল, রক্ত ও সমাজ-সম্পর্কের দিক থেকে জার্মানী এক দেশ এক জাতি। তাই তার বিভাগ সাময়িক ব্যাপার। কিন্তু ভাষা, ভূগোল, রক্ত ও সমাজ-সম্পর্কের দিক থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত জাতিসমষ্টির বাসস্থান পাকিস্তানে ধর্ম-ভিত্তিক জাতীয়তার বন্ধন অস্বাভাবিক ও অসম্ভব ব্যাপার। এই সম্পর্কের অবসানে স্বাধীন বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির অভ্যুত্থান নবজাগ্রত এশিয়ায় গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সুস্থ ও স্বাভাবিক নবজন্ম। পাকিস্তানে জাতি-সমস্যার এটাই স্থায়ী ও সঠিক মীমাংসা।

জাতীয়তাবাদের জন্ম, ক্রমবিকাশ ও বিভিন্ন সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এবং এই বহুল আলোচিত বিষয়টির পুনরালোচনা বাহুল্য। এখানে কেবল একটি কথা উল্লেখ্য যে, গত দু'শতকের বিবর্তনের ধারায় এটা স্পষ্ট, ধর্ম এবং আদর্শ জাতীয়তার প্রকৃত ভিত্তি হতে পারে না এবং পারে নি। এই জাতীয়তা টেকসই হয় না। মধ্যযুগে ধর্মীয় জাতীয়তার বেলায় এটা প্রমাণিত হয়েছে, বর্তমান যুগে আদর্শ-ভিত্তিক জাতীয়তার বেলাতেও প্রমাণিত হচ্ছে। সেযুগে ইসলামের মহানবী মহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মদিনা ও দামেস্কের

সংঘর্ষ যতটা না আদর্শগত, তার চাইতেও বেশি গোত্রবিবাদ এবং আরব-অনারব প্রাধান্যের সংঘর্ষ। ধর্মে মুসলমান হলেও আরবদেশের মুসলমানেরা সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশের মুসলমান অধিবাসীদের আজমী আখ্যা দিয়ে অবজ্ঞার চোখে দেখেছে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় আজমীদের প্রাধান্য আরবরা কখনো স্বীকার করতে চায় নি। ইসলামের কোন কোন ইতিহাসে এমন কথাও লিপিবদ্ধ দেখা যায়, আরব সাম্রাজ্যের সব চাইতে উদার ও ধর্মপ্রাণ খলিফা হজরত উমরের সময়ও অনারব বা আজমী মুসলমানদের অশ্বারোহী বাহিনীতে গ্রহণ করা হতো না। তারা যুদ্ধ করতেন পদাতিক বাহিনীর সৈন্য হিসেবে। সে যুগে ধর্মীয় জাতীয়তার বেলায় যা ঘটেছে, এযুগে ঘটছে আদর্শ-ভিত্তিক জাতীয়তার বেলায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুগোশ্লাভিয়ায় দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্কো-বেলগ্রেড সম্পর্কের অবনতি, স্ট্যালিন-টিটো বিবাদ এবং শেষপর্যন্ত কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র নয়া চীনের সঙ্গে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সীমান্ত সংঘর্ষ প্রমাণ করেছে, এ-যুগের আদর্শ-ভিত্তিক জাতীয়তাও মধ্যযুগের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার পথ অনুসরণ করে চলেছে। অন্যদিকে সাম্যবাদী আন্তর্জাতিকতা, কমন মার্কেট আর ফ্রি ট্রেড্ জোনের এই বিস্ময়কর সম্প্রসারণের যুগেও ভৌগোলিক জাতীয়তার স্রোত অপ্রতিহত। জাতীয়তার এই একটি ভিত্তি (ভৌগোলিক) এখনো সবল এবং অটুট।

মধ্যযুগে যে ঘড়ির কাঁটা অচল হয়ে গেছে, তাকে সবল করার জন্যই যেন বর্তমান যুগে পাকিস্তানের জন্ম। দম-দেওয়া ঘড়ির কাঁটা আর কতদিন চলে? তাই পুরো চব্বিশটি বছর পার হওয়ার আগেই ধর্মরাষ্ট্র পাকিস্তানের ঘড়ির দম ফুরিয়ে গেছে। কাঁটা অচল হয়ে গেছে। বন্দুকের রক্তাক্ত বাট দিয়ে এই কাঁটা আবার সচল করার চেষ্টা চলছে। তাতে ঘড়িই ভাঙবে, কাঁটা সচল হবে না। মধ্যযুগে ইউরোপের ফিউডালতন্ত্রের ভিত্তি ছিল ক্রিশ্চিয়ানিটি বা ধর্ম। দুই শক্তিশালী সহায়ক বাহু ছিল পুরোহিত আর গীর্জা। ধনবাদে উত্তরণের আগে ফিউডাল ইউরোপ আত্মস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য থিয়োক্রাসির বর্ম এঁটে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ করেছে। এই ধর্মযুদ্ধের জয় পরাজয় দ্বারা খৃস্টানধর্মের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় নি। নির্ধারিত হয়েছে ফিউডালতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। ক্রুসেডের পর থেকেই মূলতঃ ইউরোপে ধনবাদের ধীর অভ্যুত্থান, সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় শুরু। এটা ধরা পড়ে গিয়েছিল, ক্রুসেড ক্রিশ্চিয়ানিটি রক্ষার বর্ম নয়, ইউরোপের খৃস্টান

রাজন্য স্বার্থরক্ষার বর্ম। ধনবাদী অর্থনীতি ও ভৌগোলিক জাতীয়তার প্লাবনে এই বর্ম টেকে নি। তাতে খৃস্টান ধর্ম লোপ পায় নি।

এত বড় একটা সত্য চোখের সামনে থাকতেও উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের সঙ্গে স্থূল ধর্মবোধের জ্ঞাতিসম্পর্ক পাতানোর চেষ্টা হলো। ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু ভারত-বর্ষে ভৌগোলিক জাতীয়তার বিকল্প হয়ে দাঁড়ালো ধর্মীয় রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ-বোধ। লিনকনস ইনের খাঁটি 'সাহেব ব্যারিস্টার' জিন্না স্যুটের সঙ্গে মাথায় টুপি চড়িয়ে মুসলমান নেতা হলেন, কংগ্রেস ছেড়ে যোগ দিলেন মুসলিম লীগে। বললেন, ভারতবর্ষ খণ্ডিত করে ধর্মভিত্তিক মুসলমান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া সমস্যার আর কোন সমাধান নেই। ইউরোপে যে রাজন্যস্বার্থ একদা ধর্মযুদ্ধের বর্ম এঁটে চেয়েছে নিজের স্বার্থ ও অস্তিত্ব রক্ষা করতে, ধনবাদে উত্তরণের পর ভারতবর্ষকে ধর্মীয় জাতীয়তার খড়্গে দ্বিখণ্ডিত করে তারাই চাইলেন নিজেদের ঔপনিবেশিক ও বাণিজ্যিক প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে।

এটা অবস্থার একদিক। কেবল এটাকেই ভারতের তৎকালীন পরিস্থিতির একমাত্র ব্যাখ্যা ভাবা হলে পরিস্থিতির সরলীকরণ করা হবে। ভারতবর্ষে জাতিতত্ত্বের সমস্যা ছিল আরো জটিল। সম্প্রদায় ভিত্তিতে জাতিত্ব নিরূপণ বর্ণভেদ ও তৎপরবর্তী কঠোর রক্ষণশীলতারও ফল। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'ভারতে এক জাতি গঠন'* প্রবন্ধে বলেছেন, "আমি বিশ্বাস করি, ভারতের সর্ববিধ অমঙ্গলের কারণ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও প্রদেশবাসীদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অভাব। এই অভাব কেবল মুসলমানদের নয়, হিন্দুদেরও। হিন্দু জাতীয়তার স্থানে বোঝেন বর্ণগত জাত। এটাই হিন্দুর অস্থিমজ্জাগত। সেইজন্যই হিন্দু লেখেন জাতি ব্রাহ্মণ, জাতি কায়স্থ ইত্যাদি। মুসলমান প্রভাবে বা মুসলমান শাসনের চাপে হিন্দুর ধর্মগত জাতীয়তাবোধ জন্মে। তখন স্পৃশ্য অস্পৃশ্য ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলে বলিল আমরা হিন্দু জাতি। ধর্মগত জাতীয়তা মুসলমানদেরও অত্যন্ত প্রবল। মধ্যযুগে খৃস্টানদের এরূপ ছিল।"

বর্ণভেদ প্রাচীন ভারতে ধর্ম সমন্বয়ের পথে অন্তরায় হয়েছে এবং ধর্মসমন্বয়ের অনুপস্থিতিতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা জাতীয়তার স্থান দখল করেছে এটা

* ভারতে একজাতি গঠন, মাসিক বুলবুল, কার্তিক ১৩৪৪।

ঐতিহাসিক সত্য। ডক্টর শহীদুল্লাহ্ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ও প্রদেশবাসীর মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের অভাবের কথাটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তার কারণ এবং হিন্দু জাতীয়তার বিকাশকে ঠিকমত বিশ্লেষণ করেছেন বলে অনেকে মনে করেন না। প্রাচীন ভারতে ভারতবাসীর মধ্যে সর্বভারতীয় ঐক্যবোধের অভাবের অন্যতম কারণ ছিল ভারতের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক ঐক্যের অভাব (যদিও তখন ইউরোপের শিল্প-বিপ্লব পরবর্তী আধুনিক জাতীয়তার জন্ম হয় নি)। ইউরোপের মত এই রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব ধর্মীয় ঐক্য দ্বারা পূর্ণ হয় নি। অতীতেও ভারতবর্ষ এক ধর্মের দেশ ছিল না। হিন্দু কোন ধর্মের নাম নয়। হিন্দুকুশ পাহাড় পেরিয়ে এদিকে যে বিশাল দেশ হিন্দুস্থান, তারই অধিবাসীদের বিদেশীরা বলতো হিন্দু। আধুনিক যুগের সংজ্ঞায় আজ যা ভারতীয় জাতি, আসলে তাই হিন্দু জাতি। এই হিন্দু জাতির অন্তর্ভুক্ত বহু সম্প্রদায়, যেমন মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, খৃস্টান, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি। এখানে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আজ থেকে বছর পঞ্চাশ আগে আমার পরলোকগত পিতা হজ্জ সমাধার জন্য মক্কাশহরে গমন করেন। হজ্জ সমাধার পর তিনি মদিনার একটি আরব দেশীয় হোটেলে কিছুকাল অবস্থান করেন। তিনি বৃটিশ ভারতের প্রজা ছিলেন। আরব হোটেলটির রেজিস্ট্রিখাতায় তাঁর নামের পাশে লেখা হয়েছিল, নিবাস হিন্দুস্থান, ধর্ম সুন্নি মুসলমান, জাতি হিন্দু। শৈশবে পিতার মুখে এই কাহিনী শুনেছি। শুনে বিস্মিত হয়েছি। বড় হয়ে ভারতবর্ষের ধর্মসম্প্রদায়ের ইতিহাস এবং বিশেষ করে স্বদেশী যুগে লেখা রবীন্দ্রনাথের* কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করে আমার এই বিস্ময় দূর হয়।

কিন্তু এই সর্বভারতীয় জাতীয়তা বা হিন্দু জাতীয়তার বিকাশও অনেক পরে। প্রাচীনকালে তো নয়ই, পাঠান ও মোগল আমলেও নয়। আসলে জাতীয়তাবাদই তো একটা আধুনিক ব্যাপার। মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী আক্রমণের সময় কনৌজের রাজা জয়চন্দ্র পৃথ্বিরাজের বদলে ঘোরীকে সাহায্য করেছেন। পানিপথে ইব্রাহিম লোদির সঙ্গে যুদ্ধে রাজপুত রাজা সংগ্রামসিংহ কাবুল ও কান্দাহার থেকে আগত বাবুরকে সাহায্য করেছেন। বহিরাগত মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধের আয়োজন করেন নি ভারতের হিন্দু রাজারা কোনকালেই। মোগল সম্রাট আকবরের আমলে চিতোরের রাণা

প্রতাপের যুদ্ধ রাজপুত জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঔরঙ্গজেবের আমলে শিবাজির বিদ্রোহ মারাঠাদের অভ্যুত্থান, এর মধ্যে সর্বভারতীয় বা হিন্দু জাতীয়তার বীজ উপ্ত ছিল না। দিল্লীর কেন্দ্রীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে এই ধরনের বিদ্রোহ তখন দাক্ষিণাত্যের কয়েকটি মুসলমান রাজ্যও করেছে। সুতরাং ডক্টর শহীদুল্লাহ যখন বলেন, 'মুসলমান শাসনের চাপে হিন্দুর ধর্মগত জাতীয়তাবোধ জন্মে', তখন একথা মেনে নেওয়া অনেকের পক্ষেই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। অথবা তিনি যখন বলেন, ধর্মগত জাতীয়তা মুসলমানদের অত্যন্ত প্রবল, তখনও সবিনয়ে একটা কথা উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, মধ্যযুগেও ভারতে মুসলমানদের মধ্যে এই ধর্মগত জাতীয়তার তেমন প্রাবল্য দেখা যায় নি, যেমন দেখা গেছে পরবর্তী কালে। ভারতে মুসলিম পাঠান সাম্রাজ্য মুসলিম মোগল বাবুরের হাতে ধ্বংস হয়। মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব সূর্য যখন অস্তাচলে, মারাঠাদের বারংবার আক্রমণে দিল্লীর রাজশক্তি নিঃশেষ প্রায়, তখন পারস্য থেকে আগত নাদির শাহ দিল্লী আক্রমণ করেন এবং মোগল সাম্রাজ্যের শবাধারে শেষ পেরেকটি পুতে দেন। দশ দিন দশ রাত্রি ধরে নাদির শাহের সৈন্যরা দিল্লীতে অবাধ লুণ্ঠন ও হত্যালীলা চালায়। তাদের বর্বরতায়-যে হাজার হাজার নরনারী নিহত হয়, তাদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা একেবারে কম ছিল না। সে যুগের নাদির শাহ এবং এযুগের ইয়াহিয়ার ইতিহাস প্রায় অভিন্ন। পার্থক্য শুধু বর্বরতার ব্যাপকতায়। একজন দিল্লী শহর ধ্বংস করেছেন, অন্যজন গোটা বাংলাদেশ রক্তে ভাসিয়ে দিয়েছেন। এই রক্তে লক্ষ লক্ষ বাঙালী মুসলমানেরও রক্ত মিশ্রিত। নাদির শাহের মতই ইয়াহিয়া প্রমাণ করেছেন, রক্তসম্পর্ক ছাড়া রক্তের আত্মীয়তা ও জাতীয়তা তৈরী হয় না। ধর্মীয় জাতীয়তা একটা ভুয়ো শ্লোগান। তাই অনায়াসে তিনি হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালীর বুকে গুলি চালাতে পেরেছেন। কারণ, এই যে লক্ষ লোকের রক্তপাত, এই রক্তপাত ইয়াহিয়ার নিজের রক্তপাত নয়। এই রক্তের সঙ্গে তার আত্মীয়তা নেই, সম্পর্ক নেই, তাই মমত্ববোধও নেই।

পাঠান ও মোগলযুগে এক মুসলমান আক্রমণকারী অপর মুসলমানের রাজ্য ধ্বংস করেছেন, পুত্র পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, পিতা পুত্রকে হত্যা করেছেন, এটা মধ্যযুগীয় ইতিহাসেরই স্বাভাবিক ধারা। এর মধ্যে মুসলমান বা ইসলাম ধর্মের কোন ভূমিকা নেই, রয়েছে রাজ্যলিপ্সু দিগ্বিজয়ী ও শাসকের

ভূমিকা। প্রয়োজনে সর্বপ্রকার ধর্মান্ধতা থেকে মুক্ত থাকতে চেয়েছেন কোন কোন মুসলমান নৃপতি। বাবুর তার পুত্র হুমায়ুনকে শেষ গোপন উপদেশ-পত্রে ভারতে গো হত্যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। বাবুর এই পত্রে লেখেন, "তোমার উচিৎ সর্বপ্রকার ধর্মান্ধতা হইতে মনকে পরিচ্ছন্ন রাখিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস ও প্রথানুযায়ী তাদের বিচার করা। বিশেষতঃ গো হত্যা হইতে বিরত থাকিও। তাহাতে প্রজাপুঞ্জ তোমার অনুরক্ত হইবে এবং তুমি তাহাদের হৃদয় জয় করিতে পারিবে। তোমার শাসন-সীমার মধ্যে কোন জাতিরই ধর্মমন্দির বা উপাসনালয়ের উপর যেন হস্তক্ষেপ করা না হয়।"*

শুধু বাবুর নন, সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থে আকবর ধর্মসমন্বয়ের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। নতুন ধর্ম দীন-ই-ইলাহী প্রবর্তন করেছেন। আবার ঔরঙ্গজীব সিংহাসন দখলের স্বার্থে ইসলাম রক্ষার শ্লোগানকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে দুই সহোদর ভ্রাতাকে হত্যা এবং অপর ভ্রাতাকে দেশত্যাগে বাধ্য করেন। তাই মহম্মদ ঘোরী থেকে বাবুর এবং বাবুর থেকে ঔরঙ্গজীব পর্যন্ত কোথাও ধর্মীয় জাতীয়তা বা ধর্ম সাম্রাজ্যের ভূমিকা নেই। ধর্ম ব্যবহৃত হয়েছে ব্যক্তি ও গোত্রের সাম্রাজ্য স্বার্থে।

প্রাচীন ভারত এই লুব্ধ সাম্রাজ্যবাদী থাবা কোন বৃহত্তর ঐক্যবোধ দ্বারা প্রতিহত করতে পারে নি। এটাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের সব চাইতে বড় ট্র্যাজেডি। সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব এবং তজ্জনিত সর্বভারতীয় ঐক্যবোধের অভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল-রাজ্যের নৃপতিরা বিভিন্ন সময়ে একক প্রচেষ্টায় বহিরাক্রমণকারীকে ঠেকাতে চেয়েছেন। পারেন নি। কারণ, অপর নৃপতিরা অধিকাংশ সময় আক্রান্তকে সাহায্য করার পরিবর্তে নিরপেক্ষ রয়েছেন, অথবা আক্রমণকারীকে সাহায্য করেছেন। প্রাচীন ভারতের বর্ণভেদ যেমন ধর্মসমন্বয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে মধ্যযুগে একীভূত ধর্মীয় জাতীয়তার বিকাশকে ব্যাহত করেছে, তেমনি উনবিংশ শতকের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তার বিকাশ-লগ্নে এই ক্ষুদ্র, খণ্ড বর্ণ বা সম্প্রদায়ভিত্তিক ধর্মবিদ্বেষ বৃহত্তর জাতীয়তার সুস্থ বিকাশকে বিঘ্নিত ও বিলম্বিত করেছে। বৃটিশ শাসনের শেষে ভারতে পাকিস্তান নামক মধ্যযুগীয় ধর্মরাষ্ট্রের জন্ম এই অসুস্থ ও অশুভ ধর্মবিদ্বেষ ও বিভেদের শেষ পরিণতি।

---

* বাবুরের একটি ফরমান, ভূপালের নবাবের পাবলিক লাইব্রেরীতে রক্ষিত মূল ফার্সি থেকে অনুবাদ। অনুবাদ আমার নয়।

দুই

প্রাচীন ভারতেও ধর্ম-বিরোধ ছিল। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধ, জৈন ধর্মের অভ্যুত্থান, তুষানলে বৌদ্ধদের পুড়িয়ে মারার কাহিনী এখনো ইতিহাসের পাতায় কিংবদন্তীর মত ছড়িয়ে রয়েছে। এ ছাড়াও ছিল বর্ণগত ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত রাজাদের পরস্পরবিরোধ। গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর বর্ধমানের মৃত্যুর অল্প কিছুকাল পর শিশুনাগবংশীয় মহানন্দের শূদ্র স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ভারতের ক্ষত্রিয়-কুল নির্মূল করে একচ্ছত্র রাজা হয়েছিলেন। 'এই শূদ্র মাতার গর্ভজাত পুত্র ভারতের (আর্যাবর্তের) সম্রাট হওয়ার পর "একরাট" পদবী গ্রহণ করেছিলেন। রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ্র অধুনালুপ্ত মাসিক 'সবুজপত্রে' (১ম বর্ষ, পৃঃ ৪০৩) প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন, এই একরাট পদবীধারী মহাপদ্মনন্দের রাজত্বের আগে সারা আর্যাবর্তে কোন রাজনৈতিক বা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের অস্তিত্ব ছিল না।' কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রীয় ঐক্যবিধানের এই ধরনের কোন প্রচেষ্টাও যে টেকসই হয় নি, তার অন্যতম কারণ বর্ণগত ধর্ম সাম্প্রদায়িকতা। পরবর্তী কালে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ বৃত্তান্তেও এই কলহের বিবরণ পাওয়া যায়। হিউয়েন সাং লিখেছেন, "কর্ণসুবর্ণের অধিপতি বৌদ্ধধর্মের প্রবল শত্রু দুষ্টাত্মা শশাঙ্ক-কর্তৃক হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন নিহত হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক গৌতম বুদ্ধের পদচিহ্নাঙ্কিত পাষাণখণ্ড বিনাশে অসমর্থ হইয়া উহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।...শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করিয়া উহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা অশোকের বংশধর মগধরাজ পূর্ণবর্মার যত্নে পুনর্জীবিত হইয়াছিল।"*

প্রাচীন ভারতে এই বর্ণবিরোধ বা ধর্মবিরোধ যত প্রবল ও ভয়াবহ হোক, তার অন্তর্ঘাত ছিল আপাতঃ সত্য। কারণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৌদ্ধ, জৈন, শূদ্র এই সকল বর্ণ ও ধর্মমতের লোকেরাই একই ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার ফসল। প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য ছিল না, কিন্তু তার কৃষ্টি ও সভ্যতার অদৃশ্যমান ঐক্যের অন্তঃসলিলা ধারা ভারতীয় ঐক্যের মূল স্রোতকে সর্বক্ষণ রক্ষা করার চেষ্টা করেছে। মধ্যযুগের ইউরোপে পিউরিটান ও প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের প্রবল বিরোধের সঙ্গে তুলনীয় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মমতের বিরোধ। আসলে একই খৃস্টান ধর্ম ও খৃস্টীয় ধর্মমতের দুই স্রোত পিউরিটান ও প্রোটেস্ট্যান্টবাদ। যেমন

* বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৭৮

একই ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার ফসল ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, প্রভৃতি ধর্মমতবাদ। খৃস্টান পুরোহিততন্ত্রের রক্ষণশীলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার সোচ্চার প্রতিবাদ প্রোটেস্ট্যান্টবাদ। অন্যদিকে প্রাচীন ভারতে উত্তরাপথের পূর্বাঞ্চলে আর্যধর্মের চরম প্রতিক্রিয়াশীলতা ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ফল বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম। প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত সকল সময়ই নতুন ধর্মমতকে সংহার করতে চায়। কিন্তু ইউরোপের মত ভারতেও এই সংহারনীতি পরবর্তী কালে সমন্বয় ও সহঅবস্থানের নীতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতে বর্ণ সাম্প্রদায়িকতা না থাকলে ইউরোপের মত ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তার বিকাশও প্রত্যাশিত সময়ের আগেই সম্ভব হত।

ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজের বিবর্তন ধারায় বিদেশী মুসলমানদের ভারত আগমন এবং লুণ্ঠনকারীর ভূমিকা থেকে শাসকের ভূমিকা গ্রহণ গোড়া থেকেই একটা বড় বিরুদ্ধ স্রোত। ইসলাম ধর্ম ভারতের সমাজ ও সভ্যতার ফসল নয়, কিংবা ভারতীয় আর্যধর্মের মত প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার ধারায় সমর্পিত ও স্থিত হয় নি। ইসলামের জন্ম আরবের মরুভূমিতে, সম্পূর্ণ পশ্চাৎপদ ও অধঃপতিত সামাজিক কাঠামোর মধ্যে। পরবর্তী কালে ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণযুগে মানবতা ও সাম্যের বাণীকণ্ঠে নববিশ্বাসে বলীয়ান আরবদেশীয় মুসলমান শাসকগণ নতুন নতুন দেশ দখল করেছেন; কিন্তু বিজিত জাতিকে তার নিজের সংস্কৃতি গ্রহণে সহজে রাজি করতে পারেন নি। বরং বিজিত জাতির সংস্কৃতি দ্বারা বহুক্ষেত্রে নিজেরা প্রভাবিত হয়েছেন। প্রাচীন ভারতের দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড়গণ এবং বঙ্গ ও মগধের অধিবাসিগণের অনেকে যেমন আর্যধর্ম গ্রহণ করেছেন, কিন্তু নিজেদের সমোন্নত ভাষা, সভ্যতা ও আচার রীতিনীতি ত্যাগ করেন নি, বরং তদ্দারা ক্ষেত্রবিশেষে আর্যদের প্রভাবিত করেছেন; তেমনি প্রাচীন পারস্যে আর্যজাতির এক শাখা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে প্রাচীন যরদুস্তি ভাষা, সমাজ, সভ্যতা ও রীতিনীতি ত্যাগ করেন নি। যুদ্ধে যদিও আরবের মুসলমানেরা জয়ী হয়েছেন, কিন্তু সংস্কৃতি বা কৃষ্টির দ্বন্দ্বে তখনকার অনুন্নত আরব সংস্কৃতি উন্নত পারসিক সংস্কৃতির সঙ্গে পেরে উঠে নি; বরং বিজয়ী জাতি বিজিতের সমাজ ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য দ্বারাও বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছে। প্রাচীন পারস্যে বসবাসকারী আর্য জাতির এক শাখা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ইরানী মুহম্মদী নামে পরিচিত হয়েছে, অপর শাখা প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস

আঁকড়ে থেকে ষরতুস্তি নামে পরিচিত থেকেছে। কিন্তু তারা দুই জাতিতে বিভক্ত হয় নি। ইরানের মুসলমানেরা আরবের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু আরবের ভাষা ও কৃষ্টিকে গ্রহণ করে নি। ধর্মের কোন দেশ, কাল, পাত্র ভেদ নেই। কিন্তু সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির দেশ কাল পাত্রভেদ রয়েছে। ধর্ম পরিবর্তন দ্বারা বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটে, জাতীয়তা, ভাষা, দেহের গঠন ও বর্ণ পরিবর্তিত হয় না। ইউরোপের একজন খৃস্টান ধর্মপরিবর্তন দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান বা বৌদ্ধ হিসেবে পরিচিত হতে পারেন ; কিন্তু তদ্দারা তিনি আরবীয় বা ভারতীয় অধিবাসী-রূপে রাতারাতি রূপান্তরিত হতে পারেন না। জাতীয়তার এই পরিচয় দেশজ সভ্যতা-, সমাজ- ও সংস্কৃতি-নির্ভর। ইরানের মুসলমানেরা তাই আরবের নতুন ধর্মমতকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু অনুন্নত আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েছেন। দেশজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যেই সংশ্লিষ্ট জাতির বিকাশ ও পরিপুষ্টি। প্রাচীন পারসিক মুসলমানেরা এই সত্যটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই যতদিন ইরানে তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর আরবদেশীয় সমাজ সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ভাষা প্রভুত্ব বিস্তার করে রয়েছে, ইরানী মুসলমানদের ভাষায় তা তাদের অন্ধকার যুগ। মহাকবি ফেরদৌসির আমলের আগেই ইরানের মানুষ আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির জোয়াল কাঁধ থেকে ফেলে দেশজ সংস্কৃতির দিকে মুখ ফেরানোর জন্য বিদ্রোহ করেন এবং বিদেশী ও আক্রমণকারী আরবদের জয়গাথার বদলে নিজেদের অগ্নিপূজক পূর্বপুরুষদের বীরত্ব, উদারতা, ত্যাগ ও দানশীলতা সম্পর্কে গৌরব বোধ করতে শুরু করেন। ফেরদৌসির শাহ্‌নামা এই পারসিক মুসলমানদের অমুসলিম পূর্বপুরুষের কীর্তি-গাঁথা। পারসিক মুসলমানেরা বিদেশী আরবী ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মোহ ত্যাগ করে যেদিন নিজেদের প্রাচীন দেশজ সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ঐতিহ্যের দিকে মুখ ফেরানোর জন্য বিদ্রোহ করেন, সেদিন থেকে পারস্যের সাহিত্য ও সভ্যতার রেনেসাঁস বা পুনর্জন্মের শুরু। ইউরোপীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রেও এই সত্যের প্রতিফলন দেখা যায়। গ্রীস দেশটি ইউরোপের অন্তর্গত। প্রাচীন গ্রীসের ধর্মবিশ্বাস এবং আধুনিক ইউরোপের ধর্মবিশ্বাস অভিন্ন নয়। অতীতে রোমের খৃস্টানেরা প্রাচীন রোমক মন্দির ভেঙে গীর্জা তৈরী করেছে। দেবদেবীর মূর্তি চূর্ণবিচূর্ণ করেছে। অথচ তাদেরই পরবর্তী কালের বংশধরেরা প্রাচীন রোমক ও গ্রীক গ্রন্থ আবিষ্কার করে নিজেদের ঐতিহ্যবোধ ফিরে পেয়েছে।

একেই বলা হয় ইউরোপীয় রেনেসাঁস। প্রাচীন রোম ও গ্রীসদেশের পৌত্তলিক সংস্কৃতি এখন আধুনিক ইউরোপের ধ্রুপদী সংস্কৃতি—জাতীয় সংস্কৃতি। ইউরোপীয় মহাজাতীয়তার এই ভিত্তিকে খৃস্টান যাজক সম্প্রদায়ও স্বীকার করে নিয়েছেন। যেমন ইরানে মুহম্মদী সম্প্রদায় স্বীকার করে নিয়েছেন যরথুস্তি সম্প্রদায়ের সঙ্গে রয়েছে তাদের আত্মীয়তা ও অভিন্ন জাতীয়তা এবং অগ্নিপূজক পূর্বপুরুষদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিই তাদের জাতীয় ঐতিহ্য ও প্রেরণার উৎস। উনবিংশ শতাব্দীতে ইরানে পারসিক বা ফার্সী ভাষা থেকে আরবী বর্ণমালা বর্জনের আন্দোলনও জোরদার হয়ে উঠেছিল। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে বৃটেনে নিযুক্ত ইরানী রাজদূত মীর্জা মালকম খাঁ লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি অব আর্টসের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "এটা আমার স্থির বিশ্বাস, ইউরোপের তুলনায় ইরানের যে অনুন্নত অবস্থা তার একটি প্রধান কারণ আরবী অক্ষরের প্রচলন। এইরূপ লিখন পদ্ধতি যদ্দিন চালু থাকবে, ততদিন ইরানের জাতীয় অভ্যুদয় অসম্ভব।"*

পারস্যে ইসলামধর্ম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী কালে কোন কোন দেশে ইসলাম ধর্মের বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ফার্সী ভাষা ও পারসিক সংস্কৃতি ইসলামী ভাষা ও সংস্কৃতির পরিচয়ে বিস্তার লাভ করে। ভারতবর্ষে পাঠান ও মোগল শাসনের দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীকাল আরবী ভাষা রাজভাষারূপে গৃহীত হয় নি; আরবের সংস্কৃতি ভারতের মাটিতে ঠাঁই পায় নি। কিন্তু ফার্সী ভাষা রাজভাষারূপে এবং পারসিক সংস্কৃতি রাজসংস্কৃতিরূপে গৃহীত হয়েছে। ইসলামধর্মের কঠোর অনুশাসন পারস্যের মরমী সুফিবাদ ও ভক্তিবাদে রূপান্তরিত না হলে ভারতের মাটিতে কতদিন টিকতে পারতো, তাও এক প্রশ্ন। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে পারসিক সমাজ ও সংস্কৃতির প্রভাব এতটাই প্রবল ছিল যে, ভারতের শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুনকে যারা পৌত্তলিক জ্ঞানে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করতে চায় নি, রামায়ণ বা মহাভারতকে যারা নিজেদের জাতীয় গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করতে চায় নি; তারা মুসলমান ভ্রমে পারস্যের পৌত্তলিক বীর সোহ্‌রাব রুস্তমকে ইসলামের জাতীয় বীর হিসেবে গ্রহণে আপত্তি করে নি। ভারতের মুসলমানদের শিশুপাঠ্যগ্রন্থে ইসলামী ঐতিহ্য ও ভাবধারা সংরক্ষণের নামে যে নৌফল বাদশা, হাতেম তাই বা রাজা নওশেরওয়ার কিস্‌সা কাহিনী রয়েছে,

*Journal of the Society of Arts, Vol. XXIII. P. 290.

আসলে তা আরব ও পারস্যের পৌত্তলিক যুগের রাজরাজড়ার কাহিনী। ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে সব চাইতে বড় ট্র্যাজেডি এইখানে যে, তারা দীর্ঘকাল নিজেদের পূর্বপুরুষদের সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে আপন ভাবতে পারে নি, তাকে জাতীয় ঐতিহ্য হিসেবে গ্রহণ করে ভারতের রেনেসাঁসকে পূর্ণ ও পরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজেদেরও উন্নতি ও অভ্যুত্থানকে তরান্বিত করতে পারে নি। বরং তাদের বহির্মুখী দৃষ্টি, বহিরাগত মুসলমান হিসেবে পরিচিত থাকার রক্ষণশীলতা ভারতের সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের ধারায় একটা অশুভ প্রতিবাদ ও বিস্ফোটকের মত কাজ করেছে। অবশ্য এজন্যে কেবল তৎকালে ভারতীয় মুসলমানরাই দায়ী নয়, এজন্যে দায়ী ভারতের বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের বর্ণবৈষম্য ও বর্ণ সাম্প্রদায়িকতাও। যে রক্ত সম্পর্ক ও সামাজিক সমীকরণ দ্বারা আত্মীয়তা ও জাতীয়তার ভিত্তি তৈরী হয়, ভারতে মুসলমান ও অন্য ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে তা বহুলভাবে প্রচলিত ছিল না। ইরানে মুহম্মদী ও যরথুস্তি সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্ত আত্মীয়তার সম্পর্ক ভিন্ন জাতীয়তার বিকাশ রুদ্ধ করেছে। কিন্তু ভারতে এই অশুভ পরিণতি ঘটল বর্ণ অস্পৃশ্যতা রোগ থেকে। অথচ সমাজের একেবারে উপরতলায় এই অস্পৃশ্যতার প্রকোপ তেমন ছিল না। মহারাজা মানসিংহ ভগ্নী সম্প্রদান করেছেন মোগল সম্রাটকে, করেছেন অন্যান্য রাজামহারাজারাও। অথচ সমাজের নীচুতলায় ধর্মান্তরিত দেশী মুসলমানেরা রইল অস্পৃশ্য ও একঘরে হয়ে। এখানে মধ্যযুগেরও অর্থনৈতিক শ্রেণী সংগঠনে বিত্তশালী ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ধর্মভেদ ও বর্ণভেদের গৌণ ভূমিকা লক্ষণীয়। অভিজাত মোগল রাজা বা রাজকুমার অনায়াসে অভিজাত রাজপুত কুমারীর পাণিগ্রহণ করেছেন, অভিজাত রাজপুত অথবা ক্ষত্রিয় রাজকুমার মোগল রাজকুমারীর প্রণয়ভাজন হয়েছেন। কিন্তু এটা সম্ভব হয় নি আভিজাত্যহীন দেশী মুসলমান ও অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে। এখানে ধর্ম ও বর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ ও ভেদের খড়্গ হয়ে কাজ করেছে এবং এই খড়্গটি ঝুলিয়ে রেখেছেন বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের অভিজাত ও উচ্চ বর্ণের লোকেরাই। ভারতে ধর্মান্তরিত মুসলমান বেশীর ভাগ অনার্য ও অচ্ছুৎ ধর্মসম্প্রদায়ের লোক। তাই ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও উচ্চবর্ণের কাছে তার শ্রেণীগত মর্যাদা বাড়ে নি, বরং হ্রাস পেয়েছে। এই ধর্ম পরিবর্তন শ্রেণী-বিদ্বেষের সঙ্গে বর্ণ-বিদ্বেষ ও ধর্মবিভেদের পরিধি আরো বাড়িয়েছে।

এখানে আরো একটি কথা আগেই বলা প্রয়োজন। ইসলামের উন্নত ধর্মাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত অথবা মুসলিম ধর্মপ্রচারকদের অলৌকিক কার্যকলাপে মুগ্ধ হয়ে দলে দলে লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, এটা কল্পকাহিনী, বাস্তব সত্য নয়। বর্ণভেদের দুর্ভেদ্য পাঁচিলে বন্দী অচ্ছুৎ ও অস্পৃশ্য জন-সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য অংশের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মূলে প্রধানতঃ কাজ করেছে সামাজিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। সাত শ' বছরের মুসলিম শাসনে একশ্রেণীর প্রজাদের মধ্যে রাজানুগ্রহ ও আনুকূল্য লাভের ইচ্ছা এবং সাম্রাজ্যস্বার্থে মুসলমান রাজাদের ধর্মপ্রচারে পৃষ্ঠপোষকতাও ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের সম্প্রসারণে সহায়ক হয়েছে।

কিন্তু এই ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে দেশীয় সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ ও ভালবাসার বদলে বহির্মুখিতা এসেছে প্রধানত তিনটি কারণে: (ক) গ্রামকেন্দ্রিক স্বয়ংশাসিত সামাজিক কাঠামোতে মর্যাদাজনক স্থান লাভে উচ্চবর্ণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হওয়া, (খ) বিবাহ ও সামাজিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রে বহিরাগত মুসলমানদের সঙ্গে সহজেই সম্পর্ক স্থাপনের সুযোগ। (গ) বিজয়ী ও শাসক জাতির ভাষা-সংস্কৃতি হিসেবে ফার্সী ভাষা ও সংস্কৃতিকে মুসলমানী ভাষা ও সংস্কৃতিভ্রমে অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করা, রাজানুগ্রহ লাভের জন্য তার অনুকরণ করা এবং দেশীয় উচ্চবর্ণের প্রতি সামাজিক বিদ্বেষ ও বিরূপতার জন্য, দেশজ ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও বিরুদ্ধভাব পোষণ করা।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে, বর্ণভেদ ও সামাজিক অস্পৃশ্যতার কুফল হিসেবে শুধু তৎকালীন গ্রামকেন্দ্রিক ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন সমাজ-কাঠামোর সম্প্রসারণশীলতা নষ্ট হয় নি, ভারতের উন্নত ভাষা ও সংস্কৃতিও রক্ষণশীলতার দুর্গে বন্দী হয়ে জনসংযোগ হারিয়েছিল। এককালে নিম্নবর্ণের জন্য বেদপাঠ ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা নিষিদ্ধ হয়েছিল। আর্যধর্মের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের ফল যেমন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম। তেমনি সংস্কৃত ভাষার রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফল পালি ও অন্যান্য কয়েকটি ভাষা। পাঠান ও মোগল আমলে উচ্চবর্ণের লোকেরা বহিরাগত শাসক মুসলমানের সঙ্গে বহুক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, কিন্তু দেশীয় নিম্নবর্ণের সঙ্গে, এমনকি দেশীয় নবদীক্ষিত মুসলমানদের সঙ্গেও সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করেন নি, বরং তাদের অবজ্ঞার চোখে দেখেছেন। নবদীক্ষিত মুসলমানদের

প্রতি তাদের অবজ্ঞা বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে এই উচ্চবর্ণের লোকেরা শাসক জাতির ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি স্বাভাবিক আনুগত্যের দরুন ফার্সীভাষা ও সংস্কৃতির অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির 'জাত' রক্ষার জন্য তাকে নিজেদের আঙিনায় আবদ্ধ রেখেছেন, বৃহৎ জনজীবনে সম্প্রসারিত হতে দেন নি। বহিরাগত ও শাসক সংস্কৃতির ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাবের মুখে দেশীয় সংস্কৃতির এই অতি সংরক্ষণশীলতা অবশ্য তখন একেবারে অস্বাভাবিক ছিল না। মুসলমান শাসনের আমলে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির এই সংরক্ষিত অবস্থানও নবদীক্ষিত ভারতীয় মুসলমানদের বহির্মুখী প্রবণতা বৃদ্ধি করেছে। যে নিম্নবর্ণের যুবকের কাছে এতকাল সামাজিক মুক্তি ও বৈষয়িক উন্নতির পথ ছিল সম্পূর্ণ রুদ্ধ, ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে বহিরাগত মুসলমানদের যে-কোন বর্ণ ও শ্রেণীর সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন তার পক্ষে সহজ হয়েছে এবং শাসকের ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা দ্বারা দ্রুত রাজানুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে। দীর্ঘকাল সামাজিক অবজ্ঞা ও নির্যাতনের নিগড়ে বন্দী থাকার পর শুধুমাত্র ধর্মান্তর দ্বারা রাতারাতি নিজেকে শাসক শ্রেণীর বা জাতির অন্তর্ভুক্ত অথবা সমপর্যায়ে উন্নত ভাবার সুযোগ (বাস্তব ক্ষেত্রে এই চিন্তা যতই অবাস্তব হোক) অনেকের কাছেই একটা কম বড় কথা ছিল না। কালাপাহাড়ের স্বজাতি নিগ্রহ এখন বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত কিংবদন্তী। সেকালে কালাপাহাড়ের মতই এক নিম্নবর্ণের যুবক উচ্চবর্ণের প্রণয়িনীকে স্ত্রীরূপে না পেয়ে মুসলমান হন এবং বহিরাগত জনৈক মুসলিম ওমরাহের কন্যাকে বিয়ে করার পর হিন্দু-নিধন ও মন্দির ধ্বংসে উদ্যোগী হন, এমন কাহিনী একটি নয়, খুঁজলে বহু পাওয়া যাবে।

ভারতে বর্ণভেদের দরুন ধর্মভেদ ও জাতিভেদের যে কৃত্রিমতা জটিল সমস্যার রূপ নিয়েছে, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, চীন বা মালয়ের ক্ষেত্রে তা হয় নি। ইরানে বা ইন্দোনেশিয়ায় জনসংখ্যার যে-সংখ্যালঘু অংশ প্রথমে ধর্মান্তরিত হয়েছে, সংখ্যাগুরু অংশ তাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের দ্বার রুদ্ধ করে নি; এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশের কাছে ধর্মান্তরিত হওয়ার আগে থেকেই 'সামাজিক পীড়কশ্রেণী' হিসেবে চিহ্নিত ছিল না। ফলে ইরানে বা ইন্দোনেশিয়ায় যাঁরা নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা স্বদেশ, স্বসমাজ ও স্বভাষার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাইরে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্যের অবাস্তব অস্তিত্বের

অনুসন্ধান করেন নি। কালক্রমে ইরানে ও ইন্দোনেশিয়ায় মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েছেন, কিন্তু পরিচয়ে ইরানী ও ইন্দোনেশীয় রয়েছেন। ইরানের জাতীয় উৎসব অগ্নিপূজার যুগের নওরোজ উৎসব, জাতীয় বীর অগ্নিপূজক সোহ্‌রাব রুস্তম। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ায় জাতির জনক সুকর্ণের কন্যার নাম কার্তিকেশ্বরী, বিমান পরিবহণ সংস্থার নাম গরুড় এবং সর্বাধিক আদৃত গ্রন্থ রামায়ণ ও মহাভারত। সবদেশেই মুসলমানেরা স্বদেশী এবং ভৌগোলিক জাতীয়তায় নিষ্ঠ, কিন্তু একমাত্র ভারতেই তাঁরা হলেন স্বদেশ ও স্বজাতিবিহীন কেবল একটি ধর্মজাতি। ভারতীয় মুসলমানদের জীবনের এই ট্রাজেডি থেকেই ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব—যে তত্ত্বকে বহিরাগত মুসলমান শাসকেরা চেয়েছেন তাদের সাম্রাজ্যস্বার্থ রক্ষার কাজে ব্যবহার করতে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ চেয়েছেন, তাদের ঔপনিবেশিক ভেদনীতির কাজে লাগাতে এবং সবশেষে বহিরাগত মুসলিম কায়েমী স্বার্থ চেয়েছে তাদের একচেটিয়া পুঁজিস্বার্থের কাজে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে।

॥ তিন ॥

সমস্যাটি একমাত্রিক নয়, বহুমাত্রিক। প্রাচীন ভারতের বর্ণভেদ ও অতি রক্ষণশীলতা কৃত্রিম ধর্মজাতি ও ধর্মজাতি-বিদ্বেষের জন্মদানে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করেছে, কিন্তু একমাত্র কারণ হিসেবে নয়। এর মূলে রাজনৈতিক কারণও রয়েছে। যে রাজনৈতিক কারণটিকে মোটেই গৌণ কারণ ভাবা চলে না। বরং প্রাচীন গ্রামীণ সমাজের বিচ্ছিন্নতা, বর্ণভেদ ও বিদ্বেষের মতই একটি অন্যতম মুখ্য কারণ ভাবা চলে। ইরানে যখন আরবীয় মুসলমানেরা বিজয়ী জাতি হিসেবে প্রবেশ করেছে, তখনও ইসলাম ধর্মের প্রগতিশীল ভূমিকা নষ্ট হয় নি। ধর্মবিদ্বেষ ও সাম্প্রদায়িকতা তাকে আবিষ্ট করে নি। আরবের দ্বিতীয় খলিফা ওমর খৃস্টানদের পরাভূত করে জেরুসালেমে প্রবেশ করেন। এবং প্রথমেই খৃস্টানদের গীর্জার পবিত্রতা রক্ষার নির্দেশ দেন। নিজের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ওমরকে নামাজ পড়ার জন্য খৃস্টান পাদ্রী গীর্জার একাংশ ছেড়ে দেবার প্রস্তাব দেন, কিন্তু ওমর এই বলে তাতে অসম্মতি জানান যে, তাহলে মুসলমানেরা অল্পদিনের মধ্যে গীর্জাটিকে মসজিদে রূপান্তর করবে। ইরানে যখন আরবীয় মুসলমানেরা দিগ্বিজয়ীর বেশে

প্রবেশ করেন, তখনও রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে ধর্মপ্রচার তাদের উদ্দেশ্য ছিল, লুণ্ঠন ও পররাজ্য গ্রাস তাদের আগ্রাসী নীতির একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। কিন্তু তুর্ক, পাঠান ও মোগলদের ভারত আক্রমণের সময় ইসলামের প্রগতিশীল সামাজিক ভূমিকা নিঃশেষিত। আরবীয় খেলাফৎ বা নির্বাচনের মাধ্যমে শাসন পদ্ধতি বিলুপ্ত এবং তৎস্থলে ছোট বড় মুসলিম সাম্রাজ্য-শক্তি প্রতিষ্ঠিত। কাবুল, কান্দাহার বা গজনি থেকে এই সময় বহিরাগত মুসলমানদের ভারত আক্রমণের লক্ষ্য ধর্মপ্রচার বা সমাজ জীবন পুনর্গঠন ছিল না, ছিল পরধন ও পররাজ্য গ্রাসের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের ভূমিকাও ছিল আক্রমণকারীর। সত্যের খাতিরে স্বীকার করা উচিত, মুহম্মদ ঘোরী, সুলতান মাহ্‌মুদ প্রমুখ বিদেশী মুসলমানের প্রথম ভারত-আক্রমণ ভারত-জয়, রাজ্য সংগঠনের ইতিহাস নয়, লুণ্ঠন, ধ্বংস, ভারতীয় মন্দির অপবিত্রকরণের ইতিহাস। সুলতান মাহমুদ সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেন এবং কয়েকবারই সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করে দেব-দেবী মূর্তি চূর্ণ করেন এবং মন্দিরের স্বর্ণ ভাণ্ডার লুণ্ঠন করেন। চিতোরের রানী পদ্মিনীকে লাভের জন্য আলাউদ্দিন খিলজির অভিযানের কাহিনী সত্য হোক আর না হোক, সেকালে বহিরাগত মুসলিম আক্রমণকারীর হাতে ধর্ম ও সম্ভ্রম নাশের ভয়ে ভারতীয় রমণীদের জহর-ব্রত পালন ও আত্মনাশ কিংবদন্তী নয়, সত্য ঘটনা।

মধ্যযুগের ভারতে বহু শ্রেণী ও বর্ণের লোকদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষের সূচনা এই ভাবে। ইরানে আরব দেশীয় মুসলমানদের প্রবেশ শাসক হিসেবে। লুণ্ঠনকারী, প্রাচীন ধর্মের অবমাননাকারী হিসেবে নয়। ভারতে মুসলমানের আগমন কেবলমাত্র শাসক হিসেবে হলে কালক্রমে বহিরাগত মুসলমানেরাও বৃহত্তর ভারতীয় সমাজ সভ্যতার অঙ্গীভূত হতেন, মন্দির মসজিদের সহ অবস্থান এবং দেশী হিন্দু ও মুসলমানের ক্ষেত্রেও সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সংস্থানের বেলায় এমন ভিন্নতা ও বৈরিতা সৃষ্টি হত না। বহিরাগত মুসলমানের আক্রমণাত্মক ও আগ্রাসী নীতি থেকে আত্মরক্ষার নামে ভারতীয় বর্ণ সমাজ ও সংস্কৃতির শুচিবাই ও সংরক্ষণ-শীলতাও এমন বৃদ্ধি পেত না। দেশীয় অচ্ছুৎ ও অস্পৃশ্য সমাজের প্রতি উচ্চ বর্ণের এমনিতেই অবজ্ঞা ও উপেক্ষার ভাব ছিল, পরবর্তী কালে বর্ণাবর্ণ নির্বিশেষে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন, তাদের প্রতি এই অবজ্ঞা বিরাগ ও বিদ্বেষে পরিণত হত না। এই বিদ্বেষ দু'তরফা। যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়েছেন, তাঁদের রাগ প্রাচীন রক্ষণশীল সমাজ ও বর্ণভেদের প্রতি। যারা ধর্মান্তরিত হন নি,

তাঁদের রাগ এই ধর্মান্তরিত স্বজাতি, অন্ত্যবর্ণ ও স্ববর্ণের লোকদের প্রতি। তাদের ধারণা, এরা স্বদেশ-জাতির শত্রু, শত্রুর সহায়ক কালা-পাহাড়।

মধ্যযুগের ভারতে এই ধর্মভেদ নাশ দ্বারা ধর্মসন্বয় ও ধর্মজাতি সমন্বয় পূর্বক এক হিন্দুস্থানী বা হিন্দুজাতি গঠনের চেষ্টা হয় নি, তা নয়। প্রাচীন ভারতের মহামতি অশোকের বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণের মত ধর্ম সমন্বয়ের জন্য মোগল সম্রাট আকবর দীন এ এলাহি নামে নতুন ধর্ম প্রচার শুরু করেন, ভারতীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। নানক, কবীর শ্রীচৈতন্যের প্রেম ও সমন্বয়মূলক ধর্মপ্রচারও এখানে উল্লেখ্য। আকবরের ধর্মজাতি সমন্বয়ের ধারা যার হাতে পূর্ণতা লাভ করতে পারতো তিনি শাহ্‌জাহান-পুত্র সাধক দারা শিকোহ্‌। ভারতীয় উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বজ্ঞান এবং ইরানের মরমী সুফিবাদের অধ্যাত্ম প্রেম দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র হিসেবে দারা দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস আজ অন্য ভাবে লিখিত হত। কিন্তু হিংসা ও ক্ষমতা লোভ, বিবেকহীন নিষ্ঠুরতা ইসলাম ধর্ম ও শরিয়ৎ রক্ষার ছদ্মবেশ ধারণ করে সেই মধ্যযুগের ভারতেও দানবীয় মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ভ্রাতৃরক্তে হাত কলঙ্কিত করেছে। ঔরঙ্গজীব শুধু জ্যেষ্ঠভ্রাতা দারাকে হত্যা করেন নি, তিনি ভারতীয় জাতির ঐক্য প্রয়াসকেও তাঁর ব্যক্তিগত ক্ষমতালোভের যূপকাষ্ঠে হত্যা করেছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঔরঙ্গজীবের এই নৃশংসতা ধর্মজাতীয়তার ছদ্মবেশে বারবার আত্মপ্রকাশ করছে, এখনো করছে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মনে হয়, ঔরঙ্গজীবের সপ্তদশ শতকের তরবারি থেকেই যেন বিশ শতকের ভারতে ও পাকিস্তানে জিন্না এবং ইয়াহিয়ার জন্ম।

ভারতে ধর্মসমন্বয় ও ধর্মজাতিসমন্বয়ের পথে পাঠান ও মোগল আমলের কয়েক শো বছরের পরাধীনতাও কম বড় অন্তরায় সৃষ্টি করে নি। অনেকেই মনে করেন এবং এটি একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তও যে, পাঠান ও মোগল শাসনে ভারতবর্ষ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ছিল। আমি এ মতটি সমর্থন করি না। কেবল মাত্র ভারতে বসবাসের দরুন মোগল শাসকদের ভারতীয় আখ্যা দেয়া উচিত নয়। ইংরেজ রাজারা ভারত দখল করার পর ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব এবং যোগাযোগ ব্যবস্থায় যান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত না হলে সম্ভবতঃ তাদেরও কেউ কেউ ভারত শাসনের সুবিধার্থে ভারতে বসবাসেরই সিদ্ধান্ত করতেন। যোগাযোগ

ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতির যুগেও দিল্লীতে বৃটিশ ভারতের রাজধানী রাখা এবং সেখানে একজন ভাইসরয় নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল। অষ্টাদশ শতকে লণ্ডনে বসে ভারত শাসন সম্ভব হলেও মুহম্মদ ঘোরী বা সুলতান মাহমুদের যুগে গজনী কান্দাহার থেকে ভারত শাসন সম্ভব না হওয়ায় তারা স্থায়ীভাবে ভারতে রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন নি। বাবুর ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে পিতৃরাজ্য ত্যাগ করেন এবং দিল্লীতে স্থায়ী ভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। বাবুর এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরদের অনেকে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন, পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন, কিন্তু তাকে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি হিসেবে গ্রহণ করেন নি। বরং পরবর্তী কালে ইংরেজদের মতই তাঁরা ভারতে নিজেদের মাতৃভাষা ফার্সী বা পারসিক ভাষা প্রবর্তন করেছেন। কোন কোন মোগল সম্রাট রাজপুত মাতার গর্ভজাত সন্তান ছিলেন এবং ভারতেই জন্মগ্রহণ করেছেন। এটা তাঁদের ভারতীয় জাতীয়তার বড় প্রমাণ নয়। মোগলেরা ভারতকে জন্মভূমি বা মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করেন নি, ভারতের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তো নয়ই। বিশাল মোগল বাহিনীর অভারতীয় সৈন্যদের দেশী ভাষায় কাজ চালাবার সুবিধার জন্য তাঁরা কোন ভারতীয় ভাষা তার বর্ণমালা সহ গ্রহণ করেন নি, বরং আরবী বা ফার্সী হরফে হিন্দী ভাষা লেখার ব্যবস্থা করে নতুন ভাষার নাম দেন উর্দু বা শিবির। যেমন ইংরেজেরা তাদের শাসন আমলে সৈন্যদের জন্য ইংরেজি হরফে উর্দু লেখার ব্যবস্থা করে তার নাম দিয়েছিল রোমান উর্দু। মোগলদের পতনের পর যখন ভারতের কোন অঞ্চলেরই মাতৃভাষা ফার্সী না হওয়ার দরুন নতুন রাজভাষা প্রবর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একশো বছরের মধ্যে ফার্সিভাষা কার্যতঃ ভারতে বিলুপ্ত হয়, তখন কোন ঐতিহ্যশালী ভারতীয় ভাষার বদলে সামরিক ছাউনির ভাষা উর্দুর প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের ভাষাগত আনুগত্য পরিবর্তিত হয়। বিস্ময়ের কথা এই যে, মোগলেরা ধর্মে মুসলমান ছিলেন, এজন্যে ভারতীয় মুসলমানেরা তাদের স্বজাতি ভেবে বহুকাল গর্ববোধ করেছেন। কিন্তু মোগলেরা কখনো মোগল নন, এমন আরব বা পারসিক মুসলমানদের অতীত গৌরবগাথাকে নিজেদের গৌরবগাথা হিসেবে গ্রহণ করেন নি। তাঁরা বরং তাঁদের দূর অতীতের অমুসলিম দিগ্বিজয়ী চেঙ্গিজ খানের বংশধর হিসেবে নিজেদের পরিচিত করেছেন। আরব দেশীয় বীর খালেদ বিন ওলিদ বা মহাবীর তারেককে নিয়ে অযথা গৌরব

ও গর্ববোধ করেন নি। বাবুরের বা জাহাঙ্গীরের আত্মচরিত পাঠেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

পাঠান এবং মোগল আমলে বিশেষ করে মোগল আমলে ভারত ছিল বহিরাগত মুসলমানদের ভাগ্যান্বেষণ ও রাতারাতি ভাগ্য গড়ার দেশ। মোগল আমলের ইতিহাস পাঠে জানা যাবে, মোগল শাসনব্যবস্থায় ইরান তুরানের নবাগত মুসলমানদেরই ছিল প্রাধান্য। কর্পদকশূন্য আসিফ খাঁ ইরান থেকে দিল্লীতে এসে রাতারাতি বড় মনসবদার হয়েছেন, এমনকি সম্রাটের শ্বশুর হয়েছেন। নূরমহল শের খাঁ নামক এক সাধারণ জায়গীরদারের স্ত্রী থেকে দ্রুত সম্রাজ্ঞী নূরজাহানে রূপান্তরিত হয়েছেন। কাবুল, কান্দাহার বা বোখারা থেকে আনীত মুসলমান ক্রীতদাস রাতারাতি ফৌজদার (সেনাপতি) ও সুবাদার (গভর্ণর) হয়েছেন। মোগল আমলের মুসলিম ঐতিহাসিকেরা তাই ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বহিরাগত মুসলমানদেরই যশোগাথা রচনা করেছেন। বহিরাগত মুসলমান আক্রমণকারীর সাফল্য ও জয়কে সকল মুসলমানের জয় হিসেবে চিত্রিত করেছেন। যার প্রভাবে পরবর্তী কালে ভারতীয় মুসলমান তাদের অমুসলিম পূর্বপুরুষদের সাফল্যে গর্ব এবং পরাজয়ে বেদনা বোধ না করে উল্টোটা করেছেন এবং বহিরাক্রমণকারী ধর্মে মুসলমান হলেই তাকে জাতীয় বীর ভেবে বন্দনা করেছেন। এই কারণেই সুদূর অতীতের আরব জলদস্যু মুহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু লুণ্ঠন এবং বখতিয়ার খিলজির বঙ্গজয়কে সিন্ধী ও বাঙ্গালী মুসলমানেরা বহুকাল জাতীয় গৌরব ভেবে উল্লসিত হয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতালাভের বহুপরে সিন্ধী মুসলমানদের একটা বড় অংশের এই ভুল ভাঙতে শুরু করে এবং তাঁরা বিন কাশিমের বদলে রাজা দাহিরকে সিন্ধুর জাতীয় বীর হিসেবে ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের মুসলমানেরা বাংলার ইতিহাস পুনর্লিখনেব দাবী জানান।

পুনরুল্লেখ বাহুল্য, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতি বলে নির্দিষ্ট কোন ধর্ম ও জাতির অস্তিত্ব নেই। ভারতবর্ষের অপর নাম হিন্দুস্থান এবং হিন্দুস্থানের বাসিন্দারা জাতিতে হিন্দু। ভারতের বিভিন্ন ধর্মমতের একীভূত পরিচয় হিন্দুধর্ম। সুতরাং ভারতের দেশজ সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতা আখ্যা দিলে আপত্তি নেই, যদিও তা ধর্মীয় সংস্কৃতি বা সভ্যতা নয়। বরং ভারতের বিভিন্ন ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন যুগের সংস্কৃতি ও লোকাচারের সংমিশ্রণ। তাই উনবিংশ

শতাব্দীতে ভারতবর্ষে হিন্দু রিভাইবালিজম বা হিন্দু পুনর্জাগরণবাদে কোন ধর্মমত বা ধর্মসম্প্রদায়েরই আতঙ্কিত হওয়ার কিছু ছিল না, যদি বিভেদ-নীতির দরুন হিন্দু শব্দটি একই ধর্মসম্প্রদায় ও জাতির নির্দিষ্ট পরিচয়জ্ঞাপক হয়ে না উঠতো। ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, 'মুসলিম শাসনের চাপে স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল সকলে বলিল আমরা হিন্দু জাতি।' আগেই উল্লেখ করেছি কোন কোন পণ্ডিত এই মতের সঙ্গে একমত নন। তাঁরা বলেছেন, মুসলিম শাসনের আমলেও ভারতে স্থায়ী কোন রাজনৈতিক ঐক্য সাধিত হয় নি এবং যান্ত্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্বারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা দূর হয় নি। ফলে সে আমলে সর্বভারতীয় জাতীয়তার পূর্ণ বিকাশ ছিল অসম্ভব। তদুপরি ভৌগোলিক জাতীয়তা বা নেশনহুডের ধারণা বিলাত থেকে আমদানি কৃত আধুনিক ভাবধারা। এই ভাবধারায় হিন্দু বা ভারতীয় জাতীয়তা বিকশিত হতে শুরু করে অনেক পরে। তবে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে দিল্লীর কেন্দ্রীয় রাজশক্তিতে বহিরাগত মুসলিম প্রভাব বিলীয়মান হওয়ায় দিল্লীর অধীনতা মুক্ত বিভিন্ন ভারতীয় রাজ্যে যে আঞ্চলিক অথচ স্বাধীন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠিত হয়, তাতে দেশীয় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক দূর হয়ে জাতিগত ও সংস্কৃতিগত সমন্বয়ের সম্ভাবনা সূচিত হয়। বাংলাদেশে এই সম্ভাবনা আরো বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। "আলাওল থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত আমরা সপ্তদশের শেষার্ধ ও অষ্টাদশ শতকের বাংলায় পাই তার প্রমাণ। ভাষায়ও যে ফার্সী আরবী কতকটা তখন গৃহীত, তা তখনকার বাংলা চিঠিপত্রের ভাষা দেখলে বোঝা যায়। আসলে হিন্দু-মুসলমান সকল বাঙালীর একটা মিলিত জীবন ও ভাবনা ১৮শ শতকে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তা ঠিক স্থির ভিত্তিতে দৃঢ় হওয়ার আগেই এসে গেল ব্রিটিশ শাসন। সঙ্গে সঙ্গে ছেদ পড়ল মধ্যযুগের জীবন ধারায় আর ছেদ পড়ল অষ্টাদশ শতকের সেই নাতিপুষ্ট মিলিত জাতীয় ভাবনায়।"*

বৃটিশ শাসনে শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা ভারতবর্ষে মিলিত জাতীয় ভাবনায় ছেদ পড়ার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল শাসক বৃটিশ জাতির ঔপনিবেশিক স্বার্থে পুষ্ট বিভেদনীতি। এই বিভেদনীতিই উনবিংশ শতকের ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের

* গোপাল হালদার, বাঙলা দেশ: ভাবী বাঙালীর আবির্ভাব, পরিচয়, বাঙলা দেশ সংখ্যা ১৩৭৭-৭৮।

প্রভৃতি অথচ যেটা স্বাভাবিক ছিল, তা হল ভারতীয় মুসলমানের স্বদেশ ও স্বসংস্কৃতিতে প্রত্যাবর্তন। "তুর্কি ইরানের দিকে তাকিয়ে যদি কেবল আধুনিকতা দেখি, তবে অর্ধেক দেখবো। লক্ষ্য করার জিনিস তাদের আধুনিকতার আধার। তাদের নিবিড় স্বদেশানুরাগ। দেশকে এত ভালবাসে বলে তারা ইসলামের আনুষঙ্গিক আরবীয়তা থেকে সবলে মুক্ত হতে চায়। আরবী নাম পদবী নিষিদ্ধ হচ্ছে, কোরানের তর্জমা হচ্ছে দেশজ ভাষায়। আরবও তাদের কাছে বিদেশী। ইরানের প্রাক্ মুসলমান যুগ সম্পর্কে এতদিন তাদের গ্লানি ছিল, গৌরব ছিল না। এখন তারা অতীতের সঙ্গে মধ্যযুগের ও মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের অবিচ্ছিন্ন অন্বয় রক্ষা করতে উৎসুক।"*

এখন প্রশ্ন, মধ্যপ্রাচ্যের বা অন্যান্য দেশের মুসলমানদের জীবনে যা সম্ভব হয়েছে, ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে তা স্বাধীনতা-পূর্ব যুগেই সম্ভব হল না কেন? এর জবাব বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। বর্ণাশ্রম, বর্ণভেদ ও বহিরাগত মুসলিম স্বার্থ যেমন ভারতীয় মুসলমানদের ভারতীয় জাতীয়তার সঙ্গে সমীকরণে বাধা দিয়েছে, তেমনি দিয়েছে বৃটিশ ঔপনিবেশিক ভেদনীতি। দেশজ বা লোকায়ত সংস্কৃতি ধর্মসংস্কৃতি নয়। লোকায়ত সংস্কৃতির উত্তরাধিকার সকল বর্ণের, সকল ধর্মের লোকের। এই সত্যটি ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে উপেক্ষিত হয়েছে এবং মিলিত জাতীয়তার পরিবর্তে কৃত্রিম ও উদ্দেশ্যমূলক দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। অথচ আরব দেশের পৌত্তলিক যুগের লোকায়ত সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করেন নি ইসলামের মহানবীও। মক্কার কাবাঘরে দেব-দেবীর মূর্তি তিনি অপসারণ করেছেন। কিন্তু পৌত্তলিক পূর্বপুরুষদের কাছে পবিত্র পাথর খণ্ড হিসেবে বিবেচিত হজ্‌রে আসওয়াদ বা কৃষ্ণ প্রস্তরটিকে তিনি কাবাগৃহ প্রাঙ্গণে সযত্নে স্থান দিয়েছেন। এখনও দেশ-বিদেশের মুসলমানেরা হজ্জ ব্রত পালনের জন্য মক্কা গমন করে এই কালো পাথরটিতে চুম্ খান।

আরব, ইরান, তুরস্কের মুসলমানেরা তাদের পুনর্জাগরণের যুগে যে দেশজ, লোকায়ত প্রাচীন সংস্কৃতি ও আচার রীতির দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ফিরিয়েছে, বর্ণভেদ ও বহিরাগত স্বার্থসৃষ্ট বিভ্রান্তির দরুন ভারতীয় মুসলমানেরা সেই দেশজ

* ভারতীয় মুসলমান, বুলবুল, মাঘ ১৩৪৩।

সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পৌত্তলিক সংস্কৃতি তথা হিন্দুর ধর্মসংস্কৃতি ভেবে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে এই বিভ্রান্তি বাড়ানোর জন্য একশ্রেণীর বহিরাগত মুসলিম ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্যমূলক ও খণ্ডিত ইতিহাস ব্যাখ্যা যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী একশ্রেণীর বৃটিশ লেখক- ও ঐতিহাসিক কর্তৃক ভারতীয় ইতিহাসের বিকৃতি সাধন। ভারতে বৃটিশ শাসনের গোড়াপত্তনের পর উইলিয়াম হাণ্টার 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি ভেদনীতি সৃষ্টিতে বৃটিশ অপকৌশলের একটি চমৎকার নিদর্শন। হাণ্টার তাঁর গ্রন্থে ভারতে মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ হিসেবে কয়েকটি যুক্তি দাঁড় করান। এই যুক্তিগুলো হল—(ক) রাজভাষা রাতারাতি ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজি হওয়া। (খ) মুসলমানদের প্রতি বৃটিশদের অবিশ্বাস ও তদ্দরুন মুসলিম সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ ও হিন্দুর মধ্যে বণ্টন। (গ) বৃটিশ-শাসনের সঙ্গে মুসলমানদের অসহযোগিতা এবং অন্যদিকে হিন্দুদের সহযোগিতা। বলাবাহুল্য, হাণ্টারের এই যুক্তি বর্তমানে প্রায় সর্বজনস্বীকৃত ও বহুল উদ্ধৃত যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত। কিন্তু এই যুক্তিগুলো গ্রহণের আগে কয়েকটি বিষয় বিচার্য। মোগল শাসনের আমলে জনসংখ্যার যে অতি সামান্য ভগ্নাংশ দেশীয় মুসলমান ছিল, তাদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ছিল গড়ে কতজন? সেই সময় একেবারে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত শ্রেণী ছাড়া সাধারণ জনসমাজে ফার্সী ভাষার চল ছিল কিনা? (ইংরেজ আমলে গণ-শিক্ষার এত সম্প্রসারণ সত্ত্বেও সাধারণ জনজীবনের কতটা অংশ ইংরেজি ভাষা ব্যবহারে সক্ষম ছিলেন?) হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীও এই সময় আরবী ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সুতরাং রাজভাষার পরিবর্তনে হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণীও আকস্মিকভাবে অসুবিধায় পড়েছিলেন কিনা? সাধারণ হিন্দু জনসমাজ ও দেশীয় মুসলমানের কথ্য ভাষা বা মাতৃভাষা ফার্সী ছিল না। সুতরাং ভাষা পরিবর্তনে এই অশিক্ষিত জনসমাজে বড় একটা তারতম্য দেখা দেওয়ার কথা নয়। বৃটিশের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ নীতির দ্বারা ভারতে বসবাসকারী বহিরাগত মুসলিম সামন্তশ্রেণী ও উপরতলার সুবিধাভোগী আমীর ওমরাহদের সামাজিক প্রভুত্ব ও সুযোগ-সুবিধার অবসান ঘটে এবং উচ্চবর্ণের স্বল্পসংখ্যক হিন্দু পরিবার নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণীতে পরিণত হন। তদ্দ্বারা নিম্নশ্রেণীর বিশাল হিন্দু জনসমাজ বা মুসলিম চাষী মজুরের জীবনে কোন বড় পরিবর্তন সূচিত হয় নি। শিক্ষাক্ষেত্রে অসহযোগ বা সহযোগ নীতির দ্বারাও সে সময় মুসলিম

সামাজিক জীবনে বড় রকমের তারতম্য সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর 'পূর্ব পাকিস্তানের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি' প্রবন্ধে লিখেছেন, "আর্যরা ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রবর্তন করেছিলেন। আদিবাসীদের অনেকেই এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু সমাজে নিম্নবর্ণে স্থানলাভ করেছিলেন।" পরবর্তী কালে ইসলাম ধর্মের প্রসারণের যুগে এই নিম্নবর্ণের হিন্দুরা নতুন করে ধর্ম পরিবর্তন দ্বারা বর্ণ পরিবর্তন ঘটাতে পারেন নি। তৎকালীন ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা দেখি, নওয়াবী আমলেও জনসংখ্যার মুসলমান অংশ মূলতঃ কৃষিজীবী এবং শিক্ষায় ও রাজনৈতিক চেতনায় অনগ্রসর। সিরাজদ্দৌল্লার আমলেও মুর্শিদাবাদের আর্থিক স্বচ্ছলতার চাবিকাঠি ছিল জগৎশেঠ, কৃষ্ণবল্লভ ও উচ্চ বর্ণের অগ্রসর হিন্দুশ্রেণীর হাতে। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানদের অনগ্রসরতার মূল কারণ, কৃষিজীবী শ্রেণীসুলভ শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ ও অনগ্রসর সামাজিক অবস্থা। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা মুসলমান যুগে আরবী ফার্সী শিক্ষার সঙ্গে সুবিধাভোগী অগ্রসর শ্রেণী হিসেবে সহযোগিতার সুযোগ পেয়েছেন এবং সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন, যেমন করেছেন ইংরেজ আমলে ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে। বহিরাগত নেতৃস্থানীয় মুসলমান ও ধর্মনেতাদের ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে অসহযোগিতার নীতি সুবিধাভোগী মুষ্টিমেয় মুসলিম পরিবারের জন্য অধঃপতনের সূচনা করেছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শিক্ষার আলো বঞ্চিত কৃষিজীবী দেশীয় মুসলিম জনজীবনে কোন বড় পরিবর্তন সাধন করে নি।

তথাপি বৃটিশ শাসনের আমলে শাসকশক্তি ভারতে যে তত্ত্বটি দাঁড় করাতে যত্নবান ছিলেন, তা হল শিক্ষায় ও সম্পদে হিন্দুর উন্নতি মুসলমানদের অবনতি ও অধঃপতনের মূল কারণ; ভারতের ইতিহাস হিন্দু ও মুসলমানের স্বার্থদ্বন্দ্ব ও শত্রুতার ইতিহাস, মিত্রতা ও সমন্বয়ের ইতিহাস নয়। অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থের দ্বন্দ্বকে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মগত জাতিস্বার্থের আপোষহীন সংঘাতরূপে প্রতিপন্ন করা হল এবং সংঘাতের অনিবার্য পরিণতি জাতিগত স্বাতন্ত্র্য (বা দ্বিজাতিতত্ত্ব) তাও যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রমাণ করা হল! এই তত্ত্ব, তথ্য ও ইতিহাস-বিকৃতির ফল প্রথম বাংলাদেশেই ফলতে দেখা যায়। "দেশবিভাগের আগে পূর্ব বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানেরা মনে করতেন যে, ক্ষুদ্রায়তন পূর্ব বাঙলার সীমিত সম্পদ কাজে লাগাচ্ছে সংখ্যালঘু হিন্দুরা। বিরাট বিরাট জমিদারী ও অন্যান্য বাণিজ্যিক স্বার্থ হিন্দুদের দখলে রয়েছে কয়েক পুরুষ ধরে। গ্রামীণ সমাজের

অত্যাচার অনাচার যা সামন্ত সমাজের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত, অবিভক্ত বাংলা-দেশে তার পরিচয় পেয়েছে মুসলমান চাষী বেশীর ভাগ হিন্দু জমিদারদের থেকে। তার মানে এটা নয় যে, পূর্ব বাংলায় অত্যাচারী মুসলমান জমিদার, জোতদার মোটেই ছিল না। কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য হওয়ায় সামন্ত স্বার্থের প্রতিভূ বলতে বোঝাতো সাধারণতঃ হিন্দুদের। পাকিস্তান আন্দোলনও মোটামুটি এ ধারণাটাকেই সাধারণ মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দেয়।"*

অর্থনৈতিক শ্রেণীস্বার্থ উদ্ভূত দ্বন্দ্বকে কি ভাবে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে রূপান্তর করে সাম্রাজ্য রক্ষার স্বার্থে ভেদনীতির কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা যায়, বৃটিশ শাসকেরা তার তুলনাহীন সাফল্যের উদাহরণ রেখে গেছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে এই উদাহরণ আরো বেশী জাজ্বল্য। বৃটিশ শাসনের সূচনায় বাঙালীর মিলিত প্রতিরোধ সংগ্রামকে চিত্রিত করা হল হিন্দু ও মুসল-মানের পারস্পরিক দ্বন্দ্বরূপে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ 'যবনবিনাশী' আন্দোলন এবং ফকির বিদ্রোহ হিন্দু নিধন আন্দোলনরূপে কাব্য, কাহিনী ও ইতিহাসে বিবৃত হল। বৃটিশ শাসকগণ পালাক্রমে একবার মুসলমান এবং আরেকবার হিন্দু অভিজাত সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাভোগী শ্রেণীতে রূপান্তরিত করে হিন্দু ও মুসলমানের অর্থনৈতিক বৈষম্যকে সাম্প্রদায়িক বিরোধে ও কৃত্রিম জাতি-গত স্বাতন্ত্র্য চেতনার দিকে ঠেলে দিতে থাকে।

পাশ্চাত্যের ধনবাদী ঔপনিবেশিকতার বিস্ময়কর সম্প্রসারণের যুগে মধ্য-প্রাচ্যের পতনোম্মুখ মুসলিম সামন্তশক্তি বাঁচার শেষ চেষ্টা হিসেবে তার অতীত-মুখী ধর্মসংস্কৃতির উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছিল। এই সময় আরব দেশে আবদুল ওহাব নামে এক ধর্মসংস্কারক মুসলমানদের শুদ্ধিকরণ ও ইসলাম ধর্মের পুনর্জাগরণের নামে মূলতঃ আরব দেশীয় সংস্কৃতি ও আচার রীতির প্রভাব বিশ্বের সকল দেশের মুসলমানদের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং তাদের মধ্যে আরবীয় মুসলমানদের হারানো নেতৃত্ব আবার স্থাপনের চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা ১৮শ শতকের ভারতে—বিশেষ করে বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর 'নাতিপুষ্ট' মিলিত জাতীয়তার বিকাশকে রুদ্ধ করে। বাংলাদেশে ওহাবী আন্দোলনের প্রসার অনেক ঐতিহাসিক ও গবেষক পণ্ডিত বাঙালী মুসলমানের ইংরেজ-

* পূর্ব পাকিস্তানে সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস, বাসব সরকার, পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৭৮।

বিরোধী জাতীয় আন্দোলনরূপে ব্যাখ্যা করেন। মূলতঃ এই আন্দোলন অনগ্রসর কৃষিভিত্তিক বাঙালী মুসলমান সমাজে পশ্চাদপদ খণ্ডিত সামন্ত সংস্কৃত-চেতনার শেষ বহিঃপ্রকাশ। ওহাবীরা বাংলাভাষা, কৃষ্টি, বাঙালীর সমাজ-রীতি ও দেশজ সংস্কৃতির মধ্যে ইসলাম-বিরোধী পৌত্তলিকতার ছাপ আবিষ্কার করেন এবং এই দেশজ সমাজ-সংস্কৃতির মিলিত ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে আরবীয় রীতিনীতির দিকে বাঙালী মুসলমানদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। ওহাবী আন্দোলনের ফলে বাংলার নববর্ষ, শারদ, নবান্ন, পৌষপার্বণ প্রভৃতি জাতীয় উৎসব—হিন্দু ধর্মীয় উৎসব হিসেবে চিত্রিত ও বর্জিত হয় এবং বাঙালীর সমাজ-জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন কঠোর ও শুষ্ক আচারপরায়ণতাকে শরিয়ত রক্ষা ও শুদ্ধির ছাপ মেরে বাঙালী মুসলমানের সামাজিক প্রগতির পথ রুদ্ধ করা হয়। বাঙালী মুসলমানের সাংস্কৃতিক জাগরণ—যে-জাগরণের সঙ্গে তার রাজনৈতিক জাগরণ সম্পর্কিত, তার পথ রুদ্ধ করা হল। ওহাবী অনুশাসন অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য নৃত্যগীত হারাম হল, চিত্র ও কলা চর্চা 'বেদাৎ' ঘোষিত হল এবং আধুনিক শিক্ষা ও নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নানা শর্ত আরোপিত হল। ঔরঙ্গজীব ভারতে যে-ধর্ম ও জাতি সমন্বয়ের পথ রুদ্ধ করেছেন, ওহাবীরা তাকে শুদ্ধি আন্দোলনের নামে আরো দৃঢ় করেছেন। এরই পরিণতি পরবর্তী কালে ভারত ও পাকিস্তানে জিন্না থেকে ইয়াহিয়া যুগে কৃত্রিম দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব। এই তত্ত্বই বাংলাভাষা, সংস্কৃতি এবং সর্বশেষে বাঙালী জাতির নিধন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তার স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে এগুতে এগুতে একাত্তর সালের পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে অপঘাত-মৃত্যু বরণ করেছে।

চার

আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, ভারতবর্ষে মুসলমানদের একটি স্বদেশহীন ধর্মজাতি করে রাখার স্বার্থপ্রণোদিত বহিরাগত চক্রান্ত বহু শতাব্দী ধরে চলেছে। নিজেদের ব্যক্তিগত রাজ্যক্ষুধা মেটানো এবং সাম্রাজ্য স্বার্থরক্ষার জন্য এই চেষ্টা কোন কোন মোগল-সম্রাট করেছেন, যেমন ঔরঙ্গজীব। ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আগত এবং রাতারাতি ভাগ্য গঠনে সক্ষম বহিরাগত মুসলিম আমির ওমরাহ ও ব্যবসায়ীরা করেছেন নিজেদের শাসন ও শোষণের খুঁটি অটুট রাখার জন্যে। তবু

পাঠান ও মোগল আমলে জনসমাজে এই সাম্প্রদায়িকতার তেমন বিস্তৃতি ছিল না, ধর্মজাতিত্ববোধেরও প্রাবল্য এতটা ঘটে নি, যতটা ঘটেছে বৃটিশ আমলে বৃটিশদের ডিভাইড্ এণ্ড রুল পলিসির জন্য। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু তাই তাঁর এক গ্রন্থে দুঃখ করে লিখেছেন, 'বৃটিশেরা আড়াই শ বছর ভারত শাসন করে যতটা অপরাধ করে নি, তার চাইতে বেশি অপরাধ করেছে ভারতের ইতিহাস লিখে।' বস্তুতঃ এটা ইতিহাস রচনা নয়, ইতিহাসের বিকৃতি সাধন। ভারতের মুসলমান নৃপতি মাত্রেই হিন্দু বিদ্বেষী, হিন্দু উৎপীড়ক ও হিন্দু রমণীর সতীত্ব অপহারক প্রমাণ করে শিক্ষাব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বিদ্বেষের বীজ রোপণের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করা হয়। যার ফল, "আধুনিক শিক্ষিত হিন্দু… ইংরেজিতে নতুন শেখা ইতিহাসের পাঠে সুলতান মামুদ থেকে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা পর্যন্ত সকল মুসলমান শাসকদেরই এক সূত্রে গেঁথে স্থির করে বসে মুসলমান শাসকমাত্রেই ভারতের স্বাধীনতার শত্রু, অত্যাচারী যবন।"*

একদিকে শিক্ষাব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন দ্বারা বিশাল সংখ্যাগুরু অমুসলিম ভারতীয়দের ভারতীয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বিষ্ট ও উত্তেজিত করা হয় এবং অন্যদিকে ভারতীয় মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য স্যর সৈয়দ আহমদ প্রমুখ কয়েকজন অনুগ্রহভোগী ইংরেজী শিক্ষিত ভারতীয় মুসলমানকে আবিষ্কার করা হয়। স্যর সৈয়দ 'হিন্দু প্রভাবান্বিত রাজনীতি' ও শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ভারতীয় মুসলমানদের দূরে থাকার উপদেশ দেন এবং বৃটিশ শাসকদের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষিত করে তোলার জন্য আলীগড় কলেজ (পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিষ্ঠা করেন। এই ভাবে ভারতে বৃটিশ শাসনের সূচনাতেই স্বতন্ত্র ও খণ্ডিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন দ্বারা স্বতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষিত মানস তৈরীর ব্যবস্থা হয়। হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সর্বভারতীয় জাতীয়তা ও ঐক্য গঠনের পথে এই ভাবে শুরুতেই বিদ্বেষ ও বিভেদের এমন একটি ক্ষুদ্র বীজ পোতা হয়, যা পরবর্তী কালে মহীরুহে পরিণত হয়েছে। ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে স্যর সৈয়দ আহমদের মাধ্যমে আলীগড়ে যে চক্রান্ত হয়েছে, সেই একই চক্রান্ত হয়েছে বর্তমান শতকের গোড়ায় বঙ্গভঙ্গ রদ ও স্বদেশী আন্দোলনের পর ঢাকায় উর্দুভাষী মুসলমান নবাব সলিমুল্লা প্রমুখের মাধ্যমে। অনগ্রসর

* গোপাল হালদার, বাঙলা দেশ : ভাবী বাঙালীর আবির্ভাব, পরিচয়, ১৩৭৭-৭৮।

বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশের অনুন্নত ও অনগ্রসর কৃষিজীবী মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আগ্রহ থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশের কিছু ছিল না। কিন্তু এই অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ কৃষিজীবী মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ছিল, বাঙালী মুসলমানদের জন্য শিক্ষাখাতে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি, গ্রামে ও শহরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন। তৎকালে বৃটিশ-সরকার এর কিছুই করেন নি। ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আসল উদ্দেশ্য এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কিত অর্ডিন্যান্স পাঠেও জানা যায়। এই অর্ডিন্যান্সে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি সীমাবদ্ধ আসন সংখ্যক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় রূপে প্রতিষ্ঠা করা হবে। উদ্দেশ্যটি অতি স্পষ্ট, শিক্ষিত ও অভিজাত মুসলমান পরিবারের সন্তানদের মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের জন্য একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা। বলা বাহুল্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরই এই শিক্ষাকেন্দ্রের সঙ্গে আলীগড় শিক্ষাক্ষেত্রের এক অদৃশ্য যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং এই দু'টি শিক্ষাকেন্দ্র দ্বিজাতিতত্ত্বের জন্ম, বিকাশ ও প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বদলে যখন উচ্চ শিক্ষার সার্বজনীন কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়, তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ই আবার নবজাগ্রত বাঙালী জাতীয়তা, গণতন্ত্র ও প্রগতিশীল সমাজবাদী ধারণা ও চিন্তাধারা লালন এবং প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। নবাব সলিমুল্লার আমলে যে কারণটি এই বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠার পেছনে কাজ করেছে, সেই একই কারণ দ্বিজাতিতত্ত্বের পঙ্গু সন্তান পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকদের এই শতকের শেষপাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গুড়িয়ে দিতে হিংস্র করে তুলেছে।

আলীগড় শিক্ষা আন্দোলন সর্বভারতীয় ঐক্য গঠন ও মিলিত শিক্ষিত মানস তৈরীর পথই শুধু রুদ্ধ করে নি, ভারতীয় মুসলমানের শিক্ষিত অংশের মন ও মানসিকতাকেও মধ্যযুগীয় পশ্চাৎমুখী চিন্তাধারায় অসুস্থ ও আবিষ্ট করে রেখেছে। ভারতীয় লৌকিক ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের মধ্যে তারা মুসলিম ও ইসলাম-বিরোধী হিন্দু ঐতিহ্য আবিষ্কার করে গোটা ভারতীয় সমাজ-সভ্যতার দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন এবং আরব ও ইরানের সংস্কৃতিকে, এমনকি তাদের

প্রাচীন পৌত্তলিক সংস্কৃতিকে নিজেদের সংস্কৃতি ভেবে নিজেদের জাতীয় বিকাশের পথও রুদ্ধ করেছেন। এরই ফলে প্রথম মহাযুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতে যখন অসহযোগ আন্দোলনের নামে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়, ভারতীয় মুসলমানেরা তখন মৌলানা মোহাম্মদ আলী ও শওকত আলীর নেতৃত্বে তুরস্কের অতি দুর্নীতিপরায়ণ খেলাফৎ নামধারী একটি রাজতন্ত্রকে ইউরোপীয় গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য খেলাফৎ আন্দোলনে ব্যস্ত। সে সময়ে শিক্ষিত ভারতীয় মুসলমানের জাতীয়তাবোধ উদ্দীপ্ত করে নি স্বাদেশিকতা অথবা স্বাধীনতার প্রেরণা; করেছে তুর্কী মুসলমানের পতনোন্মুখ রাজতন্ত্র। এটা বৃটিশ অনুগ্রহ ভোগী স্যর সৈয়দ আহমদের আলীগড় শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম কুফল।

ভারতবর্ষ এক জাতির দেশ ছিল না, এখনো নয়। ভারত বহুজাতি ও বহু সংস্কৃতিভিত্তিক দেশ। প্রাচীন ভারতে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা এই বহুজাতি ও বহু সংস্কৃতির মধ্যে নিবিড় ঐক্য প্রতিষ্ঠার স্বাভাবিক পরিণতির সহায়ক হয় নি। বর্ণভেদ দ্বারাও বৃহত্তম ঐক্যবোধ জাগ্রত করার পথ অবরুদ্ধ হয়েছে। সিন্ধী, বাঙালী, মারাঠা, রাজপুত, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী প্রভৃতি জাতির মধ্যে সামন্ত যুগের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও অপরিচয় জাতিগত ব্যবধান বাড়িয়েছে। মোগল ও ইংরেজ আমলে ভারতের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক ঐক্য এই বৃহত্তর জাতীয়তা গঠনে সহায়ক হয়েছিল; কিন্তু বহিরাগত শাসক শক্তির স্বার্থ এই ঐক্য গঠনের অনুকূল অবস্থাকে নষ্ট করেছে ধর্মসাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প সৃষ্টি দ্বারা।

বৃটিশ ধনবাদী ঔপনিবেশিকতা ভারতে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশী ধনবাদ সংগঠিত ও শক্তিশালী হওয়ার ভয়ে বহিরাগত মুসলিম ধনিক ও বণিক স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা শুরু করেন এবং ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিকাশে উৎসাহ দান করেন। এই উৎসাহেরই ফল কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানরূপে মুসলিম লীগের জন্ম এবং জিন্না-নেতৃত্বের অভ্যুদয়। জিন্না ছিলেন নিখুঁত বৃটিশ সাহেব। ইসলামী শরিয়ত ও আচারপরায়ণতার ধার ধারতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে অমুসলিম স্যার দীনশা পেটিটের কন্যা রতন বাইকে মুসলিম ধর্মমতে নয়, সিভিল ম্যারেজ আইন-অনুযায়ী বিয়ে করেন। তাঁর স্বদেশানুরাগও তর্কাতীত ব্যাপার নয়। কংগ্রেস ত্যাগের পর তিনি লণ্ডনে স্থায়ী ভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মৌলানা মোহাম্মদ আলীর মৃত্যুর পর মুসলিম লীগে

নেতৃত্বের অন্তর্দ্বন্দ্বের সময় বৃটিশ ক্রাউন-কূটনীতির আশীর্বাদ শিরে নিয়ে জিন্না ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং মুসলিম ভারতে ইসলামের একমাত্র ত্রাণকর্তার শূন্যপদটি দখল করেন। জিন্নার গণসংযোগ ও গণপ্রীতি ছিল না, সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার তীব্র বহিঃপ্রকাশের মুখে একচ্ছত্র নেতৃত্ব গ্রহণের সুযোগ তিনি পেয়েছেন। তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন টাটা, বিড়লার অক্ষম প্রতিদ্বন্দ্বী আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যবসায়ী স্বার্থে ভারতে আগত ইস্পাহানী, আদমজী প্রভৃতি মুষ্টিমেয় পরিবার। এদের জন্য একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতামুক্ত একচেটিয়া বাজার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল তাঁর। এই প্রয়োজন পূরণেরই পরিকল্পনা পাকিস্তান। ভারতীয় মুসলিম জনসমাজকে আকৃষ্ট করার জন্য এই পরিকল্পনার উপরে ধর্মরাজ্যের ছাপ দেওয়া হয়েছে এবং সামন্তযুগীয় মুসলিম যুগের পুনর্জাগরণের অবাস্তব স্বপ্ন তুলে ধরা হয়েছে।

বহুযুগের সামন্তবাদী শোষণভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক জাতি-শোষণ ও স্থানীয়ভাবে শ্রেণী-শোষণের ফলে ভারতের জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই দরিদ্র, বুভুক্ষু এবং শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ। স্বাভাবিক ভাবেই এই বিপুল জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ মুসলমান। কিন্তু তাদের দারিদ্র্যের আসল কারণ এবং বহিরাগত ও স্থানীয় মুসলিম শোষকদের আড়াল করে যে তত্ত্ব প্রচার করা হল, তা হল মুসলমানদের দারিদ্র্য ও অনগ্রসতার কারণ একমাত্র হিন্দু-চক্রান্ত ও শোষণ (এমনকি বৃটিশদের সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণও নয়) এবং ভারতীয় মুসলমানদের জাগরণেরও প্রতিবন্ধক প্রতিবেশী হিন্দু সমাজ। বাংলাদেশে এই তত্ত্বটির আরো সফল প্রয়োগ হল এজন্যে যে, বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলিম ও হিন্দু অংশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক শিক্ষার দরুন স্বতন্ত্র ও ভিন্ন মানসিকতার দ্বন্দ্ব এবং চাকুরী-বাকুরি ব্যবসা-বাণিজ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বৃটেনের ঔপনিবেশিক ধনবাদী স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা এবং বহিরাগত মুসলিম স্বার্থের সংগঠনী শক্তি ও আনুকূল্যে তাই চল্লিশ দশকেই দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা অনিবার্য করে তুলল। বিস্ময়ের কথা এই যে, নিজেদের ধনবাদী স্বার্থ রক্ষার প্রেরণায় তৎকালীন ভারতের দক্ষিণপন্থী নেতারা—রাজা গোপালাচারী প্রমুখ যেমন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা মেনে নেওয়ার জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বের উপর চাপ দিয়েছেন, তেমনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশেষ শিবিরের

আপাতঃ স্বার্থরক্ষার স্বার্থে শিবির-অনুগত ভারতীয় বামপন্থীরাও ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-বিভাগে পরোক্ষ সমর্থন জুগিয়েছেন।*

এই সাম্প্রদায়িক দেশভাগের চাপের কাছে ভাষা ও জাতীয়তার ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ ও অঞ্চলের পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের স্বাভাবিক প্রশ্ন এবং সকল জাতির মিলিত অধিকারের ভিত্তিতে দেশ গঠনের স্বপ্ন চাপা পড়ে গেছে এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত খণ্ডিত হয়েছে। যে-রক্ত স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীত হওয়ার কথা ছিল, তা নষ্ট হল সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায়। কোটি কোটি লোক উদ্বাস্তু হল, হাজার হাজার নারীর সম্ভ্রম গেল, লক্ষ শিশু অকালে প্রাণবলি দিল। দেশভাগের পরেও এই বাস্তুত্যাগের স্রোত রইল অব্যাহত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রইল অনিবার্য। ভারতে জাতি সমস্যার সমাধান হল না। সৃষ্টি হল নতুন করে কাশ্মীর ও অন্যান্য সমস্যা, দেশীয় রাজন্যবর্গের সমস্যা রইল অমীমাংসিত। দেখা গেল ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্ব ভারতবর্ষের কোন সমস্যারই সমাধান করে নি। বরং সমস্যার জটিলতা বাড়িয়েছে, বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ ও স্নায়ুযুদ্ধ সম্প্রসারণের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

পাঁচ

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অতি অল্পদিনের মধ্যে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিভ্রম ও কুয়াশা কাটতে শুরু করে। পাকিস্তানের শাসিত বাঙালী, সিন্ধী, পাঠান ও বালুচ জাতির নেতারা বুঝতে পারেন, আসলে এটা ধর্মরাজ্য নয়, বহিরাগত মুসলমানদের শোষণ ও শাসনের নয়া সাম্রাজ্য। এই বহিরাগত মুসলমানদের কেউ এসেছেন ইরান ও তুরস্ক থেকে, কেউ বা আফ্রিকার কোন দেশ থেকে— বেশির ভাগ উত্তর ও মধ্যভারত থেকে। এই বহিরাগত মুসলমান ব্যবসায়ীদের সাথে পশ্চিম পাঞ্জাবের সামন্ত স্বার্থ, আমলাচক্র ও বৃটিশ আমলে তৈরী সামরিক চক্রের যোগসাজসে পাকিস্তানের প্রকৃত শাসকশ্রেণী তৈরী হল। এই শাসকশ্রেণীর এক ব্যক্তি বিখ্যাত 'এশিয়ান ড্রামা' গ্রন্থের লেখক মিরডালের কাছে একদা গর্ব

* ডক্টর গঙ্গাধর অধিকারী লিখিত 'পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য' (প্রকাশকাল ১৯৪৫) দেখুন।

করে বলেছিলেন, "পাকিস্তান একটি বিজিত দেশ।"* এই বিজিত দেশে বিজিত জনগণের কোন রাজনৈতিক অধিকার রইল না। এটা আরো সত্য হল দু'হাজার মাইলেরও বেশী দূরে অবস্থিত বাংলাদেশের বেলায়। বাংলাদেশ প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সমস্ত ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত রইল এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে পশ্চিম অংশের জন্য সস্তায় কাঁচা মাল যোগানদার ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যম এবং তৈরী পণ্য ক্রয়ের একচেটিয়া বাজার হয়ে উঠল।

পাকিস্তানে বাঙালীদের সঙ্গে প্রথম রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দাবী উচ্চারণ করেছে সীমান্তের পাঠান জাতি। তাদের উপর নির্মম অত্যাচার করা হয়। সীমান্ত নেতা গফফার খানকে দেশত্যাগী হতে বাধ্য করা হয়। পুশ্‌তু কবি খোশহাল খান খাটকের কবিতা প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ কবিতা রূপে গণ্য হতে থাকে পাকিস্তানী শাসকদের দ্বারা। সিন্ধীদের দাবী এবং জিয়েসিন্ধ আন্দোলন জোরদার হওয়ার আগেই দমনের ব্যবস্থা হয়। বালুচদের দমনের জন্য ঈদের জামাতে বোমা মেরে হাজার হাজার নিরস্ত্র বালুচকে হত্যা করা হয়। বালুচ মুসলমানেরা রক্ত দিয়ে ধর্মীয় দ্বিজাতিতত্ত্বের মহিমা উপলব্ধি করলেন, হয়তো বা বিস্মিত হয়ে সেদিন ভেবেছিলেন, এটা কেমন করে সম্ভব? তাদের মুসলমান শাসকেরা তাদেরই বোমা মেরে হত্যা করছেন। এটা কেমন ইসলামী জাতীয়তা?

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং সম্পূর্ণ বিপরীত জাতি-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বাংলাদেশে জাতীয়তার অভ্যুদয় ঘটেছে ধীরে অথচ দৃঢ় ও সংহত গতিতে। ধর্মীয় জাতীয়তার কৃত্রিম খোলস ভেঙে প্রাচীন ভারতের একটি প্রকৃত জাতিসত্তার এটি নব অভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থান দমনের জন্য জিন্নার আমল থেকেই চেষ্টা হয়েছে। ভাষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও সামাজিক রীতির উপর আঘাত এসেছে। বাঙালী নেতারা—ফজলুল হক থেকে শেখ মুজিব রাষ্ট্রদ্রোহিতার মিথ্যা অপবাদে আসামীর কাঠগড়ায় বার বার সোপর্দ হয়েছেন। বাঙালী জাতিসত্তার সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন ও পুনর্জাগরণ ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক বিন্যাসের মুখে জাতি-শোষণ ও শাসনের মধ্যযুগীয় ঔপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহে সংগঠিত হয়েছে। ১৯৬৯ সালে এই বিদ্রোহ সর্বপ্লাবী গণবিপ্লবে রূপান্তরিত হয়। ১৯৭১ সালে দেশব্যাপী সাধারণ

* এশিয়ান ড্রামা, ৩১০

নির্বাচনে বাঙালীদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণীর ঔপনিবেশিক চরিত্র আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রমাণিত হল, মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বাঙালী মুসলমানকে রাষ্ট্রক্ষমতায় প্রাপ্য সম-অধিকার দেয়ার ও সহ-অবস্থানের নীতিতে তাঁরা বিশ্বাসী নন। রাজনৈতিক শাসন ও অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় জাতিতত্ত্ব কত বড় প্রতারণা, তা আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ল।

উনসত্তরের গণবিপ্লব একাত্তর সালে বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয় স্বাধীনতা সংগ্রামে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের অত্যাচারী পর্তুগীজ ও ডাচ ঔপনিবেশিকদের মতই এই সংগ্রাম দমনে চরম বর্বরতার আশ্রয় নিয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকচক্র। ইসলাম ধর্ম, তথাকথিত মুসলমান ভ্রাতৃত্ব ও জাতীয়তা এই বর্বরতার পথে কোন বাধা হয় নি। ইয়াহিয়ার অস্ত্রাঘাতে বাংলাদেশকে রক্ত দিতে হয়েছে। কিন্তু এই রক্তদানের পুণ্যে নবজন্ম হয়েছে বাঙালী জাতির। বাঙালী জাতীয়তার অভ্যুদয়ে ধর্মীয় জাতিতত্ত্বের চণ্ডমূর্তি আজ মৃত। স্বাভাবিক মৃত্যুবরণের আগেই ইয়াহিয়ার অস্ত্রাঘাত বুমেরাং হয়ে এই তত্ত্বের অপঘাত-মৃত্যু ঘটিয়েছে।

পাকিস্তানের শিক্ষানীতি

—আহমদ ছফা

॥ ১ ॥

পাকিস্তানের তেইশ বছরে বাংলাদেশের শিক্ষাপদ্ধতির উপর দু' ধরনের হামলা হয়েছে। তার একটি শিক্ষাদর্শ-সম্পর্কিত এবং অন্যটি, পাকিস্তানের দু' অঞ্চলের মধ্যে অর্থ-বন্টনের আসমান-জমিন-যে বেশকম তার আওতা-ভুক্ত। এই দু'টি সরকারী নীতি আপাতদৃষ্টিতে সম্পর্কহীন মনে হতে পারে। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই প্রকৃত ব্যাপারটা ধরা না পড়ার কথা নয়—একটা অন্যটার পরিপূরক। সরকার যে দু' ধরনের নীতি গ্রহণ করেছিলো, বাংলাদেশ তথা সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার ক্ষেত্রে তা একবাক্যে যদি কেউ হামলা বলে অভিহিত করেন, তা'হলে খুব বেশী ভুল করবেন না। বাংলাদেশ পাকিস্তানের ধনিক, বণিক এবং পুঁজিপতি সম্প্রদায়ের উপনিবেশ। সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে কার্যত পশ্চিমারা শোষণই করেছে। ঔপনিবেশিক শোষক সরকার যে-শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করে, তাতে জনগণের জীবনের বাস্তব দাবীর চাইতে শাসক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের গুরুত্বই দেওয়া হয় অধিক। বাংলাদেশেও ভূতপূর্ব পাকিস্তানের কর্তারা, শাসন-শোষণ কায়েম করে রাখার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের যতোটুকু সহযোগিতা অপরিহার্য, তার বাইরে শিক্ষার কোনো রকম প্রসার হতে দেয় নি। এটা হলো বাঙালী জনসাধারণকে শিক্ষার দিক থেকে খাটো করে রাখার সরকারী ষড়যন্ত্র। এই দুরভিসন্ধি পুরোপুরি কার্যকর করার জন্য সরকার সম্ভাব্য সকল পন্থাই গ্রহণ করেছে। নামে পাকিস্তান স্বাধীন রাষ্ট্র, কিন্তু কাজে পশ্চিমাঞ্চলের এক শ্রেণীর মানুষ পূর্বাঞ্চলের সকল শ্রেণীর মানুষের উপর অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়ে এসেছে। এটা উপনিবেশ-বাদের চারিত্র লক্ষণ। পাকিস্তানকে আবার চিরায়ত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তুলনাও করা যাবে না। সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকে গায়ের জোরে। তাতে কোনো রকম রাখারাখি ঢাকাঢাকির ব্যাপার নেই। পাকিস্তান বলতে যা বোঝায়, বাংলাদেশের মানুষের সমর্থনে তার সৃষ্টি, আস্থায় স্থিতি। পাকিস্তান সৃজনে পশ্চিমা প্রদেশগুলোর অবদান খুবই সামান্য। বাঙালীরাই বানিয়েছে

পাকিস্তান, সুতরাং গায়ের জোরের কথাই উঠে না। তাই বাংলাদেশকে পশ্চিমারা উপনিবেশে রূপান্তরিত করেও মুখে স্বীকার করতো না। বাংলাদেশ যে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণক্ষেত্র, একথা যাতে করে পূর্বাঞ্চলের মানুষের উপলব্ধিতে না আসে, সেজন্য তারা রাষ্ট্র-সংগঠনকারী অপরিহার্য উপাদান—ভৌগোলিক সংলগ্নতা, জলহাওয়া, সংস্কৃতি, ভাষা এসব বাদ দিয়ে ধর্মকেই একমাত্র হাতিয়ার করেছিলো। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র, মুসলমান রাষ্ট্র ইত্যাদি শ্লোগান হরদম প্রচার করে কতিপয় নগ্ন সত্য ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলো। তার ফলে, বেশ কিছুদিন বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক শোষণটা ধরা পড়ে নি। পাকিস্তানের শিক্ষাদর্শেও এই ইসলাম শব্দটা অত্যন্ত সুকৌশলে জুড়ে দেওয়া হয়েছিলো। বর্তমান জগতে বাঁচবার বাস্তব দাবীই শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান উপজীব্য হওয়া উচিত ছিলো। ইসলামী, খ্রীস্টীয়ানী কিংবা হিন্দুয়ানী বলে কোনো শিক্ষাব্যবস্থা এযুগে সত্যি অচল এবং একেবারে অকেজো। তবু পাকিস্তানের কর্তারা শিক্ষার সঙ্গে ইসলামকে এমন ভাবে জুড়ে দিলো, মনে হবে যন্ত্র-ঘর্ঘরিত জগতে বাস করেও তারা যেন মধ্যযুগের খনি খনন করে আদিম অন্ধকার সমাজজীবনে ছড়িয়ে দেবার কাপালিক ক্রীড়ায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলো। আসলে বিষয়টা পুরো সত্য নয়। কারণ, পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মনের একটা বদ্ধমূল ধারণা, তারা যা করে, তাদের যা আছে সবই ইসলাম, ধর্মসম্মত। তাদের ভাষা ইসলামী, সংস্কৃতি ইসলামী, উপজাতীয় নাচন আদিমতা, এমনকি অশ্লীল অশালীন উর্দুতে পাঞ্জাবীতে তৈরী ছায়াছবিগুলো পর্যন্ত ইসলামী। ওরা স্বভাবের বশবর্তী হয়ে যা করে সবই ইসলামী, সুতরাং ইসলামী শিক্ষাদর্শ তাদের লোকসানের না হয়ে লাভের কারণই হওয়ার কথা। হয়েছেও তাই।

বাঙালীর ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সাহিত্য থেকে শুরু করে সঙ্গীত পর্যন্ত যা প্রকৃতির তাড়নায়, স্বভাবের প্রেরণায়, প্রাণধারণের প্রয়োজনে যুগ যুগ ধরে সৃজিত হয়ে আসছে তার কোনোটাই ইসলাম ধর্মসম্মত নয়। তাই এর প্রত্যেকটিকে ইসলামী করে তুলতে না পারলে নতুন রাষ্ট্রের উন্নতি অসম্ভব। শাসকশ্রেণী একথা প্রচার করতো। শিক্ষার মাধ্যমেই সবকিছুর দ্রুত ইসলামায়ন সম্ভব, তাই পরিবর্তন যদি আনতে হয় ইসলামী শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তনই তার একমাত্র উপায়।

পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্ত শোষণ-শাসন-পীড়িত অজ্ঞ জনসাধারণের সরকারের ইসলামী শিক্ষানীতির স্বরূপ জানার কথা নয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ ধর্মের প্রকোপে কুপিত মানুষও এ সম্বন্ধে প্রথম প্রথম কোন উচ্চ বাচ্য করেন নি। ইসলামী শিক্ষাপদ্ধতির অল্প-স্বল্প বাস্তবায়নের মধ্যেই উপনিবেশবাদী সরকারের গূঢ় ইচ্ছেটা স্পষ্টভাবে ফুটে বেরোলো। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার বিকাশ হওয়া তো দূরের কথা রাষ্ট্রারোপিত একটা ছাঁচের মধ্যে সৃষ্টিশক্তি আটকে থেকেছে। একে কোনোমতেই প্রকৃত শিক্ষা বলা যেতে পারে না। কেননা প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে বাস্তব সত্য এবং তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের একটা তৃষ্ণা অবশ্যই থাকা চাই। এবং গোটা শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এমন একটা পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যার প্রভাবে শিক্ষার্থীর মন আবিষ্কারের দিকে, বিচারের দিকে, বিশ্লেষণের দিকে ধাবিত হতে পারে। কৃত্রিম যে-শিক্ষা ,তার সে বালাই নেই। কৃত্রিম শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তিকে অপরের কাজের যোগ্য করে,:কিন্তু আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। পাকিস্তানেরও কর্তাব্যক্তিরা একটা কৃত্রিম শিক্ষানীতি উপর থেকে চাপিয়ে দিয়ে গোটা বাঙালী জাতির স্বভাবজ শক্তিকে পাকে পাকে বেঁধে ফেলতে চেষ্টা করেছে। বাঙালী জাতিকে ভাবনা-চিন্তাহীন, কল্পনাহীন এবং স্বপ্নহীন করার ষড়যন্ত্রের নামই ইসলামী শিক্ষানীতি। বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শোষণ কায়েম করে রাখার জন্য এ ধরনেরই একটা শিক্ষাপদ্ধতি চালু হওয়া আবশ্যক। যাতে করে ফিবছর কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে আমলা এবং কেরানী তৈরী হয় এবং একটিও সুচেতনাসম্পন্ন স্বাধীন চিন্তার মানুষের সৃষ্টি যাতে না হয়। এই শিক্ষানীতি বিগত তেইশ বছরে-বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি শিল্প-বিজ্ঞানের বিকাশ মারাত্মক ভাবে ঠেকিয়ে রেখেছে। এই ষড়যন্ত্রের জাল কতো দূর বিস্তৃত ছিলো এবং তা কিভাবে চিত্তের সহজ গতিতে বাধা দিয়েছে, কতিপয় বিষয়ের আলোচনার মাধ্যমে তার স্বরূপ কি তা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

॥ ২ ॥

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এক শ্রেণীর পাকিস্তানী কর্তা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখায় ইসলামের শীলমোহর এঁটে দেওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠে।

তারা অজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে এ মত প্রচার করতে থাকে যে, কোরআনই হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান সমস্ত কিছুর উৎস। কোরআনে যা নেই, তা বিশ্ব ভূ-মণ্ডলের কোথাও নেই। প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য কোরআনের জ্ঞান তথা ধর্মের জ্ঞান লাভ করা প্রত্যেক মুসলমান নরনারীর একান্ত কর্তব্য। ধর্মীয় জ্ঞানের দাপট শুধু ধর্মের ক্ষেত্রে আবদ্ধ থাকলে খুব বেশী ক্ষতি হতো না। কিন্তু ধর্মের এলাকা ছাড়িয়েও ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং শিল্প-সাহিত্যে ধর্মের বীজ অনুসন্ধান করতে যাওয়া এযুগে মত্ততারই নামান্তর। দুর্ভাগ্যবশত মত্ততাই শিক্ষার সকল স্তরে প্রাধান্য পেতে আরম্ভ করে। ইসলামী শিক্ষার প্রবর্তকদের কেউ কেউ তাদের একগুঁয়েমির সপক্ষে কবি ইকবালের 'শেকোয়া' কাব্যের একটি অংশের কিছু চরণ 'ম্যানিফেস্টো' হিসেবে তুলে ধরে। কাব্যের পঙ্‌ক্তি-যে সত্যি সত্যি তারা ব্যবহার করেছিলো, তেমন কথা বলছি নে। তবে কবিতাংশের নিহিতার্থ যা তাই তাদের শিক্ষাবিষয়ক যাবতীয় ক্রিয়াকলাপে ফুটে উঠেছিলো। সে কবিতাংশের ভাবার্থ করলে এরকম দাঁড়ায়। পৃথিবীতে আগে মুসলমান ছাড়া আরো অনেক জাতি বাস করতো। গ্রীসের লোকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতো, রোমানেরা সাম্রাজ্য বিস্তারে রত ছিলো, সাসানীয় এবং আর্মানীয়েরা আপনাপন উপাস্য দেবতার চরণে প্রণতি নিবেদন করতো। তারা তো কেউ বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌র নাম প্রচার করে নি। একমাত্র মুসলমানের বাহুবলকেই আশ্রয় করে আল্লাহ্‌র নাম পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রচারিত হয়েছে। শুধু এই অংশটুকু আলাদা-ভাবে বিচার করলে, মানে ধরে নিতে হয়, মুসলমানেরাই পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। কিন্তু গোটা কাব্যের প্রেক্ষিতে এর মানে ভিন্নরকম। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিভাগে ইসলাম এবং মুসলমানের শ্রেষ্ঠত্ব সন্ধানের একটা ধারাবাহিক প্রচেষ্টা চলতে থাকে। অতি অল্পসময়ের মধ্যেই সরকারের অঘোষিত শিক্ষানীতি হিসেবে তা সক্রিয় করে তোলা হয়। মুসলমানেরা সবচেয়ে জ্ঞানী, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এই উগ্র অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা নিরক্ষর এবং অর্ধশিক্ষিত মানুষদের মনে চারিয়ে তুলতে সরকারকে বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। পাকিস্তানের ভাগ্যবিধাতারা নিজেদের ঔপনিবেশিক স্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে এই উগ্র অসহিষ্ণু এবং অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি চালু করতে চেষ্টা করেছিলো। বাংলাদেশের কিছু স্বার্থ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এবং কিছু ধর্মান্ধ মানুষ এই অঘোষিত শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের ব্যাপারে সরকারের সহায়তা করেছে। পাকিস্তানী কর্তাদের এই নীতির সঙ্গে

হিটলারের শিক্ষানীতির তুলনা করা যেতে পারে। নাজীরা যেমন আর্যামীর ধুয়া তুলে দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য এবং শিল্পকলায় যা কিছু উগ্র রণংদেহি জার্মান জাতীয়তাবাদকে প্রোৎসাহিত করে না, সে সকল খারিজ করে দিয়েছিলো; তেমনি পাকিস্তানী প্রভুরাও যা কিছু মুসলিম জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের অনুধারণার পরিপন্থী, সমস্ত বর্জন করার জন্য মরীয়া হয়ে চেষ্টা করছিলো। কিন্তু এ নীতি একমাত্র কার্যকরী হয়েছে বাংলাদেশের বেলায়। পশ্চিম পাকিস্তানের গায়ে আঁচড়টিও লাগে নি। তারা আগে যেভাবে শিক্ষা পেয়ে আসছিলো, সে ভাবেই তাদের শিক্ষা চলতে লাগলো। বরঞ্চ অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষাদান পদ্ধতি আধুনিক করে তোলা হলো। দেশবিভাগের আগেও পশ্চিম পাকিস্তানের চার প্রদেশের কোনোটাতে বেশী অমুসলমান বাস করতেন না। তাই সেখানকার যা কিছু সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ তার অনেকটা মুসলমানের হাত দিয়েই গড়ে উঠেছে। তাই বলে পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে কিছুতেই ইসলামের সঙ্গে এক করে দেখা যাবে না। সরকার শক্তহাতে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করলো, তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের কুটোটিও নড়লো না। কারণ সেখানকার সংস্কৃতিতে, কাব্য সাহিত্যে যা কিছু অনৈসলামিক উপাদান থাকুক না কেন, মুসলমানেরাই তো ওসবের স্রষ্টা। সুতরাং পঠন-পাঠনে কোনো বাধা থাকবে কেন, যখন বাংলাদেশে-হিন্দু মুসলান যুগযুগান্তর ধরে পাশাপাশি বাস করে আসছে। বাংলার মানুষের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সাহিত্য, সঙ্গীত, ভাষা এবং আচার আচরণের সঙ্গে হিন্দুদের যোগ রয়েছে। বাঙালীর যা কিছু মনন এবং চিত্ত-সম্পদ, তা হিন্দু মুসলমানের যৌথ সাধনার সৃষ্টি। ক্ষেত্র এবং কালবিশেষে মুসলমানের অবদান হিন্দুর তুলনায় নগণ্য। শাসকগোষ্ঠী প্রচার করতে থাকলো, এ কেমন করে সম্ভব? মুসলমানেরা সর্বশ্রেষ্ঠ জাত, অন্ততঃ হিন্দুর তুলনায় শ্রেষ্ঠ তো বটেই। তারা যদি হিন্দু লেখকের লেখা পড়ে, তাদের গান গায়, তা'হলে ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব খুইয়ে বসবে। স্বার্থান্ধ এবং ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা সরকারের সিদ্ধান্তের সমর্থন করলো না শুধু, সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করতে লেগে গেলো। তার ফল দাঁড়ালো এই যে, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমান হিন্দুর চাইতে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত নতুন পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করা হলো। কোনোরকমের যুক্তি ছাড়াই অমুসলমান লেখক, স্রষ্টা এবং চিন্তানায়কদের সাধনা দৃষ্টির আড়াল করে রাখলো

অথবা বিকৃত করে উপস্থিত করলো। বিভাগ-পূর্ব আমলের সকল লেখক, সকল গ্রন্থ কিংবা সকল ধরনের বিচার বিশ্লেষণ অসম্প্রদায়িক ছিলো, ত্রুটিমুক্ত ছিলো, তেমন কথা বলা উদ্দেশ্য নয়। তবে তাঁদের ত্রুটির চাইতে গুণপনা-যে অধিক ছিলো সে আলোময় দিকটিকে সম্পূর্ণরূপে ঢেকে রাখা হলো। সত্য আবিষ্কারের স্পৃহার স্থান দখল করলো একপেশে মনোভঙ্গী এবং গোটা শিক্ষা যন্ত্রটাই একপেশে হয়ে দাঁড়ালো। যেহেতু সকল বিষয়ে মুসলমানের উৎকর্ষ দেখানো প্রয়োজন, তাই সাহিত্যের নতুন ইতিহাস লেখানো হলো, অমুসলমান সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকে বিচার-বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে হেয় করে দেখানো হলো। বাঙালীর জাতি-তত্ত্বের নতুন সংজ্ঞার প্রচলন করা হলো। ভাড়াটে ঐতিহাসিকরা বই লিখে, প্রবন্ধ ফেঁদে, বক্তৃতা দিয়ে প্রচার করতে লাগলো যে, বাঙালীরা এদেশের ক্ষেত্রজ সন্তান নন। তাঁদের পূর্বপুরুষেরা প্রায় সকলেই ইরান, তুরান কিংবা তুর্কী থেকে এসেছেন। পাকিস্তান একটি কৃত্রিম রাষ্ট্র, তার রাষ্ট্রবন্ধনটাও কৃত্রিম। একটি শ্রেণী শুধুমাত্র শোষণ করার জন্য এই রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করেছে এবং আরেকটি শ্রেণী অজ্ঞতা সঞ্জাত ভীতির বশবর্তী হয়ে এই কৃত্রিম রাষ্ট্রের সৃষ্টি করেছে। তাদের অধিকাংশই বাংলাদেশের মানুষ। শিক্ষা আধুনিক রাষ্ট্রের হৃৎপিণ্ডস্বরূপ। তাই কৃত্রিম রাষ্ট্রের জন্য কৃত্রিম শিক্ষানীতিও অপরিহার্য।

পাকিস্তানের কর্তারা শিক্ষাসংস্কারের নামে এই কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগ করে গোটা বাঙালী জাতিকে তার ঐতিহ্যের বন্ধন থেকে, সংস্কৃতির কোল থেকে, মাটির শেকড় থেকে সকলে টেনে এনে ছিন্নমূল করতে চেয়েছে। যদি তারা সফল হতো এতোদিনে বাঙালীকে একটা দাস জাতিতে রূপান্তরিত করতে পারতো। তাই তারা সাহিত্যে জোর করে বিকৃত ব্যাখ্যার প্রবর্তন করেছে, মিথ্যা এবং অর্ধ সত্য ইতিহাস রচনা করেছে, বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা এবং যুক্তিবিচারের মুখে পাথর চাপা দিয়েছে। অন্তর্লোকের জাগরণ ঘটানো, বস্তুনির্ভর সত্য উদ্ঘাটন করা এবং আধুনিক পৃথিবীতে সমাজবদ্ধ মানুষ হিসেবে বসবাস করার যোগ্য করে তোলাই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য। পাকিস্তানী শাসকেরা যে-শিক্ষাপদ্ধতি বাংলাদেশে চালু করলো, তাতে মৌলিক চিন্তার স্থান নেই, চিত্তবৃত্তির স্ফুরণের ক্ষেত্র নেই, সামাজিক দুঃখ দূর করার প্রেরণা নেই—ঘাড়ে গর্দানে বাঙালীকে দাস করে রাখার একটা নিষ্ঠুর কঠিন শৃঙ্খল ছাড়া তাকে আর কিছুই বলা যায়

না—যা সৃষ্টিশীল প্রতিভার বদলে কেরানী এবং মানবিক গুণাবলীসম্পন্ন মানুষের বদলে আমলা তৈরী করতেই শুধু সক্ষম।

॥ ৩ ॥

দেশবিভাগের পরে অনেক কৃতী শিক্ষক বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন। তার কারণ, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বলে মনে করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুল করা হবে। অথবা অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধার লোভে দেশ ছেড়েছেন বেশীর ভাগের বেলায় তাও সত্যি নয়। হিন্দুই হোন অথবা মুসলমানই হোন বাংলাদেশে শিক্ষকেরা সব সময়েই সমাজের চোখে শ্রদ্ধার পাত্র। অধিকাংশ শিক্ষক আর্থিক দিক দিয়ে দরিদ্র ছিলেন, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁদের অনেকের পশ্চিম বাংলা কিংবা ভারতের অন্য কোনো স্থানে আত্মীয়স্বজন ছিলো না। তবু তাঁরা সম্পূর্ণ অনিশ্চিতিকে সম্বল করে বাস্তুহারার দলে নাম লেখালেন কেন? তার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করতে হবে।

পাকিস্তান সরকারের অনুসৃত শিক্ষানীতির সঙ্গে তাঁদের অনেকেরই দীর্ঘদিনের সাধনার বিনিময়ে লব্ধ শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বলেই দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলেন। কথাটা অনেকাংশে সত্য। একটি জাতির কৃতী শিক্ষকের সংখ্যাও বা কতো। সাম্প্রদায়িকতার নীতি এতো কঠিন ভাবে যদি শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হতো তাহলে অনেক কৃতী শিক্ষকই দেশে থাকতে পারতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শ্রীসত্যেন বসুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়তে হয়েছিলো, যেহেতু তিনি অমুসলমান। অবশ্য শ্রী বসু দেশবিভাগের মাস কয়েক আগে চলে এসেছিলেন, কিন্তু কারণ একই। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজ্‌তবা আলীর মতো জ্ঞানী ব্যক্তির স্থান তাঁর স্বদেশে হয় নি। জগন্নাথ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক শ্রীঅজিতকুমার গুহ কোনো এক সভায় বাংলাদেশের মুসলমানের ঠিকুজী-কুলজী সম্পর্কিত একটি ইতিহাস-সম্মত মন্তব্য করেছিলেন এবং তা শাসক শ্রেণীর মনঃপূত হয় নি। সে অপরাধে তাঁর মতো একজন কৃতবিদ্য শিক্ষক জীবনের উপান্তে এসে

কলেজের চাকুরী ছাড়তে বাধ্য হন। শ্রীবসু, জনাব আলী এবং শ্রীগুহের কথা লোকের শ্রুতিগোচর হয়েছে, কেননা ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা কীর্তিমান। কিন্তু বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তর পর্যন্ত এমন অনেক অখ্যাত অশ্রুতকীর্তি শিক্ষক দেশত্যাগ করেছেন, যাঁদের সম্বন্ধে বেশী লোকের জানার কথা নয়। কিন্তু তাঁরা শিক্ষক হিসেবে ভালো ছিলেন, সমাজের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এমনও দেখা গেছে যাঁরা স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করেন নি, সরকার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ চাপ প্রয়োগ করে তাঁদের চাকুরী ছাড়তে বাধ্য করেছেন। এতোগুলো শিক্ষকের অল্পসময়ের মধ্যে দেশত্যাগ নিশ্চয়ই গোটা জাতির শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছিলো। কিন্তু পাকিস্তান সরকার সে ব্যাপারে বিশেষ ভাবনা চিন্তা করেছে, এমন কোনো প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বিরাট বিকট সমস্যার একটা সরল সমাধান সরকার আগেই যেন তৈরী করে রেখেছিলো। কৃতী অধ্যক্ষ দেশত্যাগ করলে সে আসনে এলেন আধুনিক জগত এবং জীবন সম্পর্কে বলতে গেলে একেবারে অজ্ঞ আরবী-ফার্সীর অধ্যাপক। উচ্চ বিদ্যালয়ের হেডমাস্টারের অভাব হয়তো সরকারের খয়ের খাঁ গোছের কোনো থার্ড মাস্টারকে দিয়ে পূরণ করা হয়েছে। ফরমায়েস দিয়ে দাস তৈরী করা যায়, কিন্তু শিক্ষক তৈরী করা যায় না। শিক্ষকের মন স্বাধীন না হলে প্রাণের সলতে দিয়ে প্রাণে আলো জ্বালানোর কর্মটি করা সম্ভব নয়। এক একজন শিক্ষক সুদীর্ঘ সময়ের পরিসরে প্রতিদিন নিজের দুর্বলতার সঙ্গে সংগ্রাম করে চিন্তাধারা সুবিন্যস্ত করে তোলেন এবং প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীরও চিন্তাপদ্ধতিতে শৃঙ্খলার ভাব সৃষ্টি করেন। এ ধরনের শিক্ষকের ঐতিহ্য থাকা চাই। বনবাদাড় ফুঁড়ে রাতারাতি শিক্ষক গজাবে। শিক্ষক কি ব্যাঙের ছাতা? অথচ পাকিস্তান সরকার শিক্ষার মতো একটি জটিল এবং জাতীয় জীবনের সর্বপ্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার কারখানায় তৈরী শিক্ষকদের হাতে ছেড়ে দিতে পেরে সন্তুষ্ট হয়েছিলো। এই ক্রান্তিকালের শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেরই শিক্ষকের উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র সম্পদের লেশমাত্রও ছিলো না। এই শিক্ষকেরা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু সরকারী নির্দেশ পালনে চুড়ান্ত যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। তা-সত্ত্বেও একথা স্বীকার করে নেওয়া অনুচিত হবে না,

শেষপর্যন্ত বেশ কিছু শিক্ষকই সরকারী নীতির বিরোধী ছিলেন। মনে মনে বিরোধিতা করা আর মুখ ফুটে প্রতিবাদ করা এবং তার জন্য ক্ষতি স্বীকার করতে তৈরী থাকার মতো সাহস এবং সঙ্গতি সকলের না থাকারই কথা। 'লাখে না মিলয়ে এক' ধরনের কিছু শিক্ষক বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজে এবং স্কুলগুলোতে সত্যি সত্যি ছিলেন। তাঁরা সে সময়েও সরকারী শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য শোনার এবং প্রতিকার করার মতো অবস্থা বাংলাদেশের তখনো আসে নি। গোটা সমাজটা পাকিস্তানের ইসলামী জোয়ারে তরঙ্গিত হচ্ছে, ধনিকেরা স্থূল সূক্ষ্ম দু' পদ্ধতিতে ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে শক্ত করে বাঁধছে বাংলাদেশকে, বাঙালীকে, এবং শিক্ষার মাধ্যমে উপনিবেশবাদের ভাবী বুনিয়াদ পাকাপোক্ত করতে লেগেছে। আর যারা চক্ষুষ্মান, তারা দু'হাতে সুবিধে লুঠ করছে। এই রকম সময়ে, এই রকম পরিস্থিতিতে শুধু শিক্ষক সমাজের এগিয়ে এসে বিশেষ একটা কিছু করার ছিলো না। সভা-সমিতিতে রাষ্ট্রের ইসলামী দর্শনের ননীর পুতুলের শরীরে আঁচড় লাগে এমন কোনো কথা উচ্চারণ করতে পারতেন না, সংবাদপত্রগুলোতে তাঁদের মতামত প্রকাশিত হতো না। শুধু তা নয়, প্রতিষ্ঠানিক মুখপত্রগুলোতেও স্বাধীন চিন্তা কিংবা গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা নিষিদ্ধ ছিলো, যদি তা রাষ্ট্রদর্শনের প্রতিকূলে যায়। শিক্ষক নামধারী-একশ্রেণীর পরগাছা ব্যক্তিদের পোষণ করাই সরকারের পবিত্র কর্তব্য হয়ে দাঁড়ালো। এই পরগাছা শ্রেণীর হঠাৎ প্রমোশন পাওয়া শিক্ষকেরাই কখনো সামনে এগিয়ে এসে, কখনো দাঁড়িয়ে থেকে, কখনো খোলাখুলি এবং কখনো প্রচ্ছন্নভাবে পাকিস্তানী শাসকদের বাংলা-দেশে ইসলামী শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপনিবেশবাদী নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। তাদেরই সহায়তায় সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং স্বায়ত্তশাসিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধর্মীয় প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেছে। একটির পর একটি সংস্কৃতিবিরোধী সরকারী হামলায় তারাই জুগিয়েছে সমর্থন এবং সাহস। সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা হরণ করলো, শিক্ষকদের স্বাধীনতা কেড়ে নিলো, স্বাধীন চিন্তা এবং বিজ্ঞানী-সুলভ নির্মোহ প্রশ্নশীলতার উৎসমুখ নিষেধের পাথর চাপা দিয়ে বন্ধ করে দিলো। শিক্ষকেরা পবিত্র বৃত্তির লাঞ্ছনায় মনে মনে গুমরে মরেছেন, কিছুই করতে পারেন নি, করার কিছু ছিলোও না তাঁদের। শিক্ষা একটা জাতীয় সমস্যা, সরকার নির্ধারিত নীতি চাপিয়ে

দিয়েছে গোটা জাতির উপর। জাতির যদি প্রতিবাদ করার মতো মানসিকতার অধিকারী না হয়, তাহলে শিক্ষকও তাঁর দায়িত্ব পালন করতে অনেক সময় সক্ষম হয়ে ওঠে না। তিনি জাতিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিতে পারেন, কোন্ নীতি কার্যকর হলে গোটা দেশের মানুষের কি পরিমাণ ক্ষতি সইতে হবে। সরকারী ফেরফার বোঝার মতো সূক্ষ্ম দৃষ্টির অধিকার জাতি তখনও অর্জন করতে পারে নি। তবে সময় দ্রুত এগিয়ে আসছিলো। পাকিস্তানী কর্তারা শিক্ষার প্রশ্নে এমন সব নীতি প্রণয়ন করতে আরম্ভ করলো, অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে দেশের শিক্ষিত মানুষ চোখ মেলে তাকাতে বাধ্য হলেন। দেশের মানুষের সচেতন অংশ বুঝতে আরম্ভ করলেন, শিক্ষার প্রশ্নে সরকার যে-সমস্ত নীতি নির্ধারণ করছে তা শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না, দেশের ব্যাপক জনজীবনেও অপ্রতিরোধ্য প্রভাব বিস্তার করবে। অনেক বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে কিছু কিছু শিক্ষক কতিপয় সরকারী নীতির ফলাফল-যে দেশের মানুষের পক্ষে মারাত্মক হবে তা তরুণ ছাত্র এবং দেশের মানুষকে সম্যকভাবে বোঝাতে পেরেছিলেন। শিক্ষকদের এই অবদান স্মরণ রাখার মতো। কোনো কোনো শিক্ষককে বিশেষ বিশেষ সরকারী নীতির বিরোধিতার প্রশ্নে অগ্রসৈনিকের ভূমিকা পালন করতে হয়েছে! এজন্য তাঁদের লাঞ্ছিত অপমানিত হতে হয়েছে।

॥ ৪ ॥

পাকিস্তান সরকার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চেষ্টা করেছে। তার পেছনে উপনিবেশবাদী দুরভিসন্ধি ছাড়া কোনো যুক্তি ছিলো না। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জনগণকে অনেককাল পিছিয়ে রাখা সম্ভব হবে এবং অর্থনৈতিক শোষণ সুদীর্ঘকাল ধরে চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিক-বণিক শ্রেণী। আসল উদ্দেশ্য চাপা দেওয়ার জন্য সরকার প্রচার করেছিলো, উর্দু ইসলামী ভাষা এবং এই ভাষা রাষ্ট্রভাষা হলে দু' অঞ্চলের মুসলমানদেরই সুবিধে। সেই সময়ে ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সরকারী যুক্তি খণ্ডন করে বলেছিলেন, যদি ধর্মভাষারই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার একচেটে অধিকার, তাহলে উর্দু কেন আরবী হোক না পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা।

আরবী তো দু' অঞ্চলের মুসলমানের দৃষ্টিতে সমান পবিত্র। সরকার কিংবা পশ্চিমা ধনিক বণিক শ্রেণী ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এ ধরনের মন্তব্যে প্রীত হওয়ার চাইতে বেজারই হয়েছিলো বেশী। উর্দুকে ইসলামী ভাষা বলে বাংলাদেশের জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে চায়, অথচ উর্দু ইসলামী ভাষা নয়। সত্যি যদি কোনো ভাষাকে ইসলামী বলা যায়, তাহলে আরবীর দাবী সর্বাগ্রগণ্য। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানীরা আরবীর প্রতি অনীহ। তার কারণ, তাদেরকেও তা'হলে বাংলাদেশের মানুষের মতো গোড়া থেকে ভাষা শিক্ষা করতে হয়। তারা তাতে গররাজী। তা'হলে-যে বাংলাদেশের মানুষদের পিছিয়ে রাখার সমস্ত কূট-কৌশল মিথ্যে হয়ে যায়। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ আদতে আরবীকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী ছিলেন না। শাসকদের কূটযুক্তির জবাবে কূটযুক্তির অবতারণা করেছিলেন মাত্র। তিনি একা নন। বাংলাদেশের কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সরকারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। ডঃ কাজী মোতাহের হোসেন বাংলা ভাষার সমর্থনে অনেকগুলো ধারালো প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই দু' জন প্রবীণ জ্ঞানী ব্যক্তিকে তাঁদের জনপ্রিয়তার কথা চিন্তা করে বোধ হয়, কোনোরকম প্রত্যক্ষ নির্যাতন করতে সাহসী হয় নি। তাই বলে তাঁদের উপর-যে চাপ দেওয়া হয় নি একথা সত্য নয়। অন্যান্য যে-সকল শিক্ষক ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদেরকে জেলখানায় পাঠিয়েছিলো সরকার। আজকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যক্ষ ডঃ মুজাফফর আহমদ চৌধুরী, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ নাজমুল করিম, বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিম এবং জগন্নাথ কলেজের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক ৺অজিতকুমার গুহ এঁদের সকলকে দীর্ঘকাল কারাগারে আটক থাকতে হয়েছে। তাছাড়া গোটা বাংলাদেশের কতো শিক্ষকের উপর পুলিশী নির্যাতন চলেছে এবং কতো শিক্ষক-যে চাকুরী ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন, তার সঠিক হিসেব এখনো নিরূপণ করা হয় নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষা সংস্কৃতির উপর সরকারী হামলার প্রতিবাদে বাংলাদেশের শিক্ষকেরা তো পিছিয়ে ছিলেন না, বরঞ্চ এগিয়েই এসেছিলেন। তবে শুধু প্রতিবাদ দিয়ে কিছু হয় না, তার সঙ্গে সামাজিক শক্তির সংযোগ ঘটা চাই। শিক্ষকদের সুতীক্ষ্ণ

প্রতিবাদ গণমানসে সাড়া তুলেছে অনেক সময় এবং তা রাজনৈতিক আন্দোলনেও সঞ্চার করেছে বেগ। শিক্ষকেরা রাজনৈতিক নন। শিক্ষানীতি এবং রাজনীতির মধ্যে গোটা সমাজের নিরিখে সম্বন্ধ থাকলেও অনেক সময় দেখা যায় তা প্রত্যক্ষ নয়। সরকার শিক্ষানীতির মধ্যেই রাজনীতি খাটিয়েছে, তাও আবার ঔপনিবেশিক শাসনকে সুদীর্ঘস্থায়ী করার রাজনীতি। বাধ্য হয়ে শিক্ষকদের প্রতিবাদ করতে হয়েছে। কেননা শিক্ষা এবং সংস্কৃতির বিকৃতি সাধন করে গোটা জাতিকে পুরোপুরি সৃষ্টিশক্তি রহিত করে কায়েমী স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য নতুন শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন। শিক্ষকদের সরকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদের প্রকৃতি মোটামুটি দু'ধরনের হলেও মূলতঃ তা এক লক্ষ্যাভিসারী। কিছু কিছু শিক্ষক নেহায়েত শিক্ষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানী কর্তাদের শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেছেন, কেননা এ নীতি প্রকৃত শিক্ষার পরিপন্থী। আবার অধিকতর রাজনীতি-সচেতন শিক্ষকেরা দেশের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেন—সরকারী রীতির মধ্যে ঔপনিবেশিকতার অভিসন্ধি ধরতে পেরে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, পাকিস্তান সৃষ্টির পর কর্তৃপক্ষ উর্দু বাংলা মিশিয়ে একটা 'লিংগুয়া ফ্রাংকা' তৈরী করতে চেয়েছিলো। ভাষা-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো কোনো শিক্ষক তার বিরোধিতা করেছেন, যেহেতু ভাষার নিয়ম-অনুসারে দু'টি বিচ্ছিন্ন ভৌগোলিক এককের দু'টি ভাষা কারো নির্দেশে একটা সময়সীমার মধ্যে এক হয়ে উঠতে পারে না। যাঁরা রাজনীতি সচেতন, বাঙালীর স্বকীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ভুলিয়ে দিয়ে গোটা জাতিকে চিন্তা ভাবনার দিক দিয়ে দাস করে রাখার সুচিন্তিত পরিকল্পনাই তাঁদের প্রতিবাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। বাংলা লিপির স্থলে রোমান কিংবা আরবী লিপি প্রবর্তনের প্রশ্নেও এই দ্বিমুখী প্রতিবাদ উঠেছে। ভাষা-বিজ্ঞানীদের অভিমত হলো, এটা বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত নয়, আবার রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ একটু যাঁরা অনুধাবন করতে পারেন, তাঁরা সরকারী ষড়যন্ত্রের রূপরেখাটা স্পষ্ট দেখতে পেলেন। পাকিস্তানী কর্তারা-যে দু' উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দু-মুখো উপায়ে গোটা শিক্ষা-পদ্ধতির উপর হামলা করেছে, গোড়া থেকে ক্ষীণ-অস্ফুট হলেও তার বিরুদ্ধে দু' মুখো প্রতিবাদ ফুঁড়ে উঠেছে। প্রতিটি ক্রিয়ারই সমান প্রতিক্রিয়া রয়েছে, এটা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের স্বীকৃতি। শিক্ষা এবং সংস্কৃতির উপর হামলার দু'টি পদ্ধতি যখন একটি কেন্দ্রবিন্দুতে মিশেছে, তখনই তাবত ধর্মগত, সংস্কারগত কুয়াশার

অন্তরাল থেকে বাংলাদেশকে উপনিবেশ করে রাখার গূঢ় ইচ্ছেটি শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষানীতিতে ও নানা সিদ্ধান্তে নগ্ন ভাবে প্রকটিত হয়েছে। প্রতিবাদের দু'টি ধারাও ভিন্নতর আরেকটি কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হয়ে বাংলাদেশকে উপনিবেশবাদ ঠেকাবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। তার প্রথম বাস্তব সরব প্রকাশ ঘটে উনিশ শো বাহান্ন সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে। কেউ কেউ ভাষা আন্দোলনকে বাঙালীর সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের আন্দোলন মাত্র বলে থাকেন। আমরা মনে করি সে বিচার যথার্থ নয়। ভাষা আন্দোলনে সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের দাবীটা প্রত্যক্ষ, কিন্তু তলায় কুঁড়ির মধ্যে ফুলের মতো রাজনৈতিক স্বাধিকারের দাবীও ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশে একটি একটি করে পাপড়ি মেলছিলো। প্রথম দিকে শিক্ষকেরাই এই আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন, পরে ছাত্রদের মধ্যে, তারপরে রাজনৈতিকদের মধ্যে, তারও পরে গোটা দেশের মধ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তান সরকার গোড়া থেকে সন্দেহ করে যে-শিক্ষকদের তাড়িয়ে দিয়েছিলে, চাকুরী খেয়েছিলো, কারারুদ্ধ করেছিলো ; সে শিক্ষকেরাই প্রথমবারের মতো পাকিস্তানী শিক্ষানীতির গোড়া ঘেঁষে কুঠারাঘাত করলেন। শিক্ষকদের এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতির বিকাশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হবার যোগ্য।

॥ ৫ ॥

সেনাপতি আয়ুব খানের পাকিস্তানের সিংহাসনে আসীন হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের শিক্ষাপদ্ধতিতে এক ধরনের স্বৈরাচারী নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। তিনি হামুদুর রহমান নামে একজন কুখ্যাত ব্যক্তিকে সভাপতি করে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার সাধনের জন্য কমিশন বসালেন। কমিশনের রিপোর্টে যে-সকল বিষয়ের সুপারিশ করা হয়েছিলো, তাতে জনগণের জীবনের বাস্তব দাবীর চাইতে স্বৈরাচারী একনায়কের আকাঙ্ক্ষাই অধিক বিম্বিত হয়েছে। হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী শিক্ষাকে অনাবশ্যক জটিল এবং সর্ব সাধারণের জন্য অপ্রোয়জনীয় করে তোলার তোড়জোড় চলতে লাগলো। বেশী লোক যাতে শিক্ষিত হয়ে উঠতে না পারে সে ব্যবস্থাও অবলম্বন করা হলো। সামরিক সরকারের শাসনযন্ত্র চালাবার আমলা এবং কেরাণী সৃষ্টি

করা ছাড়া শিক্ষার অন্য কোনোও ভূমিকা নেই, তা-ই হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের মূল বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার ব্যয় এতো বাড়ানো হলো যে, গরীবের ছেলের উচ্চশিক্ষা লাভ করার কোনো পথই খোলা রইলো না। গোটা বাংলাদেশের ছাত্র সমাজের প্রবল আন্দোলনের মুখে একনায়ক আয়ুব হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাতিল করতে বাধ্য হলেন।

আয়ুব খানের দশ বছরের শাসনে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কৃতির উপর যে-হামলা হয়েছে, শিক্ষকদের উপর যে-নির্যাতন চালানো হয়েছে, নৃশংসতায় আর হৃদয়হীনতায় পূর্বে তেমনটি আর ঘটে নি। সামরিক প্রধান শিক্ষা সম্প্রসারণের চাইতে সঙ্কোচনের নীতিতে অধিক বিশ্বাসী ছিলেন। জনগণের মধ্যে শিক্ষার আলোক ছড়িয়ে দেয়ার পরিবর্তে এখানে সেখানে কয়েকটি সুদৃশ্য ইমারত তৈরী করে, তাতে প্রবেশের অধিকার বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট করে দিলেন। গোটা রাষ্ট্রীয় জীবনপ্রবাহের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাকেও একনায়কতন্ত্রমুখী করে তুললেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সামরিক শাসনের পকেট করে তোলা হলো। শিক্ষকের বাক্যের, চিন্তার এবং কর্মের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনা কমিটির প্রধান করা হলো একজন সরকারী আমলাকে। তাঁদের মধ্যে ছিল না কোন ঔদার্য, ন্যায়বোধ ও নীতিনিষ্ঠা। সামরিক সরকারের নির্দেশে দাস-মনোভাবাপন্ন নাগরিক গড়াই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স জারী করে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হলো। আইন করে দেওয়া হলো শিক্ষকেরা কোনো রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। এই আড়ষ্ট হাসফাঁস করা পরিবেশে স্বাধীন চিন্তার উদ্গমের কোনো পথ আর খোলা রইলো না। কোনো শিক্ষকের লেখায় কিংবা কথায় দেশপ্রেম, মানবপ্রেম এবং স্বাধীন চিন্তার সামান্যতম অঙ্কুর দেখলেই তাঁকে চাকুরী ছাড়তে হতো অথবা লাঞ্ছনা সহ্য করতে হতো। লেখার জন্যই খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক অধ্যাপক আলাউদ্দীন-আল-আজাদকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছিলো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যক্ষ বদরুদ্দীন উমর বাঙালীর সংস্কৃতির উপর কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁকে নাকি প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো হয়তো তিনি গ্রন্থগুলো প্রত্যাহার করবেন অথবা চাকুরী ছাড়তে বাধ্য হবেন। উমর সাহেবকে চাকুরী ছেড়েই আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে হয়েছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক

খ্যাতিসম্পন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক আবদুর রাজ্জাক সামরিক সরকারের দাপটে টিকতে না পেরে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর একজন কৃতী শিক্ষক অর্থনীতি বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ আবু মোহাম্মদকেও বিদেশে চলে যেতে হয়েছিলো। এঁরা খ্যাতিমান, এঁদের কথা মানুষ জানতে পেরেছে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি স্তরে শিক্ষকেরা যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন, চাকুরী হারিয়েছেন, তার দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়ে লাভ নেই। সামরিক সরকার একটা নিয়মিত গুণ্ডা বাহিনী পুষতো সরকারী ব্যয়ে। এই গুণ্ডারা তাদের ভালো ক্লাশ দিতে শিক্ষকদের বাধ্য করতো, পরীক্ষার হলে বই খুলে উত্তর লেখার সুযোগ আদায় করতো। যে সমস্ত শিক্ষক সরকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতেন, দল বেঁধে চড়াও হয়ে সে সকল শিক্ষকের উপর শারীরিক হামলা করতেও তারা কসুর করতো না। শুধু শিক্ষা নয়, সংস্কৃতির আরো নানা ক্ষেত্রে নতুন ভাবধারা প্রবেশের পথ শক্ত হাতে বন্ধ করে দেয়া হলো।

লেখকদের সঙ্ঘ ইত্যাদি করে প্রতিশ্রুতিশীল শক্তিমান লেখকদের মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের কারখানা খোলা হলো। বস্তুতঃ আয়ুব শাসনের আমলে বিশ্ববিদ্যালয়-গুলো ও কলেজগুলো সামরিক সরকারের আমলা এবং কেরানী তৈরীর ফ্যাক্টরিতে রূপান্তরিত করা হলো। বিশ্ববিদ্যালয় যে-একটা ক্ষুদে ব্রহ্মাণ্ড, সেই ব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ বিষয়ে চিন্তা করার, অধ্যয়ন করার, মতামত ব্যক্ত করার এবং গবেষণা করার অধিকার শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলো। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সামরিক সরকারের মোহাফেজখানায় রূপান্তরিত করা হলো। আয়ুব খান আরব্যোপন্যাসের সে দৈত্যের মতো রাজনৈতিক আকাশে উদিত হয়ে বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা কল্পনা নিজের খেয়ালখুশীমত পরিচালনা করতে লাগলেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মূল্যহীন হয়ে গেলো, ঐতিহাসিক সত্য মর্যাদা-ভ্রষ্ট হলো, সাহিত্যের উদারতা অর্থহীন ধ্বনিতে পর্যবসিত হলো, রেডিও, টেলিভিশন এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো দিনে দিনে সামরিক শাসন দীর্ঘায়িত করার প্রচারযন্ত্রের ভূমিকা নিলো। সেই সময় বাংলাদেশের বিবেকবান মানুষের মনে হওয়া বিচিত্র নয়, দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস সব মিথ্যে সত্য শুধু স্বৈরাচারী নায়ক আয়ুব খান। এই সময়ে একদিন আয়ুব খানের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন

নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এটাও রাজনৈতিক অভিসন্ধি-প্রসূত সংস্কৃতির উপর অন্যান্য বারের মতো একটি হামলা। শিক্ষক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী এবং ছাত্রসমাজ প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন। সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনীতি এসে যুক্ত হলো। সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে বাধ্য হলো সরকার। আয়ুব খানের আমলেই শিক্ষা-পদ্ধতির সবচেয়ে বেশী বিকৃতি সাধন করা হয়েছে। তথাপি এই সময়েই জাতীয়তামুখী একটা শিক্ষার ধারা জাতীয়তার প্রয়োজনেই ভেতর থেকে গড়ে উঠে, যা পাকিস্তানী শিক্ষানীতির পুরোপুরি বিরোধী। কোন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে তার কোনো হদিশ পাওয়া যাবে না। জাতীয় প্রয়োজনের স্বীকৃতি এবং জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বিকাশের উদগ্র তৃষ্ণাই এই নতুন অলিখিত শিক্ষাপদ্ধতির প্রসূতি। যে-সকল শিক্ষক এই শিক্ষাধারার বিকাশে শ্রম এবং সাধনা নিয়োগ করেছিলেন, কেউ তাঁদের মাইনে দেন নি, কেউ তাঁদের পুরস্কৃত করেন নি। অপমান এবং লাঞ্ছনাই তাঁদের ভাগ্যে জুটেছে বেশী। আয়ুব খানের আমলেই শিক্ষক এবং সংস্কৃতিসেবীরা নানা নিরিখ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে সিরিয়াস গ্রন্থ রচনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, সাহসের এবং ত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তার ফলশ্রুতির কথা সকলে জানেন। আয়ুব খানকে সিংহাসন ছাড়তে হয়েছে, ইয়াহিয়া খানকেও যেতে হবে। আজকের স্বাধীনতা আন্দোলনে জনগণের মনের যে বারুদের ঘরে আগুন লেগেছে, তার জোগানদার শিক্ষকেরাও ছিলেন।

॥ ৬ ॥

শিক্ষকের পরে শিক্ষার প্রধান উপকরণ বই। বই মানে চিন্তার সুশৃঙ্খল বিন্যাস, অনুসন্ধিৎসু মনের সূর্যজ্বালা প্রশ্নমালা, সামাজিক সমস্যার সমাধানের জবাব এবং বস্তুর রহস্য-ভেদের নির্মল প্রতিবেদন। পাকিস্তান সরকার শিক্ষা-সংস্কারের নামে বইয়ের পঠন-পাঠনের উপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করলো। যে-সমস্ত বইয়ের সঙ্গে সরকারী মনোভাবের মিল হলো না, অথবা যে-সমস্ত বই পড়লে কুসংস্কার কেটে গিয়ে যুক্তিবাদিতার উন্মেষ ঘটে সাহিত্যে, দর্শনে, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে, ইতিহাসে সে সমস্ত বইয়ের পঠন-পাঠন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। বাংলাদেশের মানুষের মন যাতে চিরদিনের জন্য অবিকশিত থাকে, তার স্বভাবের

কূপমণ্ডুকবৃত্তি অটুট থাকে, তার জন্য একটা ধর্মীয় মোহের আবেষ্টনী সৃষ্টি করা হলো, যার চারধারে শক্ত করে বসানো হলো আইনের পাহারা। বিদেশ থেকে ভালো বই আমদানি করা একেবারে বন্ধ করে দিলো অথচ ক্ষয়িষ্ণু ইউরোপীয় সমাজের রঙীন বেলেল্লাপনায় ভরপুর, এমন সব বইয়ের আমদানি করে বাজার ভরিয়ে তুললো। উদ্দেশ্য, ছাত্রদের তরুণদের বাস্তবতা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার বদলে, উন্মার্গগামী করে তোলা।

যে-সব বই মানুষের মনের প্রশ্নশীলতা বৃত্তিকে শাণিত করে তোলে, জগত এবং জীবনকে নতুন দৃষ্টিতে দেখার প্রেরণা দেয় সে ধরনের বই বাজার থেকে একদম নির্বাসিত করা হলো। উদাহরণস্বরূপ ওলিয়ারীর ইসলামী দর্শনের উপরে লেখা বইয়ের নাম করা যেতে পারে। যেহেতু তাতে অন্ধভক্তির স্থলে যুক্তিশীলতাকে স্থান দেওয়া হয়েছে, সেজন্য তাঁর বই বিতরণ এবং বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো সরকার। একই কথা এইচ. জি. ওয়েলসের 'বিশ্ব ইতিহাসের রূপরেখা' গ্রন্থটি সম্বন্ধেও বলা যায়। বইটির প্রবেশও বন্ধ করে দিলো সরকার। ওয়েলসের সঙ্গে অনেকের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য হতে পারে, কিন্তু সংক্ষেপে পৃথিবীর অমন সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ইতিহাস আর কেউ লেখেন নি বললেই চলে। সরকার বইয়ের প্রবেশ বন্ধ করে আইডিয়ার সংক্রমণ রোধ করতে চেয়েছিলো। ইংরেজী বইয়ের ক্ষেত্রে যেটুকু শিথিলতা সরকারের দেখা গিয়েছে, বাংলা বইয়ের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে তা পুষিয়ে নিয়েছে।

ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির তো কথাই উঠে না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার বই প্রকাশের কেন্দ্র ছিলো কোলকাতা। তখনো ঢাকা শহরে স্কুল এবং কলেজ পাঠ্য বই ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ প্রকাশের অনুকূল ক্ষেত্র গড়ে উঠে নি। ব্যবসায়ীরা কোলকাতার বই আমদানি করেই শিক্ষক-শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করতো। মাতৃভাষার মাধ্যমে যাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা করতে চাইতেন, কোলকাতার বই ছাড়া তাঁদের অন্য কোনো উপায় ছিল না। কোলকাতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার বই-যে অন্যান্য আধুনিক ভাষার তুলনায় প্রচুর প্রকাশিত হয়েছে, তাও সত্য নয়। তবু একটা প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির জন্য কোলকাতায় প্রকাশিত বই অপরিহার্য। উনিশ শো পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধের দোহাই দিয়ে কোলকাতার বই আমদানী একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হলো। তার ফল দাঁড়ালো এই যে, বইয়ের অভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনা

একরকম অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। সেই সুযোগে একনায়কের সমর্থক অধ্যাপক বুদ্ধিজীবীরা মোটা মোটা কেতাব লিখে স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করে নিলো। ছাত্রদের বাধ্যতামূলকভাবে পড়তে হতো সে বই। অথচ সে সব বইয়ের অধিকাংশই মিথ্যে তথ্য ও তত্ত্ব দিয়ে ঠাসা—শিক্ষার্থীর মনের জ্ঞানার্জনী বৃত্তিকে জাগরিত করে তোলার কোনো প্রেরণা-যে ওসব বই দিতে পারে না, সে কথা বলাই বাহুল্য। কোলকাতার বই বাজারে থাকলে লাভ হতো এই যে, শিক্ষার্থীরা দু' দেশের বই যাচাই করে নিতে পারতেন। যেটা ভালো সেটাকেই গ্রহণ করতেন। আর লেখকেরাও কোলকাতার বইয়ের অসম্পূর্ণতা নিজেদের বইয়ে পূর্ণ করার সুযোগ পেতেন। বাস্তবক্ষেত্রে তা হলো না। শিক্ষানীতির অন্যান্য দিকে যেমন, তেমনি গ্রন্থের ক্ষেত্রেও কূপমণ্ডূকতা বৃত্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হলো। ফল কিন্তু যা ফলবার ঠিকই ফলেছে। যে-ভয়ে সরকার পশ্চিম বাংলার বই আমদানি বন্ধ করেছিলো, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী থেকে প্রকাশিত বইতে সরকারের পক্ষে ভীতিজনক ভাবধারাগুলো বিকশিত হতে থাকে। সাম্প্রদায়িক আবেগে, সাম্প্রদায়িক স্বার্থে এবং শ্রেণীগত প্ররোচনায় লিখিত বইগুলো, উদার মানবিক আদর্শে লিখিত বইকে স্থান ছেড়ে দিয়ে আলমারীর তলায় সরে যেতে বাধ্য হলো। জ্ঞান, যুক্তি এবং বাংলাদেশ ও বাংলাভাষী অধিকাংশ মানুষের দিকে দৃষ্টি দিয়ে লিখিত বই অল্প সময়ের মধ্যেই চিত্ত জয় করে নিতে সক্ষম হলো। পাকিস্তান সরকারের ইসলামী শিক্ষানীতি প্রয়োগ বিষয়ে সব জায়গায় যেমন ব্যর্থ হয়েছে, বইয়ের জগতেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

॥ ৭ ॥

বাংলাদেশের অন্যান্য ব্যাপারের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও পাকিস্তান সরকার পুরোপুরি উপনিবেশবাদী নীতি বিগত তেইশ বছর ধরে চালিয়ে এসেছে। রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি বিষয়ের মতো শিক্ষাখাতেও বরাদ্দ অর্থের মধ্যে সব সময় আকাশ-পাতাল প্রভেদ রেখেছে। পাকিস্তানের জন্মকাল থেকে প্রতিটি বছরে, পূর্বাঞ্চলের ব্যয়ের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের অর্থব্যয়ের বার্ষিক পরিমাণ যাচিয়ে দেখলে, বাংলাদেশকে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে রাখার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের

কর্তারা যে-ষড়যন্ত্র করেছে তার প্রকৃতিটি কি ধরনের জানা যায়। দেশবিভাগের সময়ে বাংলাদেশে স্কুল, কলেজের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশী ছিলো। বাংলার সাধারণ মানুষ লেখাপড়ায় কৃষ্টি সংস্কৃতিতে অনেক বেশী অগ্রসর ছিলো। অথচ পাকিস্তান-সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের শিক্ষায়তনের সংখ্যা বাংলাদেশকে ছাড়িয়ে গেলো। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী, ডাক্তারী প্রভৃতি বিদ্যা এবং বৃত্তির সকল স্তরে পশ্চিমারা বাঙালীদের তুলনায় অনেকদূর এগিয়ে গেলো। বাংলার মানুষের বিদ্যা এবং বৃত্তি শিক্ষা করার আগ্রহ হঠাৎ করে হ্রাস পেয়েছিলো একথা একটুও সত্য নয়। তাদের বিদ্যাশিক্ষা করার কোনও সুযোগই দেওয়া হতো না। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের টাকাপয়সা অর্থসম্পদ লুঠ করে পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার পথ সুগম করে। দেশভাগের পর মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিমারা সাক্ষরতা এবং লেখাপড়ার ক্ষেত্রে-যে অনেকদূর এগিয়ে যেতে পেরেছে, তার কারণ বাংলাদেশের মানুষকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং তাদের প্রাপ্য নায্য দাবীর পরিমাণ অর্থ তাদের পেছনে ব্যয় না করে পশ্চিমাদের পেছনেই ব্যয় করা হয়েছে। যে-কারণে পশ্চিমা পুঁজিপতিরা হঠাৎ ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠেছে, পশ্চিম পাকিস্তানে সুন্দর সুন্দর জনপদ গড়ে উঠেছে এবং নগরগুলোর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হয়েছে, সেই কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক বেশী স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। কারণটি, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে চিরদিনের জন্য ঔপনিবেশিক দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা। উপরে এক রাষ্ট্র এবং স্বাধীনতার নিশান উড়িয়ে, মুসলমান এবং ইসলামের ধুয়া গেয়ে, তলায় তলায় যে হৃদয়হীন শোষণ হয়ে এসেছে তা যদি নগ্ন উপনিবেশবাদ না হয়, তা'হলে উপনিবেশবাদের একটি নতুন সংজ্ঞা আবিষ্কার করতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে-পর্বতপরিমাণ বৈষম্য রয়েছে তা কতকগুলো পরিসংখ্যানের সংখ্যা উল্লেখ করে দেখানো যেতে পারে। ১৯৪৭-৪৮ সালে বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিলো সর্বমোট ২৬৫০০টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১১০০০টি। সে সংখ্যা ১৯৬০-৬১ সালে এসে দাঁড়ালো বাংলাদেশে ২৯০০০টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২৯৫০০টিতে। এই একটি নমুনাই প্রমাণ করে পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার কতো দ্রুত প্রসার হয়েছে এবং হয়েছে বাংলাদেশের সম্পদ

লুঠ করে এবং বাংলাদেশের মানুষকে বঞ্চিত করে। ১৯৪৭-৪৮ সালে বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিলো ৩৪৮১ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২৫৯৮টি। সে সংখ্যা ১৯৬০-৬১ সালে এসে দাঁড়ালো বাংলাদেশে ৩১৪০টিতে। পূর্বের তুলনায় সংখ্যাল্পতা প্রমাণ করে অনেকগুলো মাধ্যমিক বিদ্যালয় উঠিয়ে দিয়েছে। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে একলাফে এই বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়ে গেছে ২৯৭০। একই পরিসংখ্যার বিবরণী ১৯৭০-৭১ সালে নিলে দেখা যাবে বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩৯৬৪ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৪৪৭২। বাংলাদেশের কি প্রাথমিক কি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর আর্থিক অসচ্ছলতার কথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের বিদ্যালয়গুলোকে অভাবের সম্মুখীন হতে হয় নি বললেই চলে। এই বৈষম্য শুধু প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক স্তরে সীমাবদ্ধ নয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে কারিগরী প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরে প্রসারিত। ১৯৬০-৬১ সালে বাংলাদেশে কলেজের সংখ্যা ছিল ৯২ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১৬৫, কলেজের সংখ্যা ১৯৭০-৭১ সালে গিয়ে দাঁড়ালো বাংলাদেশে ২২৫ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ২৭৫; অথচ জনসংখ্যার পরিমাণের নিরিখে বিচার করলে বাংলাদেশেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা; কিন্তু কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৮ সালের পরিসংখান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বাংলাদেশের সরকার-পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ৬৫৩। তাছাড়া কলেজের মধ্যে বাংলাদেশে সরকার-পরিচালিতের সংখ্যা ছিলো ৩১ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ১১৪, পাকিস্তান সৃষ্টির সময়ে অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ সালে বাংলাদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিলো এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলো দুই। ১৯৬০-৬১ সালে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যা দুই-এ উন্নীত হলো এবং পশ্চিম পাকিস্তানে চার। ১৯৭০-৭১ সালে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় দাঁড়ালো পাঁচটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সাতটি। শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানীরা বাংলাদেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিলো তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাইশ বছর সময়ের মধ্যে তারা বাংলাদেশকে ডিঙিয়ে গেলো। সরকার জোর প্রয়োগ করে বাংলাদেশের শিক্ষাকে পেছন দিক থেকে টেনে রেখেছে। বাঙালীদের চিরদিনের জন্য দাবিয়ে রাখার মতলবে যদি বাংলাদেশের উপর এই বিমাতৃসুলভ আচরণ না করে থাকে, তাহলে কি বলতে হবে ইসলাম এবং মুসলমানদের প্রতি নেহায়েত মমতা-

বশতই এই কাজ করেছে? বাংলাদেশে শাসকগোষ্ঠীর অনুগৃহীত মোল্লা এবং ইসলাম দরদীরা যখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবীতে মিটিং মিছিল করছে, সেই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের মাদ্রাসাগুলোতেও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশে যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় এবং কমিশন গঠিত হয়েছে আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য, পশ্চিম পাকিস্তানে তখন খোলা হয়েছে একের পর এক ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। শোষকদের শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামপ্রীতির গূঢ় অর্থ এ কাজের মধ্যেই ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোতে এখনো সম্রাট আকবর কিংবা ঔরংজীবের আমলের পাঠ্যসূচী বহাল তবিয়তে রয়েছে। আধুনিক জীবনবোধ বাঁচার দাবী, মূল্য চেতনা আজকের দিনেও মাদ্রাসাসমূহে প্রবেশাধিকার পায় নি। পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে বেরিয়েছে ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার এবং কারিগর এবং বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহ প্রতিবছর হামবড়া মোল্লা প্রসব করেছে। মাদ্রাসাগুলোকে সরকার ইচ্ছে করেই প্রতিক্রিয়ার শক্তিশালী দুর্গ হিসেবে অটুট রেখেছে। বিজ্ঞান চেতনা থেকে বংলাদেশের মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য সরকার অতীতের কুহক-ভর্তি মাদ্রাসাগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করেছে ধর্মীয় শিক্ষার নামে। বৈজ্ঞানিক গবেষণা খাতে দু-অঞ্চলের অর্থ বরাদ্দের মধ্যে যে-তারতম্য পরিসংখ্যানের সে অংশটির উপর একবার মাত্র চোখ বুলিয়ে গেলে আনাড়ির চোখেও ধরা না পড়ার কথা নয়। সেজন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা খাতে নানা আর্থিক বছরে কোন অংশে কতো টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার খতিয়ানটা তুলে দিলাম।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা খাতে ব্যয়

সাল	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৫৪	৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ টাকা
১৯৫৫	১৩ ,, ,,	৪৭ ,, ,,
১৯৫৬	৫ ,, ,,	১০ ,, ,,
১৯৫৭	১৭ ,, ,,	৮৩ ,, ,,
১৯৫৮	২৬ ,, ,,	৯০ ,, ,,
১৯৫৯	১৮ ,, ,,	১০৮ ,, ,,

বৈজ্ঞানিক গবেষণা খাতে ব্যয়

সাল	বাংলাদেশ	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৬০	১৮ লক্ষ টাকা	৯৭ লক্ষ টাকা
১৯৬১	১৫ „ „	৮৫ „ „
১৯৬২	৩২ „ „	৯৯ „ „
১৯৬৩	৪২ „ „	১১৪ „ „

শিক্ষা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের মোট শতকরা ২০ ভাগ মাত্র বাংলাদেশে ব্যয় করা হয়েছে এবং বাকী শতকরা ৮০ ভাগ পশ্চিম পাকিস্তানীদের ভাগেই পড়েছে। একটি দেশের দু'অংশ যদি সমান তালে এগিয়ে যেতো তাহলে বলার কিছুই ছিলো না, কিন্তু এক অংশের শ্রমে, সম্পদে, কাঁচা মালে, বাজারে, অন্য অংশের পুষ্টি সমৃদ্ধি। এক অংশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণার মধ্যে সীমিত রেখে অপর অংশকে দ্রুত হারে আধুনিক শিক্ষার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ঘৃণ্য পদ্ধতিটিকেই পাকিস্তানী কর্তারা ইসলামী শিক্ষানীতি নামে অভিহিত করেছে। ধর্মাভিত্তিক সামন্তযুগীয় মূল্যবোধের অন্ধকার অচলায়তনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রূপান্তরিত করার ষড়যন্ত্র পাকিস্তান গোড়া থেকেই করে এসেছে। তবে সচেতন ভাবে কোনো শিক্ষাবিদ পাকিস্তানী নীতির সমালোচনা করলে তাঁর মাথার উপর সরকারী আইনের ঝলসানো খড়্গ উদ্যত হয়ে উঠেছে। অর্থনৈতিক বরাদ্দ কমিয়ে এবং শিক্ষাদর্শগত দাসত্বের প্রচার করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে শুধু সরকারী আমলা কিংবা কেরাণী অথবা নিষ্কর্মা বেকারবাহিনী সৃষ্টি করার সুদূর প্রসারী পরিকল্পনাই পাকিস্তানী শিক্ষানীতির নামান্তর।

সম্ভাব্য সকল পদ্ধতিতে পাকিস্তান সরকার বাঙালী জনসাধারণকে আধুনিক শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত করতে চেয়েছে। তার সাংস্কৃতিক মৃত্যু ঘটাতে চেষ্টা করেছে, তার ঐতিহ্য পায়ে দলতে চেষ্টা করেছে, চেষ্টা করেছে ইতিহাস-বোধ এবং বিজ্ঞান-চিন্তা ভুলিয়ে দেওয়ার। বাঙালী মস্তিষ্কসম্পন্ন জীবজাত। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার কারণে সে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করেছে। এই শিক্ষা পাকিস্তানী নীতির প্রতিবাদ করতে যেয়ে তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে। পাকিস্তানী কর্তারা চেষ্টার ত্রুটি করে নি, আয়োজন এবং সামর্থ্যের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও বাঙালী নৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং বিজ্ঞান ভাবনার দিক দিয়ে পশ্চিম

পাকিস্তানীর চাইতে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। ভীতি যা মানসিক বৃত্তিগুলোকে কুঁকড়ে রাখে, স্ফুরিত হতে দেয় নি, তেইশ বছরে সে সম্পূর্ণ ভাবে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। ভীতি-মুক্ত হতে পেরেছে বলেই যুদ্ধ ঘোষণা করে জাতীয় অস্তিত্বকে মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। এই ভীতি-মুক্তি প্রকৃত শিক্ষার আলোক না হলে ঘটে না। বাঙালী তা কাটিয়ে উঠেছে এবং শীঘ্রই স্বাধীন শোষণ-মুক্ত একটি সমাজ, একটি নতুন রাষ্ট্র সে প্রতিষ্ঠা করতে চলেছে। আধুনিক যুগোপযোগী দেশের বৃহত্তম কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে একটা শিক্ষানীতিও বাংলাদেশের মানুষ রচনা করবে এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত থাকা উচিত নয়।

সংস্কৃতির বিকাশধারা

।সাদ চৌধুরী

॥ ১ ॥

যে-প্রবল প্রাণশক্তি সৃজনশীলতার সকল দুয়ার খুলে দেয়, জীবন-যাপনের ব্যর্থ আবর্জনা সরিয়ে সুন্দরের কল্যাণের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, অশিক্ষা এবং দেউলে রাজনীতিকে অতিক্রমণ করার প্রেরণা যোগায়, আমাদের বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তানের) মানুষদের দুর্ভাগ্য, সে-প্রবল প্রাণশক্তি তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল, কখনো মূর্চ্ছাতুর ছিল, কখনো সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে বিকার-গ্রস্ত ছিল। সুন্দরভাবে বাঁচার প্রশ্নই ওঠে না, মামুলী ভাবে বাঁচাটাই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ছিল। স্বাধীনতা, মানুষের সকল রকম বন্ধন থেকে মুক্তির প্রতিশ্রুতি —আমাদের কাছে সকল রকম বন্ধনের অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত। ইখতিয়ারুদ্দীন বখতিয়ার থেকে নবাব সিরাজউদ্দোলাহ্ যে-ভাষায় আঘাত দিতে চেষ্টা করেন নি, দু শো বছরের ইংরেজ শাসনে যে-ভাষা আক্রান্ত হয় নি—স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পরের বছরই সে-ভাষা প্রবলভাবে আক্রান্ত হ'ল। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে আমরা একদা ইরান তুরানের ফসল গ্রহণেও উদ্যত হয়েছিলাম, কিন্তু স্বাধীন সরকারের সাংস্কৃতিক শোষণের ফলে আমরা গালীবের, মীর তকী মীরের গজলের রসাস্বাদনেও ব্যর্থ হলাম, এমন কি ইকবালের মত কবিও দ্বারে আঘাত করে ফিরে গেলেন; শামুকের মত নিজেদের গুটিয়ে রাখতে হয়েছে আমাদের, চোরের মত ইতিহাস পাঠ করতে হয়েছে, অনেক নক্ষত্রের আলো, আমাদের সন্দেহ ও সংশয়ের জন্যই দেখা হ'ল না। হায়, জীবনানন্দর মত আমি বলতে পারি নি—'দূর পৃথিবীর গন্ধে ভ'রে ওঠে আমার এ বাঙালীর মন'। অথচ, পৃথিবী জানে, আমরা স্বাধীন ছিলাম।

বাংলাদেশের গানে, কবিতায়, শিল্প চর্চার সকল মাধ্যমে অনিবার্যভাবে যা রূপ পেয়েছে, ইঙ্গিতে অথবা স্পষ্ট করে, তা হ'ল এই দ্বন্দ্ব। বাঙালীর আত্ম-সচেতনতার প্রেরণা এল প্রথমে ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র কাছ থেকে।

মৈত্রেয়ী দেবী বলেছেন : It is a remarkable event that a new political consciousness of East Bengal Muslims found its inspiration from art, literature and poetry.[১]

পতাকার পরিবর্তন, মানচিত্রে রঙের পরিবর্তন, সরকার পরিবর্তন প্রথম দিকে সাধারণ নরনারীর মনে নতুন করে বাঁচার উৎসাহ যুগিয়েছিল। সেদিনের শিল্পীদের আবেগকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। কিন্তু সে-আবেগ ও উন্মাদনা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণেই ক্রমশঃ থিতিয়ে এল।

"এ-বিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, ১৯৪৭ সালের ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-বিভাগের সময়ে পূর্ব বাংলার সাধারণ মুসলমান নির্দ্বিধায় তাকে স্বাগত জানিয়েছেন, নব-সৃষ্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রকে সানন্দে বরণ করে নিয়েছেন। সে-সময়কার উন্মাদনা প্রকাশ পেয়েছিল, 'এক ধর্ম—ইসলাম, এক রাষ্ট্র পাকিস্তান, এক নেতা—কায়েদে আজম জিন্নাহ্'—এই রণধ্বনিতে। অন্য কোন যুক্তিই সেদিনের পূর্ব বাংলার সাধারণ মুসলমান শুনতে রাজি ছিলেন না।

এ-ঘটনাও আকস্মিক ছিল না। প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ-অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব বাংলার মুসলমানের কাছে পাকিস্তানের উদ্ভবের অর্থ ছিল না—শুধুই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসন থেকে মুক্তি, এর আরও একটি সুস্পষ্ট অর্থ ছিল হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্নতা। তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতায় ছিল—জমিদারদের, মহাজনদের, ব্যাপারী-ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই হিন্দু। উপরন্তু যুক্ত বাংলায় ফজলুল হকের মন্ত্রিত্বে প্রণীত বঙ্গীয় কৃষি-ঋণ আইন সত্যই ঋণগ্রস্ত কৃষকদের বেশ কিছু অংশের উপকারে লেগেছে। এমন কি ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরকেও মুসলিম লীগ নেতৃত্ব হিন্দু ব্যবসায়ীদের কারসাজি হিসেবে বোঝাতে কিছুটা সক্ষম হয়েছিল। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষ তথা কৃষকের চেতনায় ঐশ্লামিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের মানে ছিল, সে এবারে জমি পাবে, ঋণের জাল থেকে মুক্তি পাবে, ছেলেপিলে লেখাপড়া শিখবে, দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়বে—এক কথায় গড়ে উঠতে চলেছে স্বাধীন উন্নতিশীল দেশ।

'এটা ঠিক যে মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশ যুক্ত বাংলায় লীগ মন্ত্রিসভার আমলে সরকারি চাকরিতে প্রচুর পরিমাণে ঢুকতে পেরেছিলেন, কিন্তু তবুও

১. Maitrayi Devi, A Note on the Background of Our Work, Council for Promotion of Communal Harmony, Calcutta. 1971, P. 3-4.

উপরতলার অফিসারদের মধ্যে সংখ্যাধিক্য ছিল হিন্দুদের। উপরন্তু ওকালতি, ডাক্তারি, শিক্ষকতা বা অধ্যাপনার ক্ষেত্রেও মুসলমানরা নিতান্তই সংখ্যালঘু। এমনকি সাহিত্য-সৃষ্টি ও সংস্কৃতির অন্যান্য ক্ষেত্রেও হিন্দুদের প্রাধান্য। সুতরাং শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানের পক্ষে ভাবা সহজ ছিল—আমরা পিছিয়ে আছি হিন্দুরা বৃটিশের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে আমাদের চেপে রেখেছে বলে, আমরা পিছিয়ে আছি, আমরা স্বতন্ত্র বলে।" [২]

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে রাষ্ট্রভাষার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে জিন্নাহ্‌র সদম্ভ মন্তব্যের[৩] প্রতিবাদ দিয়েই বাঙালী মুসলমানের 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের শুরু'। সেদিন বিক্ষোভ মিছিল হয়েছিল, কিছু-সংখ্যক ছাত্র গ্রেপ্তারও হয়েছিল।

ঐ একই বছরের শেষ দিনটিতে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালী। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা-প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালীত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা তিলক টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে তা ঢাকবার জো-টি নেই।" [৪]

বাঙালীদের সম্পর্কে আইউব খানের ধারণা ছিল অন্যরকম। তাঁর মতে, "The people of Pakistan consist of a variety of race, each with its own historical background and culture. East Bengalee, who constitute the bulk of the population, probably belong to the very original Indian races. It would be no exaggeration to say that up to the creation of Pakistan, they had not known any real freedom or sovereignty. They have been in turn ruled either by the caste Hindus, Moghuls, Pathans or the British. In addition they had been and still are under considerable Hindu culture and linguistic influence. As such

---

২ শ্যামল চক্রবর্তী, জাতিতত্ত্বের বিচারে বাংলাদেশের সংগ্রাম, পরিচয়, বর্ষ ৩৯। সংখ্যা ১১-১২, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৭৮, কলিকাতা ৮৮৯-৮৯০ পৃঃ।

৩ 'Urdu, and Urdu alone must be the state language of Pakistan.'

৪ নিখিল কুমার নন্দী রচিত সংগ্রামী বাংলাদেশ: গৌরবোজ্জ্বল প্রেক্ষিত-পরিপ্রেক্ষিত প্রবন্ধে উদ্ধৃত। অমৃত, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৭, কলিকাতা পৃঃ ৩৪৯।

they have all the inhibitions of down-trodden races and have not found it possible to adjust psychologically to the requirements of the newborn freedom. Their popular complexes, exclusiveness, suspicions and a sort of defensive aggressiveness probably emerge from their historical background".[৫]

কেন্দ্রীয় সরকারের বাঙালী-সম্পর্কে ধারণা আইউবের মতই (কিছুদিন পূর্বে, বছর পাঁচেক হবে, একটি উর্দু অভিধানে বাঙালী শব্দের অর্থ করা হয়েছিল, ভূত) ছিল। এমন কি, বেশ কিছু-সংখ্যক বাঙালী মুসলমান বাঙালী সংস্কৃতিকে ঘৃণা করতেন, জনাব বদরুদ্দীন ওমরের নির্ভীক বিশ্লেষণ—"উনিশ ও বিশ শতকে সমগ্র ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাংলাদেশে, সম্প্রদায়গত বিরোধ যত তিক্ত এবং তীব্র হলো, মুসলমানেরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত মুসলমানেরা ততই সরে আসার চেষ্টা করলো বাংলার সংস্কৃতি থেকে। তাদের কাছে বাংলার সংস্কৃতি মনে হলো বিধর্মী, কাজেই বিজাতীয়। বাংলাদেশের হিন্দুরা যেহেতু নিঃসন্দেহে বাঙালী এবং মুসলমানেরা যেহেতু হিন্দুর থেকে পৃথক কাজেই তারা বাঙালী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারে না। সে পরিচয় দিতে সক্ষম হলে বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান বিরোধ কখনও খুব বেশী তীব্র আকার ধারণ করতো না। হিন্দু-মুসলমান সকলেই নিজেদেরকে সমভাবে বাঙালী মনে করলে ধর্মীয় বিরোধের গুরুত্ব অনেকখানি কমে আসতো। কিন্তু সেটা না হয়ে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানদের বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করলো এবং তার ফলে মুসলমানেরা বাঙালী বলে নিজেদের পরিচয় দিতে শুধু দ্বিধা এবং সঙ্কোচই নয়, অনেক ক্ষেত্রে ঘৃণাও বোধ করলো। কারণ, তাদের মতে বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যে হিন্দু ধর্মের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল, কাজেই বাঙালী সংস্কৃতির দ্বারা তাদের মুসলমানিত্ব খর্ব হওয়ার সম্ভাবনা।"[৬]

তিনি আরও বলেন, "বাঙালী মুসলমানেরা বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এমন কি মাইকেল, রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত নিজেদের তথাকথিত ঐতিহ্য থেকে

৫ মোহাম্মদ আইউব খান, Friends not Master, Karachi 1967, Seminar 142, Delhi, June 1971, পত্রিকায় উদ্ধৃত।

৬ বদরুদ্দীন ওমর, বাঙালী সংস্কৃতির সংকট। মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ-সংগ্রহ : পৃঃ ১৫, কলিকাতা, আগস্ট ১৯৭০

বাদ দেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তাঁদের ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ যে-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক সে সংস্কৃতি শুধুমাত্র হিন্দু সংস্কৃতি, কাজেই মুসলমানদের পক্ষে বর্জনীয়। এ উন্মত্ততার উদাহরণ অন্য কোন দেশের ইতিহাসে পাওয়া মুস্কিল।"[৭]

অথচ এ উন্মত্ততাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই, সরকারী উদ্যোগ আর আয়োজনের ঘাটতি ছিল না। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এবং সরকারী প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে এ উন্মত্ততা লালিত-পালিত হয়েছে; প্রগতিশীল শিল্পীদের নির্যাতন করে, গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করে, এমন কি কারাগারে নিক্ষেপ করেও এই উন্মত্ত কৃত্রিম সংস্কৃতিকে জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করতে পারে নি।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে পঞ্চাশের দশক এই অসুস্থ মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসার প্রচেষ্টাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

"বাংলাদেশ বিভক্ত হওয়ার প্রথম পর্বে এ-সব হিন্দু-বিদ্বেষী মুসলমানদের প্রচারের ফলে তখনকার ঢাকায় অশিক্ষিত মুসলমানরা ১৯৪৮ সালের মুষ্টিমেয় শিক্ষক ও ছাত্রদের ভাষা আন্দোলনকে সুনজরে তো দেখেই নি, উপরন্তু ভাষা আন্দোলনকারীদের ভারতীয় হিন্দুদের দালাল বলে মনে করতে লাগল।... ১৯৪৮ সালের পর থেকে পূর্ব বাংলায় ধীরে ধীরে একটি নতুন মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠতে থাকে। এঁদের মাতৃভাষা বাংলা এবং এঁরাই বাঙালী সংস্কৃতিকে লালন করতে লাগলেন। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র চিন্তাধারা ধীরে ধীরে এই সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করে। ১৯৫২ সালে পুনরায় যে-রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন তা আর মুষ্টিমেয় ছাত্রদের মধ্যেই শুধু গণ্ডীবদ্ধ থাকল না। নবোদ্ভুত প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজ তার শরীক হলেন। যে-বাংলাভাষাকে শিক্ষিত মুসলমানরা একদিন হিন্দুর ভাষা বলে ঘৃণা করতেন, সে ভাষার জন্য মৃত্যুবরণ করলেন ঢাকার নবজাগ্রত যুবকেরা।"[৮]

'৫২-র বন্দী মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটকের দৃপ্ত সংলাপ: মিথ্যে কথা। আমর মরি নি। আমরা মরতে চাই নি। আমরা মরবো না।

৭ বদরুদ্দীন ওমর, বাঙালী সংস্কৃতির সংকট। মৈত্রেয়ী দেবী সম্পাদিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রবন্ধ সংগ্রহ: পৃঃ ১৫, কলিকাতা, আগস্ট ১৯৭০

৮ অমূল্যধন দাসশর্মা, রক্তের অক্ষরে নতুন ইতিহাস, কালি ও কলম, পৃঃ ১২৬০-৬১, বৈশাখ ১৩৭৮, কলিকাতা।

বাংলাদেশ গাইছিল,—

ওরা গুলী ছোঁড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবীকে রোখে
ওদের ঘৃণা পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়
দেশের ভাগ্য করে ওরা বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন বস্ত্র শক্তি নিয়েছে কাড়ি।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী-রচিত একুশের এই গানটি (আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী) বাংলার গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে বারংবার গীত হয়েছে। প্রতিবছরই শ্রোতারা করুণ অভিজ্ঞতায় জেনেছেন 'ওরা এদেশের নয়'।

একুশের আরেকটি জনপ্রিয় গানে বাংলাদেশের ঐতিহ্যের জন্য ব্যাকুলতা ও ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।

মুকুন্দ দাশ পাগলা কানাই
হাসান মদন আর লালন সাঁই
ওরা এদের মুখেও মারে লাথি
এই দুঃখ কি সওয়া যায়।
(ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়)

আবেগ-প্রকম্পিত হৃদয়ের আহ্বান—

দুইশ বছর ঘুমাইলি
আর কেন রে বাঙ্গালি
জাগরে এবার সময় যে আর নাই।
আইজো কি তুই বুঝবি নারে বাংলা বিনে গতি নাই। (আবদুল লতিফ)

সাধারণ নরনারীর হৃদয়কে আবেগস্পন্দিত করার জন্যে নবোদ্ভূত প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সমাজের গীতিকারকে আঞ্চলিক ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে হয়েছে।

গোপাল হালদার 'বাঙলাদেশ' আন্দোলনের প্রাণভিত্তি মনে করেন ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনকে। 'দুই-তৃতীয়াংশ বাঙালীর আত্ম-অভ্যুদয়ের সূচনা'—একুশে ফেব্রুয়ারি। তিনি বলেন, "অনেক দেশেতে জাতীয় আন্দোলনই ভাষা ও সাহিত্য আন্দোলনকে আশ্রয় করে বিকাশ লাভ করেছে দেখা যায়। ভাষা জনসমাজের আত্মীয়তার প্রধান বন্ধন, আত্মীয়তাবোধ জাতিসত্তার প্রাণমূল, আর ভাষা ও সাহিত্যই জাতিসত্তার প্রাণস্বরূপ। পূর্ব বাঙলায়ও তারই

প্রাধান্য দেখলাম। গভীরতর তার তাৎপর্য বাঙালী মাত্রেরই পক্ষে। বাঙলার উনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা আন্দোলন ও সাহিত্য সাধনার মধ্যে ছিল অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক—একই জাতীয় আত্মপ্রকাশের দুই পিঠ—সাহিত্যে জাতির আত্মপরিচয়, স্বাধীনতায় জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা। সেদিনের রিনাইসেন্স দু'এরই অঙ্কুর ছিল। তাইতো উনবিংশ শতাব্দীর সেই জাগরণ খর্বিত জাগরণ হলেও মিথ্যা নয় সে জাগরণ, কিন্তু সে রিনাইসেন্স যে শত হলেও খর্বিত রিনাইসেন্স, তাও বাঙালী ভদ্রলোকের আত্মপ্রকাশ। তারই প্রতিক্রিয়ায় বিংশ শতকের প্রথম পাদে বাঙালী শিক্ষিত মুসলমান চেয়েছিল তার সঙ্কীর্ণ আত্মপ্রকাশের সুযোগ—'বাবু কালচারের' মতই 'মিয়া কালচার'। কিন্তু ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকে অবলম্বন করে পূর্ব বাঙলায় যে 'রিনাইসেন্স' (বা জাগরণ) ঘটল তা কোন মধ্যবিত্ত শিক্ষিতের আন্দোলন নয়, শ্রেণীবিশেষের আত্মস্বার্থের সিদ্ধিলাভ তার উদ্দেশ্য নয়। এ সার্বিক জাগরণ, সর্বাঙ্গীণ, সার্বজনীন।"[৯]

পাশাপাশি একই প্রশ্নে মোহম্মদ আইউব খানের মতামত তুলে ধরতে চাই, "The language problem has to be viewed essentially as an academic and scientific problem. Unfortunately it has become a highly explosive political issue and the result is that no one wishes to talk about it for fear of being misunderstood. The intellectuals who should have been vitally interested in the matter have remained on the touch line lacking the moral courage to face up to the problem. Their attitude has been to leave it to the political leaders to come up with some solution and face the odium, so that they may be able to sit back in comfort and criticize whatever solution is offered."[১০]

বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা অন্ততঃ ভাষার প্রশ্নে সরকারের বিরাগভাজন হয়েছিল,—এবং বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের আইউব খান কী চোখে দেখতেন তার সামান্য আভাসও এই উক্তিতে মেলে। আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীর কথাই সত্য হতে চললো—'ওরা এদেশের নয়'।

৯ গোপাল হালদার' 'বাঙলাদেশ: ভাবী বাঙালীর আবির্ভাব, পরিচয়. বাঙলাদেশ সংখ্যা ১, পৃঃ ৭৩৩-৩৪, কলিকাতা, ১৩৭৭-৭৮।

১০ মোহাম্মদ আইউব খান, Friends not Masters, Seminar-এ উদ্ধৃত, পৃঃ ৩৬।

॥ ২ ॥

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমি পূর্ব বাংলার সাধারণ গণমানসের একটি বিশেষ প্রবণতার ধারাটি তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চায় যাঁরা নিয়োজিত ছিলেন—টাকার এপিঠ ওপিঠের ভূমিকা তাঁরা পালন করেছেন। অর্থাৎ একদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিরা প্রতিরোধের প্রাকার তুলেছিলেন অপর দিকে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রাকার ভাঙার উৎসবে যোগ দেওয়ার মত লোকের অভাবও কোন কালেও হয় নি।

১৯৫৪-র নির্বাচনের পর প্রথমোক্ত শিল্পীরা প্রথম ও শেষবারের মত সামান্য হলেও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। সে-সময়ে কিছু শিল্পী প্রচারের প্রধান মাধ্যম বেতারে[১১] ঢোকার সুযোগ পান। ভারতীয় পত্রপত্রিকা ও পুস্তকাদি পরিবেশিত হয়। রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পায় বাংলা। দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়।

দুই বাংলার মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখে অনেকেই উল্লসিত হন। বহুরূপী সম্প্রদায়ের 'রক্তকরবী' ও 'ছেঁড়া তার' ঢাকায় মঞ্চস্থ হয়—ঢাকার প্রথম ও শেষবার ভালভাবে মঞ্চস্থ নাটক। সুচিত্রা মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, উৎপলা সেন ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায় (এবং আরো অনেকেই—যাঁদের নাম মনে পড়ছে না) ঢাকার আসরের শ্রোতাদের উজ্জ্বল স্মৃতি উপহার দিয়ে এলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কার্জন হলে কবিতা পড়লেন এবং ভাষণ দিলেন। তালাদ মাহমুদের গান শুনলাম, 'রাজধানীর বুকে' ছবিতে।

দেশবিভাগের পর উন্নততর রুচি ও শিল্পবোধের অধিকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাইকারী দেশত্যাগের (১৯৫০) ফলে সাংস্কৃতিক জীবনে যে অচলায়তনের সৃষ্টি হয়েছিল—দুই বাংলার ভাব বিনিময়ের ফলে—এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের স্বীকৃতির সম্ভাবনায় নতুন করে তাতে প্রাণ এল।

ঢাকায় একটি মঞ্চ নেই। নাটক নৃত্যানুষ্ঠানের জন্য যে কলাকুশলী আবশ্যক তা-ও নেই (কারণ, ওভারসিয়ার তখন এঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছেন—হায় রে, সর্বক্ষেত্রেই অক্ষমের প্রবল গর্জন সইতে হয়েছে)। মুসলমান মেয়েরা পর্দা করেন—তারা তখনো মঞ্চে আসেন নি। সুদর্শন সুন্দর যুবকেরাই নায়িকার ভূমিকায়

১১ এ সময়ের কিছু পরে ট্রানজিস্টারের প্রচলন হয়।

নেমেছেন ১৯৫৪ পর্যন্ত। প্রথম স্ত্রী-পুরুষ সম্মিলিত নাটক 'পরিহাস বিজল প্রীতম' ১৯৫৪-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্চে অভিনীত হয়। দ্বিতীয় নাটক রবীন্দ্রনাথের 'শেষ রক্ষা', প্রযোজনা আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, পরিচালনা মুরুল মোমেন ; স্ত্রী ভূমিকায় নেমেছিলেন জহরত আরা (প্রথম চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' [১৯৫৫ কি '৫৬] বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেন) সাবেরা মুস্তাফা, মাসুদা চৌধুরী। ফজলুল হক ছাত্রাবাসের মঞ্চে নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ছাত্রসংসদের উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে। লক্ষণীয় এসব ক্ষেত্রে অগ্রণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীবৃন্দই। বাঁশী, হারমোনিয়াম ও তবলা দিয়েই সঙ্গীত পরিচালককে আবহ সৃষ্টি করতে হয়েছিল। মঞ্চসজ্জা ও পরিকল্পনা-সম্পর্কে কিছু না বলাই ভাল। ঢাকায় প্রথম সাজেসটিভ সেট ('মা', পরিচালনা আবদুল্লাহ আল মামুন, ঢাকা হল ছাত্রসংসদ প্রযোজিত —১৯৬৩) পরিকল্পনা করেছিলেন আহমাদুজ্জামান চৌধুরী, কিন্তু তিনি শিল্পী নন। অপটু হাত, পরিকল্পনার অভাব, এসব তো ছিলই—কিন্তু সবচেয়ে বেশী ছিল বোধ করি—সর্বগ্রাসী অভাববোধকে মোকাবেলা করার দুর্জয় সাহস। ভাল নাটক নেই, সঙ্গীত দুর্বল, মঞ্চ নেই, কলাকুশলী নেই—তবু তো মানুষের সংস্কৃতির 'ভূখ' ছিল—সে কারণেই 'কালিন্দী', 'নীলদর্পণ', 'সিরাজউদ্দৌলাহ', 'সাজাহান' বারংবার অভিনীত হয়েছে। পরবর্তী কালে, কালো দশকে, একাধিক কারণে অনুবাদ নাটকের জোয়ার এলো—ড্রামা সার্কল, সমকাল, বাঙলা একাডেমীর উদ্যোগে অনুবাদ নাটক মঞ্চস্থ হল। মেঘদূত, ছাত্র-শিক্ষক নাট্যগোষ্ঠী, কালের পুতুলগোষ্ঠী নাট্য রচনায় উৎসাহ দিয়েছে। শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের নাট্যরূপায়ণ করেন রামেন্দু মজুমদার। এঁরা সবাই ছিলেন এ্যামেচার শিল্পী। সত্তরের কোঠার পূর্বে প্রফেশনাল নাট্যশিল্পী হবার দুঃসাহস কেউ দেখান নি।

নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন প্রধানত ছাত্রসমাজই। ফুর্তির উপকরণ হিসেবে কলেজের ছাত্রসংসদগুলো নাটক মঞ্চস্থ করতো। বিভিন্ন ক্লাব, বিভিন্ন এমপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন—কখনো বা শৌখীন যুবকেরাই নাট্যানুষ্ঠানে উৎসাহিত হতেন। মুরুল মোমেন, মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, কল্যাণ মিত্র, নীলিমা ইব্রাহিম প্রমুখ নাটক লিখেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই বেশ কিছু মঞ্চসফল নাটক লিখেছেন। মুনীর চৌধুরীর 'কবর', 'দণ্ড ও দণ্ডধর', 'রক্তাক্ত প্রান্তর' মঞ্চসফলতা পেয়েছে। তাঁর নাটক পড়েই বেশী

আনন্দ পেয়েছি—হ'তে পারে সার্থক মঞ্চায়নের অভাবের জন্যেই। পড়ার নাটক লিখেছেন আবদুল মান্নান সৈয়দ—'এসো অসম্ভব এসো', 'জ্যোৎস্না রৌদ্রের চিকিৎসা' (কাব্যনাট্য), 'না শয়তান না ফেরেশতা'। এ সব নাটক বাংলাদেশে মঞ্চস্থ হয় নি।

প্রথম দিকে সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও অবস্থাটা সঙ্কটজনকই ছিল। পশ্চিম বাংলায় ত্রিশ চল্লিশ বছর পূর্বে যে-রীতি পরিত্যক্ত হয়েছে—সেই ধাঁচে রেডিওর গান শুনতে হয়েছিল। গ্রামোফন কোম্পানী পল্লীগীতি ছাড়া কিছু বের করেন না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত করার মতো শিল্পী ঘুরে ফিরে আবাসউদ্দীন, লায়লা আর্জুমান্দ বানু, সোহরাব হোসেন, আবুবকর (মৃঃ ১৯৫৬), শেখ লুৎফর রহমান, শেখ মোহিতুল হক, আফসারী খানম, মাহ্‌বুবা হাসনাৎ (রহমান), কুমু হক, খালেদা ফ্যান্সি খানম, আবদুল আলীম, বেদার উদ্দীন, কলিম শারাফী, ফেরদৌসী বেগম, আব্দুল হালিম চৌধুরী। যন্ত্রশিল্পী ওস্তাদ আয়েত আলী খান (মৃঃ ১৯৬৮), খাদেম হোসেন খান, মতি মিয়া, মীর কাশেম খান, সাখাওয়াৎ হোসেন, সোনা মিয়া, বোরহান উদ্দীন, সমর দাস, হিঙ্গু খান, ফার্নাণ্ডেজ—এঁরা ছাড়াও আরো কয়েকজন ছিলেন।

চলচ্চিত্রের প্রয়োজনে যখন অর্কেস্ট্রা গ্রুপ তৈরী হল, তখন একই শিল্পীকে বিভিন্ন গ্রুপে থাকতে হয়েছে। আলাউদ্দীন লিট্‌ল অর্কেস্ট্রা, ঢাকা লিট্‌ল অর্কেস্ট্রা—এই অভাবপূরণে সহায়তা করেছে; তবুও একটু ভাল কাজের জন্যে সুবল দাস, খান আতাউরকে লাহোরে যেতে হ'ত।

গান যাঁরা লিখতেন, গোলাম মোস্তফা (মৃঃ ১৯৬৫), জসীম উদ্দীন, ফররুখ আহমেদ, সিকান্দার আবু জাফর, খান আতাউর রহমান, আবু হেনা মুস্তফা কামাল, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, আজিজুর রহমান, আব্দুল আহাদ, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবদুল লতিফ, কে. টি. হোসেন (আখতার মৃঃ ১৯৭০), মাহবুব তালুকদার, গাজী মজহারুল আনোয়ারের নাম মনে পড়ছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য অবশ্য মাঝে মধ্যে আল মাহমুদকেও গান লিখতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে টেলিভিশনের গীতিকার মুকুল চৌধুরীর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সম্প্রতি যাঁরা মনোরঞ্জন করতেন তাঁরা হলেন, আবদুল জব্বার, মাহমুদুন্নবী, সৈয়দ আবদুল হাদী,

মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, এম. এ. হামিদ, বশির আহমেদ, নাজমুল হুদা, খোন্দকার ফারুক আহমেদ, আঞ্জুমান আরা, সাবিনা ইয়াসমীন, ফরিদা ইয়াসমীন, শাহনাজ বেগম, মুন্নি বেগম, ইসমত আরা, নীলিমা দাশ, নীনা হামিদ, সুধীন দাশ, সুখেন্দু ভট্টাচার্য, রথীন্দ্রলাল রায়-প্রমুখ।

নজরুল গীতিতে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন ফিরোজা বেগম, বোধ করি '৬৫-র পরই তিনি ঢাকা যান। নজরুলের গানের স্বরলিপি প্রণয়ন প্রভৃতি কর্মেও তাঁকে শ্রমব্যয় করতে হয়েছে। তরুণ শিল্পী খালিদ হোসেন নজরুল গীতিতে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রতি সরকারী মনোভাব যাই থাক, রসগ্রহণে সাধারণের রুচির দৈন্য যতই পীড়াদায়ক হোক না কেন, ষাটের দশকে রবীন্দ্রনাথের গান রাজনৈতিক কারণেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল অবিশ্বাস্য রকমে। মোহাম্মদ রফি এবং লতা মুঙ্গেশকরের আওয়াজে যাঁরা অভ্যস্ত—তাঁদের মুখেও হঠাৎ শোনা গেল, 'যে-রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে'। সংস্কৃতি সংসদ-এর অনুষ্ঠানে (১৯৬০) যে-গানটি প্রথম শ্রুত হল ফাহমিদা খাতুনের কণ্ঠে, যে-গান বাংলার রুদ্ধপ্রাণে ঝড়ো হাওয়ার মাতন লাগালো, সে গান 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' এই আবেগকে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন কয়েক জন বুদ্ধিজীবী, তাঁদের মধ্যে যাঁর নাম প্রথমে মনে পড়ে তিনি, জনাব ওয়াহিদুল হক। ছায়ানট প্রতিষ্ঠিত হ'ল—অনেক বাধা বিঘ্ন এড়িয়ে—সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা দূরে থাকুক প্রচণ্ড আপত্তির মধ্য দিয়ে। কামাল লোহানী ও আহমেদুর রহমান (ইত্তেফাকের ভীমরুল মৃঃ ১৯৬৫, কায়রো বিমান দুর্ঘটনার শিকার), সনজিদা খাতুন এবং আরো অনেকের সহযোগিতায় গড়া প্রতিষ্ঠানটি বাঙালী রুচি তৈরী করতে সহায়ক হয়েছিল। পয়লা বৈশাখ, পঁচিশে বৈশাখ, এগারোই জ্যৈষ্ঠ, বাইশে শ্রাবণ ছাড়াও, বর্ষা, শরৎ, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুর প্রথম দিনে এই প্রতিষ্ঠান নিয়মিত অনুষ্ঠান করে এসেছে। স্কুল গঠন করে শিল্পীর দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে সংস্কৃতিকে। এদের অনুষ্ঠানের মঞ্চ আলোক নিয়ন্ত্রণ নিঃসন্দেহে উন্নত রুচির ছিল। ঢাকায় আর্ট কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কিছু শিল্পী এই দিকে মেধা ব্যয় করেছিলেন—দুর্ভাগ্য, আমি তাঁদের নাম বিস্মৃত হয়েছি। শুধু আবেগই নয়, পরিণত শিল্পাস্বাদনের সুযোগ পেলেন বাঙালী—শ্রোতাদের অধিকাংশই বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং ছাত্রছাত্রী। 'স্থূল জনসাধারণ'-এর প্রতি বোধ

করি এঁদের তেমন উৎসাহী মনোভাব ছিল না—এঁরা তেমন 'বিপ্লবী' ছিলেন না, গোয়ার্তুমী বা জিদ প্রশ্রয় পায় নি এঁদের কাছে। ছায়ানট অনেক-গুলো সুন্দর সকাল ও সন্ধ্যা উপহার দিয়েছে। রবীন্দ্র-বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করার উত্তেজনা না দিলেও প্রেরণা দান করেছে।

যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করতেন আবদুল আহাদ, কলিম শরাফী, আতিকুল ইসলাম, জাহেদুর রহীম, ফজলে নিজামী, ইকবাল আহমেদ, আবদুর রহীম চৌধুরী, অজিত রায়, ফারকুল ইসলাম, সনজিদা খাতুন, ফাহমিদা খাতুন, লতিফা হিলালী, মালেকা আজিম, বিলকিস নাসিরুদ্দীন, রাখী চক্রবর্তী, আফসারী খানম, ফ্লোরা আহমেদ, হামিদা আতিকের নামই এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।

দ্বিজেন্দ্রগীতি ও অতুলপ্রসাদের গান[১২] পরিবেশিত হত 'ঐকতান'-এর অনুষ্ঠানে। ঐকতান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের দ্বারা গঠিত প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান-পরিবেশিত অনুষ্ঠানে বহু বিদেশী-দর্শকদের দেখা যেতো। রুচি গঠনে এই প্রতিষ্ঠানের অবদানও কম নয়।

নীতিগত কারণে কামাল লোহানী ছায়ানট ছেড়ে দিয়েছিলেন। বঙ্গ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে I. P. T. A.-র যা ভূমিকা ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা সে-রকম কিছু করার। তিনি ক্রান্তি গঠন করলেন। বোধ করি ক্রান্তির নৃত্যনাট্য 'জ্বলছে আগুন ক্ষেতে খামারে' সবচেয়ে বেশী দর্শককে আন্দোলনে অনুপ্রাণীত করেছে। ত্রিশ চল্লিশ হাজার দর্শক স্টেডিয়ামে, বিভিন্ন কৃষক শ্রেণীর সমাবেশে (ঢাকার বাইরেও) এই দলের অনুষ্ঠান উপভোগ করেছেন। রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের দরুন শেষের দিকে ক্রান্তি তেমন সুবিধে করতে পারে নি—কিন্তু একথা অবশ্যই বলা চলে গণসঙ্গীতের প্রচারে ক্রান্তি অগ্রণী ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে সক্ষম হয়েছে।

দেশবিভাগের গোড়ার দিকে যুব লীগ ও তারপরে গড়া সংস্কৃতি সংসদ অনিবার্য ভাবে দীর্ঘ আলোচনার দাবী রাখে। এদের বক্তব্যের মাধ্যম শোভাযাত্রা বা পোস্টারে সীমাবদ্ধ ছিল না—শিল্পকেই বক্তব্যের মাধ্যম হিসেবে বেছে

১২ অতুলপ্রসাদের একটি মাত্র রেকর্ড বাজারে বেরিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কোন রেকর্ড বেরোয় নি। লায়লা আর্জুমন্দ বানুর কণ্ঠে রেকর্ডটি সুধীজনের সমাদর পেয়েছিল।

নিয়েছিলেন সংস্কৃতি চর্চার বিভিন্ন মাধ্যমে জনগণের মনে সংগ্রামী চেতনার উদ্বুদ্ধ করাই প্রতিষ্ঠান দুটোর লক্ষ্য ছিল। কালোদশকের বিরুদ্ধে প্রথম ছাত্রবিক্ষোভের সময়ে সংস্কৃতি সংসদ পুনর্গঠিত হয়। কিন্তু আগের ঝাঁজ ছিল না। মস্কোপন্থী পিকিংপন্থী-র ঝগড়ার বাতাস এখানেও লেগেছিল। সংস্কৃতি সংসদ, ছাত্র প্রতিষ্ঠানের আওতায় নিরীহ-সংস্কৃতির প্লাটফরমের ভূমিকাই পালন করেছে। পঁচিশে বৈশাখ ও একুশে ফেব্রুয়ারি এবং বিভিন্ন পুস্তিকা ও প্রচার পুস্তক প্রকাশ ছাড়া পরবর্তী কালে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু পরিবেশিত হয়েছিল বলে মনে পড়ছে না।

'৬৮-র গণ-আন্দোলনের সময় হিজ মাস্টার ভয়েজ ও ঢাকা রেকর্ডস্ রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড প্রকাশ করেন।

বুলবুল চৌধুরী বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে প্রথম নৃত্যশিল্পী যিনি স্বরচিত নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর শিল্পরীতি ও অভিজ্ঞতা পরবর্তী কালে প্রত্যক্ষ সাহায্য না করলেও পরোক্ষে প্রেরণা যুগিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরই তাঁর দল ভেঙে যার। আফরোজা বুলবুল বুলবুল একাডেমী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। হাফিজের স্বপ্ন-স্রষ্টা বুলবুল চৌধুরীকে নিয়ে তেমন আলোচনা কোথাও হয় নি—এই অবজ্ঞার শিকার ওস্তাদ আয়েত আলী খানও।

তবুও বুলবুল একাডেমী-ই প্রথম পূর্ণাঙ্গ নৃত্যনাট্য পরিবেশন করে—ভক্তিময় দাশগুপ্তের পরিচালনায় 'শ্যামা' (১৯৬১) মঞ্চস্থ হয়। নৃত্যাংশের শিল্পী ছিলেন কামাল লোহানী, মন্দিরা নন্দী, নার্গিস মুরশিদা, লায়লা নার্গিস ও রুচি আহমেদ। বুলবুল একাডেমীর নৃত্যনাট্য জসীম উদ্দীনের 'নক্সী কাঁথার মাঠ' (১৯৫৬)-এ অংশ গ্রহণ করেন জি. এ. মান্নান, রাহিজা খানম, দুলাল তালুকদার, লায়লা নার্গিস। ঢাকার সর্বশেষ নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' (১৯৭০)—প্রযোজনায় বুলবুল একাডেমীর পরিচালক আতিকুল ইসলাম। যান্ত্রিক কলাকৌশল-যে অনেক উন্নত হয়েছিল তা বোঝা যায়। মীর্জাপুরের ভারতেশ্বরী হোমের ছাত্রীরাও রবীন্দ্রনাথের অনেক নৃত্যনাট্য পরিবেশন করেছেন। এ-ছাড়া পীযূষ পাল, 'ওমর খৈয়াম' পরিবেশন করেন—এবং 'দর্শকদের মনে রোমান্টিক আবেগ সংক্রামণ করতে সক্ষম হন।

অঞ্জনা সাহার লিট্‌ল ব্যালের 'শ্যামা' (১৯৬১)-ও পরিপাটি রচনা। ভারতের শ্যামা রেকর্ডটি চালিয়ে সঙ্গীতের 'কাজ' করা হ'ত।

গহর জামিল, জি. এ. মান্নান কিছু নৃত্যনাট্য রচনা করেছিলেন এবং বিদগ্ধ দর্শকদের উপহার দিয়েছেন।

ঢাকার প্রথম দিকের নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে অজিত সান্যাল ছিলেন—তাঁকে শেষের দিকে দেখি নি।

ঢাকা টেলিভিশন করপোরেশন নিয়মিত নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন করতেন। তন্মধ্যে 'আলীবাবা' মোটামুটি পরিণত শিল্প। সরকারের অথবা অনুষ্ঠান প্রযোজকের নেকনজরের জন্য অনেক 'অখাদ্য' টি. ভি. দর্শককে হজম করতে হয়েছিল।

চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, কুমিল্লা, বরিশাল, পাবনায় বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে ছাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর বার্ষিক সম্মেলনে মাঝে মধ্যে নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হ'ত।

ঢাকায় ও চট্টগ্রামে একাধিকবার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে। ঢাকার আর্ট কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দের কখনো সমবেত, কখনো বা একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে।

আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশে রেখা ও রঙের ভাষা বোঝার লোকের অভাব ছিল ও আছে, এবং নীতির পরিবর্তন না হলে থাকবেও। ছাত্রাবস্থায় বাংলা ভাষা শিখতে হয়, রেডিওর কল্যাণে গানও শুনতে হয়—অনিচ্ছাসত্ত্বে হলেও সঙ্গীত ও সাহিত্য বেশী-সংখ্যক লোক উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু রঙের রেখা, গতির সমন্বয়ে যে-শিল্পী কল্পনা, অভিজ্ঞতা ও আবেগকে ধরে রাখেন —তা বোঝার তেমন্ বড় রকমের আয়োজন নেই। সন্তোষ গুপ্ত, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, বুলবন ওসমান বিভিন্ন সময়ে চিত্রশিল্প-সম্পর্কে আলোচনা করেছেন —তবু পাঠকের মন ফেরে নি। আমি নিজেও শিল্পের এই মাধ্যম সম্পর্কে একজন আনাড়ী দর্শক। নিতান্ত কৌতূহল নিয়ে প্রদর্শনীতে যেতাম। আমার স্মৃতি থেকে কয়েকটি নামের তালিকা ছাড়া এই পর্যায়ে কিছু বেরোবে কি না সন্দেহ। জয়নুল আবেদীন, কামরুল হাসান, হামিদুর রহমান, মোহাম্মদ কিবরিয়া, আমিনুল ইসলাম, দেবদাস চক্রবর্তী, রুমী ইসলাম, সৈয়দ জাহাঙ্গীর, রশীদ চৌধুরী, শফিকুর রহমান, কাইউম চৌধুরী, মুর্তাজা বশীর, নিতুন কুণ্ড, নাসিরউদ্দিন,—এঁদের সম্পর্কে, এঁদের সৃষ্টি-সম্পর্কে শ্রদ্ধার সঙ্গে আলাপ আলোচনা হ'ত। এ ছাড়াও বিনোদ মণ্ডল, মোহসেন, প্রাণেশ মণ্ডল, কালাম

মাহমুদ, হাশেম খান, কেরামত মওলা, রফিকুন নবী, সবিহউল আলম, আসীম আনসারী, এঁদের নাম মনে পড়ছে।

ঢাকায় রুশ, ফরাসী, জার্মান ও মার্কিন চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়েছে একাধিকবার। স্থায়ী গ্যালারির জন্য শিল্পীদের আবেদন-নিবেদন শেষপর্যন্ত ফলবতী হয় নি। পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিল, বাংলা অ্যাকাডেমী এবং আর্ট কলেজ গ্যালারিতেই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হ'ত। মুক্ত অঙ্গনে, রমনা পার্কে একবার প্রদর্শনী হয়েছে।

আর্ট এনসেম্বল, সমকাল গোষ্ঠী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও চিত্রপ্রদর্শনী হয়েছে। গৃহশোভাবর্ধনের নিমিত্ত নতুন উঠতি বিত্তবানের ড্রয়িংরুমে শিল্পীর সাধনা আদৃত হয় এরকম ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন জয়নুল আবেদীন (১৯৬১)। যাঁরা ছবি কিনতেন অধিকাংশই ছিলেন বিদেশী।

জয়নুল আবেদীনের একটি এলবাম প্রকাশিত হয়েছিল। আর কারুর এলবাম প্রকাশিত হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ছে না।

গ্রাফিক শিল্পে অবিশ্বাস্য পরিণতি এসেছিল। মাত্র ২৩ বছর আগে যাঁরা পুঁথি বা ধারাপাত প্রকাশ করতেন, যুগের প্রয়োজনেই তাঁরা উন্নতমানের গ্রন্থ প্রকাশে আগ্রহী হয়ে উঠলেন। টাইপ নির্বাচন, কালি নির্বাচন, বিষয়বস্তু-অনুযায়ী গ্রন্থের সাইজ সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা, অলঙ্করণ, মুদ্রণ পরিকল্পনা—সর্বক্ষেত্রেই এই মনোভাবটি চোখে পড়বেই। '৬৫-র যুদ্ধের পর ভারতীয় গ্রন্থ নিষিদ্ধ হওয়ায় এই শিল্পের উন্নতি আরও বেশী প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বইঘর, মওলা ব্রাদার্স, সন্ধানী, লেখকসংঘ-এর বই হাতে নিয়ে আরাম পাওয়া যেত। কামরুল হাসান, কাইয়ুম চৌধুরী, দেবদাস চক্রবর্তী, হাসেম খান, মুর্তজা বশীর, মোহাম্মদ ইদ্রিস, কালাম মাহমুদ, রফিকুন নবী, গোলাম সরওয়ার মোহসিন-এর মত শিল্পীদের শ্রমে ও মেধায় এই শিল্পের শিল্পগত দিক যেমন উন্নত হয়েছিল তেমনি ভাল ভাল ছাপাখানার উন্নত যান্ত্রিক কলা-কৌশল, ব্লক নির্মাণ, বাঁধাইতেও 'একটি ভাল বই পাঠককে উপহার দেব' এই মনোভাবটি দেখা যায়। ব্যবসায়ে এই দৃষ্টিভঙ্গী উন্নত রুচিকে প্রশ্রয় দিয়েছে। মিনি পত্রিকাগুলোতে আবার নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ দেখেছি। চটের উপর, হিসেবের খাতার উপর অত্যাধুনিক বিদেশী চিত্রের প্রচ্ছদ যেমন চোখে পড়েছে তেমনি ঘড়ির মত, পিরামিডের মত, বৃষ্টির ছাঁটের মত কবিতার কম্পোজও চোখে পড়েছে।

সব সময় ভাল লেগেছে বললে মিথ্যা বলা হবে, অনেক সময় হয়তো অভ্যাসের ফলেই, চক্ষুপীড়ার কারণ ঘটিয়েছে, বিরক্তি উৎপাদন করেছে (হয়তো তাঁরা পাঠকের বিরক্তি উৎপাদনই করতেই চেয়েছিলেন)। খবরের কাগজের মেক-আপ অবিশ্বাস্য রকমের উন্নতি লাভ করেছিল। পাকিস্তান অবজর্ভার, দৈনিক পাকিস্তান, এক্সপ্রেস-এর মেক-আপ আমার চোখে এখনও লেগে আছে।

মুদ্রণ পারিপাট্য ও প্রচ্ছদের জন্য সরকারী প্রতিষ্ঠান ন্যাশন্যাল বুকস পুরস্কার গ্র্যাফিক শিল্পকে উৎসাহিত করেছে।

লাহোর চলচ্চিত্র শিল্পীদের সূতিকাগার হলেও ঢাকায় এই শিল্পের গোড়া-পত্তন দেশবিভাগের পরেই হয়েছে। ইতিহাসের হলুদ পাতা খুঁজে ঢাকার নবাববাড়ির উদ্যোগে নির্মিত ইংরেজী প্রামাণিক চিত্রের সংবাদ চিত্র-সাংবাদিকদের মারফৎ জানতে পেরেছিলাম। 'মুখ ও মুখোশ' (১৯৫৬) প্রথম বাংলা ছবি। পরিচালক ছিলেন আবদুল জব্বার, সঙ্গীত পরিচালক সমর দাস এবং চিত্রগ্রহণ করেছিল এম. কিউ. জামান। দুর্বল কাহিনী, নিষ্প্রাণ অভিনয়, যান্ত্রিক অপটুত্বের নজীর 'মুখ ও মুখোশ'। তবুও এই ছবিই প্রেরণা দিয়েছে চিত্র নির্মাণের—এই ঐতিহাসিক মর্যাদা জব্বারেরই প্রাপ্য। পরবর্তী কালের 'মাটির পাহাড়' (পরিচালক মহিউদ্দীন), 'আকাশ আর মাটি' (পরিচালক ফজলে লোহানী, সঙ্গীত পরিচালক সুবল দাস), 'এদেশ তোমার আমার' (এহতেশাম) প্রভৃতি চিত্রে চলচ্চিত্রের অগ্রগতির দিক্ নির্দেশ করে। লাহোর এবং ভারতীয় ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে চিত্রনির্মাতাদের এগোতে হয়েছিল বলে ব্যবসায়ীরা এগিয়ে আসতে সাহসী হন নি—প্রদর্শকরাও উৎসাহী হন নি। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য ছবি 'আসিয়া' (নায়িকা সুমিতা লাহিড়ী, পরিচালক ফজলে লোহানী) অপূর্ব লোকসঙ্গীতের সুন্দর প্রয়োগের জন্য এবং 'সূর্যস্নান' (পরিচালক সালাহউদ্দীন, সুরকার খান আতাউর, প্রধান চরিত্রে কাজী খালেক, আনোয়ার হোসেন, নাসিমা খান, রওশন আরা), কাহিনী (আলাউদ্দীন আল-আজাদ), ক্যামেরার কাজ (বেবী ইসলাম) ও অভিনয়ের জন্য—সামগ্রিকভাবে ছবিটি দর্শকদের তৃপ্তি দিতে সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় অভিনেত্রী তৃপ্তি মিত্র, পশ্চিম পাকিস্তানের জুবাইন, কাজী খালেক, আনিস (খান আতা)-প্রমুখদের নিয়ে এ. জেড. কারদারের অবিস্মরণীয় চিত্র **'Day Shall Dawn'** (জাগো হুয়া সাবেরা)-এর কলাকুশলীরা বিদেশী, গোটা ছবির আউটডোর সুটিং হয়েছে বাংলাদেশের

নদী অঞ্চলে। নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের এটিই শ্রেষ্ঠ ছবি। কাহিনী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি পরিচিত উপন্যাস 'পদ্মানদীর মাঝি' থেকে নেওয়া —অবশ্য কোথাও তাঁর নাম উল্লেখ ছিল না। কারদারের Of Human Happiness (দূর হ্যায় সুখ কি গাঁও) অসমাপ্ত ছবি। তাঁর শেষ ছবি No Greater Glory (১৯৬৯—কসম উস ওয়াক্ত কি) আরেকটি অনবদ্য ছবি। বাংলাদেশের চিত্র পরিচালকদের মধ্যে যিনি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার তিনি আদমজী পুরস্কারপ্রাপ্ত ঔপন্যাসিক জহীর রায়হান। দুর্ভাগ্য আমাদের, Let there be light সমাপ্ত হয় নি—যে-সব still আমরা দেখেছি তাতে বিস্ময়ে আনন্দে (শারীরিক ভাবেও) শিহরিত হয়েছি। তাঁর উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'কখনো আসে নি' (১৯৬০), 'সোনার কাজল', 'সংগম' (উর্দু—প্রথম রঙীন ছবি), 'বাহানা' (উর্দু—প্রথম সিনেমাস্কোপ), 'আনোয়ারা', 'জীবন থেকে নেয়া' (১৯৭০)। খান আতাউরের 'অনেকদিনের চেনা', 'সিরাউদ্দৌলা', সুভাষ দত্তের 'সুতরাং' ১৯৬১ (?), 'আয়না', 'মিতার ক, খ, গ, ঘ, ঙ' পরিচ্ছন্ন ছবি।

প্রস্তুতি-পর্বে সাদেক খানের 'নদী ও নারী' ও 'কারাভাঁ' (উর্দু) উন্নত-মানের ছবি হলেও ব্যবসায়িক সফলতায় ব্যর্থ।

বাংলাদেশের প্রথম উর্দু ছবি এবং বক্তব্যপ্রধান ছবি বেবী ইসলামের 'তানহা'—রিলিজ হয় অনেক পরে।

এহতেশামের 'চান্দা' (উর্দু), 'তালাশ' (উর্দু) এর অভূতপূর্ব ব্যবসায়িক সফলতায় উর্দু ছবি নির্মাণের জোয়ার এলো। বাংলা ছবিকে সংকট থেকে রক্ষা করল, না, কোন সুস্থ বক্তব্যপ্রধান বা মহান শিল্প ভাবনায় নির্মিত ছবি নয়—একটি ফোক ছবি—'রূপবান'। পরবর্তী যুগকে চিত্র সাংবাদিকেরা 'রূপবান' যুগ বলেছেন। বাঙালীর আত্মজাগৃতির অত্যুগ্র আত্মসচেতনার স্বাক্ষর 'রূপবান'। চলচ্চিত্রের ব্যাকরণ-অনুযায়ী অশুদ্ধ এই ছবির অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তার (যে-সব অঞ্চলে সিনেমা হাউস অনেক দূরে সেখানেও ছবিটি দেখানোর আয়োজন করা হয়েছিল) প্রধান কারণ কাহিনী বাংলার রূপকথা থেকে নেওয়া,—কাহিনীতে বাংলাদেশের নরনারীর শিল্প ভাবনা রূপায়িত হয়েছে। লোকশিল্পের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের ঐকান্তিকতা নিয়ে নয়, এরপর শুরু হ'ল ফোক ছবির অবাধ প্রতিযোগিতা। এতে ভিন্ন ভাবে জহির রায়হানও নামলেন—'বেহুলা' বোধ হয় এই পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ ছবি—যদিও 'সাতভাই চম্পা', 'অরুণ বরুণ কিরণমালা'

(পরিচালক দিলীপ সোম, খান আতাউর প্রযোজক) বিপুল ব্যবসায়িক সফলতা লাভ করে।

'৬৫-র পরে ভারতীয় ছবি প্রদর্শন নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বিদেশী ছবি আমদানির ক্ষেত্রেও সরকারের নীতির পরিবর্তন হয়। ফলে বাংলা ছবির চাহিদা বেড়েছিল। অথচ একটি মাত্র স্টুডিয়ো থাকায় চিত্রনির্মাতাদের অসুবিধার অন্ত ছিল না। কলাকুশলী বাড়ছিলেন, ধীরে ধীরে এই শিল্পে প্রতিভাবান শিল্পী কলাকুশলীর সমাবেশ ঘটছিল, চলচ্চিত্রের নন্দনতত্ত্ব অভিজ্ঞ শিক্ষিত সমালোচকের আবির্ভাব ঘটছিল, চলচ্চিত্র-বিষয়ক পত্রিকা প্রচুর প্রকাশিত হওয়ায় এই ব্যবসা জমে উঠেছিল।

ভালো বাংলা ছবির জন্য দর্শকদের ব্যাকুলতার খবরটি চলচ্চিত্র উৎসবে (১৯৬৬ ?) 'মহানগরী'র প্রদর্শনীতে বোঝা গেছে। পাকিস্তান ফিল্ম সোসাইটি (১৯৬৫) প্রতিষ্ঠিত হলে, বিশ্বের বিখ্যাত পরিচালকদের ছবি—পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য চিত্র—দেখার সুযোগ ঘটেছিল চিত্রামোদীদের। বুলগেরিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভেল (১৯৬৯), আরব রিপাব্লিক ফিল্ম ফেস্টিভেল (১৯৭০) ছাড়াও কয়েকটি রাশিয়ান ছবি ('ক্রেনস আর ফ্লায়িং', 'ব্যালাড অব এ সোলজার' প্রভৃতি) ব্যবসায়িক ভিত্তিতে প্রদর্শিত হয়েছিল। জার্মান, ফ্রান্স, আমেরিকা, ইউ. কে., রাশিয়া প্রভৃতি দেশের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলো প্রদর্শিত হয়েছে এ্যামবাসীগুলোর মাধ্যমে। ভারতীয় তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রে আমি 'অপরাজিত', 'দেবদাস' প্রভৃতি ছবি দেখেছি। ১৯৬৫ পর্যন্ত 'পথের পাঁচালি' প্রদর্শিত হয়েছে। প্রস্তুতি-পর্বে, 'কাবুলীওয়ালা', 'অপুর সংসার', 'জলসাঘর', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'দীপ জ্বেলে যাই', 'হেডমাস্টার' প্রভৃতি পরিচালকদের অভিজ্ঞতা ও শৈল্পিক চিন্তা-ভাবনাকে সমৃদ্ধ করেছিল। উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত ছবি বাংলা ছবির জনপ্রিয়তা বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সত্যজিৎ রায়ের স্কুলের পরিচালিকা রেবেকা-র 'বিন্দু থেকে বৃত্ত' (১৯৬৯) এবং ফখরুল আলমের 'মানুষ অমানুষ' ব্যবসায়িক সাফল্য না পেলেও সুধীজনের স্বীকৃতি পেয়েছে। ছবি দুটোর বক্তব্য ছিল।

ফোক ছবিগুলো একটি মূল্যবান শিক্ষা জনগণকে দিয়েছে, তা হ'ল, অন্যায় চিরস্থায়ী হতে পারে না, অসত্য সত্যের কাছে পরাজিত হবেই, যদিও, সত্যাশ্রয়ীকে অনেক দুঃখ অপমান লাঞ্ছনা স্বীকার করে নিতে হয়। সামাজিক

ছবিগুলোতেও উপযুক্ত আদর্শ প্রচারিত হয়েছে। দৈব-র প্রভাব এ-জাতীয় ছবিতে উৎকট।

'জীবন থেকে নেয়া', 'সিরাজউদ্দৌল্লাহ', 'ধারাপাত', 'তিতুমীর' (পরিচালক ইবনে মিজান), 'ঘূর্ণীঝড়' (আসাদ পরিচালিত) সমাজকে সচেতন হতে শিক্ষা দিয়েছে। কীর্তনের জন্যেই 'বাঁশরী' হিট করেছিল বোধ করি—ঐ একটিমাত্র ছবিতেই কীর্তন ছিল। রেডিও টেলিভিশনে কীর্তন পরিবেশিত হ'ত না।

হিট ছবির নির্মাতা কাজী জহীর—'নয়নতারা', 'মধুমিলন', 'বন্ধন' এবং 'ভাইয়া' (উর্দু) উপহার দিয়েছেন। সেক্স ও ধর্মীয় আবেগকে এক্সপ্লয়েট করতে তিনি ওস্তাদ। জহির রায়হান স্কুলের আমজাদ হোসেন, জাভেদ রহিম, বাবুল চৌধুরী বাংলাদেশকে পরিচ্ছন্ন ছবি উপহার দিয়েছেন। নজরুল ইসলামও বেশ কয়েকটি হিট ছবি উপহার দিয়েছেন ('আপন দুলাল', 'আলীবাবা', 'পিয়াসা', 'দর্পচূর্ণ', 'স্বরলিপি' প্রভৃতি)।

বাংলা ছবি যখন বাজার পেল—তখন দু-একজন সাহসী প্রযোজক হাসির ছবি নির্মাণে উৎসাহী হলেন, তাঁদের একজন সালাহউদ্দীন। তাঁর 'তেরো নম্বর ফেকু ওস্তাদগার লেন' (কাহিনী খান জয়নুল), নজরুল ইসলামের 'কার বউ' সার্থক ছবি। কবি, ঔপন্যাসিক ও চিত্রনাট্যকার সৈয়দ শামসুল হক 'কমেডি অভ এরর্স'-এর কাহিনী নিয়ে 'ফির মিলেঙে হাম দোনো' করেছিলেন, ছবিটি বাজার পায় নি।

একমাত্র অবাঙালী চিত্র পরিচালক, কবি সুরুর বারবাঙ্কভীর 'আখেরি স্টেশন' চিত্রমোদীদেরকে ভিন্ন স্বাদের আনন্দ দান করেছে, এ ছবিও বাজার পায় নি।

চিত্রোপযোগী কাহিনী না পেয়ে (ভাল উপন্যাস অবশ্যই ছিল, শিল্পী সমৃদ্ধ ছোটগল্পও ছিল বাংলাদেশে) শরৎচন্দ্র, নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র জনপ্রিয় কাহিনীতে প্রচুর পানি মিশেল দিয়ে সেলুলয়েড দিয়ে গল্প বলা হ'ত।

তারকা প্রথার প্রচলন করেন এহতেশাম মুস্তাফিজ। নতুন নায়িকা উপহার দিয়েছেন সুভাষ দত্ত (কবরী, সুচন্দা, শর্মিলী, পল্লবী, মন্দিরা প্রমুখ)।

নায়ক-নায়িকা চরিত্রে এযাবৎ যাঁরা অভিনয় করেছেন—পূর্ণিমা ('মুখ ও মুখোশ'), তৃপ্তি মিত্র ('জাগো হুয়া সাবেরা'), সুমিতা, সুলতানা জামান, রওশান আরা, চিত্রা সিনহা, শবনাম, নাসিমা খান, কবরী, রোজী সামাদ,

শর্মিলী, পল্লবী, শামিম আরা ('তানহা'), সুচন্দা, সুজাতা, ববিতা, আনোয়ারা, জামাল, শাবানা, আতিয়া চৌধুরী, সবিতা, সঞ্চিতা, মন্দিরা, আবদুল জব্বর খান, কাফী খান, প্রবীরকুমার, আনিস (খান আতাউর), রহমান, আনোয়ার হোসেন, সৈয়দ হাসান ইমাম, হায়দার শফি ('বাংলা'—পরিচালক শিবলি সাদিক), শওকত আকবর, খলিল, হারুন, আজিম, রাজ্জাক, উজ্জ্বল, কায়েস, আহসান, নাদিম, ওয়াহিদ মুরাদ ('ভাইয়া'), আখতার, মাহফুজ, সাজ্জাদ, জাফর ইকবাল এবং ওমর চিশতি ('লেট দেয়ার বি লাইটে'র প্রধান চরিত্র—এঁর কোন ছবি মুক্তি পায় নি)।

বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেছেন, কাজী খালেক (মৃঃ ১৯৭০), সঞ্জীব দত্ত ('কখনো আসে নি', 'যে নদী মরুপথে'), দাশু বর্ধন (মৃঃ), মোস্তফা, দীন মোহাম্মদ, এনাম আহমেদ, মেজবাহ, রাজ, সুভাষ দত্ত, রাজু আহমেদ, খান জয়নুল, আশীষকুমার লোহ, জলিল আফঘানী, ফ্যাটি মোহসীন, জলিল, হাসমত, আনিস, নারায়ণ চক্রবর্তী, আনোয়ার হোসেন, শওকত আকবর, বেবী জামান, আমজাদ সাইফুদ্দীন, আজমল হোসেন (মিঠু), সিরাজ, আনিস (ছোট), সোনা মিয়া (মৃঃ), খায়ের, এফ কারিম, আলতাফ হোসেন, ফজলুল হক ('সান অভ পাকিস্তান'—প্রথম শিশুচিত্রের পরিচালকও তিনি—প্রথম পর্বের 'আজান' মুক্তি পায় নি), মেহফুজ, শাহানশা, রহিমা খাতুন, জরিন, রাণী সরকার, শিরিন, স্বাতী খন্দকার, রওশন জামিল, নার্গিস মুরশেদা, পাপিয়া, রেবেকা, রেশমা, সুলতানা, নাজনীন, জয়ন্তী রহমান, তন্দ্রা ইসলাম, শ্রাবণী, বেবী রীটা, কবিতা, দেবী ওয়াহিদা প্রমুখ; আর তার সঙ্গে সাপ তো আছেই। কী ফোক, কী সামাজিক—সাপ কমন।

পরীক্ষানিরীক্ষামূলক চিত্র 'কখনো আসেনি' (জহীর রায়হান), 'মানুষ অমানুষ' (ফখরুল আলম), 'আয়না' (সুভাষ দত্ত), 'বিন্দু থেকে বৃত্ত' (রেবেকা), 'তানহা' (বেবী ইসলাম)। সুরকারদের মধ্যে যাঁদের নাম মনে পড়ছে—সমর দাস, সুবল দাস, কাদের জামেরী, আবদুল আহাদ, খান আতাউর, রবীন ঘোষ, সত্য সাহা, ধীর আলী—মনসুর, আলতাফ মাহমুদ, মীরকাশেম খান, আলী হোসেন, ফেরদৌসী রহমান, আবদুল লতীফ, রাজা হোসেন, করিম শাহাবুদ্দীন, আমীর আলী ও আজাদ রহমানের নাম পড়ছে। প্রখ্যাত শিল্পী বাহাদুর হোসেন খান রূপকারের সর্বশেষ ছবিতে সুরারোপ করে-

ছিলেন, ছবিটি রূপকারের অন্যান্য ছবির মতই (‘পল্লী বাওরা’, ‘জলতে সূরজ কে নীচে’) মুক্তি পায় নি।

‘জাগো হুয়া সাভেরা’ মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে, অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছিল। এ. জে. কারদারের অপর ছবি (অসমাপ্ত) ‘দূর হ্যায় সুখ কি গাঁও’-র স্টীল সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। খান আতাউরের ‘সোয়ে নদীয়া জাগে পানি’—মস্কো, এবং সুভাষ দত্তের ‘আবির্ভাব’ কম্বোডিয়া চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয় এবং প্রশংসা অর্জন করে।

চা শিল্প ও পূর্ব পাকিস্তানের স্থাপত্য প্রভৃতি বিষয়ে উত্তমমানের প্রামাণ্য চিত্র নির্মিত হয়েছিল। প্রামাণ্য চিত্র ও শর্ট ফিল্ম তৈরীর রেওয়াজ সবেমাত্র শুরু হয়েছিল।

সেন্সর বিধি-নিষেধ ও সরকারের তীব্র ভ্রূকুটির মধ্যে থেকে, আর্থিক ঝুঁকি নিয়ে বাংলা ছবি করাটাই ছিল যেখানে চ্যালেঞ্জ, সেখানে মাত্র চৌদ্দ বছরের ঐতিহ্যে বাংলা ছবি আশাতীত উন্নতি লাভ করেছিল একথা বললে বোধ করি খুব একটা অন্যায় হবে না।

কলেজ অব মিউজিক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি মহৎ উদ্দেশ্যে—অ্যাকাডেমিক পদ্ধতিতে সঙ্গীত চর্চায় উৎসাহ প্রদানের জন্যে। জনাব শার্কী সাহেব প্রথম অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। পরে বারীণ মজুমদার যোগ্যতর হাতে এই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হন। বাংলাদেশের শিল্পান্দোলনে এই কলেজের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ১৯৭০-এ মিউজিক কনফারেন্সের আয়োজন সঙ্গীতামোদীদের বহুদিনের তৃষ্ণা মিটিয়েছে।

লঞ্চে, বাসে, ট্রেনে গ্রামের সঙ্গে শহরের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছিল। যাত্রীদের ব্যাপক অভিজ্ঞতা প্রাচীন কৃষিভিত্তিক সমাজের জড়তার সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করেছিল। ইতিমধ্যেই গ্রামে ভূমিহীন চাষীর পুত্ররা শহরে শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়েছে বা হচ্ছে। গ্রামের সমাজ ভেঙে যাচ্ছিল একাধিক কারণে—সমাজের প্রতাপ ও দাপটও কমে গিয়েছিল রূপান্তরের জোয়ারে। গ্রামকেন্দ্রিক বিভিন্ন শিল্পকর্মে এর নমুনা বা নজীর দেখানো যাবে না, কেননা, জারী সারী ভাটিয়ালী প্রভৃতির মাধ্যম প্রথানুগত্য সত্যপ্রকাশের অন্তরায়। এই সময় কী শ্রমিককে কী কৃষককে তৃপ্তি দিয়েছেন, আনন্দ দিয়েছেন, উৎসাহ দিয়েছেন—রমেশ শীল, বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিয়াল,

ব্যক্তি নন, প্রতিষ্ঠান। দেশের প্রতি কর্তব্য পালনে যখন শিক্ষিত শিল্পীরা দ্বিধাগ্রস্ত তখন তিনিই নির্ভয়ে সেই বিদ্রোহী পতাকা বহন করেছিলেন। কৃষকের শ্রমিকের অভিজ্ঞতার শরীক, মাটির কাছাকাছির নয়—একেবারেই মাটির মানুষ, রমেশ শীলের কাছে আজকের বাঙালীর ঋণ অপরিসীম।

১৯৬০ এর পর 'যাত্রা' পুনরায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ঘোড়াশাল শিল্প এলাকায় যাত্রার স্থায়ী মঞ্চ আছে। চট্টগ্রাম শিল্প এলাকায় নিয়মিত যাত্রাগান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাঙ্গালী, চাঁদের মেয়ে, প্রতাপাদিত্য, রিক্সাঅলা, সিরাজউদ্দোলাই জনপ্রিয় পালা এবং জাতীয়তাবাদের প্রচারের বাহন। ভাওয়াল সন্ন্যাসী, রানী ভবানী, সাধক রামপ্রসাদ, সুন্তানদীর তীরে এসব পালা গ্রামাঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়। আর্য, ভোলানাথ, জয়দুর্গা, নবদুর্গা, নবযুগ, নবরঞ্জন, বাবুল, বুলবুল প্রভৃতি ব্যবসায়িক যাত্রা প্রতিষ্ঠানগুলো গোটা দেশে যাত্রাগান পরিবেশন করে। রাজনৈতিক বক্তব্যের উৎকৃষ্ট প্লাটফরম হ'তে পারতো যাত্রা—কিন্তু উপযুক্ত প্রতিভাবানের অভাবে, চিন্তা ও সংগঠনের অভাবে তা হয় নি। যা হয়েছে, সিনেমার নাচ ও গানের অনুকরণ। তবু যাত্রা ও কবিগান জনশিক্ষার প্রধান মাধ্যম ছিল। আব্দুল গণি বয়াতী, গেন্দু বয়াতী, মোহাম্মদ মোসলেম ও জরিনা বিবি-র দলের জারীগান জনপ্রিয় ছিল। জারীগানেও রূপান্তর এসেছিল।

জীবনযাপনের ছোটখাট খুঁটিনাটি দ্রব্যসামগ্রী সুন্দর ও রুচিশীল ভাবে পরিবেশিত হয়েছে কামরুল হাসান পরিচালিত ডিজাইন সেণ্টারের মাধ্যমে। উগ্র টেডিবাদ থেকে রক্ষা করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান, মুজিব কোট দিয়ে। বাংলা বাজারের খদ্দরের দোকান খরিদ্দারের অভাবে উঠে গিয়েছিল। ১৯৬৮-র মার্চ মাসের পর খদ্দরের পাঞ্জাবী ইত্যাদির 'ফ্যাশন' শুরু হ'ল—ফলে, ঢাকায় ২১১টি খদ্দর ভবনের প্রয়োজন হ'ল।

বাটা ও রাহু পাদুকা শিল্পে রুচি ফিরিয়েছে। জুতা পরিধান সম্পর্কিত সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীকে কবর দিয়েছিল স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল ; বোধ হয়, স্যাণ্ডেল অনেক বেশি নাগরিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে প্রশ্রয় দেয়। ঢাকা নগরীর ব্যাপক উন্নয়নের ও প্রসারের ফলে, নাগরিকতা ও আধুনিকতা প্রসার লাভ করেছিল সুফল, কুফলসহ। শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী (কাচের, কাঠের, লোহা, এনামেল প্রভৃতি), প্যাকেজিং, এডভার্টাইজমেন্ট প্রভৃতিতে ধীরে ধীরে গ্রাম্যতা

বর্জিত হচ্ছিল—প্রাণহরা চিত্তহরা না হলেও অন্তত নয়নাভিরাম হচ্ছিল। শাহবাগ হোটেল, নিউমার্কেট এবং কলোনী গড়ার জন্যে নুরুল আমীন নির্বাচনী বক্তৃতায় যুক্তফ্রন্টের গালাগালি শুনেছিলেন—পরে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ও পূর্বানী ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হয়। আরো কলোনী ও উপশহর এবং আবাসিক এলাকা গড়ে তুলতে হয়। চিত্তবিনোদনের উপকরণ বাড়ছিল। হেকিম কবিরাজের ঢাকা শহরে চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল নির্মিত হয়েছিল, খেলাধুলার চর্চা বেড়েছিল। ক্রিকেটে শেরে বাংলা টুর্নামেন্ট, কারদার সামার, ফুটবলে আগা খান গোল্ড কাপ প্রতিযোগিতা উৎসাহ-উদ্দীপনা যুগিয়েছিল। ঢাকা ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট রাস্তাঘাট তৈরী করেছিল।

ঢাকায় অপরাধের সংখ্যা বাড়ছিল, কলগার্লের সংখ্যা বাড়ছিল, স্কুল-কলেজের সংখ্যাও বাড়ছিল। ঢাকা মহানগরী হ'তে চলেছিল। ঢাকাকে কেন্দ্র করেই সংস্কৃতি-চর্চা। কলকাতার বিকল্পে ঢাকাকে ঢাকা হ'তেই সময় লেগেছে অধিক দিন।

॥ ৩ ॥

While the roots of East Bengali nationalism could be found in the cultural autonomy of the past of the subcontinent, the pace of growth of national feelings and aspirations of the people of Bangla Desh was hastened by political and economic developments in Pakistan. In fact it was in response to the colonial policies pursued by the Central Government of Pakistan that the dormant nationalism of East Bengal had began to assist inself.[১৩]

'পশ্চিম পাকিস্তানীদের অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক আক্রমণের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্য পূর্ববঙ্গের লোকদের অনেক বেশী বাঙালী হ'তে সাহায্য করেছে।'[১৪]

'পাকিস্তান যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাঙালী, অবাঙালী, পূর্ব পাকিস্তানী—

১৩ Sisir Gupta, the, seminar 142, Delhi, June 1971. P. 10

১৪ নিরঞ্জন হালদার। এক সমীক্ষায় বাঙলাদেশ। কালি ও কলম, বাঙলাদেশ সংখ্যা ১২৫২ পৃঃ কলিকাতা।

পশ্চিম পাকিস্তানী কোন কিছুরই প্রশ্ন উঠে নাই। সকলেই আমরা পাকিস্তানী এবং সকলের উন্নতি বিধানই রাষ্ট্রনায়কদের লক্ষ্য হইবে, ইহাই ছিল সকলের কামনা। কিন্তু আল্লাহ্‌র কি মর্জি, আল্লাহ্‌র রহমতে পাকিস্তান কায়েম হইলেও ঠকবাজরা আল্লাহ্‌র প্রিয় ধর্ম ইসলামের মুখোশ পরিয়া আল্লাহ্‌র রহমত হইতে মানুষকে বঞ্চিত করিল। একদম বৃটিশ আমলের অবস্থা—শাসক ও শাসিত—এ সম্পর্ক করিয়া তুলিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে। গত আট বৎসরের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে হৃদয়হীন বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হইয়াছে আমরা তাহার বহু তথ্য সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছি।'[১৫]

'সমস্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তনেরই সূত্রপাত ঘটে সাংস্কৃতিক চিন্তায়। সংস্কৃতির ভুল ব্যাখ্যায় সময় সময় যে কি রকম ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটাতে পারে হিটলারের বিভ্রান্তিকর আর্যামি তার প্রমাণ যা পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। ভারত-বিভাগের সর্বনাশও সূচিত হয়েছে জিন্নাহ্‌ সাহেব এবং তাঁর চেলাচামুণ্ডাদের ভ্রমাত্মক ধর্মীয় ব্যাখ্যায়। ভারতের মুসলমান সমাজকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রলোভন দেখিয়ে উত্তেজিত করার জন্যে যে-পথ তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তাতে উদার ইসলাম ধর্মকে তাঁরা-যে বিশ্বের কাছে কত ছোট করে ফেলেছেন স্বার্থান্ধতায় তা তাঁরা উপলব্ধিই করতে পারেন নি। তাঁদের সেই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে বাংলাদেশ অসংখ্য আত্মবলি দিয়ে।[১৬]

To overcome the crisis that engulfs the nation, we must resolve those issues which are its cause. The first is deprivation of political freedom. The second is the sense of economic injustice felt by the overwhelming multitudes of our people. The third is the deep sense of injustice created by widening economic disparity between the regions. It is thus underlies the anguish and the anger of the Bengali people.

১৫ মুসাফির (তোফাজ্জল হোসেন): রাজনৈতিক মঞ্চ, ইত্তেফাক, ৮ই মার্চ, ১৯৫৬, ঢাকা (বাসবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত স্বাধীন বাংলাদেশ দেখে এলাম প্রবন্ধে উদ্ধৃত—নবজাতক, সপ্তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ১৩৭৭, পৃঃ ২৮২, কলিকাতা)

১৬ দক্ষিণারঞ্জন বসু: বাংলাদেশের এই যুদ্ধের সূচনা, অমৃত, বাংলাদেশ সংখ্যা, নববর্ষ ১৩৭৮, কলিকাতা, পৃঃ ১৯

They have money, they have influence, they have the capacity to use force against the people.[১৭]

শিশির গুপ্ত, নিরঞ্জন হালদার, তোফাজ্জল হোসেন, দক্ষিণারঞ্জন বসু, শেখ মুজিবর রহমান—এঁদের সুচিন্তিত মতামত ও ভাষণ পরপর পাশাপাশি নিবেদন করেছি বাংলাদেশের ওপর অর্থনৈতিক শোষণের চরিত্র এবং সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া দেখানোর জন্যে। বঙ্গবন্ধু 'আমাদের বাঁচার দাবী ছয়দফা কর্মসূচী'তে বলেছিলেন, 'দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে বাংলা ফজলুল হককে এঁরা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী এ-ও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সুহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহীতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল এঁদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবীর কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল-জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে।'[১৮]

সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাই শিল্পে সাহিত্যে রূপায়িত হয়। '৫৮ থেকে '৬২ পর্যন্ত তাও সম্ভব হয় নি। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্বাধীন মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা কিছুই ছিল না। এই বন্ধ্যা সময়ের আর্তি ফুটেছে আশরাফ সিদ্দিকীর কবিতায়—

কলাহীন শিল্পহীন সাহিত্য-সঙ্গীতহীন যে-জাতি তাদের
জীবন মৃত্যুর মতো—বিধাতার তারা এক মূর্ত অভিশাপ।

আল মাহমুদের অসহায় আর্ত চিৎকার—

বোধিদ্রুমের শাখায় শকুনী ডাকে।

রবীন্দ্রজন্মদিনে তিনি ভেঙে পড়েন—

এ কেমন অন্ধকার বঙ্গদেশ উত্থান রহিত
নৈঃশব্দ্যের মন্ত্রে যেন ডালে আর পাখীও বসে না।

১৭ শেখ মুজিবুর রহমান, Election Brodcast, ২৮-এ অক্টোবর, ১৯৭০. Dawn, 29 Oct. 1970, Karachi—Seminar, 142, উদ্ধৃত।

১৮ ৬ই মার্চ, ১৯৬৬ স্বাধীন বাংলাদেশ কেন? বাংলাদেশ মুক্তিসংগ্রাম সহায়ক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, পৃঃ ১৭

নদীগুলো দুঃখময় নির্পতগ মাটিতে জন্মায়
কেবল ব্যাঙের ছাতা, অন্য কোন শ্যামলতা নেই।…
গাছ নেই নদী নেই অপুষ্পক সময় বইছে
পুনর্জন্ম নেই আর জন্মের বিরুদ্ধে সবাই।

এ সময়ে কয়েকজন তরুণ কবি বন্ধুর মতো গলা জড়িয়ে উৎসাহ দেয়,

'বন্ধু, হতাশাই শেষ কথা নয়।' (বুলবুল খান মাহবুব)
আমাকে কুচি কুচি করে কাটলেও
রক্ত মাংস সবটুকুই
বাংলা
হৃদয়কে দুঃখ শোকে প্রেম শান্তি সবটুকুই বাঙালী।
(নিয়ামত হোসেন)

৬২-র সেপ্টেম্বর আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সামনে দাঁড়ালেন লেখক ও শিল্পীগোষ্ঠী। সে-সময়ে জসীমউদ্দীন, বেগম সুফিয়া কামালের সংগ্রামী ভূমিকা জনগণকে নির্ভীক হ'তে সাহায্য করেছে। অগণিত জনতার সঙ্গে তাঁরা মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন। গোটা বাংলা এঁরা চষে বেড়িয়েছেন—বঙ্গ সংস্কৃতির কথা বলেছেন—আবেগ প্রকম্পিত জসীমউদ্দীনের বজ্রহুঙ্কার মনে পড়ে,—আমার যদি ক্ষমতা থাকতো, রেডিও টেলিভিশন অফিস আমি মাটির সঙ্গে গুড়িয়ে দিতাম। বাঙালী, ওরা বেইমানী করে, ওরা শয়তানী করে, ওরা দালালী করে……।

গণ-সমাবেশে শিল্পীরা বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে যোগ দিয়েছেন, তাঁরাও মিছিলে অংশ নিয়েছেন। '৬৫-র নির্বাচনে আইউবের বিজয়ে সাময়িক হতাশা এসেছিল। '৬৫-র সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পরই দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল। '৬৬-র মার্চে ছয়-দফা জনগণের সামনে এল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা—যাকে ছাত্রনেতারা বললেন, পিণ্ডি ষড়যন্ত্র মামলা—গোপনে যে-বার্তা সাধারণ বাঙালীর হৃদযন্ত্রে ঘা দিয়ে জানিয়ে গেল তারই প্রবল প্রতিক্রিয়া—

তোমার দেশ আমার দেশ
বাঙলাদেশ। বাঙলাদেশ।

কবিতার পঙ্‌ক্তি নয়—শ্লোগানের ভাষা। বাংলাদেশের কবির নতুন উপলব্ধি।

জীবন মানেই
তালে তালে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মিছিলে চলা, নিশান ওড়ানো
অন্যায়ের প্রতিবাদে শূন্যে মুঠি তোলা
জীবন মানেই
স্ফুলিঙ্গের মত সব ইস্তাহার বিলি করা

আনাচে কানাচে

শামসুর রাহমান যেন শিল্পীদের করণীয় কর্মের নির্দেশ দিচ্ছেন।

ট্রাক-ট্রাক-ট্রাক
ট্রাকের বুকে আগুন দিতে মতিয়ুরকে ডাক—
কোথায় পাবো মতিয়ুরকে
ঘুমিয়ে আছে সে
তোরাই তবে সোনা-মানিক
আগুন জ্বেলে দে।

কারফিউ ভাঙার উৎসাহ ও ব্যস্ততা ফুটে ওঠে আল মাহমুদের হাঁকেডাকে, সৃজনশীল শিল্পী সময়ের অঘোষিত নির্দেশে বিদ্রোহী জনতার একজন হয়ে ওঠেন।

আধুনিক ইতিহাসের কলঙ্কতম পাতায় আমরা আজ নিঃশ্বাস নিচ্ছি। দশ লক্ষ মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে আমরা সগর্বে ঘোষণা করছি; আমরা মানুষের উপর বিশ্বাস হারাই নি।

আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বজন হারানোর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার বিনিময়ে বাংলাদেশের মানুষ বাঙালী হয়েছি। বাংলা সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় ও আন্তরিক হয়েছে। শোষণের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার নৈতিক প্রেরণা যোগাচ্ছে এই রক্তার্জিত চেতনা।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যযুগে বাস করেও আমরা মধ্যযুগের সর্বাধুনিক গানই গাই—

শুনহ মানুষ ভাই—
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

বাঙালীর আত্ম-অনুসন্ধান ও লোক-ঐতিহ্যের চর্চা

—আবদুল হাফিজ

একটি জাতির সামগ্রিক জাগরণের মূলে থাকে আত্ম-অনুসন্ধান, যেমন সম্প্রতি ঘটেছে বাংলাদেশে অথবা ঘটেছিল ইউরোপের নানা দেশে একসময়, বিশেষ ঐতিহাসিক কাল-পরিবেশে, অর্থনৈতিক অবস্থার তারতম্যে ; এবং রাজনৈতিক ক্রোধ যেহেতু শোভাযাত্রা-ফেস্টুন-প্রাচীরপত্রে সর্বদা দৃশ্যগোচর হয় অথবা যেমন বিপ্লব রক্তপাতে তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে সংবাদপত্রে বা সর্বচক্ষুর প্রত্যক্ষগোচর হয়, তেমন অবশ্যই ঘটে না মানসিক বিস্ফোরণের বেলায়, কেননা আত্ম-অনুসন্ধান একটি মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, লোকচক্ষুর অন্তরালে তা ঘটে যায় ধীরে-সুস্থে কিন্তু নিশ্চিতভাবে। সাংস্কৃতিক বিকাশ-ধারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধার ধারে বটে, কিন্তু তার জন্ম, বিকাশ ও বিলয় অন্য কোন ঘটনার মত হঠাৎ চোখে পড়ে না, বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্যের (Folklore) চর্চা এবং তার বিকাশের ধারাটি আলোচনা করলে তার প্রমাণ মেলে, অথচ অনুভব না করে পারি নি, কী নিঃশব্দে কত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেছে। আমরা স্বীকার করি আর নাই করি, এসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ধীরে কিন্তু নিঃসন্দেহে বাঙালীর আত্ম-অনুসন্ধানকে ত্বরান্বিত করেছে ও বাঙালী জনগোষ্ঠীর সমস্ত মানুষ লোক-ঐতিহ্যের মধ্যে আত্ম-প্রতিকৃতির সন্ধান পেয়েছে। এবং একথা যদিও মানি যে, বাঙালীর আধুনিক শিল্প-সাহিত্যের বিকাশও কম মূল্যবান নয়, তবু বাঙালী মানসের পরিচয় নিখুঁত ভাবে তার লোক-ঐতিহ্যের মধ্যেই নিহিত।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর, পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের জিগির তুলে বাঙালীর লৌকিক এবং আধুনিক সংস্কৃতিকে হত্যা করবার যে, প্রচেষ্টা চালায়, তার ইতিহাস রচিত হয় নি বটে, কিন্তু মোল্লা-মৌলভী এবং তথাকথিত ইসলাম-দরদী রাজনৈতিক দলগুলি ক্রমাগত বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্যের উপর যে হামলা শুরু করে, তারই ফলে বাংলাদেশ জুড়ে যে-রকম লোকনাট্যের অভিনয় চালু ছিল, তা বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে 'বিষহরির পালা' ছিল খুবই জনপ্রিয়, বর্তমানে তা আর অভিনীত হয় না।

এমনি করেই বাংলাদেশের বহু লোকসঙ্গীত হারিয়ে গেছে, বহু লৌকিক অনুষ্ঠান বর্জিত হয়েছে, সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোক-নৃত্যকলা। লোকশিল্পের যদিও কিছু উদাহরণ পাওয়া যেত, কিন্তু লোক-নৃত্যকলার কোন শিল্পীই আর দেশে নেই। লোক-ঐতিহ্যের উপর উপর্যুপরি আক্রমণ, হিন্দু জনগণের ব্যাপক দেশত্যাগ, সরকারী পক্ষের জোরালো প্ররোচনা ও প্রচারণা ইত্যাদির ফলে লোক-ঐতিহ্য মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। অন্যান্য যে-কোন ঘটনার মত সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীও যেহেতু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপরই নির্ভরশীল, সেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিরা বাংলাদেশকে নির্মমভাবে শোষণ করবার ফলে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে এবং 'বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ' বাংলাদেশ সর্বস্ব হারিয়ে ঔপনিবেশিক শোষণের জাঁতাকলে পড়ে প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে থাকে। আধুনিক সাহিত্য-সংস্কৃতি তো বটেই, লৌকিক সংস্কৃতিও অর্থনৈতিক শোষণের চাপে বিকাশের সমস্ত পথ হারায়। পাকিস্তানের শাসকচক্র ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে শুধু অর্থনৈতিক সাহায্যই পায় নি, পেয়েছিল অস্ত্র-সম্ভার এবং সেইসঙ্গে সাম্রাজ্য-বাদীদের সাংস্কৃতিক তত্ত্ব। এই সাংস্কৃতিক তত্ত্বের মৌলিক বক্তব্য হল: ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দিক থেকে সংস্কৃতির মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ কর, জাতীয় সংখ্যালঘুকে সাংস্কৃতিক দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে দেবে না এবং উভয়কে বিচ্ছিন্ন কর এবং সর্বোপরি জাতীয় সংহতির নামে পাকিস্তানের জাতিসত্তাগুলিকে (Nationalities) নির্মমভাবে হত্যা কর। বস্তুত হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের জনগণকে বিভিন্ন অজুহাতে বিচ্ছিন্ন করবার নীতিতে পাকিস্তান ছিল অবিচল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণকে হিন্দুয়ানীর ভয় দেখিয়ে তাকে আপন লোক-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধেই লেলিয়ে দেবার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতেছিল করাচী-পিণ্ডির নয়া-উপনিবেশবাদী সরকার। ঠিক একইভাবে বাংলাদেশের উপজাতিগুলি—যেমন সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজবংশী, গারো, চাকমা, কুকি, পাংখো প্রভৃতি কুড়িটি জনগোষ্ঠীর জনগণও কোন সুবিচার পায় নি পাকিস্তানের জঙ্গীশাহীর কাছে। কাজেই বাংলার হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ও উপজাতিগুলি মানবিক দিক থেকেও ছিল বঞ্চিত। আপন আপন লৌকিক সংস্কৃতির চর্চা করবার অধিকার প্রতিটি জনগোষ্ঠীর জন্মগত অধিকার। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের একান্ত তাঁবেদার পাকিস্তান সরকার মানুষকে দেয় নি তার

মৌলিক অধিকার, দেয় নি তাকে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-অনুযায়ী বসবাসের অধিকার—বিশ্বের ইতিহাসে এ-ঘটনার জুড়ি মেলা ভার।

কিন্তু সমস্ত স্বার্থান্ধ শোষণ-লোলুপ উপনিবেশবাদী শাসনের বিরুদ্ধেই বিপ্লব-বহ্নি জ্বলে ওঠে গোপনে গোপনে, তারপর সৃষ্টি হয় বৃহৎ দাবানলের। কংসের কারাগারে যেমন জন্ম হয় কৃষ্ণের কিংবা দৈত্যকুলে যেমন জন্ম হয় প্রহ্লাদের, তেমনি ঔপনিবেশিক শোষণের ভেতরে ভেতরে তৈরি হতে থাকে শোষণ-বিরোধী শক্তিসমূহের, প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয় বিপ্লব-বাহী সাংস্কৃতিক তত্ত্ব। পশ্চিম-পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে। প্রথম সার্থক সংগ্রাম শুরু হয় ১৯৪৮ সালে প্রথম রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্যে, ১৯৫২ সালের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তারই সার্থক পরিণতি ও ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে প্রতিক্রিয়ার শক্তি পরাজিত হয়, পশ্চিম-পাকিস্তানী পুঁজিবাদের বাঙালী তাঁবেদারেরা চিরকালের জন্য মঞ্চ থেকে বিদায় নেয়—ফলে ১৯৫২ সাল থেকে বাঙালী সংস্কৃতির নিরঙ্কুশ চর্চা শুরু হয়ে যায় এবং সেইসঙ্গে লোক-ঐতিহ্যের প্রতি গুণীজনের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। একথা সত্য যে, রাষ্ট্রভাষার সংগ্রাম শুধুমাত্র সাংস্কৃতিক সংগ্রাম ছিল না, কিন্তু চারিত্র্যে ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এ-আন্দোলনের মৌলিক বক্তব্য ছিল সাংস্কৃতিক স্বাধিকার অর্জন। বাঙালীর পক্ষে এও এক মহাগৌরবের কথা যে, সে তার সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনকে পরিণত করেছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। এবং সে সংগ্রাম আজ রূপান্তরিত হয়েছে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে, বাংলা ও বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধে। পৃথিবীর ইতিহাসে এও একটি বিরল ঘটনা।

১৯৫২ সাল থেকে বাঙালী জনগণের মধ্যে যে-মুহূর্তে সাংস্কৃতিক চেতনা দেখা দিল, তখন থেকে শুরু করে আজ অবধি লোক-ঐতিহ্যের মধ্যে তারা আপনার প্রতিকৃতির সন্ধান করেছে। গত কুড়ি বছরের মধ্যে লোক-ঐতিহ্য সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত সাত শতেরও অধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হয় অসংখ্য বই-পুস্তক। বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও অসংখ্য গুণী ব্যক্তি এগিয়ে আসেন লোক-ঐতিহ্যের সংগ্রহে ও চর্চায়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাঙলা একাডেমী। একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একটি লোকসাহিত্য বিভাগ খুলে তাতে লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উদাহরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কাজ

শুরু করা হয়। একাডেমী প্রতিটি জেলায় বেতনভুক সংগ্রাহক নিয়োজিত করে জেলাভিত্তিক সংগ্রহের কাজ আরম্ভ করেন। একাডেমীর সংগৃহীত লোক-সংস্কৃতির উদাহরণের মধ্যে রয়েছে: লোককাহিনী, লোকসঙ্গীত, ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোকসংস্কার, লোকশিল্প এবং লোকবাদ্যযন্ত্র। বাঙলা একাডেমীর সংগ্রহই পরিণত হয়েছে বাংলাদেশের বৃহত্তম লৌকিক সংস্কৃতির সংগ্রহশালায়। আমি যতদূর জানি, আয়ার্ল্যাণ্ডের সংগ্রহশালায় দেড় লক্ষাধিক পৃষ্ঠায় সংগৃহীত হয়েছে লোককাহিনী। কিন্তু তুলনায় একাডেমীর সংগ্রহশালা বিচিত্র। অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় লোকসাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্যিকী', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্য-পত্রিকা', বাঙলা উন্নয়ন-বোর্ডের পত্রিকা, ইতিহাস পরিদের 'ইতিহাস' পত্রিকা, বাংলাদেশের মাসিক, ত্রৈমাসিক ও দৈনিক পত্রিকাগুলি, কলেজ-স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সাময়িকী ও ম্যাগাজিনসমূহে লৌকিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকের ওপর প্রবন্ধ প্রকাশ করেছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা লোক-ঐতিহ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছেন কিংবা এ-বিষয়ক প্রবন্ধ বা বইপুস্তক লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, অধ্যাপক মনসুর উদ্দিন, কবি জসিম উদ্দিন, ডঃ মযহারুল ইসলাম ও ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধান অবদান রেখেছেন বাংলাদেশের অসংখ্য শিক্ষক, ছাত্র ও লোকসংস্কৃতির অনুরাগী স্বল্পশিক্ষিত মানুষ। অন্যদিকে লোকশিল্পের সংগ্রহে সর্বাধিক অবদান হ'ল শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের, আর এই সঙ্গে স্মরণ করি শিল্পী কামরুল হাসান ও রাজসাহী 'পাকিস্তান কাউন্সিল'-এর আঞ্চলিক পরিচালক জনাব তোফায়েল আহমেদের নাম। প্রকৃতপক্ষে বহু মানুষের বহু পরিশ্রম ও প্রতিভার যোগে বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্যের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও চর্চা আজ অবারিত হতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল, ঠিক কিভাবে বাঙালী তার আপন প্রতিকৃতি ও স্বরূপকে জানতে পেরেছিল লোক-ঐতিহ্যের সুবিস্তৃত ধারার মধ্যে?

সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাসসমূহ ও বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্য

বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীস্টান ও কুড়িটি উপজাতি একই ভৌগোলিক পরিবেশে, একই আবহাওয়ায়, একই ঐতিহাসিক কাল-পরিবেশে

শতাব্দীর পর শতাব্দী বসবাস করেছে, একই আবেগে, ধ্যানে-ধারণায় অনুপ্রাণিত হয়েছে, একই রকম আচার-ব্যবহার, পূজো-পার্বণ, দৈনন্দিন কাজকর্মে অভ্যস্ত হয়েছে, একই রকম প্রাকৃতিক ও মানসিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছে—অথচ সেই বাঙালী জাতিকে বিভক্ত করবার জন্য পশ্চিম-পাকিস্তানী শাসকচক্র সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে দ্বিধা করে নি। ভাবলে আনন্দ হয়, বাঙালী আজ এক হয়েছে, অভিন্ন সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে, জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যিনি বা যাঁরা লোক-ঐতিহ্যের সংগ্রহে বা বিশ্লেষণে নিয়োজিত তাঁরাই জানেন, লোক-ঐতিহ্যের শেকড় সর্বপ্রাণবাদে প্রোথিত। সর্বপ্রাণবাদে অধিকার সামগ্রিকভাবে মানব-সমাজের। যে-মুসলিম মাতা সন্তানের মঙ্গলকামনায় পীরের দরগায় শিন্নী দেন, তিনি জানেন না হয়তো—ঠিক একই ভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়ে একজন হিন্দু-মাতাও স্বামী-পুত্র-কন্যার মঙ্গলের জন্য কালীর দুয়ারে ধরণা দেন। উভয়ের বিশ্বাস উৎপত্তি লাভ করেছে সর্বপ্রাণবাদ থেকে। 'মানসিক' করবার মধ্যে সত্যবস্তুটা কি? একজন যা মনে মনে চান, তা যেন পূর্ণ হয়। পীরের মধ্যে অগাধ শক্তি, এমন কি তিনি মরে যাবার পরও তাঁর শক্তি কমে না। আর সেজন্যই পীরের দরগায় কিছু দেব বলে মানত করলে তা দিতে হয়। কালীই হোন আর যে-কোনও দেব-দেবীই হোন, দৃশত তিনি বা তাঁরা মৃন্ময় মূর্তিধারী বা ধারিণী, কিন্তু তার ভেতরে আছে জাগ্রত মহাশক্তির আধার। সেজন্যই হিন্দু মোটর বা বাস ড্রাইভার পথিপার্শ্বে কালী মন্দিরে সামান্যক্ষণের জন্য হলেও বাস থামিয়ে পয়সা দেয় আর একই কারণে মুসলিম বাস ড্রাইভার পথের পাশে পীর-দরবেশ-ফকিরের মাজার কিংবা দরগা দেখলে বাস থামায় এবং পয়সা দিয়ে চলে যায়। বিশ্বাস করা হয় যে, তা না করলে বাস বা মোটর বন্ধ হয়ে যাবে। কখনও কখনও এমন ঘটে যে, একই ড্রাইভার যুগপৎ মন্দিরে এবং দরগায় গাড়ি থামিয়ে পয়সা দেয়। যিনি মৃত তিনি যে কি করে মৃত্যুর পরেও শক্তির লীলা দেখান অথবা আপাতত যিনি মৃত্তিকামূর্তি-ধারিণী, তিনি যে কি করে জাগ্রত মহাশক্তির প্রমাণ দেন, তা বিজ্ঞানের জিজ্ঞাস্য বিষয় হতে পারে, কিন্তু লোকতাত্ত্বিক (Folklorist) সে-বিষয়ে নীরব থাকতে বাধ্য। কেন না মানুষ যা বিশ্বাস করে, মানুষ যা মানে, মানুষ যা সৃষ্টি করে, শুধু তাই তাঁর আলোচ্য বিষয়। যে-মুসলিম রমণীর পক্ষে পৌত্তলিকতা একান্ত নিষিদ্ধ এবং যিনি দিনে-রাতে পাঁচবার নামাজ পড়েন তিনি হিন্দু রমণীর মত বিশ্বাস করেন রবিবারে

বাঁশ কাটা মানা—কেননা ঐ দিনটি বাঁশের জন্মদিন। সমগ্র বাংলাদেশে এই কৃষি-বিষয়ক বিশ্বাসটি প্রচলিত। তেমনি অনাবৃষ্টি কালে কৃষির সবচেয়ে সঙ্কটের দিন যায়। কি হিন্দু কি মুসলমান সবাই একই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'হুদমা দেও'য়ের গান গায়, বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে মাগুন করে বদনা মাথায় নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বদনার জল ছিটোনো হয়, লাঙল উল্টো করে পুঁতে রাখা হয়, মেয়েরা গ্রামের নির্জন প্রান্তে বিবস্ত্র হয়ে নাচ করে—মাটিতে পানি ফেলে কাদা করে এবং ব্যাঙের বিয়ে দেয়। এককালে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ক্ষেত্রপূজা। হিন্দু-মুসলমান সবাই জমিতে ধান বা অন্য ফসল লাগাবার পূর্বে জমিতে ক্ষীর-গুড় দিত, দরিদ্রকে খাওয়াত, ধান কাটার সময় নানারকম আচার-অনুষ্ঠান করত, ধান কাটা হলে সাড়ম্বরে নবান্ন করত। এসব স্থলে সবার দৃষ্টিভঙ্গী এক ও অভিন্ন—জমির মঙ্গলার্থে, অধিক ফসল উৎপাদনের আশায় এবং ভবিষ্যৎ যাতে নিশ্চিত হয়, সেজন্যই এগুলি করা হয়। নারীর জীবনে সঙ্কট আসে বারে বারে—যেমন প্রথম ঋতুস্রাবের সময়, বিয়ের সময়, গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসবের সময়। এবং এ-ধরনের প্রতিটি সঙ্কটের ক্ষেত্রে—হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ-খ্রীস্টান একই ক্রিয়া (RITUAL) ও অনুষ্ঠান (CEREMONY) পালন করেন। গর্ভে সন্তান থাকলে বাংলাদেশের নারীরা লাউ-কুমড়ো কাটেন না, কোন জিনিস ডিঙিয়ে যান না, সহজে বাড়ির পেছন দিকে যান না, অমাবস্যাকালে সাবধানে থাকেন। সন্তান হলে আঁতুড়ে আগুন রাখা হয় সর্বক্ষণ, শিশুর শিয়রে রাখা হয় লোহার যে-কোনও অস্ত্র বা জিনিস, পোয়াতীকে বাইরে যেতে হলে নানা নিয়ম-কানুন মানতে হয়। তেমনি নবজাতকের বেলায় আছে বহু বাধানিষেধ। শিশুর কপালে কিংবা কপোলে কালো টিপ ছাড়া বাইরে নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ—কেননা কুদৃষ্টির প্রভাব মারাত্মক হতে পারে। মানব-জীবনের হেন পর্যায় নেই, যেখানে সংস্কার নেই। খাওয়া, শোয়া, কাপড় পরা, মলমূত্র ত্যাগ, জন্ম, মৃত্যু, আধি-ব্যাধি, প্রাকৃতিক আপদ-বিপদ, কৃষিকাজ, বৃক্ষরোপণ, ফসলকর্তন, প্রেম-ভালবাসা, বিবাহ, ভ্রমণ, ক্রয়-বিক্রয়, পঠন-পাঠন, বিদ্যালাভ, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মপালন, যৌন-জীবন সর্বত্র আছে সর্বপ্রাণবাদ থেকে উদ্ভূত লোকবিশ্বাসের নির্মম রাজত্ব। এখানে হিন্দুও এক, মুসলমানও এক, এখানে খ্রীস্টানও অভিন্ন, বৌদ্ধও অভিন্ন—অভিন্ন সমস্ত উপজাতিও। বলা বাহুল্য—সমস্ত বিশ্বের মানুষ এই একজায়গায় পরস্পরের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধনসূত্রে

আবদ্ধ। বাংলাদেশের এমন কোনও স্ত্রীলোক নেই, যিনি তাঁর ঋতুস্রাবকালে ব্যবহৃত ন্যাকড়া লোকচক্ষুর আড়ালে না রাখেন। কারণ ঐ ন্যাকড়াকে মন্ত্রপূত করে তাঁর ক্ষতি করা সম্ভব। বাংলাদেশে এমন কোনও কৃষক নেই, যিনি কৃষি বা আবহাওয়াসংক্রান্ত (Agricultural and Weather Beliefs) ব্যাপারে একটা না একটা সংস্কার মানেন। অসুখ-বিসুখে সমস্ত ডাক্তারি, কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথি বিদ্যা যদি ব্যর্থ প্রমাণিত হয়, তাহলে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের লোকেরাও সংস্কারের হাতে আত্মসমর্পণ করেন। ঝাড়-ফুঁক, তেল পড়া, পানি পড়া, সন্ন্যাসীর পাদোদক কিছুই তখন বাদ যায় না। আর এ-সমস্ত সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও লোকবিশ্বাস এসেছে সর্বপ্রাণবাদ থেকে।

সর্বপ্রাণবাদ বস্তুর মধ্যে অবস্থিত শক্তিতে বিশ্বাস করে। পাথরে, পাহাড়ে, মৃত্তিকায়, বৃক্ষে, আকাশে, চন্দ্র-সূর্যে, সাপে-গরুতে, কীট-পতঙ্গের মধ্যে রয়েছে মহাশক্তি। এই মহাশক্তিই পরবর্তী কালে দেব-দেবীরূপে পূজিত হয়েছে, এর থেকেই এসেছে সর্বশক্তিমান এক দেবতার ধারণা—আরও অনেক পরে সামন্তবাদী সভ্যতার উন্মেষ কালে 'এক দেবতা'র ধারণা জন্ম দিয়েছে একটিমাত্র সৃষ্টিকর্তার, যিনি ঈশ্বররূপে সর্বধর্মে স্থান লাভ করেছেন। কাজেই আজকের ধর্মীয় বিশ্বাসের বহু পূর্বে মানব-জন্মকালেই এসেছিল লোকবিশ্বাস। পূর্ব-দিগন্তের অন্ধকার-জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে যখন সূর্য তার যাত্রা শুরু করত, তখন পৃথিবীর আদিমতম অধিবাসীরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত সূর্যের মহান শোভাযাত্রার দিকে। সূর্যদেব উঠেছেন তাঁর রথে, দিগ-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে তাঁর দেহজ্যোতি। বিস্ময় এবং বিশ্বাসের থেকে জন্ম হয়েছিল Myth বা পুরাণ-কাহিনীর। পুরাণ-কাহিনী তাই সমগ্র মানব-সমাজের সৃষ্টি, যৌথ সৃষ্টি—তাতে সকলের সমান অধিকার। পরবর্তী কালে সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ম এসেছে, সামন্তবাদের সঙ্গে মিতালী করে সে ধর্ম ক্রমাগত জাতিভেদের পাষাণ-প্রাচীর রচনা করেছে, আরো অনেক পরে ধর্ম পুঁজিবাদী শোষণের সেবাদাসী হয়েছে, উপনিবেশ রক্ষায় ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মত পুঁজিপতিও শ্রমিক-শ্রেণীর কাছে আনুগত্য আদায় করতে চেয়েছে। মানব-সভ্যতায় ধর্মের অবদানকে কেউ অস্বীকার করেন না—কিন্তু সেই সঙ্গে জানা দরকার, ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে পাকিস্তান সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং সেই ধর্মের নামেই বাঙালী জাতিকে বিভক্ত করা হয়েছে, সেই ধর্মের নামেই বাংলাদেশে জাতিহত্যা

করা হচ্ছে, সেই ধর্মের নামেই বাংলাদেশের আধুনিক ও লৌকিক সংস্কৃতির টুঁটি চেপে ধরে শ্বাসরোধ করবার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং এ-মুহূর্তেও তা করা হচ্ছে এবং সেই ধর্মের নামেই জাতীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে নিধনের কাজ করা হচ্ছে। অথচ বাংলাদেশের সমস্ত মানুষ লোকবিশ্বাসের ক্ষেত্রে এক অভিন্ন বন্ধুত্বে আবদ্ধ।

লোকতাত্ত্বিক মানুষকে মানুষ হিসেবেই বিচার করেন; হিন্দু বা মুসলমান হিসেবে নয়। পাকিস্তানের শাসকচক্র প্রথমাবধি বাঙালীকে ধর্মীয় দিক থেকে ভাগ করে শাসন করবার চেষ্টা করেছে। পাকিস্তানের জবরদস্ত জঙ্গী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কালো দশকে একটি ভীষণ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছিল—সেই তত্ত্বের মোদ্দা কথাটা ছিল—বাঙালী বলে কোন জাতের অস্তিত্ব নেই, আছে হিন্দু, আছে মুসলমান, আছে খ্রীস্টান, আছে বৌদ্ধ। এই চাপের ফলেই অবশ্য বাঙালী অনুভব না করে পারে নি সে হিন্দু নয়, সে মুসলমান নয়, সে বৌদ্ধ কিংবা খ্রীস্টান নয়, সে শুধুই বাঙালী, বাঙালী ছাড়া সে আর কিছুই নয়। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের Divide and Rule নীতিটা খুব ভালো করেই আয়ত্ত করেছিল। এবং বাঙালী যাতে তার নিজস্ব নামটাও ভুলে যায়, সেজন্য বাংলাদেশের নাম করেছিল 'পূর্ব-পাকিস্তান', সেজন্যই বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করবার প্রশ্নকে বানচাল করার সব রকম প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা এভাবেই জাতি-সত্তাকে হত্যা করে শোষণের প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। বাঙালীর জাতীয়-সত্তাকে রক্তাক্ত করে পাঞ্জাবের শোষকেরা বাঙালী জাতিকেই হত্যা করতে চেয়েছিল। কিন্তু সংস্কৃতি-সচেতন বাংলাদেশের গণ-মানুষ জ্বলে উঠেছিল আগ্নেয়গিরির মত, প্রতিরোধের পর প্রতিরোধ রচনা করে সে তার সংস্কৃতির বিপর্যয়কে রোধ করেছে।

বাংলাদেশের জনগণ তাই আপন লোক-ঐতিহ্যের চর্চা করতে গিয়ে নিজেকে খুঁজে পেল। কিন্তু কি ভাবে?

লোক-ঐতিহ্যের শ্রেণীবিভাগ ও বাঙালীর আত্ম-অনুসন্ধান

১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পর থেকে অসংখ্য মানুষ লোক-ঐতিহ্য সম্বন্ধে লিখতে থাকেন। এঁদের মধ্যে গুটিকত ব্যক্তি ছিলেন পণ্ডিত। কিন্তু সর্বাধিক লেখক ছিলেন গ্রামের মানুষ—যাঁদের সঙ্গে বাংলার

গ্রামাঞ্চলের প্রাণের যোগাযোগ ছিল। এঁরা ভালবাসতেন বাঙালীর লোক-ঐতিহ্যের আবহমান ধারাকে এবং সেই তাগিদেই লিখতেন। এঁদের কারো মধ্যে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। চারদিকের নিরানন্দ পরিবেশে বাস করে, এঁরাই খুঁজে বের করেছিলেন বাংলা-মায়ের আনন্দময় স্বরূপকে। লোক-ঐতিহ্যের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। কোন রক্ষণশীলতা ছিল না। কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল না। কিন্তু লোক-ঐতিহ্যের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা নির্ণয়, লোক-ঐতিহ্যের শ্রেণীবিভাগ কিংবা লোক-ঐতিহ্যকে বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠনের বিষয় হিসেবে উপস্থিত করবার মত ক্ষমতা এঁদের কারো মধ্যে ছিল না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও এঁরাই বাঙালীর সত্তাকে খুঁজে বের করেছিলেন বাঙালীর লোক-ঐতিহ্যের মধ্যে।

লোক-ঐতিহ্যের সঠিক সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। বাংলায় ইংরেজী Folklore শব্দটির কোনও সঠিক প্রতিশব্দ নেই। পণ্ডিত ব্যক্তিরা এ শব্দটির অনেক প্রতিশব্দ নির্ণয় করেছেন বটে, কিন্তু সেগুলি নিয়ে বিতর্ক আজও মেটে নি। আমি Folklore-এর পরিবর্তে বাংলায় লোক-ঐতিহ্য ব্যবহারের পক্ষপাতী। যে-কোনও একটি ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককাহিনী, একটি নকৃশী কাঁথা কিংবা যে-কোনও একটি লোকনৃত্য লোক-ঐতিহ্য বলে অভিহিত হতে পারে। ইংরেজীতে যে-শাস্ত্র বা বিজ্ঞান লোক-ঐতিহ্যের বৈজ্ঞানিক পঠন-পাঠন করে থাকে —তাকে আজকাল The Science of Folklore বা Folkloristics বলে অভিহিত করা হয়। বাংলায় যে-শাস্ত্র বা বিজ্ঞান লোক-ঐতিহ্যের এবংবিধ পঠন-পাঠন করে তাকে লোকতত্ত্ব বলে অভিহিত করা যায়। লোকতত্ত্বের সংজ্ঞা নিম্নলিখিতরূপে করা যেতে পারে :

যে-শাস্ত্র বা বিজ্ঞান লোক-সমাজে প্রচলিত লোক-ঐতিহ্যের সামগ্রিক পঠন-পাঠন করে থাকে তাকেই লোকতত্ত্ব বলে অভিহিত করা যায়। লোক-সমাজ বলতে সেই সমাজকে বোঝাবে যে-সমাজের অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর বা Non-literate এবং এই সমাজে কিছু সংখ্যক শিক্ষিত লোক থাকলেও থাকতে পারেন। শহরাঞ্চলেও লোক-ঐতিহ্যের সন্ধান পাওয়া যায়—কিন্তু লোকতত্ত্ব প্রধানত নিরক্ষর লোক-সমাজের ঐতিহ্য সম্বন্ধেই আগ্রহী।

বাংলাদেশ লোক-ঐতিহ্যের দিক থেকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধ অঞ্চল। কিন্তু এ-পর্যন্ত লোক-ঐতিহ্য যতটা সংগৃহীত হয়েছে, তা অকিঞ্চিৎকর বললে

অত্যুক্তি হয় না। যাই হোক, লোকতত্ত্বের বিষয়বস্তুকে নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণী বিভক্ত করা যায় :
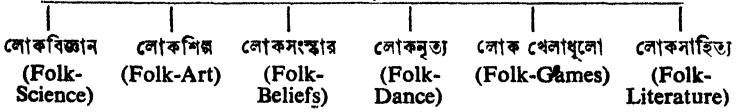
লোকতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রেণীবিভাগ করলে উপরি-উক্ত বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলাদেশ গত কুড়ি বছরে আত্ম-অনুসন্ধান করতে গিয়ে মৌলিক-ভাবে লোক-সাহিত্যের চর্চা করেছে বেশি। কারণ যে-কোনও লোকের পক্ষে এটাই সহজে করা সম্ভব ছিল। লোকবিজ্ঞান, লোকশিল্প, লোকনৃত্য, লোক-খেলাধূলো বিষয়ে তেমন গবেষণা হয় নি। লোকবিজ্ঞান নিয়ে একটিও প্রবন্ধ লেখা হয় নি। লোকনৃত্য সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত একটি প্রবন্ধ পড়েছি। লোকশিল্প সংগৃহীত হয়েছে, কিন্তু এ-বিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য গবেষণা হয় নি। লোক-খেলাধূলোর মধ্যে লাঠি-খেলা সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়বার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। লোকসংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। লোকশিল্প সম্বন্ধে কবি জসিম-উদ্দীনের দু'টি, শিল্পী কামরুল হাসানের দু'টি ও শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের একটি প্রবন্ধ পড়েছি। অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমেদের 'আমাদের প্রাচীন শিল্প' গ্রন্থটিতে এ-বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু বাঙলা একাডেমীর সংগ্রাহক জনাব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান এ-বিষয়ে একাধিক চিত্রশোভিত প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সুতরাং দেখা যায়, লোকসাহিত্য ব্যতীত লোকতত্ত্বের অন্যান্য বিষয়ে আগ্রহ থাকলেও কাজ করা ছিল দুরূহ। আর একটি ব্যতিক্রম হল লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ ও আলোচনা। কিন্তু লোকসঙ্গীতের সুর সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যম ছাড়া সামগ্রিক প্রচেষ্টা অনুপস্থিত ছিল। বাঙলা একাডেমী ১৯৭০-৭১ সালে লোকসঙ্গীতের সুর সংগ্রহের জন্য একটি প্রকল্প নিয়েছিলেন, তার ভাগ্যে যে এখন কি ঘটছে তা কে জানে! কিন্তু লোক-ঐতিহ্যের কোন কোন উদাহরণ যেমন লোকবিজ্ঞান, লোকশিল্প, লোকনৃত্য প্রভৃতির আলোচনা করতে গেলে শিল্পের অন্যান্য শাখার সাধারণ জ্ঞান অবশ্যম্ভাবী

ছিল—কাজেই সকলের পক্ষে এ সবের আলোচনায় প্রবেশ করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু লোকসাহিত্যের ব্যাপক চর্চার মধ্যেই বাঙালী জনগণ আত্মসচেতন হয়ে উঠল। লোকতত্ত্বের সমস্ত আলোচ্য বিষয়বস্তুর মধ্যেই সর্বপ্রাণবাদের প্রভাব আছে অথবা বলা যায় সর্বপ্রাণবাদই বাঙালীর লোক-ঐতিহ্যের মূল ভিত্তি। সর্বপ্রাণবাদ থেকেই উৎপত্তি লাভ করে যাদুবিদ্যা। বাঙালী হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীস্টান যাদুবিদ্যা মানে জীবনের সর্ব স্তরে। যাদুবিদ্যায় বিশ্বাস মুসলমানের ইসলাম কিংবা হিন্দুর ধর্মমতকে কখনেও আঘাত করে নি বরং বলা যায় সমস্ত ধর্মই লোকসংস্কারের সঙ্গে সহাবস্থানের নীতি-নিয়ম মেনে কাজ করছে বাংলাদেশে। এবং চিরকাল ধরে এ-ঘটনা ঘটে আসছে, তবু সাম্প্রদায়িকতার বিষ-বাষ্প ছড়িয়ে যখন হিন্দুকে শুধুই হিন্দু কিংবা মুসলমানকে শুধুই মুসলমান বলে প্রমাণ করবার প্রচেষ্টা করা হয়, তখন তার মূলে থাকে শাসক-চক্রের সর্বনাশা চক্রান্ত। বাংলার লোক-ঐতিহ্যের মধ্যেই এ-চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিহিত রয়েছে। পানিতে কি আছে, তার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাংলার লোকসমাজ জানে না—কিন্তু গঙ্গাজল মহাপুণ্যের উৎস বটে, তেমনি জমজম কূপের পানিও মুসলমানের কাছে পুণ্যের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, আবার খ্রীস্টানের কাছে জর্ডান নদীর পানি পবিত্র। বস্তুর মধ্যে বিশেষ ক্ষমতা বা শক্তির সন্ধান, আগেই বলেছি, সর্বপ্রাণবাদের মূল বিষয়। তাগা-তাবিজ-কবচ ধারণ করে সবাই অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচতে চান। এবং এরকম ক্ষেত্রে জাত-ধর্মের কথা তুলে লাভ হয় না। যাই হোক, লোকতত্ত্বের বিষয়সমূহের স্বতন্ত্র আলোচনায় আরো ধরা পড়বে, বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্যের মধ্যেই বাঙালী তার নিজ স্বরূপকে উপলব্ধি করতে পেরেছে বিশদভাবে।

ক. লোকবিজ্ঞান (Folk-Science)

নিরক্ষর লোকসমাজও বিজ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। বাড়িঘর নির্মাণ, জমিতে আল তৈরি, ক্ষেত নিড়ানি, জমির চাষ, বীজ বোনা, জলসেচ, বৃক্ষরোপণ, স্বাস্থ্যরক্ষা, অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে লোকসমাজ বিজ্ঞান প্রয়োগ করে থাকে। বাংলার মানুষ জাতিধর্মনির্বিশেষে বাংলাদেশের আবহাওয়া অনুযায়ী নিজেদের কাজকর্ম বৈজ্ঞানিক ভাবে করে থাকেন, কিন্তু বিজ্ঞানে ও লোকবিজ্ঞানে পার্থক্য আছে। বিজ্ঞান সংস্কার মানে না, লোকবিজ্ঞান

কিন্তু যাদুবিদ্যাশাসিত। ঘর নির্মাণের কাজটি বাঙালীরা বৈজ্ঞানিক উপায়ে করেন বটে, কিন্তু গৃহের মঙ্গলের জন্য প্রতিটি ঘরের ভিত্তি দেবার সময় সোনা-রূপো, মোহর প্রভৃতি দেওয়া হয়। তেমনি ইট পোড়াবার উপায় বৈজ্ঞানিক হলেও, ইটের ভাঁটায় সবাই আগুন দেন না। ধারণা এই যে তাতে করে বংশ নিপাত হয়ে যাবে। মা বসুমতীকে পোড়ানো মহাপাপ। জমিতে লাঙল দেওয়া হয় বিজ্ঞানের নীতি-নিয়ম মেনে, কিন্তু দিন ক্ষণ বিচার করেন সব কৃষকই। অম্বুবাচীর দিন জমিতে চাষ দেওয়া মানা। ধারণা ধরিত্রী সেদিন ঋতুমতী হন। লোকসমাজের লোকবিশ্বাস (Folk-Belief) যেমন তার ধর্মবিশ্বাসকে (Religious Belief) আঘাত হানে না; তেমনি তার বিজ্ঞান ও যাদুবিদ্যা পরস্পরকে সাহায্য করে যাচ্ছে নিরবধি কাল থেকে। এবং এই দুটির কোনটিই একে অন্যের এলাকায় অবৈধ প্রবেশ করে না। বাংলার বাড়িঘর নির্মাণের নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। থালা-বাটি, বাসন-কোসন, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাট-পালঙ্ক, বেড়া-চালা, দড়ি-দড়া, লাঙল-জোয়াল এবং গরুর গাড়ি প্রভৃতির ক্ষেত্রেও বাঙালীর নিজস্ব ধ্যান-ধারণার ছাপ আছে। লোকবিজ্ঞানের অন্যতম শাখা হল লোক-কারিগরীবিদ্যা (Folk-Technology) —এই কারিগরীবিদ্যার প্রমাণ মিলবে 'শিকা'র গেরোর (Knot) রচনায় কাজে; ঝাঁটার বিচিত্র বিন্যাসে, মাটির হাঁড়ি-পাতিল তৈরির নিয়ম-নীতিতে, কাঠের ও পোড়ামাটির কাজে। দেখা যাবে, লোকবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বাঙালী একই ঐতিহ্যের অধিকারী। হিন্দুর লাঙলের ফাল, মুসলমানের লাঙলের ফাল থেকে আলাদা নয়, তবু এযাবৎকাল হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খ্রীস্টানের পার্থক্যের ওপরই জোর দেওয়া হচ্ছে সর্বাধিক, অথচ বাস্তবত এঁদের মধ্যে গরমিলের চেয়ে ঐক্যের পরিমাণই সর্বাধিক। বাংলার লোক-ঐতিহ্য প্রমাণ করে বাঙালী জীবনের সর্বত্র ঐক্যই প্রধান কথা—ভিন্নতা যা আছে, তা সামান্য। যদিও লোকবিজ্ঞান সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত কোন গবেষণা হয় নি, তবু এই সামান্য আলোচনা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাবে।[১]

১। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য আমার 'লোকসংস্কারের বিচিত্র কথা'-নামক গ্রন্থ দেখুন। পৃঃ ২৬৬-২৬৯ দ্রষ্টব্য।

খ. লোকশিল্পকলা

লোকশিল্প প্রয়োজনের জিনিস। তাতে যেটুকু শিল্প থাকে তা সৌন্দর্যের মাপকাঠিতে বিচার করলে খুব উঁচুদরের বস্তু বলে প্রতীয়মান হয় না। বাংলাদেশের মানুষ কাঁথা, শিকা, আলপনা, পোড়ামাটির মূর্তি ও খেলনা, কাঁচা মাটির তৈরি কিন্তু রঙ-করা পুতুল, নকশী পিঠে, কাঁসা-পেতলের মূর্তি ও অন্যান্য জিনিস, শীতলপাটি, জায়নামাজ ও আসন, দেব-দেবীর মূর্তির চালচিত্র, কুলা, শৌখিন মাটির হাঁড়ি, নকশী লাঠি, কাঠের মূর্তি ও খোদাইয়ের কাজ, পট প্রভৃতির মধ্যে শিল্পকলাকে ফুটিয়ে তোলেন। সারা বিশ্বেই লোকশিল্পকলার দুই ধরনের বিশ্লেষণ দেখা যায়। কোন কোন পণ্ডিত লোকশিল্পকলাকে শিল্প হিসেবে গণ্য করতে চান না। অন্য আর একদল আছেন যাঁরা লোকশিল্পকলাকে রোমান্টিক চোখে বিচার করে তাতে জাতীয়তাবাদের প্রলেপ লাগাতে চান। দু'টি মতই ভ্রান্ত না হলেও, সত্যকে তুলে ধরতে পারে নি। বাংলাদেশের কাঁথার মধ্যে সৌন্দর্যের অঢেল প্রমাণ আছে। ময়মনসিংহের পাকোয়ান বা নকশী পিঠের তুলনা মেলা একরকম অসম্ভব। বেতের কাজের উৎকৃষ্ট উদাহরণ আছে সিলেট-ময়মনসিংহে। রাজশাহী জেলার শৌখিন মাটির হাঁড়ি বাংলাদেশের অন্যত্র দুর্লভ। কাঠ-খোদাইয়ের যে-সব নমুনা আমার হাতে এসেছে, সেগুলি শিল্পকর্মের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। পাবনার পোড়ামাটির খেলনা, বিশেষ করে সন্তানসহ মাতৃমূর্তি প্রায় অবিশ্বাস্য গীতিরসের সন্ধান দেয়। তবে এমন অনেক লোকশিল্প আছে, যাতে শিল্পকলার সামান্য পরিচয়ই পাওয়া যায়। কিন্তু লোকশিল্প প্রধানত প্রয়োজনের জিনিস বলে তাতে সর্বদা রূপরসের সন্ধান সঠিকভাবে নাও পাওয়া যেতে পারে।

লোকতত্ত্বের অন্যান্য বিষয়বস্তুর মত লোকশিল্পকলার উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতিও মূলত সর্বপ্রাণবাদের কাছে ঋণী। লোকশিল্পের মটিফ বিচার করলে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যে কতকগুলি মটিফ যেমন ত্রিভুজ, চক্র, বৃত্ত, রশ্মি-বিকীরণরত সূর্য (Rayed Sun), আড়াআড়ি দণ্ডসমন্বিত চক্র, সর্পিল রেখা, অর্ধবৃত্ত, পদ্ম, শঙ্খ, অর্ধচন্দ্র, রঙীন ও কালো বিন্দু প্রভৃতি যাদুবিদ্যা থেকে উদ্ভূত। যুগ যুগ ধরে বাংলার মা-বোনেরা এ-সব মটিফ ব্যবহার করছেন। এই শিল্পকলার মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। হিন্দু বাঙালী তার লক্ষ্মীর পা, ঝাঁপি কিংবা সরায় যে বক্তব্য রাখেন, বাঙালী মুসলমান জায়নামাজ ও

মহরমের বিচিত্র মটিফসম্পন্ন পিঠেতেও সেই একই বক্তব্য রাখেন। উদ্দেশ্যও একই। ধর্মের মধ্যে যা মহৎ, তাকে উৎসারিত করা। বাঙালীর মা-বোনেরা যে-কাঁথা তৈরি করে, তা বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বহু আগেই। বাংলাদেশ ও বাঙালীকে যদি সত্য অর্থে কোথাও পরিষ্কারভাবে চিনতে পারা যায়—তবে তা হ'ল তার কাঁথার বিচিত্র সম্ভার।[২]

গ. লোকসংস্কার

বাংলাদেশের সমস্ত লোকসংস্কার উদ্ভূত হয়েছে সর্বপ্রাণবাদ থেকে। লোকসংস্কারের সঙ্গে ধর্ম ও যাদুবিদ্যার আত্মীয়তার সম্বন্ধ। লোকতত্ত্বের সমস্ত বিষয়ের মধ্যে লোকসংস্কারই হচ্ছে একমাত্র সাধারণ বিষয়। এ-কারণেই লোকসংস্কারের তাৎপর্যময় পঠন-পাঠন ব্যতীত লোক-ঐতিহ্যের সঠিক বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। আগেই বলেছি, বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রীস্টান শুধু একই রকম লোকসংস্কার মানেন তা নয়, লোকসংস্কারের মধ্যে যে-সব নীতি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে, তাও এক। যে-সব সংস্কার আপাতত ধর্মীয় কারণে এক মনে হয় না, সেখানেও নীতিটি কিন্তু একই থাকে। ধরা যাক, হিন্দু-নারীদের ব্রত পালনের কথা। ব্রত পালনের মূল কথা হ'ল ইচ্ছাপূরণ। ভালো বলেছেন শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

পূর্বকালে মানুষ যে-কোন কারণে হোক মনে করত যে জিনিস সে কামনা

২। লোকশিল্পকলার আলোচনা সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই তথ্যের সন্ধান দিয়েছি। লোকশিল্পের সংগ্রহ রয়েছে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন ও শিল্পী কামরুল হাসান সাহেবের। বাংলা একাডেমীও একটি চমৎকার সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছে। অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদের সংগ্রহও বিচিত্র। লোকশিল্পকলা সম্বন্ধে আমি ব্যাপকভাবে গবেষণা শুরু করি ১৯৬৬ সাল থেকে। ১৯৬৯ সালে ঢাকার 'দৈনিক পাকিস্তান' পত্রিকায় আমি ধারাবাহিকভাবে লোকশিল্পের চিত্রসহ সতেরোটি প্রবন্ধ লিখি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'সাহিত্যিকী'তে লোকশিল্প সম্বন্ধে দুটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করি। বাংলা উন্নয়ন-বোর্ড পত্রিকাতেও এ-বিষয়ে আমার আর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের সমস্ত জেলাগুলি ঘুরে আমি লোকশিল্পের দেড় হাজারেরও বেশি চিত্র তুলতে সমর্থ হই। এ-ছাড়াও আমার এ্যালবামে লোকশিল্পের রঙীন চিত্রও ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের এক পর্যায়ে আমি বাসা ত্যাগ করতে বাধ্য হই। ফলে লোকশিল্পকলা সংক্রান্ত আমার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ও এ্যালবামটি আমি আনতে পারি নি।

করছে, তার প্রতিচ্ছবি লিখে কিংবা তার প্রতিমূর্তি গড়ে তাতে ফুল ধরে কামনা জানালে সিদ্ধিলাভ হবে।[৩]

দশ পুতুলের ব্রতে মেয়েরা রাম-লক্ষ্মণ-সীতা প্রভৃতি মহাকাব্যের নায়ক-নায়িকার মূর্তি গড়ে। তাতে ফুল ধরে মেয়েরা কামনা জানায়, তারা যেন রামের মত পতি পায়, লক্ষ্মণের মত ভাই পায়, আর তারা যেন সীতার মত সতী হয়। মুসলমান মেয়েরা কামনা করে অসুস্থ ছেলে ভাল হলে পীরের দরগায় কবুতর দেবে, পাঁচসিকে পয়সা দেবে, কিংবা পীরের মাজারে বাতি জ্বেলে দেবে। দু'টিই ইচ্ছাপূরণের ঘটনা কিন্তু পরিবেশ ভিন্ন, ভাষা ভিন্ন। এটির উদ্ভব হয়েছে যাদুবিদ্যা বা Magic থেকে। যাদুবিদ্যার একটি অংশের নাম সদৃশ যাদু-বিধান (Homeopathic Magic)। দেখা যাবে, ভিন্নতর পরিবেশে এবং ভিন্নতর ভাষায় পরিবেশিত হলেও উভয়ের ইচ্ছাপূরণের মধ্যে সদৃশ যাদু-বিধানই ক্রিয়াশীল। সদৃশ যাদু-বিধানের মূলকথা—যেমন যেমন কামনা করি, যেন তেমন তেমন ঘটে। যাদুবিদ্যার আর একটি অংশের নাম সংক্রামক যাদু-বিধান (Contagious Magic)। সংক্রামক যাদু-বিধানের মূল বক্তব্য হল দেহের সঙ্গে সম্পৃক্ত যা কিছু তা দেহধারীর ব্যক্তিত্বেরও অংশ পায়। হিন্দু বিধবা যখন গঙ্গাস্নান সেরে ঘরে ফিরতে থাকেন, তখন যদি তাঁর ছায়া (Shadow) কোন অস্পৃশ্য মাড়িয়ে দেয়, তবে তিনি অশুদ্ধ হয়ে যান। পুনর্বার তাঁকে স্নান করতে হয়। ছায়া দেহের সঙ্গে সম্পৃক্ত বলেই দেহের মতই ছায়াও পবিত্র। মুসলমান কনের বিয়ের পর তার গায়ের হলুদ সাবধানে রাখা হয়, যাতে তা কেউ না নিতে পারে। যে-হলুদ কনের গায়ে মাখা হয়েছিল, তাতে কনের ব্যক্তিত্ব সংক্রমিত হয়েছে। সুতরাং সে-হলুদ দিয়ে কনেকে 'গুণ' করা সম্ভব। এভাবে অসংখ্য উদাহরণ উল্লেখ করে প্রমাণ করা যায় যে, বাংলাদেশের মানুষ একই সূত্র থেকে আহরণ করেছে তার লোকবিশ্বাসের অবিশ্বাস্য ভাণ্ডার।[৪]

ঘ. লোকনৃত্য

বাংলাদেশে লোকনৃত্য সম্বন্ধে কোন আলোচনা এ পর্যন্ত হয় নি। কারণ বিষয় হিসেবে লোকনৃত্য অনেক বেশি কুশলী কর্মীর গবেষণার অপেক্ষা রাখে।

৩। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী, পৃঃ ৬১।

৪। বাংলাদেশের লোকসংস্কারের পরিচয় জানতে হলে আমার 'লোকসংস্কারের বিচিত্র কথা' গ্রন্থটি পড়ুন।

দ্বিতীয়ত, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের প্রচারণাও লোকনৃত্যের চর্চাকে রুদ্ধ করে দেয়। লোকনৃত্যের উদ্ভবও হয়েছে যাদুবিদ্যাগত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে ভিত্তি করে। বাংলাদেশের গাজন-নৃত্য, ব্রত-নৃত্য, পুতুল-নাচ ও বিবাহ-নৃত্যে লোকসংস্কারের ব্যাপক পরিচয় বিধৃত। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলা রংপুরে একটি যাদুবিদ্যাগত নৃত্যানুষ্ঠানের নাম হল 'হুদমাদেও'-এর নাচ। রাজসাহীর গ্রামাঞ্চলে অনাবৃষ্টি-সংক্রান্ত একটি নৃত্যের প্রচলন আছে। এর নাম 'মইথারাণীর নাচ।' এ-নাচে বর্ষীয়সী মেয়েরা উলঙ্গ হয়ে অংশ গ্রহণ করে। হিন্দু-মুসলিম কৃষক সমাজে নাচের প্রচলন এককালে ছিল। আজও কোথাও কোথাও আছে।

ঙ. লোক-খেলাধূলো

লোক-খেলাধূলো সম্বন্ধেও কোন পূর্ণাঙ্গ গবেষণা বাংলাদেশে হয় নি। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের মত খেলাধূলোরও উৎপত্তি হয়েছে লোকসংস্কার থেকে। ভবিষ্যৎ গণনার বিদ্যা ও ভাগ্য-পরীক্ষাসংক্রান্ত খেলাধূলো (Games of chance) থেকেই পরবর্তী কালে উদ্ভুত হয় নানা রকমের খেলাধূলো। হাড়ের গুটি ব্যবহৃত হ'ত ভবিষ্যৎ গণনার কাজে। পরে তাই পাশা খেলার গুটিতে রূপান্তরিত হল। যে-সমস্ত খেলা পরে জুয়োতে রূপান্তরিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটিই ছিল ভাগ্য নির্ধারণের খেলা। তাসের খেলাও ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের কাজে ব্যবহৃত হ'ত। বাংলাদেশের শিশু ও বয়স্ক মেয়েদের খেলার সঙ্গে অবশ্যই কোন না কোন ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের সম্পর্ক ছিল। বাংলাদেশের লাঠি ও হাডু-ডু খেলার মধ্যে পৌরুষ আছে। যাই হোক, লোক-খেলাধূলোর বেশির ভাগ হ'ল আভ্যন্তরীণ বা গৃহে খেলার মত খেলা। খেলার মধ্যেও বাঙালীর নিজস্ব ঐতিহ্য আছে।

চ. লোকসাহিত্য

লোকতত্ত্বের বিষয়গুলির মধ্যে লোকসাহিত্যের পঠন-পাঠন হয়েছে প্রভূত। কিন্তু আজও অবধি লোকসাহিত্যের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা বা শ্রেণীবিভাগ হয় নি। লোকসাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ নীচে প্রদান করা হ'ল :
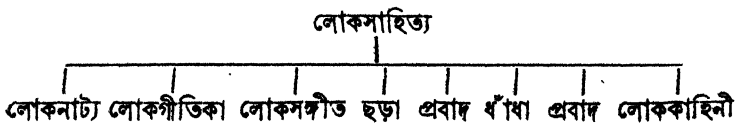
বাংলাদেশে লোকসাহিত্যের সমস্ত বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হলেও লোকনাট্য তার ব্যতিক্রম। লোকনাট্য সম্বন্ধে উৎসাহ খুব একটা দেখা যায় নি। লোকসাহিত্য সম্বন্ধে বই-পুথি বা প্রবন্ধ অনেক। ভাবলে অবাক লাগে, লোক-ঐতিহ্যের ওপর প্রচণ্ড আঘাত সত্ত্বেও এ-বিষয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। নিম্নে লোকসাহিত্যের প্রতিটি বিষয়ের আলোচনা প্রদান করা হ'ল।

ক. লোকনাট্য

লোকনাট্য সম্বন্ধে লেখা হয়েছে অনেক কম, তার কারণ লোকনাট্য শুধু পড়বার বিষয় নয়, তা অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত। কাজেই লোকনাট্যের পঠন-পাঠনে অনেক বেশি সচেতন কর্মীর প্রয়োজন। যাই হোক, লোকনাট্যের বিষয়ে গবেষণা কম হলেও, লোকনাট্য বাঙালী জনগণের লোক-ঐতিহ্যের এক বিপুল পরিচয় বহন করে। কারণ লোকনাট্যের অভিনয় প্রথম দিকে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হলেও পরে তা চালু হয়। লোকনাট্যের দর্শকের অভাব হয় না। ফলে লোক-ঐতিহ্যের মধ্যে লোকনাট্যের আবেদন সর্বদাই প্রত্যক্ষ। জনপ্রিয় লোকনাট্যগুলি জনগণকে বিপুল আনন্দ দিয়েছে। নিরক্ষর জনগণ লোকনাট্যের মধ্যে নিজেদেরকে আবিষ্কার করেছেন নতুন করে। এখানে বলে রাখতে চাই, দু-একটি লোকনাট্যের রচয়িতা মুসলিম হলেও, অধিকাংশ লোকনাট্য রচনা করেছেন বাঙালী হিন্দু। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার হ'ল, লোকনাট্যের কাহিনীও প্রধানত হিন্দু উপাখ্যান থেকে গৃহীত হয়ে থাকে—কিন্তু তাতে মুসলমানদের রসাস্বাদনের কোন ব্যাঘাত ঘটে নি। অভিনেতাদের (লোকনাট্যে কোনও অভিনেত্রী থাকে না) মধ্যেও মুসলমানের সংখ্যা কম নয়। মুসলিমদের রচিত নাটকের কাহিনীও হিন্দু উপাখ্যান থেকে নেওয়া হয়। লোকনাট্যের যে-সমস্ত দলকে আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, তার প্রত্যেকটিতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক থাকতেন। প্রতিটি লোকনাট্যের বন্দনা ইসলাম ও হিন্দুধর্মের মিলনস্থল। বাংলাদেশের একটি প্রখ্যাত লোকনাট্য 'গুণাই বিবি'র বন্দনাংশ উদ্ধৃত করছি। এ-লোকনাট্যটির রচয়িতা একজন মুসলিম।

> প্রথমে মোর আল্লার নামটি নিতে করলাম শুরু
> হায় হায় নিতে করলাম শুরু।
> ওরে দয়া করবেন দয়ার আল্লারে, রাখবেন রাঙা পায়,
> ও মোর দয়ার আল্লারে।

এখানে বলে রাখি, ইসলাম ধর্মে আল্লাহ্‌র অবয়ব কল্পনা করলে তা ইসলামকে অস্বীকার করবার সামিল। কিন্তু লোকসমাজে সর্বপ্রাণবাদের প্রভাব এত বেশি যে, সঙ্গত কারণেই এরকম ঘটে যায়। যাই হোক এর পরের বন্দনাংশটিতে হিন্দু দেব-দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে :

ওরে উত্তরে বন্দনা করি হিমালয় পর্বত,
হায় হায় হিমালয় পর্বত।
ওরে যাহার কিনারায় নাই এই যে মানুষের বসত,
ও মোর আল্লারে।
পূর্বেতে বন্দনা করি সূর্য উদয় ভানু,
ওরে একদিকেতে উঠে ভানু চারিদিকে কিরণ,
হায় হায় ও মোর আল্লারে।
ওরে দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীরোদ সাগর
হায় হায় ক্ষীরোদ সাগর।

বন্দনাটি সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত হলেও এতে বাঙালী হিন্দু মুসলমানের ধর্মীয় চিন্তা যথার্থ সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছে। আল্লাহ্‌র নামে এ-বন্দনাটি শুরু হলেও, পরে পিতামাতা ও সভাস্থ সকলের বন্দনা করা হয়েছে। চারি-দিকের বন্দনায় প্রথমে পশ্চিমের মক্কা, উত্তরের হিমালয়, পূর্বের সূর্য এবং দক্ষিণের ক্ষীরোদ সাগর বা ক্ষীরসমুদ্রের বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলমানদের তীর্থভূমি মক্কা ও মমিন মুসলমানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় হিমালয়কে স্মরণ করা হয়েছে। সূর্য বন্দনা ঋগ্বেদেই পাচ্ছি, সুতরাং রীতি হিসেবে এটি প্রাচীনতার দাবীদার। পুরাণে আছে ক্ষীরোদ সাগর বা ক্ষীরসমুদ্রের কথা। এই ক্ষীরসমুদ্রেই বিষ্ণু অনন্ত শয়ানে শায়িত আছেন। এবারে হিন্দু রচিত একটি লোকনাট্যের বন্দনাংশ উদ্ধৃত করছি :

উত্তরে বন্দনা করি মাগো শিবদুর্গা চরণ,
হিন্দুলোকে পূজে মাগো তোমারি চরণ।
পশ্চিমে বন্দনা করি পীরের আসন,
মুসলমানে করে ধর্ম পড়ে যে কোরান।

['বিফুল মালতী' লোকনাট্য থেকে উদ্ধৃত]

অন্যদিকে লোকনাট্যের রচনা ও পরিচালনার ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম সবাই যুক্তভাবে অংশগ্রহণ করতেন। লোকনাট্যের বন্দনাংশে তারও উল্লেখ থাকত। 'রূপছবি' নামক একটি লোকনাট্যের বন্দনাংশ উদ্ধৃত করছি :

আজিকার গান আমাদের রূপছবি নাম,
সুরসঙ্গীতে রচিয়াছেন তৈয়ব মাষ্টার নাম ॥
ম্যানেজারের চরণ বন্দি' পেরি সরকার নাম,
বদরগঞ্জের উত্তরপার্শ্বে মন্তাপুর গ্রাম ॥
সেক্রেটারির চরণ বন্দি' করমতুল্লা নাম,
দামোদরপুরের দক্ষিণ পার্শ্বে মন্তাপুর গ্রাম ॥
অধিকারীর চরণ বন্দি' মোহাম্মদ হোসেন নাম ;
মন্তাপুরে তাহার বাড়ি শোনেন সর্বজন ॥
দলপতির চরণ বন্দি' কমলাকান্ত নাম,
সেকেরহাটের পশ্চিমপার্শ্বে মন্তাপুর গ্রাম।
প্রমটারের চরণ বন্দি' নগেন্দ্রনাথ নাম,
বাড়ি তাহার শৌলার পাড়ে মন্তাপুর গ্রাম ॥
লীডার বাবুর চরণ বন্দি' জগিন্দ্র সরকার নাম,
শৌলার পাড়ে তাহার বাড়ি মন্তাপুর গ্রাম ॥

এই বন্দনাংশটিতে হিন্দু-মুসলিম জনগণ যুক্তভাবে লোকনাট্য পরিচালনায় যেভাবে অংশগ্রহণ করতেন, তার প্রমাণ আছে। একথা ভাবলে আনন্দিত হতেই হয় যে, লোকনাট্যের দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম উভয়ই থাকত বলে লোকনাট্যের রচয়িতা, শিল্পী ও পরিচালকদেরকে উভয় রকমের শ্রোতার পক্ষে গ্রহণযোগ্য করে রচনা করতে হ'ত বন্দনাংশ ও সমগ্র লোকনাট্যকে। প্রকৃতপক্ষে বহু ধর্মাবলম্বী একটি জনতার জন্য এটিই ছিল একমাত্র আদর্শ পদ্ধতি। একথা লোকনাট্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কেও সত্য। প্রতিটি লোকনাট্যের কাহিনী ছিল হিন্দু চরিত্রে পরিপূর্ণ। কিন্তু লোকনাট্যের রসই ছিল রসপিপাসু জনগণের জন্য একমাত্র আস্বাদ্য বস্তু। কাহিনীর চরিত্রগুলি হিন্দু না মুসলমান, একথা কারও মনেই আসত না।

খ. লোকগীতিকা

বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার লোকগীতিকা। লোককবির কল্পনাশক্তি তার সকল মহান ঐতিহ্যসহ রূপায়িত হয়েছিল লোকগীতিকার মধ্যে। লোকনাট্যের মত লোকগীতিকার বিষয়বস্তু এসেছে নানা সূত্র থেকে। লোক-গীতিকার চরিত্র যাই হোক না কেন, তার পরিবেশনে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন মুসলিম বয়াতিরা। লোকনাট্যের মতই লোকগীতিকাও লোক-কাহিনীকে কাব্যরসে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। বাংলাদেশের লোক-কল্পনাশক্তি তার শ্রেষ্ঠ বিকাশ দেখেছে লোকগীতিকায়, লোকসমাজের প্রেম রোমান্সের রঙীন বিশ্ব সৃষ্টি করেছে এই লোকগীতিকার মধ্যে, লোকসমাজের সমস্ত সংস্কার, বিশ্বাস ও যাদুবিদ্যাগত ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান অবিকল উপস্থিত রয়েছে এরই মধ্যে। বাঙালী লোকসমাজের প্রতিভা অবিনশ্বর হয়ে আছে লোকগীতিকায়। 'মহুয়া' লোকগীতিকাটির বন্দনাংশ প্রথমে উদ্ধৃত করছি ঃ

> পূবেতে বন্দনা করলাম পূবের ভানুশ্বর
> ... ...
> দক্ষিণে বন্দনা গো করলাম ক্ষীর নদী সাগর।
> যেখানে বানিজ্ জি করে চান্দ সদাগর॥
> যেখানে পড়িয়া গো আছে আলীর মালাসের পাথ্থর॥
> পশ্চিমে বন্দনা গো করলাম মক্কা এন স্থান।
> উরদিশে বাড়ায় ছেলাম মমিন মুসলমান॥
> সভা কইরা কইছ রে ভাই ইন্দু মুসলমান।
> সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম॥
> চাইরকুনা পিরথিমী গো বইন্ধ্যা মন করলাম স্থির।
> সুন্দরবন মুকামে বন্দলাম গাজী জিন্দাপীর॥
> আসমানে জমিনে বন্দলাম চান্দে আর সুরুয।
> আলাম কালাম বন্দুম কিতাব আর কুরান॥

এই বন্দনাংশে যা আছে, তার বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় এই যে, বাংলাদেশের লোকসমাজ তার নিজের ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন। তাই হিন্দু-মুসলমান মিলিতভাবে স্ব স্ব ঐতিহ্যকে পৃথক না করে লোকসংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ধর্মী কিন্তু একান্তই মানবিক চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছে। লোকসমাজের

শিল্পীরা ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির স্বীকৃতি দিয়েছেন খোলাখুলিভাবে। সূর্য-বন্দনা তাই প্রতিটি বন্দনাংশেরই একটি অঙ্গ। পৃথিবীর চারদিকের বন্দনা প্রাচীন সংস্কৃতিরই অংশ। আসমান-জমিন এবং চন্দ্র-সূর্যের বন্দনা এবং কেতাব-কোরানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও একই সঙ্গে তা করা দুঃসাহসের ব্যাপার। অন্যদিকে চাঁদ সদাগর ও গাজী জিন্দাপীরের উল্লেখ থেকে মনে করবার কারণ আছে যে, বাংলাদেশের লোকসমাজ স্বসৃষ্ট ঐতিহ্যকেও স্মরণ করেছে পরম আগ্রহে। চাঁদ সদাগর বাংলার লোক-ঐতিহ্যের এক মহান দান। বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির একমাত্র সাহসী বীর হলেন চাঁদ সদাগর, যিনি দেবতাকে অস্বীকার করবার মত দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। চাঁদ সদাগরের কাহিনী বাঙালী হিন্দু-মুসলিম সকলেরই এক প্রিয় কাহিনী। গাজীও হিন্দু-মুসলিম সকলের শ্রদ্ধা লাভ করে অমর হয়েছেন। বাংলার হিন্দু-মুসলিম জনগণকে বিভক্ত করবার যে-প্রচেষ্টা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ গ্রহণ করে, তারই ফলে পরবর্তী কালে বাংলার লোকসংস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িকতার জন্ম হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দু ও মুসলিম সমর্থক খুঁজে বের করে। এইসব সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাই পরে সংস্কৃতির বিচার-বিশ্লেষণে প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবীর ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু বাংলাদেশের লোকসমাজ এসব সাম্প্রদায়িকতাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিবিপ্লবীদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে বহুধর্মে বিশ্বাসী বহুসংস্কারে আচ্ছন্ন একটি জাতি সহনশীলতার নজির স্থাপন করতে পারে—কিভাবে মিলে মিশে থাকতে পারে। সেজন্য লোকনাট্য ও লোকগীতিকায় বন্দনাংশ রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তুর দিক থেকে তা যেমন সমন্বয়ধর্মী, তেমনি গীতিকার পরিবেশনকারীরা স্পষ্টভাবেই বুঝতেন তার শ্রোতৃসমাজের চরিত্র। আর সেজন্যই তাঁদের সবিনয় নিবেদন:

সভা কইরা কইছ ভাইরে ইন্দু মুসলমান।
সভার চরণে আমি জানাইলাম ছেলাম॥

বাংলার লোকসমাজ এভাবে বারংবার সঠিক বক্তব্য দিলেও সাংস্কৃতিক প্রতি-বিপ্লবীরা সর্বদা পার্থক্যের ওপর জোর দিয়েছে স্ব-উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। অনেক গীতিকা আছে, যার বন্দনাংশে শুধুই হিন্দু ঐতিহ্য আছে আবার অনেকগুলিতে আছে শুধুই মুসলিম ঐতিহ্য। যেমন ময়মনসিংহের 'মলুয়া' এবং সিলেটের

'চন্দ্রসেন রাজা'র গীতিকায়। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা অতি উৎসাহে এগুলি উল্লেখ করতে চাইবেন। কিন্তু শুধুমাত্র একটি দিক থেকে লোক-ঐতিহ্যের বিচার অন্ধের হস্তীদর্শনের মত। দেখা যাবে মুসলিম-বিরচিত গীতিকার বন্দনাংশ ছাড়াও মূল কাহিনীটি সম্পূর্ণভাবে হিন্দু নায়ক-নায়িকায় পূর্ণ। মুসলিম বিরচিত কোনও কোনও গীতিকার বন্দনাংশে মাছ, নদী, পাহাড়, ফলমূল, শস্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি খাদ্যদ্রব্যের বন্দনাও আছে [দ্রষ্টব্যঃ বদিউজ্জামান (সম্পাদিত), সিলেট গীতিকা (১ম খণ্ড), ১ম প্রকাশ, ১৯৬৮, বাঙলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ৭৭]।

বাংলাদেশের লোকগীতিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য লোকসমাজের প্রেম-ভাবনার মধ্যে নিহিত। বাংলাদেশে 'প্রেম' বিষয় হিসেবে লোক-কল্পনাকে উদ্বোধিত করেছিল বিচিত্রভাবে—কিন্তু মৌলিকভাবে এই প্রেম-ভাবনা এসেছে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা থেকে। জয়দেবের প্রেম-ভাবনা মূলত দৈবী মহিমার সঙ্গে যুক্ত। রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর প্রেম-ভাবনা বৈষ্ণব-রসতত্ত্বেই গ্রাহ্য। রাজসভার কবি দৌলত উজির বাহরাম খান (লায়লী-মজনু), দৌলত কাজী (লোর-চন্দ্রাণী), মুহম্মদ কবীর (মধুমালতী) এবং আলাওল (পদ্মাবতী) যে-কয়েকটি রোমান্স-কাব্য সৃষ্টি করেন, তার প্রেম-ভাবনা ছিল শ্রেণী-স্বার্থে নিবেদিত—একমাত্র লোকগীতিকার মধ্যেই জনগণগ্রাহ্য ধর্মনিরপেক্ষ প্রেম-চিন্তা অবাধে প্রকাশিত হয়েছে।

গ. লোকসঙ্গীত

বাংলাদেশে এ-পর্যন্ত যেসব লোকসঙ্গীত পাওয়া গেছে, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করলে দেখা যায়, এগুলির অধিকাংশই ধর্ম ও যাদুবিদ্যাগত লোকসঙ্গীত **(Magico-religious Folk-songs)**। কিন্তু এর অর্থ এও নয় যে লোকসঙ্গীত জনসমাজের ধর্ম-যাদুনিরপেক্ষ চিন্তাধারার পরিচয় বহন করে না। পূজো উপলক্ষে গেয় লোকসঙ্গীতে বাংলার লোকসমাজের দারিদ্র্য, বুভুক্ষা, বেকারী, জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য, অবিচার-অনাচার, উৎপন্ন কৃষিদ্রব্যের নিম্নমূল্য প্রভৃতির বর্ণনা অবাক করে। বাংলা লোকসঙ্গীতে বাঙালীর লোকসংস্কার সর্বাধিক স্থান পেয়েছে। এবং বলা বাহুল্য, এর অধিকাংশই সৃষ্টি হয়েছে লোকসংস্কার থেকে। এতে আর্য ধর্ম নয়, বাংলার লোকসংস্কারই প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার

করেছে। এবং এর কিছুসংখ্যক লোকসঙ্গীত ব্যতীত আর সবই সর্বপ্রাণবাদী চিন্তাভাবনার ধারক ও বাহক। এবং আমি একাধিকবার বলেছি, সর্বপ্রাণবাদী ভাবনা-চিন্তা বাংলার হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ-খ্রীস্টান জনগণের সমষ্টিগত সম্পত্তি।

লোকসঙ্গীত সংগ্রহের কাজে উৎসাহ বহু পূর্বেই দেখা গেলেও, সংগ্রহের কাজে নিছক উৎসাহ যথেষ্ট ছিল না। স্বরসংগ্রহ ছাড়া লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ ব্যর্থও হয় অনেকাংশে। প্রকৃতপক্ষে হয়েছেও তাই। এবং অদ্যাবধি সংগৃহীত লোকসঙ্গীতের যথার্থ নৃতাত্ত্বিক ও লোকতাত্ত্বিক পঠন-পাঠনও হয় নি। ফলে অন্যান্য ক্ষেত্রের মত এখানেও নৈরাজ্য বিদ্যমান। তবু এখানে আমি বাংলার লোকসঙ্গীতের একটি শ্রেণীবিভাগ ও একটি সম্পূর্ণ তালিকা প্রদান করছি এই আশায় যে তাতে করে খানিকটা বিভ্রান্তির অবসান হবে :
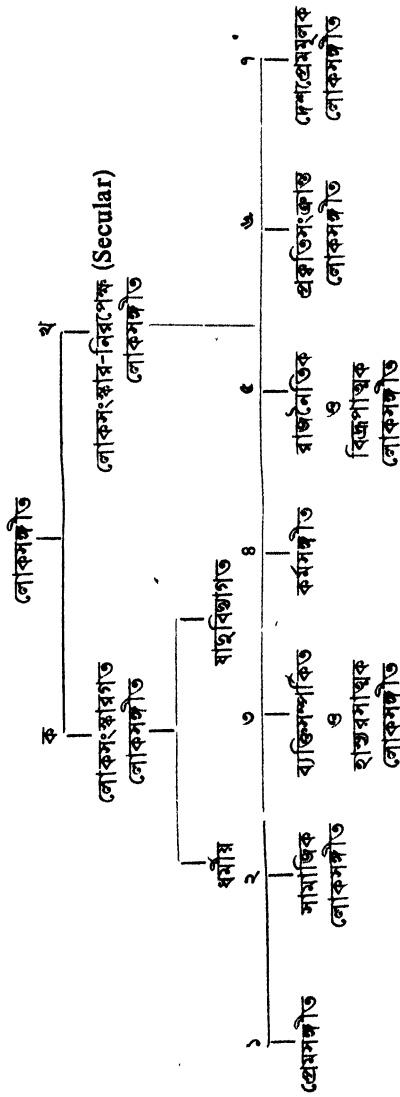
লোকসঙ্গীতের যে-সাধারণ শ্রেণীবিভাগ ওপরে দিয়েছি, তা থেকে মনে হতে পারে যে লোকসংস্কার-নিরপেক্ষ লোকসঙ্গীতের সংখ্যা বুঝি-বা বেশি। কিন্তু আসলে তা নয়। শুধুমাত্র শ্রেণীবিভাগের জন্যই এটি করা হয়েছে। মূলতঃ ধর্মীয়-যাদুবিদ্যাগত লোকসঙ্গীতের সংখ্যাই বেশি। অন্যদিকে লোকসঙ্গীতে ধর্ম ও যাদু-নিরপেক্ষ উপাদানের সন্ধান পেতে হলে ধর্মীয়-যাদুবিদ্যাগত সঙ্গীতেই তা খুঁজতে হবে। নিম্নে যথাসম্ভব সংক্ষেপে বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের পরিচয় প্রদান করা হল :

লোকসঙ্গীতের নাম	ধর্মীয় না যাদুভিত্তিক ?	প্রদেশ, অঞ্চল ও এলাকা	কারা গায় পুরুষ না নারী ?	মন্তব্য
১। মনসাপূজোর গান	ধর্মীয় ও যাদুভিত্তিক	বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ	প্রধানত নারী	ক্রিয়া (Rite) ও অনুষ্ঠান (ceremony) আছেই
২। জন্মাষ্টমীর গান	ঐ	বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ	—	ঐ
৩। দুর্গাপূজোর গান	ধর্মীয়	বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ	পুরুষ (প্রধানত)	ঐ
৪। রামলীলার গান	ঐ	উভয়বঙ্গ	ঐ	ঐ
৫। বনদুর্গার গান	যাদুভিত্তিক	বাংলাদেশ	নারী	ঐ
৬। কালীপূজোর গান	ধর্মীয় ও যাদুভিত্তিক	বাংলাদেশ	পুরুষ	ঐ
৭। ভাইফোঁটার গান	যাদুভিত্তিক	বাংলাদেশ	নারী	ঐ
৮। কার্তিকব্রতের গান	যাদুভিত্তিক	বাংলাদেশ	নারী	ঐ

লোকসঙ্গীতের নাম	ধর্মীয় না যাদুভিত্তিক ?	প্রদেশ, অঞ্চল ও এলাকা	কারা গায় পুরুষ না নারী ?	মন্তব্য
৯। রাসলীলার গান	ধর্মীয় ও যাদুভিত্তিক	উভয়বঙ্গ	নারী ও পুরুষ	ক্রিয়া (Rite) ও অনুষ্ঠান (ceremony) আছেই
১০। বাস্তুপূজোর গান	যাদুভিত্তিক	উভয়বঙ্গ	নারী	ঐ
১১। পৌষপার্বণের গান	ঐ	উভয়বঙ্গ	নারী	ঐ
১২। মাঘমণ্ডলের গান	ঐ	বাংলাদেশ	নারী	ঐ
১৩। উত্তম ঠাকুরের গান	ঐ	বাংলাদেশ	নারী	ঐ
১৪। নীলপূজোর গান	ঐ (গাজনের গান)	বাংলাদেশ	পুরুষ	ঐ
১৫। বোলান	ধর্মীয় ও যাদুভিত্তিক	উভয়বঙ্গ	ঐ	ঐ
১৬। ভাজো গান	যাদুভিত্তিক	পশ্চিমবঙ্গ	নারী	ঐ
১৭। জারী গান	ধর্মীয় ও যাদুভিত্তিক	উভয়বঙ্গ	পুরুষ	ঐ
(ক) মর্শিয়া জারী (খ) মাতাম জারী (গ) নাড়া জারী (ঘ) চালি জারী	ঐ	বাংলাদেশের রংপুর জেলায় প্রচলিত	ঐ	ঐ

লোকসঙ্গীতের নাম	ধর্মীয় না যাদুভিত্তিক?	প্রদেশ, অঞ্চল ও এলাকা	কারা গায় পুরুষ না নারী?	মন্তব্য
(ঙ) জব জারী (চ) ব্যাঙ জারী (ছ) রচনার জারী (জ) জারী যাত্রা	ধর্মীয় ও যাদুভিত্তিক	বাংলাদেশের রংপুর জেলায় প্রচলিত	পুরুষ	ক্রিয়া (Rite) ও অনুষ্ঠান (ceremony) আছেই
১৮। সহেলার গান	যাদুভিত্তিক	পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ	নারী	ঐ
১৯। লৌলা গান	ঐ	বাংলাদেশ	ঐ	ঐ
২০। কুলের মাগনের গান	ঐ	ঐ	পুরুষ	ঐ
২১। ত্রিনাথের গান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২২। গাজীর গান	ঐ	উভয়বঙ্গ	ঐ	ঐ
২৩। বসন রায়ের গান	ঐ	বাংলাদেশ	নারী	ঐ
২৪। হোলীর গান	ধর্মীয় ও যাদুভিত্তিক	উভয়বঙ্গ	পুরুষ	ঐ
২৫। ঘেঁটু পূজোর গান	যাদুভিত্তিক	পশ্চিমবঙ্গ	ঐ	ঐ
২৬। শীতলা পূজোর গান	ঐ	উভয়বঙ্গ	ঐ	ঐ
২৭। শীতলা নৃত্যের গান	ঐ	বাংলাদেশ	নারী	ঐ
২৮। গাজনের গান	ঐ	উভয়বঙ্গ	পুরুষ	ঐ

লোকসঙ্গীতের নাম	ধর্মীয় না যাতুভিত্তিক ?	প্রদেশ, অঞ্চল ও এলাকা	কারা গায় পুরুষ না নারী ?	মন্তব্য
২৯। বেহুলার গান	যাতুভিত্তিক	পশ্চিমবঙ্গ	পুরুষ	ক্রিয়া (Rite) ও অনুষ্ঠান (ceremony) আছেই
৩০। হুদমা দেওয়ের গান	ঐ	উভয়বঙ্গের উত্তরাঞ্চল	ঐ	ঐ
৩১। বদনা বিয়ের গান	ঐ	বাংলাদেশ	নারী ও পুরুষ	ঐ
			উভয়ে	ঐ
৩২। ব্যাঙের বিয়ের গান	ঐ	ঐ	নারী	ঐ
৩৩। মাদারের গান	ঐ	ঐ	পুরুষ	ঐ
৩৪। মাণিকপীরের গান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৫। সত্যপীরের গান	ঐ	উভয়বঙ্গ	ঐ	ঐ
৩৬। সোনা রায়ের গান	ঐ	বাংলাদেশ	ঐ	ঐ
৩৭। মেঘের গান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৮। গোরক্ষনাথের গান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯। পটুয়াদের গান	ঐ	প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ	ঐ	ঐ
৪০। ভাদু গান	ঐ	পশ্চিমবঙ্গ	নারী	ঐ

লোকসঙ্গীতের নাম	ধর্মীয় না যাদুভিত্তিক ?	প্রদেশ, অঞ্চল ও এলাকা	কারা গায় পুরুষ না নারী ?	মন্তব্য
৪১। টুসু গান	যাদুভিত্তিক	পশ্চিমবঙ্গ	নারী	ক্রিয়া (Rite) ও অনুষ্ঠান (ceremony) আছেই
৪২। জাওয়া গান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩। ঝুমুর গান	বর্তমানে ধর্ম ও যাদুনিরপেক্ষ	উভয়বঙ্গ	নারী ও পুরুষ উভয়ে	—
৪৪। (ক) দাঁড়শালিয়া (খ) ছোনাচের ঝুমুর (গ) খেমটি নাচের ঝুমুর (ঘ) পাতা নাচের ঝুমুর (ঙ) ভাদুরিয়া (চ) করম নাচের ঝুমুর	ঐ	পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চল বিশেষতঃ মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া	ঐ	ঐ
৪[illegible]। বাঁধনা পরবের গান	যাদুবিদ্যা ভিত্তিক	পশ্চিমবঙ্গ	পুরুষ	ঐ
৪৬। তুলসী ও দড়ি গাছার গান	ঐ	ঐ	নারী	ঐ

লোকসঙ্গীতের নাম	ধর্মীয় না যাদুভিত্তিক ?	প্রদেশ, অঞ্চল ও এলাকা	কারা গায় পুরুষ না নারী ?	মন্তব্য
৪৭। কাঠি নাচের গান	যাদুভিত্তিক	পশ্চিমবঙ্গ	পুরুষ	ক্রিয়া (Rite) ও অনুষ্ঠান (ceremony) আছেই
৪৮। চড়কের গান	ঐ	উভয়বঙ্গ	নারী	ঐ
৪৯। জিতা পূজোর গান	ঐ	পশ্চিমবঙ্গ	ঐ	ঐ
৫০। গরু নাচের গান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫১। খেমটা নাচের গান	ঈষৎ ধর্ম ও যাদু-নিরপেক্ষ	ঐ	ঐ	—
৫২। গম্ভীরা গান	ধর্মীয় ও যাদুবিদ্যা ভিত্তিক	উভয়বঙ্গ	পুরুষ	ঐ
৫৩। ভাওয়াইয়া	ধর্ম ও যাদু-নিরপেক্ষ	উভয়বঙ্গের উত্তরাঞ্চল	ঐ	—
৫৪। চটকা	ঐ	ঐ	ঐ	—
৫৫। আলকাপা	ঈষৎ ধর্ম ও যাদু-নিরপেক্ষ	উভয়বঙ্গ	ঐ	—
৫৬। ছেঁচর গান	ঐ	পশ্চিমবঙ্গ	ঐ	ঐ

লোকসঙ্গীতের নাম	ধর্মীয় না যাদুভিত্তিক ?	প্রদেশ, অঞ্চল ও এলাকা	কারা গায় পুরুষ না নারী ?	মন্তব্য
৫৭। ভাটিয়ালী	ধর্ম ও যাদু-নিরপেক্ষ	বাংলাদেশ	পুরুষ	—
৫৮। ঘাঁটু গান	ধর্মীয়	ঐ	ঐ	—
৫৯। ধূয়া গান	যুগপৎ ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ	ঐ	ঐ	—
৬০। বারাষী গান	ধর্মনিরপেক্ষ	ঐ	ঐ	—
৬১। হ্যাঁচোড়ার গান	ধর্মীয় ও যাদু-সংক্রান্ত	ঐ	ঐ	ক্রিয়ানুষ্ঠান আছে
৬২। রাখালী গান	ধর্মনিরপেক্ষ	ঐ	ঐ	—
৬৩। সোহেলী গান	যুগপৎ ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ	ঐ	নারী	ক্রিয়ানুষ্ঠান আছে
৬৪। পুথি গানের ঘোষা	ধর্মনিরপেক্ষ	ঐ	পুরুষ	—
৬৫। আরি গান	ঐ	ঐ	ঐ	—
৬৬। মালসী গান	যুগপৎ ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ	উভয়বঙ্গ	ঐ	ক্রিয়ানুষ্ঠান আছে আবার কোন ক্ষেত্রে অনুপস্থিত
৬৭। ডাক গান	ধর্মনিরপেক্ষ	বাংলাদেশ	ঐ	—

লোকসঙ্গীতের নাম	ধর্মীয় না যাদুভিত্তিক ?	প্রদেশ, অঞ্চল ও এলাকা	কারা গায় পুরুষ না নারী ?	মন্তব্য
৬৮। হাবু গান	ধর্মনিরপেক্ষ কিন্তু কখনও ধর্মীয় বটে	বাংলাদেশ	পুরুষ	—
৬৯। রসিকা গান	ঈষৎ ধর্মনিরপেক্ষ	ঐ	ঐ	—
৭০। খেমটা গান	ধর্মনিরপেক্ষ	ঐ	ঐ	—
৭১। ছোকরা নাচা গান	ঐ	ঐ	ঐ	—
৭২। বিচার গান	ধর্মীয়	ঐ	ঐ	—
৭৩। তরজা গান	ধর্মীয়	উভয়বঙ্গ	ঐ	—
৭৪। কবি গান	যুগপৎ ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ	ঐ	ঐ	—
৭৫। গোয়ালীর গান	যুগপৎ যাদুভিত্তিক ও ধর্মনিরপেক্ষ	বাংলাদেশ	ঐ	—
৭৬। লুটো গান	ধর্মনিরপেক্ষ	পশ্চিমবঙ্গ	ঐ	—
৭৭। মুর্শিদী গান	ধর্মীয়	বাংলাদেশ	ঐ	—
৭৮। মারেফতি গান	ধর্মীয়	ঐ	ঐ	—
৭৯। বাউল গান	ধর্মীয় ও যাদুভিত্তিক	উভয়বঙ্গ	ঐ	ক্রিয়ানুষ্ঠান বিদ্যমান

লোকসঙ্গীতের নাম	ধর্মীয় না যাদুভিত্তিক ?	প্রদেশ, অঞ্চল ও এলাকা	কারা গায় পুরুষ না নারী ?	মন্তব্য
৮০। হালকার গান	ধর্মীয়	বাংলাদেশ	পুরুষ	ক্রিয়ানুষ্ঠান বিদ্যমান
৮১। ফকিরালি জিকির গান	ধর্মীয়	ঐ	ঐ	—
৮২। পাঠ গান	ধর্মনিরপেক্ষ	ঐ	ঐ	—
৮৩। কড়চা গান	[জানা নেই]	ঐ	[জানা নেই]	[জানা নেই]
৮৪। ধামালী গান	ধর্মীয়	ঐ	নারী	ক্রিয়ানুষ্ঠান বিদ্যমান
৮৫। বৃত্তিভিত্তিক গান (সাপুড়ে-বেদে প্রভৃতির গান)	ধর্মীয় ও যাদুভিত্তিক	উভয়বঙ্গ	পুরুষ	ঐ
৮৬। কৃষাণ গান	ধর্মীয়	পশ্চিমবঙ্গ	ঐ	—
৮৭। অষ্টক গান	ঐ	উভয়বঙ্গ	ঐ	—
৮৮। বান্দুটি	ঐ	ঐ	ঐ	—
৮৯। পাঁচালী	ঐ	ঐ	ঐ	—
৯০। রঙ পাঁচালী	ধর্মনিরপেক্ষ	ঐ	ঐ	—
৯১। বালার্থি	ধর্মীয়	পশ্চিমবঙ্গ	ঐ	—
৯২। পুতুল নাচের গান	ঐ	উভয়বঙ্গ	ঐ	—
৯৩। ঝাঁপান গান	যাদুভিত্তিক	ঐ	ঐ	—

লোকসঙ্গীতের নাম	ধর্মীয় না যাদুভিত্তিক ?	প্রদেশ, অঞ্চল ও এলাকা	কারা গায় পুরুষ না নারী ?	মন্তব্য
৯৪। হোলবোল	যুগপৎ ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ	উভয়বঙ্গ	পুরুষ	—
৯৫। বারোমাসী গান	ঐ	ঐ	নারী	—
৯৬। মেয়েলি গীত	ঐ	ঐ	ঐ	ক্রিয়ানুষ্ঠান বিদ্যমান
(ক) মাড়োয়ার গীত				
(খ) ফোরোল ডুবার গীত				
(গ) উমালী বাড়ার গীত	যাদুভিত্তিক	বাংলাদেশ	ঐ	ঐ
(ঘ) মেহেদী তোলার গীত				
(ঙ) হাংগোর ধরা গীত				
৯৭। নবজাতকের গান	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
(ক) হাইট্যারা গীত				
(খ) তেল-পান-গুয়ার গীত	যাদুভিত্তিক	ঐ	ঐ	ঐ
(গ) সাইটোরের গীত				
৯৮। মানতের গীত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
(ক) বেড়া ভাসানোর গীত	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

এখানে প্রায় একশত লোকসঙ্গীতের নাম দেওয়া হয়েছে। এবং লোক-সঙ্গীতগুলির যে-সংক্ষিপ্ত সাধারণ পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, তাতে আর যাই হোক, আত্ম-সন্তুষ্টির কোন স্থান নেই। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে এর চেয়ে আর বেশি কিছু করবার ছিল না। তবু এই সামান্য আলোচনা থেকে যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল :

১. বাংলার লোকসঙ্গীত দু একটি ক্ষেত্র বাদ দিলে সর্বদা সম্মিলিত ভাবে গেয় এবং যে-কোনও ভাবে বিশ্লেষণ করি না কেন, লোকসঙ্গীত সর্বদাই লোকসমাজের যৌথ সৃষ্টি।

২. দ্বিতীয়ত বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ অনেকগুলি লোকসঙ্গীতের যৌথ মালিকানা ভোগ করে। অনেকগুলি লোকসঙ্গীত শুধু পশ্চিমবঙ্গে কিংবা শুধু বাংলাদেশে প্রচলিত। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এই দুই প্রদেশের মধ্যে যে লোকবিনিময় হয়, তার ফলে উভয় বাংলার লোক-ঐতিহ্য কি ভাবে প্রভাবিত হয়েছে, তা এখনও নির্ণীত হয় নি। তদুপরি উভয় বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে কি ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, তাও পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব হয় নি।

৩. ধর্মীয় ও যাদুভিত্তিক লোকসঙ্গীতের সংখ্যা সর্বাধিক। তুলনায় ধর্ম-নিরপেক্ষ ও যাদু-নিরপেক্ষ লোকসঙ্গীতের সংখ্যা খুব বেশি নয়। অন্যদিকে ধর্মীয় (Religious) লোকসঙ্গীতের চেয়ে যাদুভিত্তিক (Magical) লোক-সঙ্গীতের সংখ্যা বেশি। ধর্মীয়ভাবে অনুমোদিত হিন্দুদের পূজোর সাথে সম্পৃক্ত লোকসঙ্গীতের সংখ্যা অনেক কম। যাদুভিত্তিক লোকসঙ্গীত বাংলাদেশের লোকমানসের সৃষ্টি। লোকসঙ্গীতে ধর্ম-নিরপেক্ষ ও যাদু-নিরপেক্ষ উপাদান বিচারের সময় শুধুমাত্র ধর্ম-যাদু-নিরপেক্ষ লোকসঙ্গীতের বিশ্লেষণ করলে চলবে না। ধর্মীয় ও যাদুভিত্তিক (Magico-Religious) লোকসঙ্গীতের বিশ্লেষণ হবে সেখানে একান্ত জরুরী।

৪. অনেকগুলি লোকসঙ্গীত সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী বা পশ্চিমবঙ্গব্যাপী প্রচলিত, এবং কতকগুলি লোকসঙ্গীত স্থানীয়ভাবে প্রচলিত। মুসলিমদের জারীগান সমগ্র বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গব্যাপী প্রচলিত। তেমনি হিন্দু জনগণের গাজনের গান উভয় বঙ্গেই ব্যাপকভাবে গাওয়া হয়। কিন্তু অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। জারী গানে হিন্দুরা অংশ নেন না, আবার গাজনের গানেও সঙ্গতকারণে মুসলিমরা অংশ নেন না। কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলী সর্বদাই উভয়

সমাজের লোক। আবার বেহুলার গান (উভয়বঙ্গেই এ-গানের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে) উভয়বঙ্গেই প্রচলিত। এতে অংশগ্রহণও করেন উভয় সমাজের লোক। ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীতের একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হওয়া সত্ত্বেও এ-লোকসঙ্গীত আঞ্চলিক, কারণ উভয়বঙ্গের উত্তরাঞ্চলে এর জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি। আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের বিশ্লেষণে পরিবেশ বিচারই মুখ্য কথা।

৫. বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের জন্ম, বিকাশ ও পরিণতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মা-বোনদের দান সর্বাধিক। ধর্মীয়ভাবে অনুমোদিত লোকসঙ্গীত ছাড়া যাদুবিদ্যাভিত্তিক লোকসঙ্গীত সৃষ্টির মুখ্য প্রেরণা এসেছে বাংলাদেশের নারী-সমাজ থেকে। সম্পত্তি রক্ষা, সন্তান-সন্ততি, স্বামী ও পরিবারের মঙ্গল কামনা, কৃষির উন্নতি, গো-সম্পদ রক্ষা, বৃক্ষ ও ফসলাদির উন্নতি প্রভৃতি ভাবনা থেকেই এগুলি উৎপত্তি লাভ করে। এবং এসব ক্ষেত্রে নারী-সমাজের ভূমিকা মুখ্য হওয়ার ফলে যাদুভিত্তিক লোকসঙ্গীতের সংখ্যা ও আয়ু দীর্ঘ হয়েছে। অন্যদিকে পুরুষের গেয় গানগুলি ধীরে ধীরে হলেও ধর্ম ও যাদুর খোলস থেকে বেরিয়ে ধর্ম ও যাদুনিরপেক্ষ হতে পেরেছে এবং যেসব গান এখনও চরিত্রে ধর্মীয় বা যাদুভিত্তিক, সেখানে ধর্ম ও যাদু-নিরপেক্ষ উপাদান প্রবেশ করেছে।

৬. ধর্ম ও যাদুভিত্তিক লোকসঙ্গীতের সঙ্গে ক্রিয়া (Rite) ও অনুষ্ঠানের (Ceremony) ব্যবস্থা বা বিধি-বিধান থাকবে। এ-পর্যন্ত লোকসঙ্গীত সংগ্রহ কম হয় নি, কিন্তু সেই সঙ্গে ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানগুলির যথাযথ পঠন-পাঠন হয় নি। যাই হোক, সব ধর্মীয় লোকসঙ্গীতের সঙ্গে ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে না, কিন্তু যাদুভিত্তিক লোকসঙ্গীতে তা থাকবেই।

৭. লোকসঙ্গীতের পারস্পরিক পঠন-পাঠনও (Cross-Cultural Study) হয় নি। ফলে হিন্দুর লোকসঙ্গীত ঠিক কতটা পরিমাণে মুসলমান বা বৌদ্ধদের সমাজকে আক্রান্ত করেছে, তার পরিমাপ হয় নি। সমানভাবে, মুসলমান বা বৌদ্ধের লোকসঙ্গীত হিন্দু বা অন্যান্য ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে কতটা প্রভাবিত করেছে তা নিয়ে সামান্যই কাজ হয়েছে।

যাই হোক, গবেষণার ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বাদ দিলে, লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ হয়েছে যথেষ্ট। এবং লোকনাট্য ও লোকগীতিকার মত লোকসঙ্গীতও বাঙালী জনগণের মানসকে মূর্ত করে তুলেছে। বাংলাদেশের সমগ্র জনসংখ্যার বৃহত্তম

অংশের বাস গ্রামাঞ্চলে। সঙ্গত কারণে বাংলার লোকসঙ্গীতকে তাঁরাই বাঁচিয়ে রেখেছেন আর তারই মধ্যে দেখেছেন নিজেদের জাতীয় স্বরূপ-সত্তাকে।

ঘ. ছড়া

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন অংশের মত ছড়ার পঠন-পাঠনও হয়েছে অঢেল। লোকসাহিত্যের অন্যান্য অংশের চেয়ে ছড়া সর্বাধিক ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। ছড়ার সঙ্গে শিশু-কিশোরের সম্পর্ক থাকায় ছড়ার মধ্যে ধর্ম-নিরপেক্ষতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে অনেক ছড়াতে ধর্মীয় মনোভাব ও যাদু-বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন কি কোন কোন ছড়া এককালে মন্ত্র ছিল বলে মনে হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বাংলাদেশের ছড়ায় বাঙালী মা-বোনেরা সন্তান-প্রীতির এক অনন্য স্বাক্ষর রেখেছেন। এবং এক্ষেত্রেও বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের চিন্তাভাবনার রূপায়ণকে প্রত্যক্ষ করেছেন। চাঁদ হিন্দু-মুসলিম বৌদ্ধ-খ্রীস্টান প্রভৃতি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর সীমানা-সীমান্ত পেরিয়ে সকলের শিশুকে আনন্দ দিয়েছে, মায়েরা শিশুকে চাঁদের কথা শুনিয়েছেন, একই ভাষায়, একই পরিবেশে। চাঁদের যেমন জাত-জন্ম নেই, তেমনি নেই শিশুর।

ঙ. ধাঁধা

ধাঁধার জন্ম, বিকাশ ও পরিণতি ধর্ম ও যাদুভিত্তিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের মধ্যে। ঋগ্বেদের মধ্যেও ধাঁধার সন্ধান পাওয়া যায়। যাগ-যজ্ঞের সঙ্গেও ধাঁধার সম্পর্ক ছিল। কিন্তু ধাঁধার উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন, আস্তে আস্তে তা ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে উঠে এবং লোকমানসে তা প্রচণ্ড আগ্রহের সৃষ্টি করে। বস্তুত লোকতত্ত্বের বিষয় হিসেবে ধাঁধা একটি ভিন্নতর গবেষণার দাবী রাখে। নিরক্ষর লোকসমাজ কিভাবে প্রাচীনকাল থেকে প্রাকৃতিক ধাঁধার সম্মুখীন হয়েছে এবং কিভাবে তার উত্তর পেয়েছে, তা একটি স্বতন্ত্র বিষয় এবং এটি লোকবিজ্ঞানের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের লোকসমাজ ধাঁধা সৃষ্টি করে তার জবাব দেয় উঠতি বংশধরদের। ধাঁধায় তরুণ সমাজের মন কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এবং পরে তারা এগুলির উত্তর খোঁজে। আর উত্তর না পেলে বর্ষীয়ানদের কাছে যায়। কাজেই ধাঁধা হ'ল লোকশিক্ষার (Folk-Education) উপায় বিশেষ। অন্য কথায়, লোকসমাজের অর্জিত জ্ঞান (Folk-Knowledge) নিহিত থাকে ধাঁধার মধ্যে। লোকসাহিত্যের কোন কোন বিষয়ের রচয়িতা

থাকেন। কিন্তু ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধা এবং লোককাহিনীর রচয়িতা নেই। অর্থাৎ এগুলিও লোকসমাজের যৌথসৃষ্টি। এবং বলা বাহুল্য, ধাঁধাও বাঙালী জনগণের সাধারণ সম্পদ এবং এই সঙ্গত কারণেই ধাঁধার মধ্যে বাঙালী জনগণ নিজস্ব ঐতিহ্যকে সার্থক করে তুলেছেন।

ধাঁধা ছিল হাস্যরসেরও অফুরন্ত উৎস। বিয়ের সভায়, বাসরে, পরস্পর দেখাশোনার স্থলে ধাঁধা জিজ্ঞেস করে যেমন জ্ঞানের যাচাই হ'ত, তেমনি হাস্যরসের বন্যাও বয়ে যেত। বিয়ের সভায় ও বাসরে জামাইকে ধাঁধার অর্থ জিজ্ঞেস করবার রীতি ছিল সর্বজনীন। উত্তর দিতে না পারলে নতুন জামাইকে নাস্তানাবুদ হতে হ'ত। ওদিকে শ্যালক-শ্যালিকাদের মধ্যে উঠত হাসির হুল্লোড় এবং এসব ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করতেন, আনন্দিত হতেন।

চ. প্রবাদ

ধাঁধার উত্তরে যেমন লোকসমাজের জ্ঞানের পরিচয় থাকে, তেমনি প্রবাদ হ'ল নিরক্ষর লোকসমাজের যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত রূপ। আদিম কাল থেকেই লোকসমাজ নতুন নতুন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে এবং আপন চেষ্টাতেই তার সমাধান করেছে। আর এগুলি করতে গিয়েই যে-অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চয় হ'ত, তা লিপিবদ্ধ হয়েছে প্রবাদের মধ্যে। প্রবাদও ধর্ম ও যাদু-প্রভাবের হাত থেকে রেহাই পায় নি। কিন্তু ধাঁধার মত প্রবাদও ধীরে ধীরে ধর্মনিরপেক্ষতা অর্জন করেছে। লোকসমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠী জীবনে একই রকম সমস্যা ও সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে এবং স্বভাবতই একই রকম অভিজ্ঞতাও তারা অর্জন করে। প্রাকৃতিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা ও সঙ্কট হিন্দুর জন্য একরকম ও মুসলমানের জন্য অন্যরকম হয়ে থাকে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁরা সাম্প্রদায়িক তো বটেই, মূলত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা প্রতিবিপ্লবী। প্রবাদ সঙ্গত কারণে বাংলার হিন্দু-মুসলিম সকলেরই মিলিত অভিজ্ঞতার ফসল।

ছ. লোককাহিনী

বাংলা লোকসাহিত্যের একটি বৃহত্তম অংশ হ'ল লোককাহিনী। সমগ্র বিশ্বব্যাপী লোককাহিনী সম্পর্কে গবেষণা ও বিশ্লেষণের অন্ত নেই। বস্তুত

লোকসাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশটি সম্বন্ধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গবেষণা দিন দিন বেড়েই চলেছে। লোককাহিনীর মধ্যেই যাদুবিস্তাগত উপাদান সর্বাপেক্ষা বেশি সংরক্ষিত হয়েছে। ধর্মীয় মনোভাবে পরিপূর্ণ লোককাহিনীও সংখ্যায় কম নয়। কিন্তু লোককাহিনীর কয়েকটি শাখা ধর্মনিরপেক্ষ চারিত্র্য অর্জন করেছে। লোককাহিনীর নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ প্রদান করা হ'ল :

লোককাহিনী

১	২	৩	৪
ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী (Explanatory Tales)	পুরাণ-কাহিনী (Myths)	পশু-পক্ষীর কাহিনী (Animal Tales)	নীতি কাহিনী (Fables)
৫	৬	৭	৮
স্থানিক কাহিনী (Legends)	রোমাঞ্চকর কাহিনী (Novella)	বীর কাহিনী (Hero Tales)	রূপ কাহিনী (Fairy Tales)
৯	১০	১১	
হাস্যরসাত্মক ক্ষুদ্র কাহিনী (Anecdotes)	সূত্রধারী কাহিনী (Formula Tales)	ক্রমপুঞ্জিত কাহিনী (Cumulative Tales)	

১. ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী (Explanatory Tales)

ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী সরাসরি লোকসংস্কার থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কাজেই ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনীর লোকসমাজের সাধারণ সম্পত্তি। ব্যাখ্যা-দানকারী কাহিনীর বিশ্লেষণ করবার আগে প্রথমে একটি মুসলিম ও পরে একটি হিন্দু ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী প্রদান করছি :

ক. বানরের জন্ম হ'ল কেমন করে ?

মুছা আলায়হেচ্ছালাম যে-মসজিদে খোদবা পাঠ করতেন সে মসজিদটা আছিল একটা গাঙ্গের পারে। মুছা এতই মধুর সুরে খোদবা পাঠ করতেন যে মহিত হইয়া গাঙ্গের মাছ পর্যন্ত তার খোদবা পাঠ শুইনতো। মসজিদের পাশে গাঙ্গের মাছের আমোদ দেইখ্যা একদিন মুছুল্লীরা গেল বেহুঁশ হইয়া। তারা নামাজ বাদ দিয়া মাছ ধরা শুরু কইরল। কয়াকটা শুক্রবারই তারা মাছ ধরছিল। ইয়াতে মাছেরা আল্লার কাছে নালিশ জানাইল, "হে পাক পরওয়ার-

দেগার, আমরা মুছা নবীর খোদবা পাঠ শুইনবার আসি, কিন্তু মুছুল্লীরা আমাগো হত্যা করে।" তখন ঐসব মুছুল্লীগো ওপর আল্লার গজব নাজেল হইল। তারা বানর হইয়া গেল। সেজন্যই দেহা যায় বানরের মুখ কিছুটা মাইন্‌সের মুখের আকার। আইজও ভয়ে অনেকে শুক্রবারে মাছ ধরে না।

কথক : মুন্সী আবু হানিফা। বয়স ৬০। সাং—পশ্চিম পয়লা।
থানা : ঘিয়র। জেলা—ঢাকা। সংগ্রাহক : বাঙলা একাডেমীর
সংগ্রাহক : আবদুর রহমান ঠাকুর।

খ. মশার জন্ম হল কেমন করে ?

জাইল্যারা রাইত জাইগ্যা মাছ ধরে। তাতে তাগোর কামের ক্ষতি। এ্যাহনে কি করা যায় ? জাইল্যারা একজনরে পাঠাইল মা দুইগ্‌গার কাছে। হে জাইয়া আর্জি দিল একথা—"হে মা দুইগ্‌গা, আমরা রাত জাইগ্যা মাছ ধরি, কিন্তু আমাগো খালি ঘুম আসে। আমাগো এমন বর দিবেন যে রাইতে আমাগো ঘুমটা একটু কমে।"

তখন মা দুইগ্‌গা তার গতর থাইক্যা এক চিমটি ছাতা উঠাইয়া ঐ মাঝি ব্যাটার হাতে দিল। ঐ ছাতা থিক্যা জন্ম হ'ল মশার। এ্যাহনে রাইতে মাঝিরা মশার কামড়ের চোটে ঘুম আইসপ্যার পারে না।

কথক : চারুবালা দেবী, বয়স—৬৯। সাং : পয়লা, থানা : ঘিয়র।
সংগ্রাহক : ঐ

দুটি কাহিনীর অঙ্গেই ধর্মীয় পরিচ্ছদ খানিকটা আছে বটে ; কিন্তু একথা গোপন নেই যে, উভয় কাহিনীই উৎপত্তি লাভ করেছে সর্বপ্রাণবাদের শ্রেষ্ঠ রণনীতি যাদুবিদ্যা থেকে। মানুষের বানরে রূপান্তরণ (Transformation) কিংবা দুর্গার গায়ের ময়লা থেকে মশার জন্ম মূলত যাদুবিদ্যা থেকে উদ্ভূত। বলা বাহুল্য, এ-ধরনের অসংখ্য কাহিনী বাংলাদেশে থাকলেও তা সংগৃহীত হয়েছে অল্পই। ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী প্রধানত বিশেষ বিশেষ ঘটনার ব্যাখ্যা দেয়। কেন আকাশটা ওপরে উঠল, কেন ধানের চারা চালের বদলে ধান ফলাল, মুসলমানদের জন্য শূকরের মাংস নিষিদ্ধ হ'ল কেন ইত্যাদি ঘটনার ব্যাখ্যা দেয় 'ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী। তেমনি এ-ধরনের কাহিনী সৃষ্টি বা উৎপত্তির

সঙ্গেও জড়িত থাকে। কেউ কেউ এগুলিকে তাই Origin Story বলবার পক্ষপাতী। সে যাই হোক, এ-ধরনের কাহিনীর মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের সর্বপ্রাণবাদী চিন্তাধারাই রূপায়িত হয়েছে।

২. পুরাণ-কাহিনী (Myths)

ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনীর মত পুরাণ-কাহিনীও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয় বর্ণিত হয়। এসব কাহিনীর মধ্যে দেবতা, আধা-ঐশ্বরিক নায়ক বা বীরেরা স্থান লাভ করেন। বাংলাদেশে এ-ধরনের কোনও পুরাণ-কাহিনী নেই। কেননা রামায়ণ ও মহাভারতই হচ্ছে প্রাচ্য দেশসমূহের শ্রেষ্ঠ পুরাণ-কাহিনীর উদাহরণ। ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী লোকসমাজেই প্রিয় কিন্তু পুরাণ-কাহিনী ভারতের সমস্ত মানুষের সাধারণ কিন্তু শ্রদ্ধেয় ঐতিহ্য। ব্যাখ্যা-দানকারী কাহিনী কখনও কখনও স্থানীয় বা আঞ্চলিকভাবে একত্রিত হয়ে বা বিশেষ কোনও কাহিনী সামগ্রিকভাবে একটি অঞ্চলে জনপ্রিয় হয়ে উঠলে তা আঞ্চলিক পুরাণের জন্ম দেয়। বাংলাদেশের চাঁদসদাগর, বেহুলা ও মনসার কাহিনী এভাবে একটি পুরাণ-কাহিনীর উদ্ভবকে সম্ভব করে তোলে। কিন্তু সমগ্র জাতি কর্তৃক স্বীকৃতি না পেলে রামায়ণ-মহাভারত কিংবা ইলিয়াড-ওডিসির মত পুরাণ-কাহিনী গড়ে ওঠে না। বাংলাদেশে এ-ধরনের কোনও পুরাণ-কাহিনী নেই।

৩. পশু-পক্ষীর কাহিনী (Animal Tales)

পুরাণ-বহির্ভূত সমস্ত পশু-পক্ষীর কাহিনীই এ-পর্যায়ে পড়ে। এসব কাহিনীতে পশু-পাখির চরিত্রে মানবীয় গুণারোপ করা হয়। দেখা যায়, এসব কাহিনীর মধ্যে চতুর পশু-পাখি বোকা পশু-পাখিকে প্রতারণা করে। লোক-কাহিনীর একটা বিশেষ অংশ জুড়ে আছে এসব পশু-পাখির কাহিনী। বাংলা-দেশে এ-ধরনের কাহিনী অনেক। তবে সংগ্রহ বেশি হয় নি। লোকসমাজ শুধু এ-রকম কাহিনী সৃষ্টিই করে না, এতে লোকসমাজের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাও প্রকাশ পায়।

৪. নীতি কাহিনী (Fables)

পশু-পক্ষীর কাহিনীর সঙ্গে নীতি বা উপদেশ যুক্ত করলে তাই পরে নীতি-কাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। ঈসপের কাহিনী, হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রে

এ-ধরনের নীতি-কাহিনী পাওয়া যায়। বাংলাদেশে নীতি-কাহিনী খুব বেশি সংগৃহীত হয় নি।

৫. হাস্যরসাত্মক ক্ষুদ্র কাহিনী (Anecdotes)

বাংলাদেশে ছোট ছোট কাহিনীতে হাসি-ঠাট্টা রঙ্গ-রসিকতা প্রকাশ পায় সর্বাধিক। এসব কাহিনীতে পশু-পাখির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বোকা লোকদের নিয়ে হাসি-তামাসা প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। বাংলাদেশে এ-ধরনের অসংখ্য কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলির সংগ্রহ তেমন সার্থকভাবে হয় নি।

৬. রোমাঞ্চকর কাহিনী (Novella)

রোমাঞ্চকর কাহিনী গঠন-প্রকৃতির দিক থেকে রূপকাহিনীর মতই। এর লিখিত ঐতিহ্য পাওয়া যায় বোক্কাচিওর ডেকামেরন ও আলিফ লায়লা ওয়া লায়লার মধ্যে। নাবিক সিন্দবাদের কাহিনীও এ-পর্যায়ে পড়ে। বাংলাদেশের জনপ্রিয় হাতেম তাই পুথির কোনও কোনও কাহিনী এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। দেশের মৌখিক ঐতিহ্যে রোমাঞ্চকর কাহিনী খুব বেশি নেই।

৭. বীর কাহিনী (Hero Tales)

বীর কাহিনী অবাস্তব বা আধা-অবাস্তব জগতে ঘটে। গ্রীক মহাকাব্যের বীর হারকিউলিস ও থিসিয়াসের কাহিনী অবশ্যই বীর কাহিনী। ভারতীয় মহাকাব্যদ্বয়ে এ-ধরনের বীর কাহিনী বিদ্যমান। বাংলাদেশের মৌখিক ঐতিহ্যে এ-রকম কাহিনী আছে কিনা তা এখনও জানা যায় নি।

৮. স্থানিক কাহিনী (Legends)

স্থানিক কাহিনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল, এ-কাহিনীর ঘটনাগুলি সত্যি সত্যি ঘটেছিল বলে মনে করা হয় এবং বিশেষ বিশেষ স্থান বা অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই এসব কাহিনী বিকাশ লাভ করে। বাংলাদেশে এ-ধরনের কাহিনী আছে অসংখ্য, তবে সংগ্রহের পরিমাণ খুব বেশি নয়।

৯. সূত্রধারী কাহিনী (Formula Tales)

সূত্রধারী কাহিনীর মধ্যে একটি সূত্রই বারংবার আবৃত্ত হয়। ছেলেমেয়েদের কাহিনী শোনাতে শোনাতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে মা-বোনেরা সূত্রধারী কাহিনী

পরিবেশন করে থাকেন। এরকম ধরনের কাহিনী ফুরায় না, ফলে ছেলেমেয়েরা সূত্রটির বারংবার আবৃত্তি শুনে ঘুমিয়ে পড়ে। এ-ধরনের কাহিনীর সংখ্যা এমনিতেই খুব বেশি নয়। তবু বাংলাদেশ থেকে এ-ধরনের কিছু কাহিনী আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

১০. ক্রমপুঞ্জিত কাহিনী (Cumulative Tales)

ক্রমপুঞ্জিত কাহিনীও সূত্রধারী কাহিনীর মতই খেলার মনোভাব নিয়ে পরিবেশিত হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কৌতূহলকে তৃপ্ত করবার জন্য মূল কাহিনীর সঙ্গে অন্যান্য কাহিনী যোগ করে পরিবেশন করা হয়। ফলে কাহিনী ক্রমপুঞ্জিত হয়ে ওঠে। কাজেই এ-ধরনের কাহিনীতে অসংলগ্নতা লক্ষ্য না করে পারা যায় না। বাংলাদেশ থেকে এসব কাহিনী সামান্যই সংগৃহীত হয়েছে।

১১. রূপকাহিনী (Fairy Tales)

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের রূপকাহিনীও সবচেয়ে জনপ্রিয়। রূপকাহিনীর সংগ্রহও হয়েছে সর্বাধিক। বাঙলা একাডেমীর সংগ্রহালয়ে এ-কাহিনীর বিপুল সংগ্রহ রয়েছে। দৈর্ঘ্যে এ-কাহিনীই বৃহৎ। অন্য দিকে রূপকাহিনীর মধ্যে বাঙালীর জাতিসত্তার সর্বাধিক পরিচয় বিদ্যমান। রূপ-কাহিনীর ঘটনাবলী যেমন বিচিত্র, তেমনি তা বাঙালী জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠানের সার্থক দলিল। নায়ক-নায়িকার অ্যাডভেঞ্চার, অতিপ্রাকৃত জীব-জানোয়ার, পাখি ও অন্যান্য যাদুগত ঘটনাদি মূল কাহিনীতে প্রাণরসের সঞ্চার করে বলে রূপকাহিনী জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

লোককাহিনীর যে শ্রেণীবিভাগ এখানে দেওয়া হ'ল, তার অধিকাংশই ধর্ম-নিরপেক্ষ। কিন্তু ব্যাখ্যাদানকারী কাহিনী, রোমাঞ্চকর কাহিনী, বীর কাহিনী, পুরাণ কাহিনী ও রূপকাহিনী মানবসমাজের আদিম লোকসংস্কারের পরিচয় বহন করে। লোক-ঐতিহ্যের মধ্যে লোককাহিনীই একমাত্র ঐতিহ্য ; যার পঠন-পাঠন আন্তর্জাতিকভাবে সংগঠিত হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলি যেমন এতে আগ্রহ দেখিয়েছে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিও এ-প্রসঙ্গে বিস্তর গবেষণামূলক কাজ করেছে। লোককাহিনী তার সমস্ত ধর্মীয় ও যাদুবিদ্যাগত উপাদানসহ বাঙালী জনগণকে আনন্দ দিয়েছে। লোককাহিনী চারিত্র্যগত দিক থেকে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাইকে সমানভাবে আনন্দ যোগাতে সক্ষম।

সাংস্কৃতিক প্রতিবিপ্লবীদের বক্তব্য :

সাংস্কৃতিক প্রতিবিপ্লবীরা রাজনৈতিক প্রতিবিপ্লবীদের মতই জনগণের নিজস্ব লোক-ঐতিহ্যকে খণ্ডিত করে বিচার করবার চেষ্টা করে। বাংলাদেশে ইসলামী সংস্কৃতি ও জাতীয় সংহতির নামে এতকাল লোক-ঐতিহ্যকে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করবার মরণপণ প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। আমি আগেই বলেছি, বাংলাদেশের লোক-ঐতিহ্যে হিন্দু-মুসলিম উপাদান আছে বটে, তবে তা যথার্থ সমন্বয় পেয়েছে সর্বক্ষেত্রে। কিন্তু তা সত্ত্বেও করাচী-পিণ্ডির প্রভুদের নির্দেশে সাংস্কৃতিক প্রতি-বিপ্লবীরা ভিন্ন পথ গ্রহণ করে এবং সর্বদা প্রমাণ করবার চেষ্টা করে যে মুসলমান মুসলমানই, হিন্দু হিন্দুই ; বাঙালী বলে যে-জাতটা এতকাল ছিল, তা না-কি নিছক কল্পনার ব্যাপার। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাবোটাজ করবার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় বি. এন. আর. বা জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা। অর্থাৎ বাংলার সংস্কৃতি থেকে হিন্দুয়ানী বিদায় করবার সংস্থা। বেতার, টেলিভিশন এবং সরকারী প্রচার যন্ত্রগুলি নিয়োজিত ছিল এই একই কাজে। বহু পণ্ডিত, গবেষক ও সংস্কৃতি-কর্মী এ কাজে সহায়তা জুগিয়েছে করাচী-পিণ্ডির প্রভুদের। লোক-ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে লালন ফকিরের জীবন ও তাঁর সঙ্গীতধারা নিয়ে এই চক্রান্ত শুরু হয় প্রথম থেকেই। লোক-ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে মুসলিম উপাদানকে আলাদা করে বিচার করবার প্রবণতা বেড়ে যায়। গত চব্বিশ বছর ধরে সাংস্কৃতিক প্রতি-বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ জেহাদ করেছেন, জেহাদ করে জিতেছেন এবং নিজেদের সংস্কৃতি রক্ষা করে সাংস্কৃতিক স্বাধিকারকে ছিনিয়ে এনেছেন।

একশ্রেণীর তথাকথিত ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তি লোক-ঐতিহ্যের নাম শুনলেই ক্ষেপে যেতেন। এক অদ্ভুত বিজাতীয় ঘৃণা প্রকাশ করে এঁরা লোক-ঐতিহ্যের গবেষণাকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছেন। এঁরা মূলত সাংস্কৃতিক প্রতিবিপ্লবীদের হাতকেই শক্তিশালী করেছেন। অন্য দিকে আর একদল পণ্ডিত ও গবেষক 'লোক-ঐতিহ্য'কে ব্যবসায়ের পণ্যে রূপান্তরিত করেন। ফলে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লোক-ঐতিহ্যের বিচার হয় নি। এবং এসব সত্ত্বেও, বাংলাদেশের সাত শতের অধিক প্রবন্ধ ও বই-পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে লোক-ঐতিহ্য সম্বন্ধে। বাঙালীর এই আত্ম-অনুসন্ধান ব্যর্থ হয় নি। বাংলাদেশ সার্থকভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে রূপান্তরিত করেছে সর্বাত্মক মুক্তিসংগ্রামে।

বাংলাদেশ আন্দোলন ঃ সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে

—সৈয়দ আলী আহ্‌সান

১৯৪৭ সালে যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় তখন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল। আজ ১৯৭১ সালে তাঁদের সকলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। বুদ্ধিজীবীদের মানসচৈতন্যের এই পরিবর্তন বিস্ময়কর হলেও অস্বাভাবিক নয়। দেশবিভাগের পূর্বে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের একটি প্রবল প্রতিবাদ ছিল অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে। এই অর্থনৈতিক শোষণের ক্ষমতা ছিল যাদের, তারা সেই ক্ষমতার প্রয়োগে শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে আপন প্রতিষ্ঠাকে সম্ভবপর করেছিল। তাই অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ একটি রাজনৈতিক পরিমণ্ডল নির্মাণ করেছিল বাংলাদেশের মানুষের জন্য। তখন অর্থনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বাংলাদেশের হিন্দু ভূস্বামীবৃন্দ এবং এই ক্ষমতার বলে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন অগ্রসর এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভের অধিকারী। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে সকল ক্ষেত্রে অধিকার লাভের জন্য বাংলাদেশের মুসলমানদের যে-সমস্ত আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে সেগুলো হচ্ছে—(১) আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার জন্য আন্দোলন; (২) অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির আন্দোলন; (৩) প্রাদেশিক পরিষদে ন্যায্য আসন লাভের জন্য আন্দোলন। গুরুত্বরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, সব কটি আন্দোলনই অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির আন্দোলন; ইংরেজী শিক্ষায় মুসলমানরা হিন্দুদের সঙ্গে সমকক্ষতা রক্ষা করতে পারছে না বলে ব্যবসা এবং চাকুরীতে পিছিয়ে আছে। আবার প্রাদেশিক পরিষদে যথাযথ সংখ্যা নেই বলে অর্থনৈতিক অধিকারকে তারা ন্যায্য প্রমাণ করতে পারছে না। সুতরাং এ-কথা বললে অন্যায় হয় না যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে মুসলমানদের সকল আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজ এবং জীবন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি এবং সুপ্রতিষ্ঠা লাভ। অবাঙালী মুসলমান নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের মুসলমানদের এই অভিযোগকে তাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে ক্রমশ ব্যবহার করতে লাগলেন।

মিঃ জিন্নাহ্ ভারতীয় মুসলমানদের জন্য যে ১৪ দফা আন্দোলন শুরু করলেন তাতে বাঙালী মুসলমানরা তাদের জন্য মুক্তির আশ্বাস আছে বলে মনে করেছিল এবং মুসলমানদের এই মানসিকতা নির্মাণের কাজে যেসব বাঙালী মুসলমান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন সাধারণ বাঙালী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন উর্দুভাষী বিত্তবান মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক। যেমন ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা নাজিমুদ্দিন। সাধারণ বাঙালী মুসলমানের নেতা ছিলেন জনাব ফজলুল হক সাহেব, কিন্তু সময়ের অভিঘাতে তিনি তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যস্ত। একটি প্রবল আবেগের উচ্চরোলে বাংলাদেশের মুসলমানরা তখন সম্মোহিত। তারা তখন মিঃ জিন্নাহ্‌কে নেতৃত্ব দিয়েছে যিনি সাম্প্রদায়িকতাকে মূলমন্ত্র করে হিন্দু বিরোধিতাকে একটি তীব্র ভাবাবেগে পরিণত করেছেন। জনাব ফজলুল হক সাহেব অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুসলমান কৃষকদেরকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, মহাজনদের কাছ থেকে ঋণগ্রস্ত দরিদ্র মুসলমানকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্বে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মুসলমান সাময়িক অন্ধতা বশে ফজলুল হককে অস্বীকার করেছিল। মিঃ জিন্নাহ্‌র আন্দোলনে তারা অকস্মাৎ যে আবেগকে অবলম্বন করেছিল ফজলুল হকের রাজনীতি সে আবেগের বিরোধিতা করছে ভেবে তারা ফজলুল হককে অগ্রাহ্য করল। সে সময় বাংলাদেশে পাকিস্তান আন্দোলনের দার্শনিক ছিলেন প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান অধ্যাপকবৃন্দ এবং উৎসাহী কর্মী ছিলেন মুসলমান ছাত্রবৃন্দ। ফজলুল হক মুসলমান কৃষক সমাজকে জানতেন কিন্তু তখনকার ছাত্রসমাজের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর কোনও সংযোগ ছিল না। তাই দুর্বলের আত্মপ্রতিষ্ঠা তাঁর সারা জীবনের লক্ষ্য হলেও সেই আত্মপ্রতিষ্ঠার যে নতুন সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা বুদ্ধিজীবী সমাজে গৃহীত হয়েছে সে ব্যাখ্যাকে তিনি কাজে লাগাতে চান নি। একটি হিংসার রাজনীতিকে সচল করে দরিদ্র মুসলমানদের জন্য অর্থনৈতিক শোষণ-মুক্তির যে-স্বপ্ন সৌধ জিন্নাহ্ সাহেব নির্মাণ করলেন তাতে বাঙালী মুসলমান বিভ্রান্ত হল। এভাবে নেতিবাচক রাষ্ট্রীয় চেতনায় পাকিস্তান আন্দোলন একটি তথাকথিত স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হল। সর্বদেশব্যাপী প্রবল সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভের ফলশ্রুতি-স্বরূপ স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হল। এই স্বাধীনতার পেছনে

আত্মত্যাগ ছিল না, দেশপ্রেম ছিল না, অন্তর্দাহ ছিল না, ছিল শুধু ধর্মান্ধতা এবং হিন্দু-বিরোধিতা। বাংলাদেশের মুসলমান বুদ্ধিজীবিগণ একটি অন্ধ ধর্মীয় চৈতন্যের অহমিকায় যে কোলাহল নির্মাণ করেছিল সেই কোলাহলের ফলস্বরূপ একটি স্বাধীন দেশের জন্ম দেখল। তারা তখন বোঝে নি যে, যে-কারণে তারা পাকিস্তান দাবী করেছিল, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সেগুলি অবিবেচিতই থাকবে। তারা ভেবেছিল চাকুরী ক্ষেত্রে তাদের অবস্থার উন্নতি হবে, ব্যবসায় তারা অধিকার পাবে এবং শাসনক্ষমতায় যথার্থ স্থান পাবে, কিন্তু কার্যত দেখা গেল যে, তারা যা চেয়েছিল তার কোনটাই হচ্ছে না।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জিন্নাহ্ সাহেব ঢাকায় এলেন। বিমান বন্দরে যে-স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যর্থনা পেলেন তা কল্পনাতীত। ঢাকা শহরের লোকেরা তো ছিলই, গ্রাম গ্রামান্তর থেকেও অগণিত লোক এসেছিল দেশনায়ককে দর্শন করবার জন্য। রমনা রেসকোর্সে একটি বিপুল জনসমাবেশে তিনি বক্তৃতা করলেন। এই বক্তৃতায় সর্বপ্রথম স্পষ্ট হল যে, জিন্নাহ্ সাহেব ঢাকায় এসেছেন অধিকারীর মনোভাব নিয়ে, জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে নয়। বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে, উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হবে। জনসমুদ্রের এক অংশে যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ একত্রিত হয়ে ভাষণ শুনছিলেন সেখান থেকে সমস্বরে প্রতিবাদ উঠে—"না, না, না।" প্রতিবাদ জিন্নাহ্ সাহেব গ্রাহ্য করলেন না। তিনি পুনর্বার বললেন যে, উর্দু পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে। দু'দিন পরে কার্জন হলে বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে একই কথার পুনরাবৃত্তি যখন তিনি করলেন তখন প্রতিবাদ হল আরও প্রবল। এবার জিন্নাহ্ সাহেব প্রতিবাদের ভাষা বুঝতে পারলেন যেন। তিনি সংশোধন করে বললেন যে, তাঁর বিবেচনায় উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হওয়া উচিত কিন্তু এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার হল সংবিধান পরিষদের। জিন্নাহ্ সাহেবের সংশোধন সত্ত্বেও বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা সেদিন বুঝতে পেরেছিল যে, স্বাধীন পাকিস্তানে বাঙালীরা তাদের কাম্যকে নিশ্চিন্তে পাবে না। সেইজন্য তাদের সংগ্রাম করতে হবে। এর পরে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী সাহেব যখন ঢাকায় এলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে একটি মানপত্র দেওয়া হয়। উক্ত মানপত্রে বাঙালীদের অভাব অভিযোগের কথা ছাত্ররা স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরে। তারা বলে যে, কেন্দ্রীয়

চাকুরীতে জনসংখ্যার হারে বাঙালীদের জন্য আসন সংরক্ষণ করতে হবে, প্রদেশে প্রদেশে অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করতে হবে এবং সামরিক বাহিনীতে যথেষ্ট সংখ্যক বাঙালীকে নিতে হবে। লিয়াকত আলী সাহেব এই মানপত্র পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, মানপত্রটি সংকীর্ণ মনের পরিচয় বহন করছে এবং তাতে প্রাদেশিকতার স্বাক্ষর আছে। তাঁর বিবেচনায় নতুন রাষ্ট্রের নাগরিকদের কর্তব্য হচ্ছে পাকিস্তানী হিসেবে নিজেদের বিবেচনা করা, বাঙালী অথবা পাঞ্জাবী হিসেবে নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং শিক্ষকসমাজ প্রধানমন্ত্রীর উত্তরে সন্তুষ্ট হয় নি।

বাঙালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সেদিন বুঝতে পেরেছিল যে, পাকিস্তানের সংহতির নামে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ বাঙালীদের ক্রমশ নিঃসম্বল করবেন। সেই সময় বুদ্ধিজীবীদের অনেকে একথা ভেবেছিল যে, হয়তো আমাদের প্রাপ্য আমরা এখনই পাব না, দেশের একটি গঠনতন্ত্র প্রণীত হলেই আমাদের অধিকারের রক্ষাকবচ সেখানে থাকবে। কিন্তু সময় গড়িয়ে যেতে লাগল, গঠনতন্ত্র আর তৈরী হল না। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন এলাকায় নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। কিন্তু বাংলাদেশে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়বার কোন উদ্যোগ দেখা গেল না। আমাদের কোন অভিযোগেরই কোন সমাধান হল না। বরং নতুন নতুন অভিযোগের কারণ ঘটতে লাগল।

দেশবিভাগের পূর্বে আমরা শুনেছিলাম এবং বিশ্বাসও করেছিলাম যে, ইসলাম আমাদের জাতির ভিত্তিস্বরূপ এবং সেই কারণেই পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গ এক জাতীয়তার ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। বিশ্বাস করেছিলাম যে, ইসলাম ধর্ম এমন একটি ভ্রাতৃত্ব দান করবে যাতে ব্যবহারিক জীবনের সকল প্রকারের ভিন্নতা-সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা এবং পূর্ব-বঙ্গের লোকেরা একত্রে থাকতে পারবে। পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের একটি স্বাতন্ত্র্য আছে, যে-স্বাতন্ত্র্য পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বিপর্যস্ত করে না বরঞ্চ বৈচিত্র্য দেয়। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা ভেবেছিল যে, বাঙালী হিসেবে আমাদের সামাজিক এবং ব্যবহারিক জীবনের অধিকার যদি অক্ষুণ্ণ থাকে তাহলে বৃহত্তর পাকিস্তানের সংহতিতে আমরাও আপন অস্তিত্ব নিয়ে মিলিত থাকব। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী এবং রাজনীতি ক্ষেত্রে তাদের অনুচর গুটিকয়েক বাঙালী, বৈচিত্র্যের মধ্যে বৃহত্তর এবং মহত্তর ঐক্য সাধন যে সম্ভবপর তা বিশ্বাস

করলেন না। এর ফলেই বিপর্যয় এল এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের চিন্তাগত এবং আবেগগত ব্যবধান অধিকতর বিস্তার লাভ করল। যেহেতু যথার্থ স্বাধীনতার জন্য এবং দেশপ্রেমকে উপলক্ষ্য করে পাকিস্তান লাভ করা হয় নি, বরঞ্চ ধর্মান্ধতাকে কেন্দ্র করে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান তৈরী হয়েছে তাই তাঁরা দেশপ্রেমকে পাকিস্তানের সংহতির মূল আবেগ হিসেবে বিবেচনা করলেন না—মূল আবেগ হিসেবে বিবেচিত হল জাতিবিদ্বেষ এবং ধর্মান্ধতা। শাসকবর্গ ভাবলেন যে, পাকিস্তানে যদি এই দ্বিজাতি-তত্ত্ব এবং ধর্মান্ধতা বাঁচিয়ে না রাখা যায় তাহলে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে। রাজনীতিবিদগণ সেই মুহূর্তে এই অন্ধ বিশ্বাসকে চিত্তে জাগরূক রেখে তাঁদের সকল সমস্যার সমাধানে তৎপর হলেন। সুতরাং তাঁদের সর্বসময়ের লক্ষ্য হল ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ববঙ্গকে একত্রিত করা। এই একত্রিত করার অর্থ হল প্রথমত উর্দু ভাষাকে বাঙালীদের উপর চাপিয়ে দেওয়া; দ্বিতীয়ত বাংলাদেশের অতীতকে আমাদের চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুছে দেওয়া। পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিবেচনায় বাংলা ভাষা এবং বঙ্গ সংস্কৃতি মূলত হিন্দু ধর্ম ও ঐতিহ্যের ধারক এবং বাহক। দ্বিজাতিতত্ত্বকে যদি অনুক্ষণ স্মরণ করতে হয় তাহলে হিন্দু নামাঙ্কিত সমস্ত কিছুকেই আমাদের জীবন থেকে মুছে ফেলতে হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ প্রথমাবধি তা'ই চেয়েছিলেন। তাঁদের সহযোগী হিসেবে কাজ করেছিলেন পাকিস্তানের প্রথম মুসলিম লীগ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান সাহেব। ইনি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন যে, বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানী জীবনধারার সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হলে এ ভাষার চেহারা সম্পূর্ণ বদলাতে হবে। সুতরাং তিনি প্রস্তাব করলেন যে, বাংলা বর্ণলিপি বর্জন করে আরবী হরফ গ্রহণ করা দরকার। তাঁর যুক্তি ছিল যে, বাংলা লিখন-পদ্ধতির পরিবর্তন যদি এভাবে ঘটে তাহলে একই সঙ্গে দু'টি সমস্যার সমাধান ঘটবে—(ক) পশ্চিমবঙ্গের বাংলা ভাষার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষার সম্পর্ক আর থাকবে না, তার ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্ব-বঙ্গ ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে; (খ) আরবী হরফে লিখিত হওয়ার ফলে ক্রমশ পূর্ববঙ্গের বাংলা ভাষা উর্দুর কাছাকাছি আসবে এবং এভাবে একদিন সমগ্র পাকিস্তানে সর্বজনবোধ্য একটি সাধারণ ভাষা নির্মিত হতে পারবে। এ দু'টি অদ্ভুত তত্ত্ব ফজলুল রহমানের মস্তিষ্ককে এমনভাবে আলোড়িত করেছিল

যে, ভদ্রলোক সর্বপ্রকার শোভনতা, যুক্তি এবং কল্যাণ-বুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে বিবিধ উদ্ভট পরিকল্পনা নির্মাণ করতে থাকলেন এবং অর্থব্যয়ও হল প্রচুর। পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ফজলুল রহমানের এই পরিকল্পনা কোন দিন গ্রাহ্য করে নি। প্রবীণ ভাষাতত্ত্ববিদ, নিষ্ঠাবান সাহিত্য-সেবী এবং একান্ত ধর্মপরায়ণ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপকবৃন্দ এবং ছাত্রসমাজ প্রকাশ্যে ফজলুল রহমানের পরিকল্পনার বিরোধিতা করল। একটি প্রকাশ্য সভায় ডক্টর শহীদুল্লাহ্‌ ঘোষণা করলেন যে, আমাদের ধর্ম যাই হোক না কেন প্রকৃতি, ভূগোল এবং ইতিহাস আমাদের সর্ব অবয়ব এবং মানসিকতায় বাঙালীত্বের যে স্বাক্ষর রেখেছে তা কখনও মুছে যাবার নয়। এ সহজ সত্যটি পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ এবং তাঁদের বাঙালী অনুচরগণ কখনও বোঝেন নি যে ভাষা এবং সংস্কৃতির নিজস্ব একটি ধারা আছে। একটি গাছ যেমন মাটি, বাতাস, আলো, সিক্ততা এবং সর্বোপরি তার নিজস্ব অঙ্কুরকে অবলম্বন করে আপন স্বভাবে বর্ধিত হয়, ভাষা ও সংস্কৃতিও তেমনি একটি অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, ইতিহাস, মনুষ্য-স্বভাব এবং আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠে। মানুষকে কখনও তার সংস্কৃতি এবং ভাষা থেকে বিযুক্ত করা যায় না। পূর্ববঙ্গের মুসলমান তার নিজস্ব বঙ্গ সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে নব নব চৈতন্যে এবং অহমিকায় আপনাকে বিশিষ্ট ও অনন্য করতে চেয়েছিল, তাই এক্ষেত্রে কোন প্রকার বাধা সহ্য করতে সে প্রস্তুত ছিল না। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সর্বমুহূর্তে একথা বলেছে যে, উর্দু'র বিরুদ্ধে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে সকল সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে একটি বৈচিত্র্যের মধ্যে আমরা বাস করতে চাই। একটি দেশে যদি একটিমাত্র সংস্কৃতি-ধারা থাকে তাহলে সে দেশ বৈচিত্র্যহীন হয়। মরুভূমিতে যেমন বৈচিত্র্য নেই, পৃথিবীর সব মরুভূমিই যেমন একরকম, তেমনি পাকিস্তান যদি পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল মিলিয়ে একই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয় তাহলে পাকিস্তান হবে বৈচিত্র্যহীন এবং সেই কারণে তাৎপর্যহীন একটি দেশ। পৃথিবীর বিভিন্ন উর্বরা ভূখণ্ড যেমন শস্যসম্ভারে এবং সজীবতায় একে অন্যের থেকে ভিন্ন অথচ সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যে ও সজীবতায় একে অন্যের নিকটবর্তীও তেমনি পাকিস্তান তার বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ভাষাকে অবলম্বন করে বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হতে পারত এবং সেই ভাবেই

ক্রমশ একে অন্যের নিকটবর্তী হতে পারত। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ তা ঘটতে দিলেন না। তাঁরা ভাবলেন যে-হিন্দু-মুসলিম বৈরিতায় দেশ বিভক্ত হয়েছে ; সে বৈরিতাকে বাঁচিয়ে না রাখলে পাকিস্তানকে বাঁচানো যাবে না। এই উন্মাদ এবং অবাস্তব জীবনদর্শন তাঁদের সর্বপ্রকার বিবেচনাবোধকে আচ্ছন্ন করল এবং তাঁরা সত্যকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন না। তাঁদের নিষ্ঠুর এবং বিকল অবিবেচনা পাকিস্তানের ঐক্যের বিরুদ্ধে একটি মর্মান্তিক আঘাতস্বরূপ ছিল তাও তাঁরা জানতে পারেন নি। পূর্ব বাংলার বুদ্ধিজীবীরা আবেগ ভুলে গিয়ে, অনুভূতিকে হারিয়ে শুধু একটি অবধারিত নিয়মে প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বাস করতে চায় নি। তারা সকল সময় বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কিত থেকে সর্বমুহূর্তে ইচ্ছা ও আগ্রহের অতি সাধারণ মানুষ হয়েই প্রকাশিত হতে চেয়েছে। তারা নিজের ভাষাকে ভুলে গিয়ে এবং আপন মাতৃভূমির সঙ্গে সম্পর্কহীন এক সংস্কৃতিহীন শাসন মেনে নিয়ে শৃঙ্খলিত পরিধির মধ্যে চিত্তকে একটি বন্দিদশায় হারিয়ে ফেলতে চায় নি। আমরা আমাদের জীবনের সফলতার জন্য নৃতত্ত্ব, ভূগোল, ইতিহাস এবং সর্বসময়ের পরিমণ্ডলকে গ্রাহ্য করেছিলাম। কিন্তু এই গ্রাহ্য করাকে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ নিশ্চিন্তে মেনে নিতে পারেন নি। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, আমরা ক্রমশ আমাদের পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ব।

এই পৃথিবীতে আত্ম-আবিষ্কারের পদ্ধতি বহু বিচিত্র। আদিম যুগে মানুষ বন্য জন্তুদের সঙ্গে সংগ্রাম করে আহার্য সন্ধান করেছে। তখন তার প্রয়োজন ছিল তার মুখ্য শত্রুকে আবিষ্কার করা এবং তাকে পরাজিত করে আহার্যের অধিকার লাভ করা। এই আহার্যের অধিকার লাভ করতে গিয়ে মানুষ বন্য জন্তুদের সঙ্গে তার পার্থক্য নিরূপণ করল এবং ক্রমশ বাঁচবার অধিকার নিয়ে মানুষ তার পরিচয়কে চিহ্নিত করল। এভাবে ক্রমশ গোত্র ও সমাজ-বন্ধনও গড়ে উঠল এবং মানুষ তার স্বভাবের অনুশীলনে দক্ষতা অর্জন করে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করল। মধ্যযুগে লক্ষ করি যে, মানুষ ধর্মকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে তার বিচিত্র সত্তা নির্ধারণ করেছে। ধর্ম তখন হয়েছে তার রক্ষাকবচ এবং ধর্মের অনুশাসনে সে পেয়েছে শৃঙ্খলা, আদর্শ এবং কর্ম-নির্দেশ। বহুদিন পর্যন্ত এই ধর্ম মানব-জীবনের গতিধারা নিয়ন্ত্রণ করেছে। ধর্ম রাজনীতি ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত

হয়েছে। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এক একটি জাতি আপন রাষ্ট্রের ভূ-খণ্ডকে সম্প্রসারিত করেছে এবং অন্য রাষ্ট্রের উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। খৃস্টান এবং ইসলাম ধর্মকে অবলম্বন করে বিপুল আয়তনের সাম্রাজ্য সৃষ্টির ইতিহাস আমরা জানি। যেহেতু তত্ত্বগত ভাবে ধর্ম হচ্ছে জীবন ক্ষেত্রে একটি নৈতিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা এবং সেই বিচারে কোন ধর্মভিত্তিক রাজ্য প্রতিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে বিধাতার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা, তাই ধর্মের নামে পররাজ্য আক্রমণকে মানুষ নির্বিবাদে ক্ষমা করেছে। আধুনিক কালে মানুষ নিজেকে ধর্মের মাধ্যমে আবিষ্কার করে না। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে সে জেনেছে যে, মানুষের পরিচয় তার ভূগোল, ইতিহাস, জাতিগত স্মৃতি, আবহাওয়া, আহার্য, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং ভাষার মধ্যে নিহিত। মানুষের প্রতিদিনের আচরণে, তার অবয়বে এবং তার ইচ্ছা ও অহমিকায় সে জাতি হিসেবে চিহ্নিত। ধর্ম কারো কারো জীবনে মূল্যবান হলেও, ধর্ম মানুষের আকৃতি এবং জাতিগত স্বভাবের পরিবর্তন ঘটাতে পারে না। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা এ-সত্যকে প্রবল ভাবে অনুভব করেছিল, তার কারণ তাদের অস্তিত্বের উপর আক্রমণ এসেছিল। যদি আমাদের ভাষার উপর আক্রমণ না আসত, যদি আমাদের সংস্কৃতি-চর্চায় আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম এবং যদি আমাদের উপর পশ্চিম পাকিস্তানী মানসিকতাকে আরোপ করবার অপকৌশল না থাকত তাহলে আমরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভিত্তির মধ্যে বাঙালী হিসেবে বেঁচে থাকতাম এবং পাকিস্তানকে সমৃদ্ধও করতাম। কিন্তু যে-ভেদবুদ্ধিকে অবলম্বন করে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিবেচনায় পাকিস্তানের সৃষ্টি সেই তত্ত্ব থেকে পশ্চিম পাকিস্তানী রাজনীতিবিদগণ কখনও বিচ্যুত হতে চান নি। অর্থাৎ একটি নেতিবাচক ধর্মান্ধতাকে অবলম্বন করে তাঁরা পাকিস্তানের সংহতি নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন। অথচ বাংলাদেশে আমরা দেশবিভাগের পূর্বে অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে মুক্তি চেয়েছিলাম এবং সেই সূত্রে রাজনীতি ক্ষেত্রে আপন ভাগ্য-নির্ধারণের অধিকার চেয়েছিলাম। তাই দেখা গেল পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে আমাদের বিরোধটা সাধারণ নয়। এই বিরোধ দূর করবার একমাত্র উপায় ছিল যদি পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদগণ বাঙালী হিসেবে আমাদের বাঁচবার অধিকারকে মেনে নিতেন। কিন্তু তা হবার ছিল না। একদিকে হিংসা ও ভেদবুদ্ধির রাজনীতি, অন্যদিকে আত্ম-অধিকার লাভের রাজনীতি—এ দু'য়ের মধ্যে কোন ক্রমেই মিলন ঘটতে পারে না।

১৯৫২ সালে প্রথম প্রমাণিত হল যে, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী সর্বতোভাবে আমাদের নিঃস্ব করে পূর্ববঙ্গকে তাদের একটি উপনিবেশে পরিণত করতে চায়। বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৫২ সালে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে আমাদের যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ, সে সংঘর্ষ হচ্ছে মূলত অধিকার-হননকারীদের সঙ্গে অধিকারকামীর সংঘর্ষ। এর পরে ১৯৫৪ সালে সর্বপ্রথম পূর্ববঙ্গে যে নির্বাচন হল সে নির্বাচনে মুসলিম লীগ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হল এবং যূথবদ্ধ কয়েকটি দল বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়ী হয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করল। এই নির্বাচনে পূর্ব-বঙ্গের লোকেরা বাঙালী হিসেবে আপন অস্তিত্বের একটি প্রবল স্বাক্ষর উপস্থিত করল। যেহেতু পশ্চিম পাকিস্তানীদের কুশলী আক্রমণ ছিল আমাদের সংস্কৃতির উপর তাই এই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের গবেষণার জন্য বাংলা একাডেমী প্রতিষ্ঠা করলেন। এই একাডেমীর কর্তব্য হিসেবে নির্ধারিত হল যে, তারা বাংলা ভাষার যথার্থ প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করবে অর্থাৎ তার শব্দসম্ভার এবং ধ্বনিরূপ নিয়ে পরীক্ষা করবে, পূর্ববঙ্গের সকল অঞ্চলে বাংলা ভাষার যে ব্যবহারিক রূপ-বৈচিত্র্য আছে তা আবিষ্কার করবার চেষ্টা করবে এবং প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য নিয়ে গবেষণা করবে। একাডেমীর এই কার্যক্রম দেখলেই বোঝা যায় যে, একাডেমী প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার যথার্থ রূপকে চিরদিনের জন্য সুচিহ্নিত করা, যাতে অন্ধ রাজনৈতিক আক্রমণ থেকে সে ভাষার মর্যাদাকে রক্ষা করা যায়।

যেহেতু ভাষাবিজ্ঞানী এবং পণ্ডিতগণ একাডেমীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাই আশা করা গিয়েছিল যে, একাডেমীর দক্ষ গবেষণা কার্য ফলপ্রসূ হবে এবং ভবিষ্যতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে কদর্য রাজনীতির খেলা বন্ধ হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হল না। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বেশী দিন টিকল না এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের রাজনীতির চক্রান্তে ফজলুল হকের মত দেশপ্রেমিকও দেশদ্রোহী বলে ঘোষিত হলেন। পাঞ্জাবী রাজনীতির চক্রান্তে প্রথমে লিয়াকত আলী নিহত হলেন এবং পরে নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভা গভর্ণর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের নির্দেশে বাতিল করা হল। তারপর ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করা হল এবং আয়ুব খান দেশের শাসনক্ষমতা দখল করলেন। এবার চেষ্টা চলল সামরিক শক্তি বলে, অর্থনৈতিক প্রলোভনে, রাজনৈতিক কৌশলে এবং ধর্মান্ধতায় বাঙালী বুদ্ধিজীবীকে ক্রয় করার।

সরকারী সাহায্যে এবং প্রত্যক্ষ সংযোগে স্থাপিত ও পরিচালিত হল "জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা", "লেখক সংঘ" এবং "পাকিস্তান কাউন্সিল"। জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল এ-কথা অনুক্ষণ প্রচার করা যে, পাকিস্তানের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে ইসলাম এবং এই ইসলামকে অবলম্বন করলে পাকিস্তানের সর্ব অঞ্চলের মানুষ ইসলামী আবেগে প্রবুদ্ধ হয়ে একটি জাতিতে পরিণত হবে। সরকার বহু অর্থ ব্যয় করলেন এই আদর্শকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেবার জন্য। কিন্তু একটি কথা তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, নিজে আদর্শবাদী না হলে কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকবৃন্দের কেউ ধর্মপ্রাণ ছিলেন না। ব্যক্তিগত জীবনে এঁদের মত পাষণ্ড এবং দুরাচারী খুব কম লোকই দেখা যায়। ইসলাম-কর্তৃক নিষিদ্ধ সর্বপ্রকার আচরণ এঁদের জন্য ছিল সম্মানজনক এবং অনুসরণযোগ্য। রাজনীতির ক্ষেত্রে এঁরা ইসলামকে ব্যবহার করেছেন ধর্মভীরু বাঙালীকে বিভ্রান্ত করবার জন্য, কিন্তু নিজেদের জীবনে ইসলামকে কখনও অনুসরণ করেন নি। বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের কাছে এ-সত্যটা সহজেই স্পষ্ট হয়েছিল। তাই তারা জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার কার্যক্রমকে সহজে মেনে নিতে পারে নি। লেখক সংঘ গঠিত হয়েছিল পাকিস্তানের সকল অঞ্চলের লেখকদের অর্থনৈতিক প্রলোভন দেখিয়ে আয়ুবশাহীকে সমর্থন জানাবার জন্য। অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালীদের চিরদিনের যে-অভিযোগ এবং প্রতিবাদ তাকে যাঁরা ভাষা দিয়ে প্রকাশ্য বিক্ষোভে পরিণত করে থাকেন তাঁরা হলেন দেশের কবি ও সাহিত্যিক। এঁরা আবার বিত্তহীনও বটে। এই লেখকদের পুরস্কার দিয়ে, পুস্তক প্রকাশে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়ে এবং বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ দিয়ে আয়ুব চেয়েছিলেন তাঁর প্রচারকার্যে এঁদের সবাইকে নিযুক্ত করতে, মুখ্য বা গৌণ যেভাবেই হোক। দেশের পুঁজিপতিরা কাব্য, গবেষণা, অনুবাদ এবং সাহিত্যের অন্যবিধ ক্ষেত্রের মৌলিক সাহিত্য-কর্মের জন্য পাঁচ হাজার এবং দশ হাজার টাকার অনেক পুরস্কার ঘোষণা করলেন। এই পুরস্কারগুলি সরকারী চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল এবং পুরস্কারগুলি প্রদত্ত হতে লাগল লেখক সংঘের মাধ্যমে। বিস্ময়ের কথা এই যে, বাঙালী লেখকরা পুরস্কার গ্রহণ করলেন ঠিকই এবং অনেকে আয়ুবের জন্য প্রশংসাপত্রও রচনা করলেন কিন্তু ১৯৬৮–৬৯ সালের দিকে দেশে যখন গণ-আন্দোলন জাগল তখন সেই আন্দোলনকে তাঁরা পূর্ণভাবে সমর্থন জানালেন। অর্থাৎ কার্যত প্রমাণিত হল

যে, অর্থ দিয়ে বুদ্ধিজীবীকে ক্রয় করা যায় না। এঁদের সর্বশেষ কৌশল হল পাকিস্তান কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠা। পূর্বের দু'টি ক্ষেত্রে ব্যর্থ হওয়ায় পাকিস্তান কাউন্সিলের ক্ষেত্রে এঁরা সার্থক হবার চেষ্টা করলেন বাঙালী সংস্কৃতিকে জানবার একটি ভাঁওতা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত, বাঙালীর ইতিহাস, ভাস্কর্য ও চিত্রকলা এবং সর্বোপরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে এঁরা বিভিন্ন আলোচনা চক্র গড়ে তুললেন। প্রথম প্রথম ভালই মনে হচ্ছিল, কিন্তু ক্রমশ দেখা গেল যে, এই সমস্ত আলোচনার মাধ্যমে তাঁরা কিছু সংখ্যক বাঙালী বুদ্ধিজীবীকে চিহ্নিত করতে চাচ্ছেন যাঁরা ছাত্রসমাজকে নেতৃত্ব দান করে থাকেন। চিহ্নিত করবার একমাত্র কারণ ছিল যে, এঁদের বিরুদ্ধে গোপনে এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন যাতে এঁরা নেতৃত্ব দানে অক্ষম হয়ে পড়েন। উদাহরণস্বরূপ অধ্যাপক অজিত গুহের কথা বলা যেতে পারে, যিনি উৎসাহিত হয়ে পাকিস্তান কাউন্সিলের অনেক সভায় যোগ দিয়েছেন। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বক্তৃতা করেছেন। এজন্য অজিত গুহকে জেলে যেতে হয়েছিল। তিনি তাঁর চাকুরীও হারিয়েছিলেন। আমি একটিমাত্র উদাহরণ উপস্থিত করলাম। এরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে। সরকারের এই সমস্ত চতুরতার ফলে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা এবং ছাত্রসমাজ পাকিস্তান কাউন্সিলের প্রতি বিক্ষুব্ধ হল এবং ১৯৬৮-৬৯ সালের দিকে প্রকাশ্য আন্দোলনে কাউন্সিলকে ধিকৃত করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও রাজনৈতিক আক্রমণ চালিয়েছিলেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত বন্ধ করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রবীন্দ্রচর্চা খর্ব করা, আমাদের সংস্কৃতির বিলোপসাধনের পথে তাঁদের একটি প্রধান অস্ত্র। কিন্তু তাঁরা কিছুই করতে পারলেন না। শুধু বাঙালীদের মনে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে অধিকতর বিতৃষ্ণার ভাব গড়ে তুললেন। যে-রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কবি হিসেবে বাঙালীদের উৎসাহ ও গর্ব ছিল সেই রবীন্দ্রনাথ পশ্চিম পাকিস্তানীদের অপকৌশলের ফলে বাঙালীদের জাতীয় আদর্শে পরিণত হল। বুদ্ধিহীনতা, চিত্তবিকার এবং অন্ধ ভারত-বৈর পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ বর্বরদের সমতুল্য করে তুলেছিল।

১৯৬৮-৬৯ সালের আন্দোলনে প্রমাণিত হল যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা আমাদের কল্যাণ কখনও চায় না। তারা অস্ত্রের সাহায্যে বাংলাদেশে নিজেদের

অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে শোষণ ও লুণ্ঠন কার্য চালাতে চায়। বাংলা-দেশে আমরা দেখেছি যে, পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের অন্যায়কে যতই আমরা বাধা দিয়েছি ক্রমান্বয়ে বাধা পেয়ে সে অন্যায় শুধুই প্রবল হয়েছে। তাই শেষপর্যন্ত আমাদের যুব সম্প্রদায় বিদ্রোহ ঘোষণা করল। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী এবং যুবক সম্প্রদায় যখন আবিষ্কার করল যে, পাকিস্তানী শাসকবৃন্দ বাঙালী জাতির ললাটে চিরকালের নির্দেশ-পালনকারীর চিহ্ন এঁকে দিতে চাচ্ছে তখন তারা আত্মসচেতন হল। এবং প্রবল বিক্ষোভে সমগ্র বঙ্গভূমিকে আলোড়িত করল।

বাংলাদেশে আমরা আমাদের প্রকৃতি, পরিমণ্ডল, ইতিহাস ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে বাস করতে চেয়েছিলাম। আমরা বিশ্বাস করতাম এবং এখনও করি যে, আমাদের কণ্ঠে উচ্চারিত ধ্বনি, দৃষ্টিতে গৃহীত চিত্রছায়া এবং চিন্তার জন্য চিত্তে স্মৃতির অবলম্বন সবই আমাদের দেশ এবং ইতিহাসকে কেন্দ্র করে। আমরা জেনেছি যে, আমাদের প্রতিদিনের কর্মে, বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের যে-সম্পর্ক সেই সম্পর্কই প্রেরণা-স্বরূপ কাজ করছে। পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের অবমাননা ঘটাতে চেয়েছিল। তাদের ঘৃণিত অমানবিক আচরণের প্রতিবাদে আজ আমাদের সংগ্রাম।

বাংলাদেশে গণহত্যা

—জাফর সাদেক

'এত রক্ত মধ্যযুগ দেখে নি কখনো'

চির সবুজের দেশ বাংলার নিরীহ, নিরস্ত্র, শান্তিপ্রিয় মানুষ আজ সুপরিকল্পিত গণহত্যা-যজ্ঞের অসহায় শিকার। সর্বাধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে পশ্চিম পাকিস্তানী ষড়যন্ত্রকারীরা, সৈন্যরা, পশুরা। সমস্ত মানবিক বোধ-বর্জিত, বিকৃত মানসিকতার মূর্তিমান প্রতীক পশ্চিমী সমরনায়ক ও সৈন্যদের নারকীয় তাণ্ডবলীলায় লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে কোটি কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি। শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ, বিদ্যায়তন-গ্রন্থাগার, অফিস-আদালত, মন্দির-মসজিদ, গীর্জা-বিহার কিছুই বাদ যায় নি পশুশক্তির আক্রমণ থেকে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষ ও তাদের সম্পত্তি, ঐতিহ্যের নিদর্শন ও ধর্মীয় পীঠস্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বৃদ্ধা, নারী, শিশুও রেহাই পায় নি। নিরপরাধ শান্তিকামী নিরীহ দেশবাসীর উপর পাক-সেনারা জল, স্থল ও বিমানপথে ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়েছে ও চালাচ্ছে। হত্যা, ধ্বংস, পাশবিক অত্যাচার, অগ্নিসংযোগ ও লুণ্ঠনের মাধ্যমে পাক-সেনারা সারা বাংলায় এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করেছে। শহরে মৃতদেহ, গ্রামে মৃতদেহ, সাগরে মৃতদেহ, নদীতে মৃতদেহ, গৃহাঙ্গনে মৃতদেহ, সবুজ প্রান্তরে মৃতদেহ। বাংলার পথে পথে আজ মৃতদেহের প্রদর্শনী। চিল-শকুন, শিয়াল-কুকুর সর্বত্র মৃত মানুষের দেহের উপর মহোৎসব লাগিয়েছে। প্রায় বিশ লক্ষ নিরস্ত্র বাঙালী নরনারী প্রাণ হারিয়েছে। সত্তর লক্ষ বাঙালী গৃহ থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় নিয়েছে ভারতে। আর কমপক্ষে তিনশ' লক্ষের মত মানুষ নিরাপত্তার সন্ধানে এক স্থান থেকে আর এক স্থানে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশেরই অভ্যন্তরে। জীবনের নিরাপত্তার কাছে শারীরিক সুখ, বিষয়-বৈভব, বিলাস-ব্যসন, এমন কি সামান্য গৃহ ও শয্যা পর্যন্ত মিথ্যা হয়ে গেছে। বাঙালী আজ নিজ গৃহে হত,

অবমানিত, নিজেরই গৃহ থেকে পলাতক। দুধকলা দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পোষা বিষধর সাপের বিশ্বাসঘাতকতায় সে হতচেতন। তার মাথার উপর ছায়া নেমেছে হত্যার, লক্ষ লক্ষ নিরস্ত্র, অসামরিক মানুষকে বিনা অপরাধে, বিনা বিচারে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যার—যে হত্যার নাম গণহত্যা।

ইয়াহিয়া চক্রের শত সাবধানতা সত্ত্বেও বাংলায় তাদের নৃশংসতার কাহিনী চাপা থাকে নি। যেখানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বেশ কিছুকাল হিটলার গণহত্যার সংবাদ ও তার বিবরণ পৃথিবীর মানুষের গোচরের বাইরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল, সেখানে রক্তপিপাসু পশ্চিমী সামরিক ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের পূর্ব পরিকল্পনা ও পরবর্তী কার্যকলাপের অধিকাংশ বিষয়ই লুকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের ঘৃণ্য অত্যাচারের কাহিনী সকল দেশের মানবদরদী শান্তিকামী মানুষকে শিহরিত ও বিচলিত করেছে ; রাষ্ট্রপ্রধান থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাই অত্যন্ত মর্মাহত এবং তাই সারা পৃথিবীতে প্রবল দাবী উঠেছে : গণহত্যা বন্ধ কর।

কারণ গণহত্যা (Genocide) প্রচলিত (Customary) ও আন্তর্জাতিক আইনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ও কঠোর শাস্তিসাপেক্ষ। বহুকাল ধরে নানা দেশে নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষ অস্ত্রধারীর হাতে হত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। বিনীত, আইনানুগত প্রজা বা নাগরিক হয়েও অত্যাচারী, হৃদয়হীন ন্যায়বোধশূন্য রাষ্ট্রশাসকের অন্যায় রোষ থেকে তারা জীবন ও সম্পত্তি বাঁচাতে পারে নি। কখনও ধর্মের কারণে, কখনও সংস্কৃতির কারণে—আসলে মূলত অর্থনৈতিক শোষণের প্রয়োজনে—অস্ত্রধারী নিরস্ত্র নিরীহ মানুষের প্রাণনাশ করেছে ; রাজনৈতিক মতামতের দোহাই দিয়ে তো বটেই। মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, রাজার হাতে প্রজার জীবন ও সম্পত্তি সবসময় নিরাপদ নয়। অথচ ন্যায়ের বিচারে একজন সৎ আইনমান্যকারী নাগরিকের নিরাপদে সুখে স্বস্তিতে বাঁচার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কোন সরকার হাতে পেলেই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের জীবন কোন কারণেই বিপন্ন করতে পারেন না। প্রতি ক্ষেত্রেই সরকারকে নিয়মমাফিক প্রমাণ করতে হবে যে, সংশ্লিষ্ট মানুষটি প্রতিষ্ঠিত আইনের চোখে অপরাধী ; আইনসম্মত উপায়েই অপরাধীর শাস্তি বিধান করতে হবে। অর্থাৎ কোন দেশের নাগরিক সে-দেশের সরকারের খেয়ালখুশির সামগ্রী নয় ; প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনে ব্যক্তি, সমষ্টি ও সরকার একই সঙ্গে বাঁধা।

আইনসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত কোন রাষ্ট্রের নাগরিক সেই রাষ্ট্রেরই একমাত্র উদ্বেগের বিষয় কিনা এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইনের কিছু করণীয় আছে কিনা—এ প্রশ্ন বহুদিনের। সাধারণ ক্ষেত্রে এবং কোন চুক্তিবদ্ধ শর্তাদি না থাকলে, কোন নাগরিকের প্রতি তার রাষ্ট্রের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় পড়ার কথা নয় এবং সমস্ত ব্যাপারটাই সেই রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ-ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্যে পড়ে। কিন্তু বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ শেষপর্যন্ত এ সত্য অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, ব্যক্তির নিরাপত্তা ও কল্যাণ জাতীয়তা-নির্বিশেষে একটি আন্তর্জাতিক বিষয়। এই বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল কোন রাষ্ট্রে বসবাসকারী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রাষ্ট্রের অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য আন্তর্জাতিক রক্ষাব্যবস্থা প্রয়োগের প্রশ্ন নিয়ে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মিত্র শক্তি ও তাদের সহযোগী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহ ও বলকান রাষ্ট্রাবলীর যে কতিপয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেখানে শর্ত ছিল: কোন রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল অধিবাসীকে ভাষা, জাতি ও ধর্ম-নির্বিশেষে প্রাণের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে এবং তাদের ধর্মমত ও বিশ্বাস অনুযায়ী আচরণের স্বাধীনতা দিতে হবে।[১] অন্য একটি শর্তে সমস্ত রাষ্ট্রের সব জাতিকেই আইনের চোখে সমান অধিকার দেওয়া হয় এবং একই নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করা হয়।[২] এর ফলে প্রতিটি রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর নাগরিকই আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা লাভের উপযুক্ত বলে স্বীকৃত হয়েছে। রাষ্ট্রমধ্যস্থিত সব জাতি, ধর্ম ও ভাষার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্যান্য নাগরিকদের সঙ্গে সমান আইনানুগ ব্যবহার পাওয়ার ও নিরাপত্তা বিধানের শর্তও সেখানে সংযোজিত হয়।[৩] সেই সঙ্গে নিজেদের মধ্যে ভাব-বিনিময়, গ্রন্থরচনা, জনসভায় বক্তৃতা ও আদালতে বক্তব্য পেশ করার অধিকারও তাদের প্রদান করা হয়। আরও বলা হয়, তারা বিদ্যালয়, ধর্মীয় ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারবে। জাতিপুঞ্জের (League of Nations) দায়িত্বে এই সমস্ত শর্ত

১ Article 2: The Minorities Treaty with Poland of 1919; The Minorities Treaty with Czechoslovakia of 1919: Manual of Public International Law, ed., Max Sorensen, Macmillan, New York, 1968, p. 496

২ Article 7: ibid

৩ Article 8: ibid

আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতায় পরিণত হয় এবং জাতিপুঞ্জের সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে সেগুলো সংশোধন করা সম্ভব ছিল না।[৪]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে এই সব বাধা-নিষেধ উপেক্ষিত হয় চরমভাবে। যুদ্ধের পর ইটালীর সঙ্গে সম্পাদিত শান্তিচুক্তিতে সংখ্যালঘুকে সমান অধিকার দানের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৫ সালে স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে অস্ট্রিয়াকে পুনঃপ্রতিষ্ঠাকালে যে রাষ্ট্রীয় চুক্তি হয় সেখানেও সংখ্যালঘুরা সমান অধিকার লাভ করে। ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার-সম্পর্কিত এক প্রস্তাবে নিজস্ব সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষার প্রতি সংখ্যালঘুর অধিকার স্বীকৃত হয়।[৫]

আসলে কোন রাষ্ট্রের শুধু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার লাভের ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অর্থাৎ রাষ্ট্রের সকল অধিবাসীর জন্য রক্ষাব্যবস্থা করার প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার পর। কোন কোন রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু-কর্তৃক সংখ্যাগুরুর নিরাপত্তা ও মৌলিক অধিকার হরণ লক্ষ করে বিশ্বের শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। ফলে নর-নারী, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির কারণে এবং জাতিগত ও বর্ণগত সমস্ত অবিচার বন্ধ করার জন্য বিস্তৃত যে ব্যবস্থা করা হয় তার মধ্যে সংখ্যালঘুরও নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ও পরবর্তী কালে, নাৎসীদের নৃশংসতার পটভূমিতে, পৃথিবীর সর্বত্র মানবাধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা যে বিশ্বের শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার স্বার্থেই প্রয়োজন তা অনুভূত হয়। এ সম্পর্কে অনুষ্ঠিত একাধিক সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে এবং মিত্র শক্তির সঙ্গে ইটালী, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, ফিনল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশের সম্পাদিত চুক্তিতে বলা হয়: এই সমস্ত রাষ্ট্র জাতি, নর-নারী, ভাষা বা ধর্ম-নির্বিশেষে মানবিক অধিকারগুলো এবং সংবাদপত্রের ও গ্রন্থপ্রকাশের, ধর্মীয়, রাজনৈতিক মতামত প্রকাশের ও জনসভা অনুষ্ঠানের স্বাধীনতা-সহ সকল মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রে বসবাসকারী সমস্ত মানুষ যাতে ভোগ করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৪ ibid

৫ Article 27: Res. 2200 (XXI), 16 December 1966: Manual of Public International Law. p. 497

পরবর্তী কালে ব্যক্তি হিসেবে মানুষের মৌলিক অধিকার লাভের প্রশ্নটি রীতিমত গুরুত্বসহ বিবেচিত হতে থাকে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় হয়ে পড়ে। একটি রাষ্ট্রের গণস্বার্থবিরোধী বা মানবতাবিরোধী সরকার যাতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের মানবিক ও মৌলিক অধিকার হরণ করতে না পারে তার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলো কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং সেই চেষ্টার প্রতিফলন ঘটে জাতিসংঘের সনদে। ১৯৪৮ সালে গৃহীত জাতিসংঘ সনদের[৬] ত্রিশটি ধারায় মানুষের মৌলিক অধিকার-সমূহ নির্দেশিত হয়েছে : জাতি, বর্ণ, নর-নারী, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত, জাতীয় অথবা সামাজিক পরিচয় (origin), সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য পরিচিতি (statue) নির্বিশেষে সর্বত্র সকল পুরুষ ও নারী মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা-সমূহ ভোগ করবে। এই সমস্ত অধিকার ও স্বাধীনতা প্রধানত দু' শ্রেণীর : নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারসমূহ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে পড়ে : ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার, দাসত্ব থেকে স্বাধীনতা, নির্যাতন অথবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি থেকে স্বাধীনতা, নির্বিচার গ্রেফতার ও আটক থেকে স্বাধীনতা, একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত-কর্তৃক ন্যায্য বিচারলাভের অধিকার, দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ গণ্য হওয়ার স্বাধীনতা, চিঠিপত্রের ব্যক্তিগত চারিত্র্য ও গোপনীয়তা অলঙ্ঘনীয় রাখা, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত ও বসবাসের স্বাধীনতা, নির্যাতনের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা ও লাভের অধিকার, জাতীয়তা লাভের অধিকার, বিবাহ ও পরিবার স্থাপনের অধিকার, সম্পত্তির মালিকানা লাভের অধিকার, চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা, শান্তিপূর্ণ সভা ও সমিতি করার স্বাধীনতা, ভোট দেওয়া ও সরকারের কাজে অংশগ্রহণের অধিকার। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকারের মধ্যে পড়ে : সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, কাজ করা, বিশ্রাম নেওয়া ও অবসর যাপনের অধিকার, জীবনযাত্রার যথোপযুক্ত মান লাভের অধিকার, বিদ্যাশিক্ষার অধিকার এবং সমাজের সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার।

[৬] GA Res. 217 (III), 10 December 1948

জাতিসংঘ সনদ স্পষ্ট ভাষায় প্রতিটি মানুষের সমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও অধিকার দেওয়ার কথা বলেছে। রাষ্ট্রীয় সীমার সঙ্গে মানুষের মৌলিক অধিকার লাভের প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী ভাবে জড়িত নয়। আন্তর্জাতিক আইন ব্যক্তির পিছনে দাঁড়িয়ে; আইনের চোখে তাকে সমান অধিকার দিতেই হবে।

কোন কোন মৌলিক অধিকার জনসাধারণকে দিতে প্রতিটি রাষ্ট্র বাধ্য থাকবে তার কোন নির্দিষ্ট ও সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হয় নি। আসলে প্রতিটি দেশের সামনে একটি লক্ষ্য হিসেবে জাতিসংঘ সনদ উপস্থিত করা হয়। কিন্তু কোন চুক্তির মাধ্যমে তা সাধারণভাবে বাধ্যতামূলক করা হয় নি। জাতিসংঘ সনদভুক্ত মৌলিক ও মানবিক অধিকারসমূহ রক্ষা করার ব্যাপারে প্রতিটি সদস্য-রাষ্ট্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাধ্যতামূলক না হওয়া সত্ত্বেও এই সনদ অগ্রাহ্য করার অধিকার কারুর আছে বলে জাতিসংঘ স্বীকার করে নি। ৫৬ সংখ্যক ধারা-অনুসারে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রয়োজন হলে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সম্মিলিতভাবে বা পৃথকভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা। ২ সংখ্যক ধারার ৭ সংখ্যক উপধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, সনদে যা সন্নিবেশিত হয় নি সে-সম্পর্কেও ব্যবস্থা গ্রহণকালে জাতিসংঘ কোন রাষ্ট্রের নিতান্তই আভ্যন্তরীণ বিষয়ের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে। প্রকৃত প্রস্তাবে সনদভুক্ত মৌলিক অধিকারগুলো যাতে সকল রাষ্ট্র জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষা নির্বিশেষে সবাইকে প্রদান করে তার জন্য একটি সক্রিয় ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে জাতিসংঘ প্রায় এক যুগ ধরে চেষ্টা চালিয়েছে। ১৯৬৫ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ সকল প্রকারের জাতিগত ভেদ-নির্ভর আচরণ (racial discrimination) নির্মূল করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তিসভাপত্র (International convention) গ্রহণ করে।[৭] এখানে সদস্য-রাষ্ট্রগুলো জাতিগত ভেদ-নির্ভর আচরণ, বিশেষ করে, জাতিগত নিঃসঙ্গকরণ (racial segregation) ও বর্ণবিদ্বেষের (apartheid) নিন্দা করে। এইসব আচরণ উচ্ছেদ করার বাস্তব পন্থা হিসেবে এই চুক্তিসভাপত্রে ১৮ জন বিশেষজ্ঞের একটি পর্ষদ নিয়োগের ব্যবস্থা আছে যা এ প্রেক্ষিতে প্রত্যেক রাষ্ট্র-কর্তৃক গৃহীত আইন প্রণয়নগত, বিচারগত, শাসনব্যবস্থাগত বা অন্যান্য বিষয়গত ব্যবস্থাদি বিবেচনা

৭ Res. 2106 (XX), 21 December 1965 : Sorensen, p. 503

করবে, সে সম্পর্কে সাধারণ পরিষদকে পরামর্শ দেবে ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ করবে। ১৯৬৬ সালে জাতিসংঘ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত দুটি আন্তর্জাতিক চুক্তিনামা গ্রহণ করে।[৮] দুটি চুক্তিনামাতেই সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার-সম্পর্কিত শর্তাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রথমটিকে প্রত্যেক মানুষের কাজ করার, কাজের যথাযথ ও অনুকূল শর্তাবলী লাভের, শ্রমিক-সমিতিতে যোগদানের, সামাজিক নিরাপত্তার, জীবনযাত্রার যথোপযুক্ত মান লাভের, স্বাস্থ্যরক্ষার ও শিক্ষালাভের অধিকার সদস্য-রাষ্ট্রগুলো স্বীকার করেছে। দ্বিতীয় চুক্তিনামায় মানুষের জীবনের, ব্যক্তিগত গোপনীয়তার, বিবেকের, ধর্মের, মতামতের, সভার ও সমিতির অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এতে শারীরিক নির্যাতন বা দাসত্ব এবং জাতি, বর্ণ, নর-নারী প্রভৃতি-ভিত্তিক কোন পৃথক আচরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে, আর সেই সঙ্গে দেওয়া হয়েছে, সুবিচার পাওয়ার নিশ্চয়তা। একই সঙ্গে এতে নিশ্চিত করা হয়েছে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকারসমূহ, শিশুদের ও সংখ্যালঘুদের জাতিগত, ধর্মগত ও ভাষাগত নিরাপত্তা। এইসব চুক্তিপত্রে সন্নিবেশিত শর্ত-অনুসারে যে-কোন সদস্য-রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চুক্তিবদ্ধ শর্তাবলী লঙ্ঘনের অভিযোগ আনতে পারবেন। এমনকি, যে-কোন লোক ব্যক্তিগতভাবেও কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শর্তাবলী লঙ্ঘনের অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবে।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের প্রশ্নে জাতিসংঘ বহুবার তার বিধিবদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে। বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী ও রুমানিয়ায় জাতিসংঘ সনদের বরখেলাপ ঘটলে জাতিসংঘ যথাযথভাবে তার নিন্দা করে।[৯] ১৯৫৫ সালে বর্ণ-বৈষম্যের প্রশ্নে মানবাধিকার রক্ষার ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকা সহযোগিতা দানে অস্বীকার করায় সাধারণ পরিষদ উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং সংশ্লিষ্ট সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষরদান কালে মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহ, মানবদেহের মর্যাদা ও মূল্য সে সরকার সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করেছিল; সাধারণ পরিষদ ৫৬ সংখ্যক ধারায় নির্দেশিত বাধ্যবাধকতা পালন করার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে আহ্বান করে। তৎসত্ত্বেও

৮ Res. 2200 (XXI), 16 December 1966

৯ Res. 385 (V), 3 November 1950, ibid, p. 499

সনদভুক্ত বাধ্যবাধকতা পালনের ক্ষেত্রে ক্রমাগত পুরোপুরি অবাধ্যতা প্রদর্শন করায় দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কঠোর নিন্দা করে সাধারণ পরিষদ প্রস্তাব নেয় ১৯৬১ সালে।[১০] এর কিছুকাল পরেই সাধারণ পরিষদ সদস্য-রাষ্ট্রদের অনুরোধ করে, পৃথকভাবে বা সমবেতভাবে এমন সব ব্যবস্থা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গ্রহণ করতে—যেমন কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা, দক্ষিণ আফ্রিকার পতাকা শোভিত জাহাজের জন্য বন্দরসমূহ বন্ধ করে দেওয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার পণ্য বর্জন করা—যার ফলে রাষ্ট্রটি তার বর্ণবৈষম্য-নীতি বর্জন করে। এই সঙ্গে সাধারণ পরিষদ অবরোধসহ উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে নিরাপত্তা পরিষদকে অনুরোধ করার সিদ্ধান্ত নেয়, যাতে করে দক্ষিণ আফ্রিকা এ বিষয়-সম্পর্কিত সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্তগুলো মেনে নেয়।[১১] সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের ক্রমাগত গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মান্য করতে ব্যর্থ হওয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র সরকারের নিন্দা করে ১৯৬৩ সালে নিরাপত্তা পরিষদ আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং সংশ্লিষ্ট সমস্ত সরকারকে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও রক্ষা এবং প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত রকম যন্ত্রপাতি ও উপাদান বিক্রয় ও জাহাজে পাঠানো বন্ধ করার আহ্বান জানায়।

বস্তুত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত নানা আন্তর্জাতিক আইনে মানুষের মৌলিক অধিকার স্বীকার ও রক্ষা করার যে ব্যবস্থা করা হয় তা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আরও কঠোরতর আইন-কাঠামো লাভ করে। প্রতিটি সভ্য দেশের শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার জাতিসংঘ সনদের আলোকে স্বীকার করা হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশের আভ্যন্তরীণ আইন ও আন্তর্জাতিক আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন বিশেষ সরকারের অসুবিধা-সত্ত্বেও ব্যক্তির মৌলিক অধিকার হরণের ক্ষমতা কারুর নেই। সরকারের সমালোচনা মাত্রই রাষ্ট্রবিরোধিতা নয়—এই সত্য স্বীকৃতি লাভ করেছে; সেই সঙ্গে একথাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, কোন দেশের নাগরিক সেই দেশের যথেচ্ছার জিনিস নয়। প্রতিষ্ঠিত ও আন্তর্জাতিক আইন তার নিরাপত্তা বিধান ও তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে হিটলার ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা অসংখ্য নিরস্ত্র অসামরিক নর-নারীকে সুপরিকল্পিত উপায়ে হত্যা করে। তারা ভঙ্গ করে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত

---

১০ Res. 1663 (XVI), 28 November 1961, ibid, p. 499

১১ Res. 1761 (XVII), 6 November 1963, ibid, p. 500

প্রচলিত ও আন্তর্জাতিক আইন। এ জন্যে গণহত্যার অপরাধে ন্যুরেমবার্গে তাদের বিচার করা হয়। জাপান সরকারের কয়েকজন কর্মকর্তাও আন্তর্জাতিক আইনভঙ্গের জন্য টোকিও আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতে বিচারের সম্মুখীন হন।

মূলত হিটলারের নিষ্ঠুরতার ফলে পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ গণহত্যা সম্পর্কিত আইন বিধিবদ্ধ ও কঠোরতর করতে সচেষ্ট হয়। ন্যূরেমবার্গ সনদে এ-সম্পর্কিত কিছু বিধিব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী কালে এ-প্রেক্ষিতে একাধিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং জাতিসংঘ বিষয়টি নিয়ে বিশেষভাবে চেষ্টা করতে থাকে। তারই ফলে ১৯৪৮ সালে 'গণহত্যা চুক্তিসভাপত্র' (Genocide Convention) ও ১৯৪৯ সালে চারটি জেনেভা চুক্তিসভাপত্র (Geneva Conventions) গৃহীত হয়। সংশ্লিষ্ট আরো কিছু কার্যকরী ব্যবস্থাও গৃহীত হয় একই সঙ্গে। এখানে বিধিবদ্ধ আইনগুলোর প্রায় সবই প্রচলিত আন্তর্জাতিক আইনের প্রতিভূ-মাত্র। চুক্তিসভাপত্রে স্বাক্ষরকারী না হয়েও প্রতিটি রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট আইন মানতে বাধ্য। পাকিস্তান একজন স্বাক্ষরকারী।

ন্যুরেমবার্গ[১২] ও টোকিওতে[১৩] যে আন্তর্জাতিক বিচারালয় বসে সেখানে আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে কতিপয় মৌলিক নীতি গৃহীত হয়। সে অনুসারে শান্তির বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ, যুদ্ধে কৃত অপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে কৃত অপরাধ—আন্তর্জাতিক আইনে—শাস্তিযোগ্য। যে দেশে অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে সে দেশের আভ্যন্তরীণ আইনানুসারে উপরি-উক্ত কোন অপরাধ শাস্তি-যোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য না হলেও আন্তর্জাতিক আইনে তার ক্ষমা নেই। অপরাধীদের দায়িত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ন্যুরেমবার্গ ট্রাইবুনাল তাঁদের রায়ে[১৪] বলেন:

'একথা বহুকাল ধরে স্বীকৃত যে আন্তর্জাতিক আইন ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের উপর দায়দায়িত্ব আরোপ করে…কোন নির্বস্তু সত্তা নয়, বরং মানুষই আন্তর্জাতিক

১২ যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়া লণ্ডনে ১৯৪৫ সালের ৮ই আগস্টে সম্পাদিত এক চুক্তিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রধান যুদ্ধাপরাধীদের আন্তর্জাতিক আইনে বিচারের ব্যবস্থা করে।

১৩ দূর প্রাচ্যে মিত্রশক্তির সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ১৯৪৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী দূর প্রাচ্যের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইবুনাল গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

১৪ ১৯৪৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর এই রায় প্রদত্ত হয়।

আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ করে থাকে, এবং যারা এ ধরনের অপরাধ করে থাকে কেবল তাদের শাস্তি দিয়েই আন্তর্জাতিক আইন কার্যকর করা যায়...বিশেষ অবস্থায় একটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদেরকে যে আন্তর্জাতিক আইন নিরাপত্তা প্রদান করে তা আন্তর্জাতিক আইনে নিন্দিত অপরাধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এইসব কাজের জন্য দায়ী ব্যক্তিরা যথাযথ বিচারে প্রাপ্তব্য শাস্তি এড়িয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের সরকারী পদমর্যাদার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন না...কোন রাষ্ট্র যদি আন্তর্জাতিক আইন-দত্ত ক্ষমতার বাইরে ক্রিয়াশীল হয়ে কাউকে কোন কর্তব্য সম্পাদনের অধিকার প্রদান করে তাহলে, সেই অধিকারবলে কর্তব্য সম্পাদনকালে যুদ্ধের আইন ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দায়মুক্ত হতে পারেন না...একজন সৈনিককে যে যুদ্ধের আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করে হত্যা ও অত্যাচার করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল—নিষ্ঠুরতার পক্ষে যুক্তি হিসেবে এটি কখনও স্বীকৃত হয় নি, এমনকি সেই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তি কমানোর জন্য অনুরোধ করা গেলেও।'[১৫]

ন্যুরেমবার্গ সনদে যুদ্ধের পূর্বে ও যুদ্ধকালে হত্যা, অন্যায় আচরণ, দাসত্ব বা অন্য কোন কাজে দখলকৃত এলাকার অসামরিক জনসাধারণকে নিয়োগ যুদ্ধাপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে। মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ: অসামরিক জনসাধারণকে হত্যা, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্নকরণ, দাসত্বে নিযুক্তি, অন্যত্র চালান দেওয়া এবং তাদের প্রতি অন্যান্য অমানুষিক আচরণ।[১৬] যুদ্ধবন্দীদের প্রতি আচরণ, নগর, শহর বা গ্রাম খেয়ালখুশিমত ধ্বংস করা সনদে অপরাধ বলে অন্যায় চিহ্নিত করা হয়েছে।[১৭] ন্যুরেমবার্গ সনদে প্রধান প্রধান অপরাধের উল্লেখ থাকলেও ন্যুরেমবার্গ রায় সেই তালিকা সম্পূর্ণ নয় বলে মন্তব্য করেন।[১৮]

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৬ সালে ন্যুরেমবার্গ ও টোকিও সনদভুক্ত

১৫ Manual of Public International Law, p. 516.

১৬ Article 6b and 6c : U. S. War Crimes in Vietnam : Juridical Science Institute under The Vietnam State Commission of Social Sciences, Hanoi, p. 197.

১৭ Vietnam ! Vietnam ! Felix Greene, Pengiun Special S255, 1966, p. 160.

১৮ U. S. War Crimes in Vietnam, Hanoi, p. 205.

নীতিমালার প্রতি অনুমোদন দান করে।[১৯] একই সঙ্গে গৃহীত এক প্রস্তাবে গণহত্যাকে আন্তর্জাতিক আইনে দণ্ডনীয় বলে ঘোষণা করা হয়। সেই আইনে দোষী প্রমাণিত হলে রাষ্ট্রপ্রধান (Statesman), সরকারী কর্মচারী (Public official) অথবা ব্যক্তিবিশেষও (Private individual) যথাবিহিত দণ্ডযোগ্য।[২০] এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর পরই জাতিসংঘ গণহত্যা-সম্পর্কিত যথাযথ আইন প্রণয়নের কাজে হাত দেয়। এবং তারই ফলে ১৯৪৮ সালে সাধারণ পরিষদ-কর্তৃক গণহত্যাপরাধের প্রতিরোধ ও শাস্তিবিধান সম্পর্কিত চুক্তিসভাপত্র (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) গৃহীত হয়। সাধারণত 'গণহত্যা চুক্তিসভাপত্র' নামে পরিচিত এই আইন ১৯৫১ সালে কার্যকর করা হয়।

১৯৪৮ সালের গণহত্যা চুক্তিসভাপত্র ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য চুক্তিপত্র পাকিস্তানী হোতাদের গণহত্যাপরাধ প্রমাণের ক্ষেত্রে প্রধান মানদণ্ড। এই সব চুক্তিপত্র-ধৃত শর্তাবলীর বিবরণ উল্লেখের আগে সংঘর্ষকালে জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা সম্পর্কে হেগ-এ অনুষ্ঠিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিসভা ও সেখানে প্রণীত আন্তর্জাতিক আইন স্মর্তব্য।

১৯০৭ সালের হেগ চুক্তিসভাপত্রের ২২ সংখ্যক ধারায় স্পষ্ট ঘোষণা করা হয় যে, শত্রুকে আঘাত করার জন্য পদ্ধতি নিরূপণের ক্ষেত্রে যুদ্ধরত শক্তির কোন সীমাহীন অধিকার নেই।[২১] অসামরিক জনসাধারণের ক্ষেত্রে সে অধিকার থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। চুক্তিসভাপত্রের ২৫ সংখ্যক ধারায় অরক্ষিত শহর, গ্রাম, বাসগৃহ বা ভবনাদির উপর বোমাবর্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২৭ সংখ্যক ধারায় আরো বলা হয়েছে: অবরোধ বা বোমাবর্ষণের সময় সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হলে ধর্ম, শিল্পকলা, বিজ্ঞান বা দাতব্যকর্মে উৎসর্গীকৃত ভবনাদি, ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ, হাসপাতাল এবং পীড়িত ও আহত ব্যক্তিদের আশ্রয় দেওয়া হয় এমন সব স্থান যতদূর সম্ভব আঘাত না করার জন্য প্রয়োজনীয়

১৯ Res. 95(1), 11 December 1946. Manual of Public International Law, p. 517

২০ Res. 96(1), 11 December 1946, ibid

২১ U. S. War Crimes in Vietnam, p. 59

সবরকম ব্যবস্থা অবশ্যই নিতে হবে।[২২] ন্যুরেমবার্গ সনদের ৬ সংখ্যক ধারায় যুদ্ধের আইন ও নিয়মকানুন ভঙ্গ করার প্রসঙ্গে সামরিক প্রয়োজনে ন্যায্যতা প্রমাণিত হয় না এমন অবস্থায় শহর, নগর বা গ্রাম ইচ্ছাকৃত ধ্বংসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[২৩]

লক্ষণীয় যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বা পরে যে-সমস্ত আইন ছিল ও হয়েছে তাতে স্বতঃসিদ্ধভাবে স্বীকৃত যে, কোন অবস্থাতেই অসামরিক জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি বিপন্ন ও বিনষ্ট করা চলবে না। বস্তুত যুদ্ধরত মানুষকে কতখানি আঘাত করা যাবে সে ব্যাপারেও আইন সীমা নির্দেশ করেছে। সেক্ষেত্রে নিরস্ত্র, অসামরিক মানুষকে আঘাত বা হত্যা করার কোন সমর্থন আইনে থাকার কথা নয়।

১৯২৩ সালে গৃহীত হেগ বিমানযুদ্ধে কল্যাণকর আইনকানুন[২৪] (Hague Air welfare Rules) ও ১৯২৩ সালের জুলাই মাসে অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্ত্বেও অসামরিক জনসাধারণ ও লক্ষ্যবস্তুর ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রযোজ্য। এই সব আইনকানুন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনকানুনে মোটামুটি নিম্নলিখিত নীতিমালা গৃহীত হয়েছে:

ক. অসামরিক জনসাধারণকে আহত ও ভীত করার জন্য বিমানপথে বোমাবর্ষণ অন্যায় (illegal)। অসামরিক কোন সম্পত্তি বিমানপথে বোমাবর্ষণ করে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করাও অন্যায়।

খ. নগর, শহর, গ্রাম, বাসগৃহ বা ভবনাদির উপর যথেচ্ছা বোমাবর্ষণ নিষিদ্ধ। যদি অসামরিক জনসাধারণকে নির্বিচারে আঘাত না করে কেবল সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত সামরিক লক্ষবস্তুর উপর বোমাবর্ষণ করা অসম্ভব হয় তাহলে বিমানকে অবশ্যই ঘাঁটিতে ফিরে আসতে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বহু ব্রিটিশ বিমান সামরিক লক্ষ্যবস্তু নিশ্চিতভাবে নির্দেশ করতে না পারায় ঘাঁটিতে ফিরে আসে।

২২ ibid, p. 47

২৩ ibid, p. 48

২৪ Manual of Public International Law, p. 823

গ. ধর্ম, শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও দাতব্যকর্মে উৎসর্গীকৃত ভবনাদি, ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ, হাসপাতাল প্রভৃতির উপর বোমাবর্ষণ করা চলবে না।

সামরিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে জড়িত নয় এমন কোন সম্পত্তি বিনষ্ট করার ব্যাপারে সশস্ত্র শক্তির অধিকার কোন সময়েই স্বীকার করা হয় নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলার বাহিনী এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। ১৯৪৪ সালে দখল করার পর ওয়ারস শহর জার্মানীরা ধ্বংস করে দেয় ও সেখানকার অধিবাসীদেরকে শহর ত্যাগ করতে বাধ্য করে। হিটলার একই সঙ্গে ওয়ারস, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, বেলগ্রেড, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে অন্যায়ভাবে যথেচ্ছা বোমাবর্ষণ করে।

উল্লেখ্য যে, বিমানপথে যুদ্ধ, অসামরিক সম্পত্তি ও এলাকাকে যুদ্ধের আওতা থেকে অব্যাহতি, সমুদ্রপথে যুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অসংখ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।[২৫] কারণ প্রায়ই অসামরিক জনসাধারণ ও সম্পত্তি সংঘর্ষকালে অসহায় শিকারে পরিণত হয়। এই সব আইনে নির্দেশ করা হয়েছে যে, যুদ্ধের জন্য একটি চিহ্নিত যুদ্ধক্ষেত্র থাকে। সেকারণেই কোন এলাকাকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করার ইচ্ছা থাকলে আগের থেকে অধিবাসীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়ার কথা। সংঘর্ষে লিপ্ত দেশের মধ্যে আইনের সংজ্ঞানুসারে যে-সমস্ত নিরপেক্ষ অঞ্চল, হাসপাতাল এবং পূর্বোল্লিখিত অন্যান্য অসামরিক এলাকা ও ভবনাদি থাকে সেখানে যে-কোন উপায়ে ধ্বংসকার্য চালানো সম্পূর্ণ বেআইনী।

পূর্বে উল্লেখিত ১৯৪৮ সালের গণহত্যা চুক্তিসভাপত্রে নির্বিচারে নরনারীকে হত্যা করার জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা আছে। কোন্ কোন্ কার্যাবলী এই আইনের আওতায় অপরাধ তাও এখানে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ৯ই ডিসেম্বর ৫৬-০ ভোটে যখন এই চুক্তিসভাপত্র জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয় তখন পাকিস্তানও এর পক্ষে ভোট দান করেছিল।

সাধারণ পরিষদের সেই সিদ্ধান্তে যুদ্ধকালে বা শান্তির সময়ে গণহত্যা আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ, জাতিসংঘের লক্ষ্যের পরিপন্থী ও সভ্য জগৎ কর্তৃক

২৫ a) The Declaration of St. Petersburg of 11 December 1868; b) The Hague Declaration of 29 July 1899; c) The Hague Convention Nos. IV, VII, VIII & IX of 18 October 1907 d) Geneva Protocol of 17 June 1925; e) Hague Convention of 14 May 1954 etc.

নিন্দিত বলে ঘোষণা করা হয়। একই সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রগুলো গণহত্যা বন্ধ করতে ও অপরাধীদের শাস্তি দিতে দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করে। চুক্তিসভাপত্রের সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহে বলা হয়েছে :

ধারা ২ : বর্তমান চুক্তিসভাপত্রে জাতীয়তা-গত (national), জাতিগত (ethnical), গোত্র-গত (racial) বা ধর্ম-গত কোন গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক ভাবে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত যে-কোন আচরণ গণহত্যার সামিল হবে :

ক. কোন গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা।

খ. কোন গোষ্ঠীর সদস্যদের সাংঘাতিক দৈহিক বা মানসিক ক্ষতি সাধন করা।

গ. ইচ্ছাকৃত ভাবে কোন গোষ্ঠীর উপর এমন পরিকল্পিত জীবনযাত্রা-ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া যাতে তাদের দৈহিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণ রূপে বা আংশিক ভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

ঘ. কোন গোষ্ঠীর মধ্যে মানব-জন্ম রোধের জন্য কোন ব্যবস্থা আরোপ করা।

ঙ. কোন গোষ্ঠীর শিশুদের জোর করে অন্য গোষ্ঠীতে চালান দেওয়া।

ধারা ৩ : নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহ শাস্তিযোগ্য :

ক. গণহত্যা।

খ. গণহত্যার জন্য ষড়যন্ত্র করা।

গ. গণহত্যার পক্ষে সরাসরি ও প্রকাশ্য উত্তেজনা সৃষ্টি।

ঘ. গণহত্যার চেষ্টা করা।

ঙ গণহত্যায় সহযোগিতা করা।

ধারা ৪ : যে-ব্যক্তি ৩ সংখ্যক ধারায় বর্ণিত গণহত্যা বা অন্য কোন আচরণ করবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, তা সে শাসনতন্ত্রানুসারে দায়িত্ব-ভারপ্রাপ্ত শাসক (rulers), সরকারী কর্মচারী বা সাধারণ ব্যক্তিবিশেষ হোক না কেন।[২৬]

২৬ United Nations, Yearbook on Human Rights for 1948. U. N. N. Y. 1950 pp. 482-486: Quoted in Bangla Desh: Ed. Dr. Subhash C. Kashyap: The Institute of Constitutional and Parliamentary Studies, New Delhi, 1971; p. 90.

এই আন্তর্জাতিক আইন শুধু যে গণহত্যা সংঘটিত হওয়ার পরই ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছে তাই নয়, গণহত্যা অনুষ্ঠিত হওয়ার সামান্যতম সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্বও সদস্য-রাষ্ট্রগুলোর উপর অর্পণ করেছে। সভ্য দেশের জীবনীশক্তি হিসেবে যে-সব মূল্যবোধ অপরিহার্য তারই উপর ভিত্তি করে এই আইন গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্র এই চুক্তিসভাপত্রের অধীনে কোন অধিকার ভোগ করুক আর নাই করুক, এই আইন মানতে বাধ্য। ১৯৫১ সালের ২৮-এ মে আন্তর্জাতিক বিচারালয় এ সম্পর্কে মতামত প্রকাশকালে গণহত্যা-সম্পর্কিত আইন প্রতিটি রাষ্ট্রের উপর বাধ্যতামূলক বলে মন্তব্য করেন। এই আইন ও সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের মন্তব্যে এটি সুস্পষ্ট যে, একটি আন্তর্জাতিক ব্যবহারবিধি প্রতিটি রাষ্ট্রকে মানতে হবে এবং গণহত্যা-সম্পর্কিত আইনভঙ্গ করার অর্থই হচ্ছে আইনভঙ্গকারী অপরাধী হিসেবে নিজের জীবন বিপন্ন করা।

পৃথিবীর অধিবাসীরা যাতে কোন রাষ্ট্রের খেয়ালখুশির পাত্র হিসেবে নিপীড়িত না হয় সেজন্য নানা আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার ফলে জাতিসংঘ আরও কঠোর আইন প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করে। ফলে যুদ্ধে বা যে-কোন রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে অসামরিক জনসাধারণকে হত্যা ও পীড়ন থেকে বাঁচাবার জন্য ১৯৪৯ সালে যে-চারটি চুক্তি-সভাপত্র গৃহীত হয় তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। পাকিস্তান ১৯৫১ সালে এই চুক্তিসভাপত্রাবলীতে স্বাক্ষরদান করে।[২৭] এখানে ৩ সংখ্যক ধারায় স্পষ্ট বলা হয়েছে :

চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নয় এমন কোন সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধলে সংঘর্ষে লিপ্ত প্রত্যেক পক্ষ কমপক্ষে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী মানতে বাধ্য থাকবে :

১. সশস্ত্র বাহিনীর যে-সমস্ত লোক অস্ত্র সমর্পণ করেছে এবং যারা অসুস্থতা, আঘাত, আটক বা অন্য কোন কারণে সংঘর্ষে অসমর্থ হয়ে পড়েছে সেই সমস্ত লোক-সহ যে-সব ব্যক্তি সংঘর্ষে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে নি তাদের

---

২৭ 'Progress of the Geneva Conventions of 1949', Current Notes by Hudson in AJIL, 1951, p. 776 : Quoted in Bangla Desh and International Law, Subimal Kumar Mukherjee, West Bengal Political Science Association, Calcutta, p. 85.

সঙ্গে সর্ব অবস্থায় গোত্র, বর্ণ, ধর্ম বা বিশ্বাস, নর-নারী, জন্ম বা সম্পদসূত্র অথবা অন্য কোন মানদণ্ড-নির্ভর ক্ষতিকারক পার্থক্য না করে মানবোচিত ব্যবহার করতে হবে। এ প্রেক্ষিতে উপরি-উক্ত ব্যক্তিদের ব্যাপারে যে-কোন সময়ে ও যে-কোন স্থানে নিম্নবর্ণিত আচরণসমূহ নিষিদ্ধ : (ক) জীবন ও দেহের প্রতি আক্রমণ, বিশেষ করে সকল রকমের হত্যা, বিকলাঙ্গকরণ, নিষ্ঠুর আচরণ ও নির্যাতন ; (খ) নরনারীকে জামিন হিসেবে ধরে রাখা ; (গ) ব্যক্তিগত মর্যাদাহানি, বিশেষ করে অবমাননাকর ও নীতিগর্হিত আচরণ ; (ঘ) সভ্য জাতিসমূহ কর্তৃক অপরিহার্যরূপে স্বীকৃত সুবিচার লাভের সমস্ত নিশ্চয়তা প্রদান করে, নিয়মিতভাবে গঠিত একটি বিচারালয় কর্তৃক পূর্বাহ্নে ঘোষিত রায় ব্যতিরেকে কারুর শাস্তি ঘোষণা ও তা কার্যকর করা।

২. আহত ও পীড়িত ব্যক্তিদের সংগ্রহ করে সেবা করতে হবে।[২৮]

যে-ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংঘর্ষ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ঘটছে না এবং যে-গৃহযুদ্ধকালে সংঘর্ষরত পক্ষকে (Belligerency) স্বীকৃতি করে দেওয়া হয় নি সেক্ষেত্রে প্রধানত উপরি-উক্ত ৩ সংখ্যক ধারা পুরোপুরি প্রযোজ্য।[২৯] বিশেষ করে এই আন্তর্জাতিক আইন হওয়ার ফলে মৌলিক মানবাধিকার রাষ্ট্রের অধিবাসীদের দেওয়া না দেওয়ার ব্যাপারটি এখন আর কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ এখতিয়ার নয়।[৩০]

চুক্তিসভাপত্রে ২৭ থেকে ৩৩ সংখ্যক ধারায় দখলকৃত এলাকায় যুদ্ধমান পক্ষের জন্য কয়েকটি নীতি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সে অনুসারে অসামরিক জনসাধারণের দৈহিক মর্যাদা ও ব্যক্তিগত সম্মান বজায় রাখতে হবে। তাঁরা তাঁদের ধর্মীয় আচরণ-অনুষ্ঠানের ও পরিবার-জীবন যাপনের অধিকার পাবেন। গোত্র, ধর্ম বা রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে তাঁদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করতে হবে। বিশেষ করে কোন সংবাদ জানার জন্য তাঁদের উপর কোন প্রকার দৈহিক

২৮ International Law Documents, 1950-51, Naval War College, USA, Vol. XLVII, p. 82 : Quoted in S. K. Mukherjee, cit. p. 35-36.

২৯ Oppenheim (Lauterpacht), International Law, Vol. I, Seventh Ed., Longmans. Green & Co. pp. 279-80 : Quoted in S. K. Mukherjee, cit. p. 36.

৩০ Crutteridge, 'The Geneva Conventions of 1949 in British Year Book of International Law, 1949, pp. 294-326 : Quoted in S. K. Mukherjee, cit. p.36.

বা নৈতিক নির্যাতন করা চলবে না। জনসাধারণ দৈহিক দুর্দশার শিকার হয় বা তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞা কেবল হত্যা, নির্যাতন, দৈহিক শাস্তি, অঙ্গহানি এবং নিরাপত্তাধীন ব্যক্তির ওপর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন নয় এমন কোন চিকিৎসাগত বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্যের ক্ষেত্রেই-যে প্রযোজ্য তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে অসামরিক বা সামরিক এজেন্ট কর্তৃক গৃহীত অন্যান্য নিষ্ঠুরতার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। একই সঙ্গে বহু লোককে একত্রে শাস্তি প্রদান এবং বলপ্রয়োগে বশে আনা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

এই চুক্তিসভাপত্রের ৪৭ থেকে ৪৯ সংখ্যক ধারা অনুসারে, উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, দখলকৃত এলাকা থেকে বলপ্রয়োগ করে ব্যক্তিবিশেষকে বা বহুলোককে একত্রে দখলকারী শক্তির দেশে অথবা দখলকারীর অধিকৃত বা অধিকৃত নয় এমন কোন দেশে চালান দেওয়া নিষিদ্ধ। দখলকারী শক্তি তার নিজের দেশের অধিবাসীদের কোন অংশকে দখলকৃত এলাকায় চালান দিতে পারবে না। দখলকারী শক্তি নিজের দেশের অধিবাসীদের আমদানি করে যাতে দখলকৃত এলাকার অধিবাসীদের স্থানচ্যুত করতে না পারে সেজন্যই এই নিষিদ্ধকরণ।

অসামরিক জনসাধারণের নিরাপত্তা-সম্পর্কিত উল্লিখিত চুক্তিসভাপত্রের ৫৩ সংখ্যক ধারায় সম্পত্তির ধ্বংসসাধন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। ব্যক্তির, রাষ্ট্রের বা অন্য কোন সরকারী কর্তৃপক্ষের, সমাজকল্যাণ বা সমবায় প্রতিষ্ঠানের কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী সম্পত্তি অপরিহার্য সামরিক প্রয়োজন ছাড়া ধ্বংস করা নিষিদ্ধ। ৫৫ সংখ্যক ধারায় বলা হয়েছে যে, দখলকৃত এলাকার অধিবাসীদের জন্য খাদ্য, ঔষধপত্র ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা দখলকারী শক্তির সুস্পষ্ট কর্তব্য এবং যদি সেখানকার অসামরিক অধিবাসীদের প্রয়োজন মেটানো হয়ে থাকে তাহলেই দখলকারী সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের জন্য খাদ্যদ্রব্য দখল করার অধিকার দখলকারীর থাকবে। দখলকৃত এলাকা পুরোপুরিভাবে বা আংশিকভাবে খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হলে বিদেশ থেকে কিভাবে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ করে বিতরণ করা হবে তার বিস্তারিত পরিকল্পনা সম্পর্কে শর্তাবলী ৫৯ থেকে ৬২ সংখ্যক ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে।

রাষ্ট্রের নিরাপত্তাবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত বা সেই সন্দেহে ধৃত কোন

ব্যক্তি, বন্দী গুপ্তচর ও অন্তর্ঘাতক (saboteur) প্রভৃতির সঙ্গে সর্ব অবস্থায় মানবোচিত ব্যবহার করতে হবে এবং যথাযোগ্য ও নিয়মমাফিক বিচার পাওয়ার অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা চলবে না—এই ৫ সংখ্যক ধারা যে-কোন প্রচলিত দায়দায়িত্ব নির্বিশেষে সমস্ত রাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক।

যুদ্ধে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার সম্পর্কে যে-আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে তা বর্তমান ক্ষেত্রে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে। এ সম্পর্কে একাধিক আইন প্রণীত ও চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ১৯০৭ সালের হেগ চুক্তিসভাপত্রের ২৩ক ধারানুসারে বিষাক্ত কোন দ্রব্যের ব্যবহার মাত্রই নিষিদ্ধ। ১৯২৫ সালের ১৭ই জুনের জেনেভা প্রোটোকোলে রাসায়নিক ও রোগজীবাণুপূর্ণ যুদ্ধাস্ত্র, মানবদেহের জীবনপ্রক্রিয়া সাময়িক ভাবে স্তব্ধ করে দিতে পারে ও বিষাক্ত এমন সমস্ত গ্যাস ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৬৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ রাসায়নিক ও রোগজীবাণু বোমা-সম্পর্কিত প্রোটোকোল-বদ্ধ আইনকানুন পুরোপুরি গ্রহণ করে।[৩১] সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তে উল্লেখ করা হয় যে, প্রচণ্ড ধ্বংসশক্তিসম্পন্ন অস্ত্র সমগ্র মানব জাতির জন্য বিপজ্জনক এবং সভ্যতা-দত্ত মূল্যবোধের বিরোধী। জেনেভা প্রোটোকোল যে-সমস্ত নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন করেছিল সেগুলো কঠোর ভাবে মেনে চলবার আহ্বান সমস্ত রাষ্ট্রের প্রতি করা হয়। ১৯৬৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদ এল. ৪৮৮ সংখ্যক খসড়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ-ক্ষেত্রে আরো কাঠোরতর ব্যবস্থা নেয়।[৩২] পাকিস্তান এই খসড়ার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিল। এই সিদ্ধান্তে জেনেভা প্রোটোকোল নির্দেশিত অস্ত্রের ব্যবহার আন্তর্জাতিক আইনের বিরোধী হিসেবে পুনরুল্লেখ করা হয়। এবং পুনরায় নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলা হয়: ক. মানুষ, জীবজন্তু ও বৃক্ষলতার উপর সরাসরি বিষাক্ত ক্রিয়া করবে এই উদ্দেশ্যে গ্যাস, তরল বা নিরেট আকারের কোন রাসায়নিক দ্রব্য যুদ্ধে ব্যবহার করা চলবে না; খ. মানুষ, জীবজন্তু ও বৃক্ষলতার মৃত্যু বা রোগের কারণ হয় এবং মানুষ, জীবজন্তু ও বৃক্ষলতার দেহে প্রবেশ করে ক্ষতি করার ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি করতে পারে এমন কোন রোগজীবাণু অস্ত্র—তাদের প্রকৃতি বা সংক্রমণের ক্ষমতা যাই হোক না কেন—ব্যবহার করা চলবে না।

---

৩১ U. S. War Crimes in Vietnam, p. 59

৩২ Res. 2603A (XXIV) 16 December 1969

১৯৫৪ সালে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষার জন্য একটি চুক্তিসভাপত্র গৃহীত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বর্ণ, জাতি, ধর্ম বা অন্য কোন কারণে কোন গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ধ্বংস বন্ধ করা।

সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হলে সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায় এমন কোন কাজ করাও অপরাধ। ন্যুরেমবার্গ ট্রাইবুন্যালের রায়ে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সংঘর্ষের শুরু থেকে বিশাল আকারে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে যার দুটি চরিত্র : যুদ্ধ অপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।[৩৩]

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলার সংশ্লিষ্ট সমস্ত আইনকানুন ভঙ্গ করে : যুদ্ধের আইন, মানবাধিকার ও শান্তি-সম্পর্কিত আইন, অসামরিক জনসাধারণ সম্পর্কিত আইন, দখলকৃত এলাকা-সম্পর্কিত আইন। হিটলার দখলকৃত এলাকার সমস্ত স্থানীয় আইন উড়িয়ে দেয়, জার্মানীর স্বার্থে ধ্বংস করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার জনসাধারণ ও সরকারের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি দখল করতে থাকে, লক্ষ লক্ষ নরনারীকে বাধ্যতামূলক ক্যাম্পে (concentration camp) পাঠায় ও নাৎসী মানসিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। দখলকৃত এলাকার অধিবাসীরা যাতে কোন প্রতিরোধ করতে বা গড়ে তুলতে না পারে সেজন্যে জোর, জুলুম, হত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসের মাধ্যমে একটি সন্ত্রাস প্রতিষ্ঠার ঘৃণ্য চেষ্টা করেছিল নাৎসীরা। এ সমস্ত লক্ষ করে ও হেগ আইনকানুনের ৪৬ সংখ্যক ধারা নির্দেশ করে ন্যুরেমবার্গ ট্রাইবুনাল জার্মান অধিকৃত এলাকা যুদ্ধের সমস্ত আইন ভঙ্গ করে শাসন করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। তাঁরা প্রসঙ্গত আরো বলেন যে, পরিকল্পিত উপায়েই যে আক্রমণ, নিষ্ঠুরতা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে দখলকৃত এলাকায় শাসন চালানো হয়েছে তার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। পূর্ব ইউরোপে বুদ্ধিজীবী ও বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল নাৎসীরা। সেই সঙ্গে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে লক্ষ লক্ষ লোকের উপর তারা কিভাবে নিষ্ঠুরতার পরীক্ষা চালিয়েছিল এবং তাদেরকে হত্যা করেছিল তা আজ আর কারুর অজানা নেই। ক্যাম্পের অধিবাসীদের খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই একরকম নেওয়া হয় নি। বহু নারীকেই তারা বস্ত্রহীন করে রাখত। সমস্ত ব্যাপারটাই ছিল বিকৃত মানসিকতার

৩৩ **U. S. War Crimes in Vietnam, p. 199.**

প্রকাশ। নাৎসী কর্তাদের, নাৎসী গার্ডদের খেয়ালখুশির উপর বন্দী মানুষের ভাগ্য নির্ভর করত। নির্যাতনের জন্য অসংখ্য পদ্ধতি তারা আবিষ্কার করেছিল। গ্যাস, আগুন, গুলি, বেয়োনেট ব্যবহার করা হোত মানুষ হত্যার জন্য। জীবন্ত সমাধিদান সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। হিটলার ৬০ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করে। একই সঙ্গে দখলকৃত এলাকার লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ হারায়।

যুদ্ধকালে সামরিক বাহিনী দখলকৃত এলাকায় যে-সমস্ত আইন মেনে চলতে বাধ্য সেগুলো ভঙ্গ করার অভিযোগ, ন্যুরেমবার্গ ট্রাইবুনালে, বহু আসামীর বিরুদ্ধে আনা হয়। পূর্ব ইউরোপে দখলকৃত এলাকায় জার্মানীদের চরম অত্যাচারের একটি নিদর্শন হিসেবে জার্মান সরকারের ১৯৪১ সালের বারবারোসা আইনাধিকার আদেশটির উল্লেখ করা হয়। বিভিন্ন যুদ্ধাপরাধ বিচার ট্রাইবুনাল এই আদেশ পরিকল্পনা ও প্রয়োগের দিক থেকে অপরাধমূলক বলে মন্তব্য করেছেন। এই আদেশে অসামরিক শত্রুদের কোনরকম আইনগত বিচার না করে হত্যা করার অধিকার নাৎসী সেনাবাহিনীকে দেওয়া হয়। অসামরিক প্রতিরোধকারীদের সাক্ষাৎ ক্ষেত্রেই যে-কোন উপায়ে দমন করার অধিকার পায় দখলকারী সেনারা। একজন ধৃত প্রতিরোধকারীকে হত্যা করা হবে কিনা তা নির্ধারণ করার পূর্ণ দায়িত্ব ছিল সংশ্লিষ্ট অফিসারের উপর। আদেশে বিশেষভাবে বলা হয় যে, দখলকৃত এলাকা বিশাল হওয়ায় সেখানে নাৎসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনগত বিচারপদ্ধতি অনুসরণ না করে যে-কোন ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে সকল প্রতিরোধ নির্মূল করার চেষ্টা করতে পারবে জার্মান সেনাবাহিনী, দখলকৃত এলাকায় যাতে প্রতিরোধের ইচ্ছা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করা যায় সেজন্য জার্মান সেনাবাহিনী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করবে। অসহায় মানুষকে নিশ্চিহ্ন করাই ছিল হিটলারী পরিকল্পনার লক্ষ্য।

হিটলারের অকল্পনীয় অত্যাচার ও অন্যায় আচরণ সেদিন মানবজাতিকে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিল। পৃথিবীব্যাপী মানুষ প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল ও একান্তভাবে কামনা করেছিল হিটলাররা ধ্বংস হোক, অসহায় মানুষ পরিত্রাণ পাক।

লক্ষ্যযোগ্য যে, মানবজাতিকে অন্যায় অত্যাচার থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন সময়ে বহু প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই সব

আইন পৃথিবীর প্রত্যেকটি নাগরিকের জানা নাও থাকতে পারে, কিন্তু কোন্‌টি ন্যায়, কোন্‌টি অন্যায় এটি বুঝতে কারুর অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। মানুষ তার বুদ্ধি এবং বিবেচনার দ্বারাই সত্য মিথ্যা যাচাই করতে পারে। আইনের একমাত্র ভিত্তি হচ্ছে মানুষের কাণ্ডজ্ঞান। সেখানে ন্যায়-অন্যায় সবকিছুই ধরা পড়ে। তাই স্থানীয় আইনই হোক আর আন্তর্জাতিক আইনই হোক সবকিছুরই উৎস এবং বলা যায় সবকিছুর চাইতেও বড় হচ্ছে মানুষের বিবেক। ব্যক্তিবিশেষের বিবেক বিকল হলেও পৃথিবীর সমস্ত মানুষের বিবেক নিশ্চয়ই ন্যায় এবং সত্যের সন্ধান দিতে পারে।

মানবাধিকার ও মানুষের নিরাপত্তা-সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনের যে-দীর্ঘ ভূমি আমরা পরিক্রমা করেছি তার প্রেক্ষিতে বিস্তৃত বিবরণে না গিয়েও এ মন্তব্য নিশ্চয়ই করা চলে যে, পাকিস্তানের সামরিক সরকার সংশ্লিষ্ট সমস্ত আইন ভঙ্গ করেছে এবং তারা অপরাধী, গণহত্যার জন্য তো বটেই। পাকিস্তানের সমর-নায়কেরা ঠিক হিটলারের মতই 'সবাইকে হত্যা কর, সবকিছু জ্বালিয়ে দাও, সবকিছু ধ্বংস কর' নীতি গ্রহণ করেছে। হিটলারের নীতির ফলে বহু জাতি ধ্বংসের শিকার হয়েছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে সে নিজেদেরও ধ্বংস ডেকে এনেছিল। সেই আত্মধ্বংসী নীতির ফল জার্মান জাতি অন্তত দেশবিভাগের মধ্য দিয়ে আজ ভোগ করছে। ইয়াহিয়া খান ও তার নির্বোধ সাঙ্গপাঙ্গরা একই রকম আত্মধ্বংসী নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে লক্ষ লক্ষ প্রাণ বিনষ্ট হচ্ছে, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে, আন্তর্জাতিক আইন ও সমস্ত মূল্যবোধ পদদলিত হচ্ছে।

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে আমরা মানবতার অবমাননার খতিয়ান নেব।

বাংলাদেশে ইয়াহিয়া গোষ্ঠী যে নৃশংস কার্যকলাপে লিপ্ত তা পূর্ব পরিকল্পিত। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই গণতন্ত্রবিরোধী চক্র গণস্বার্থপরিপন্থী যে-ষড়যন্ত্র করে আসছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষকে শোষণ করা। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে জেনেই তারা ছলে বলে কলে কৌশলে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে দিতে বদ্ধপরিকর। ১৯৬৯ সালে গণ-আন্দোলনের মুখে আইউব খানের পতন লক্ষ করে সামরিক নেতারা খুবই শঙ্কিত হয়ে পড়ে। আগের থেকেই তারা তাদের প্রয়োজনে গণস্বার্থবিরোধী চরম কোন ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভেবে আসছিল। আইউব খানের আমলে কয়েকজন অফিসারকে নাৎসীদের নির্যাতন পদ্ধতি জানার জন্য

অধ্যয়ন ও গবেষণার নামে পশ্চিম জার্মানীতে পাঠানো হয়েছিল। বাংলাদেশের একজন প্রখ্যাত লেখকের কাছে একজন খ্যাতনামা পশ্চিম পাকিস্তানী পণ্ডিত আইউব আমলে ঠাট্টাস্থলে বলেছিলেন যে, এই সব কর্তাব্যক্তিদের হিটলার হওয়ার খায়েশ হয়েছে। সেই ঠাট্টাই সত্য হবে তিনি হয়তো স্বপ্নেও ভাবেন নি। এই সংবাদের সত্যিই কোন ভিত্তি ছিল কিনা তা যাচাই করা এখন অসম্ভব হলেও শাসকচক্রের কার্যাবলী প্রমাণ করেছে যে, তারা বহু পূর্বেই আজকের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলার পরিকল্পনা করেছিল। বিদেশী সাংবাদিকরাও সেই কথা বলেছেন। লণ্ডনের সানডে টেলিগ্রাফ পত্রিকা, ৪ঠা এপ্রিল ১৯৭১, পাকিস্তানী কুচক্রীদের মানসিকতা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ও মন্তব্য করেছেন :

'গত সপ্তাহে নৃশংস যোগ্যতার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনী গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার-কামী পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের জীবনীশক্তি নিঃশেষ করা ছাড়া আর সবই করেছে। পাকিস্তানের জেনারেল ও কর্নেলরা খুব সাবধানে দু বছর ধরে যে পরিকল্পনা করেছে তারই ফলে এই নৃশংসতা। তাদের অনেকেই বৃটিশদের হাতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত, অনেকেই চারিত্রিক নম্রতায় না হলেও, বাহ্যিক ব্যবহারে 'বৃটিশদের চাইতেও বৃটিশ'।

এই সব উচ্চপদস্থ অফিসাররা কঠোরভাবে স্তরে স্তরে গঠিত পাকিস্তান সমাজের মূলাংশ এবং সামরিক নেতৃত্বের কেন্দ্রশক্তি যা দুবছর আগে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে অনিচ্ছাভরে প্রেসিডেন্ট পদে বসিয়েছিল। ইয়াহিয়া যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সচল করেছিলেন তাতে কোন দিনই এই সব লোকের আস্থা ছিল না।

তারা এতে আস্থা রাখে নি, তার কারণ প্রকৃতি, মানসিক গঠন বা বিশ্বাসের দিক থেকে তারা গণতান্ত্রিক নয়, বরং স্বেচ্ছাচারী, পিতৃশাসনকামী, আভিজাত্য-অভিমানী ও দলবদ্ধ জনতার প্রতি ঘৃণা পোষণকারী। বিশ শতকের চেয়ে আঠারো শতকেরই মানুষ এরা।

এতে তারা আস্থা রাখে নি, তার কারণ ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানের যে গণ-আন্দোলন আইউব খানকে বিতাড়িত করেছিল তার শক্তি তারা দেখেছিল। তারা তখন অনুধাবন করেছিল যে, সেই বিশাল

জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলনের ঝড়কে শায়েস্তা করতে না পারলে তাদেরকেও তা গ্রাস করবে।

তারা বুঝেছিল যে, আর একটি গণ-অভ্যুত্থান অথবা মাত্র একমাস আগে যে-ধরনের বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা প্রায় নিশ্চিত মনে হয়েছিল (কিন্তু আসলে কখনও নিশ্চিত ছিল না) সেই ধরনের সরকারের কাছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের দ্বারা কর্তৃত্বকারী গোষ্ঠী হিসেবে তাদের সমস্ত ভবিষ্যতই বিপদাপন্ন হতে চলেছে···

তারা হিসেব করেছিল যে, ডিসেম্বর নির্বাচনে অমীমাংসিত ফল হবে। সামরিক শাসন চালিয়ে যাওয়ার জন্য সেটাই হবে সব থেকে যথার্থ বাহানা।

কিন্তু তার বদলে একজন মানুষ ও একটি দল পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করল, পূর্বাঞ্চলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর আওয়ামী লীগ। সেই ৬ই ডিসেম্বরের দিন থেকেই জেনারেল ও কর্নেলরা ভেবে রেখেছে কি তাদের করতে হবে। এর পর তারা কেবল সুযোগের জন্য অপেক্ষা করছিল···

ঠিক যখন শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট শাসনতান্ত্রিক আলোচনার শেষ পর্যায়ে ছিলেন তখন স্পষ্টত, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নতুন সামরিক আইন প্রশাসক লেফট্‌ন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে ক্রমান্বয়ে শেষ প্রস্তুতি চলছিল···

এমনকি মুজিবের সঙ্গে আলোচনার সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া সেনাবাহিনী যে-সমস্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল তা নিশ্চয়ই জানতেন। ঘটনার প্রবাহ লক্ষ করে গভীর বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ থেকে প্রেসিডেন্টকে নিষ্কৃতি দেওয়া কঠিন।

ডেলি টেলিগ্রাফ, লণ্ডন, ৩০-এ এপ্রিল ১৯৭১, বলেছেন যে, সমস্ত ব্যাপারটি টিক্কা খানের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হয়। লণ্ডনের সানডে টাইমস পত্রিকায়, ১৩ই জুন, ১৯৭১, গণহত্যা শীর্ষক যে-বিরাট রিপোর্ট বেরিয়েছে সেখানেও সমস্ত ব্যাপারটি পূর্বপরিকল্পিত বলে মন্তব্য করা হয়েছে। এই পত্রিকার পাকিস্তানস্থ প্রতিনিধি বেশ কিছুদিন পাকিস্তান সেনা-বাহিনীর সঙ্গে ঘুরেছেন ও তাদের হত্যা ও ধ্বংসকাণ্ড স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। অতঃপর সত্য কথা পৃথিবীকে জানানোর জন্য অনেক চেষ্টা করে সপরিবারে করাচীর বাসগৃহ ও সকল সম্পত্তি পরিত্যাগ করে ইংলণ্ডে চলে যান। সানডে

টাইমসের প্রথম পৃষ্ঠাসহ একাধিক পৃষ্ঠায় তাঁর দেওয়া বিস্তৃত হৃদয় বিদারক সংবাদ বেরোয়। সেখানে তিনি মন্তব্য করেছেন :

'ঘটনাবলীর দ্বারা বুঝা যায় যে, এই গণহত্যা কোন স্বতঃপ্রণোদিত বা বিশৃঙ্খল প্রতিক্রিয়ার ফল নয়। এটা পরিকল্পিত।

এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, সবিনয়ী অ্যাডমিরাল (এস. এম.) আহসানের কাছ থেকে পূর্ব বাংলার গভর্নর-পদ ও জ্ঞানানুরাগী লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল সাহিবজাদা (ইয়াকুব) খানের কাছ থেকে সেখানকার সামরিক কর্তৃত্বভার লেফ্‌টেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান গ্রহণের সময়েই 'বাছাইয়ে'র পরিকল্পনা শুরু হয়।

তখন মার্চ মাসের শুরু, শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছে, কারণ জাতীয় পরিষদের যে অধিবেশন থেকে বাঙালীরা এত কিছু আশা করছিল তা স্থগিত করে দেওয়া হয়…

২৫-এ মার্চ সন্ধ্যায় সেনাবাহিনী যখন…পূর্বপরিকল্পিত আক্রমণ চালানোর জন্য বেরিয়ে পড়ে তখন তাদের অনেকেরই হাতে যে-সব লোককে হত্যা করতে হবে তার একটি তালিকা ছিল।'

৫ই জুন, ১৯৭১ গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জনাব রহমান সোবহান এই ষড়যন্ত্রের স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছেন। মুজিবের সঙ্গে শেষ আলোচনা সভাগুলো একটি কালো পর্দা হিসেবে ঝুলিয়ে ইয়াহিয়া খানরা গণহত্যার জন্য তৈরী হচ্ছিল। এখানে মন্তব্য করা হয়েছে যে, দীর্ঘ দুবছর ধরে ইয়াহিয়া খানরা বাংলার মানুষের সঙ্গে চরম শঠতার জন্য তৈরী হচ্ছিল। এ সম্পর্কে গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ একই কথা বলেছেন। ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১ যে-দীর্ঘ বিবৃতি তিনি দিয়েছেন সেখানে তিনি বলেছেন যে, ১লা মার্চ থেকে ২৫-এ মার্চ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক প্রস্তুতি পুরোদমে চলে। এমন কি ১লা মার্চের কিছু আগে রংপুরে পাঠানো কিছু ট্যাঙ্ক ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। ১লা মার্চ থেকে সামরিক লোকদের পরিবার পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো আরম্ভ হয়। পি. আই. এ.-র বিমানে সাদা পোশাকে আসতে থাকে সামরিক বাহিনীর লোকেরা। ঢাকায় অস্ত্রশস্ত্র আসতে থাকে সি-১৩০ পরিবহণ বিমানে। বিমানবন্দরে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়। ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ ও গুপ্তহত্যায় পারদর্শী একটি এস. এস. জি. কমাণ্ডো গ্রুপকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়া

হয়। এরাই সম্ভবত ঢাকা ও সাইদপুরে ২৫-এ মার্চের আগেই স্থানীয় ও বহিরাগতদের মধ্যে সংঘর্ষের ব্যবস্থা করে। মুজিবের ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে নিয়েছেন ও সেই কথা ঘোষণা করে ২৫-এ মার্চ ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন এমন স্পষ্ট নিশ্চয়তাই আওয়ামী লীগকে দেওয়া হয়েছিল।[৩৪] কিন্তু তার পরিবর্তে বিশ্বাসঘাতকের দল ২৫-এ মার্চের রাত্রেই ঝাঁপিয়ে পড়ল নিরস্ত্র জনতার উপর।

২৬-এ মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খান এক ভাষণে শেখ মুজিব ও তাঁর সমর্থকদের দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করেন। তিনি বলেন যে, তাঁর সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সেনাবাহিনীকে 'তাদের কর্তব্য পালন করতে' বলেছেন। (টাইম, ৫ই এপ্রিল, ১৯৭১)

তাদের সেই 'কর্তব্য' পালন করার নামে তারা ঢাকার রাস্তায় তিন ব্যাটেলিয়ান সৈন্য নামায়, এক ব্যাটেলিয়ান বর্মাচ্ছাদিত, এক ব্যাটেলিয়ান বিমানধ্বংসী অস্ত্রসজ্জিত ও এক ব্যাটেলিয়ান পদাতিক বাহিনী। রাত্রি ১০টার একটু আগে সেনাবাহিনীর নৃশংস কার্যকলাপ শুরু হয় বলে ৩০-এ মার্চের ডেলী টেলিগ্রাফ পত্রিকা জানিয়েছেন। উপরি-উক্ত সংবাদ দিয়েছেন টেলিগ্রাফ পত্রিকার প্রতিনিধি সাইমন ড্রিঙ। ২৫-এ তারিখে ঢাকায় অবস্থানরত ৩৫ জন বিদেশী সাংবাদিককে বাইরে বের হতে দেওয়া হয় নি এবং পরে তাঁদের সবাইকে জোর করে বাংলাদেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সাইমন ড্রিঙ পালিয়ে যান। ফলে তিনি ঢাকায় অনুষ্ঠিত তাণ্ডবলীলা ঘুরে ঘুরে দেখার সুযোগ পান। তিনি জানিয়েছেন, সেনাবাহিনীর প্রথম লক্ষ্য ছিল ছাত্ররা। আমেরিকার দেওয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার এস-২৪ ট্যাঙ্ক নিয়ে একদল সৈন্য মধ্যরাতের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আক্রমণ করে। হঠাৎ আক্রমণে ইকবাল হলের কমপক্ষে ২০০ ছাত্র গুলিগোলার মুখে মৃত্যুবরণ করে। ৭ জন অধ্যাপককে তাঁদের বাসগৃহেই হত্যা করা হয়। অন্ততঃ ১২ জন সদস্যের একটি পরিবারকে পুরোপুরি নির্মূল করা হয়। ঠিক কত জন অধ্যাপককে হত্যা করা হয়েছে এবং কাকে কাকে হত্যা করা হয়েছে তার সঠিক তালিকা সাইমন ড্রিঙ দেন নি। তবে টাইম্স, নিউজ উইক-সহ সমস্ত প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা জানিয়েছেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন

৩৪ Reproduced in Case for Bangla Desh, Communist Party Publications, New Delhi, 1971, p. 9-10.

বিভাগের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দেব, পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যক্ষ জনাব মনিরুজ্জমান, ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা সৈনাবাহিনীর শিকার হন। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন যে, উপরি-উক্ত তিন জন অধ্যাপক ছাড়া ভূবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোকতাদির, মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক জনাব ফজলুর রহমান, ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক অনুদৈপায়ন, শিক্ষা-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবু সালেহ, সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক তলাপাত্র, গণিত বিভাগের অধ্যাপক সাইফুদ্দিন, মনোবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর শফিক, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর জালালউদ্দিন, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক এ. আর. খান খাদিম সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। শেষোক্ত ৬ জনের মধ্যে দু'একজনের মৃত্যু সম্পর্কে সামান্য সন্দেহের অবকাশ আছে। এ ছাড়া আরো কয়েকজন মারা গেছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতার সঙ্গে আরো তিন জন অধ্যাপককে গুলি করা হয়। ঢাকা হল ও ইকবাল হলে বেশ কয়েকজন অধ্যাপক মারা যান। এঁরা কারা এখনও জানা সম্ভব হয় নি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তিজন অধ্যাপককেও হত্যা করা হয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন গণিত বিভাগের অধ্যাপক হাবিবুর রহমান, পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর সালেহ আহমদ ও সংস্কৃতের অধ্যাপক এস. আর. সমাদ্দার। চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু অধ্যাপককে অমানুষিক অবস্থার মধ্যে বন্দী করে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।

সাইমন ড্রিঙ তাঁর বিবরণে আরো জানিয়েছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে রেললাইন বরাবর-যে সব বস্তী এলাকা ছিল সেগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ছাত্ররা তাদের শয্যায় শোয়া অবস্থায় মারা যায়, মহিলা ও শিশুরা তাদের ঘরে আগুনে দগ্ধ হন। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় হত্যা করা বহু লোকের লাস সেনাবাহিনী সরিয়ে ফেলে কিন্তু ৩০টি পড়ে থাকা লাস তাড়াতাড়ি খোঁড়া কবরে একসঙ্গে সেনাবাহিনী সমাধিস্থ করে। একই সঙ্গে তারা রাজারবাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার আক্রমণ করে সেখানে অবস্থানরত ১১০০ পুলিশের প্রায় সবাইকে হত্যা করে। প্রত্যেক স্থানে ট্যাঙ্ক, মর্টার, মেশিনগান প্রভৃতি দিয়ে চারদিক থেকে আক্রমণ করা হয়। বাংলা দৈনিক 'ইত্তেফাক' পত্রিকা অফিস চারটি ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য অস্ত্রের আক্রমণের সম্মুখীন হয়। ৪০০ লোকেরও বেশী এখানে

আশ্রয় নিয়েছিল। সমস্ত বাড়িটি গোলাগুলিতে একেবারে ধ্বংস ও ভস্মীভূত হয়ে যায়। সাইমন ড্রিঙ বলেছেন যে, সেখানে একটি নরক তৈরী হয়েছিল। বহু মানুষের দেহ ভস্মীভূত হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ঢাকা মেডিকেল কলেজেও গোলাগুলি বর্ষণ করা হয়। সেখানে একটি মসজিদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেনাবাহিনী কাছাকাছি একটি বাজার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। যখন দোকানে দোকানে মানুষ শুয়ে আছে তখনই সেনাবাহিনীর গুলি তাদের আঘাত করে, সেই অবস্থাতেই তাদের মৃত্যু হয়। পরদিন দুপুরের দিকে সেনাবাহিনী ঢাকার পুরানো এলাকায় প্রবেশ করে। অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে তারা পেট্রোল নিয়ে যায়। সেখানে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের বাস। সেনাবাহিনী চারদিক থেকে ঘিরে বাড়িগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়, একই সঙ্গে চলতে থাকে গোলাগুলি বর্ষণ। টেলিগ্রাফের এই সংবাদে মর্মস্পর্শী চিত্র মেলে টাইম পত্রিকার ৩রা মে, ১৯৭১ সংখ্যায়। সেখানে বলা হয়েছে, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় পুরানো ঢাকায়। কতকগুলো এলাকা এখানে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়, ২৫টি এলাকা সেনাবাহিনী ধ্বংস করে। বাড়িগুলোর উপরে পেট্রোল ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তারপর তার উপর ছুঁড়ে দেওয়া হয় ফ্লেম থ্রোয়ার। এগুলো এক ধরনের পাউডার ভর্তি শেল যা মুহূর্তের মধ্যে সাংঘাতিক ভাবে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। গোলাবর্ষণ সমানে চলতে থাকে। আগুন ও গোলা থেকে বাঁচার জন্য অসহায় নরনারী, শিশু, বৃদ্ধারা যখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য বেরিয়ে আসছিল, তখন গুলি করে তাদের হত্যা করা হয়। আগুনের ব্যূহ থেকে বেরিয়ে তারা বন্দুকের গুলিতে এসে পড়ে। এ সময় এক পশ্চিমী ভদ্রলোক সৈন্যদের চিৎকার করে বলতে শোনেন, 'ওরা বেরিয়ে আসছে, হারামজাদাদের হত্যা কর'। এখানে হত্যা করা বহু লোককে সৈন্যরা কবর দেওয়ার জন্যে নিয়ে যেতে পর্যন্ত দেয় নি। জনসাধারণ যাতে দেখে ভয় পায়, সেজন্যে এ ব্যবস্থা। ডেলি টেলিগ্রাফ আরো জানিয়েছে যে, এ সমস্ত এলাকায় বহু হিন্দু বাস করত।

আমেরিকান এড (AID) কার্যসূচীর অধীনে ৩ বছর ঢাকায় ছিলেন জন রোড নামক জনৈক আমেরিকান কর্মকর্তা। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির সামনে যে জবানবন্দী দেন (টাইমস অফ ইণ্ডিয়া, ২রা মে, ১৯৭১) তাতে তিনি বলেন যে, পূর্ব বাংলায় জঙ্গলের আইন চালু রয়েছে। সুপরিকল্পিত উপায়ে নিরস্ত্র অসামরিক জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবী এবং হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে।

তিনি ২৯-এ মার্চ রমনা কালীবাড়ি পরিদর্শন করে দেখেন যে, সেখানে ২০০ থেকে ৩০০ লোক হত্যা করা হয়েছে। মেশিনগানের গুলি খেয়ে, আগুনে পুড়ে নরনারী ও শিশুদের মৃতদেহ কাঁড়ি হয়ে পড়ে আছে। সমস্ত জায়গাটি ধূলিস্মাৎ করে দেওয়া হয়। ডেলি টেলিগ্রাফ, টাইম, নিউজ উইক, নিউ ইয়র্ক টাইমস প্রভৃতি পত্রিকা একই সংবাদ দিয়েছেন। তাঁতিবাজার ও শাঁখারীবাজার এলাকা ভস্মীভূত হয়েছে বলে নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকা (৩০-এ মার্চ, ১৯৭১) জানিয়েছেন। পত্রিকাটি আরো বলেছেন যে, বিদেশী রাষ্ট্রদূত মহল জানান যে, সর্বত্র অসামরিক ব্যক্তিদের সেনাবাহিনী হত্যা করেছে। একই পত্রিকা ২৮-এ মার্চ সংখ্যায় জানিয়েছেন যে, ইংরেজী 'দি পিপ্‌ল' কার্যালয় একেবারে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে দেখা এক মর্মান্তিক দৃশ্যের কথা বলেছেন পত্রিকাটি। হোটেলের সামনের রাস্তায় ১৫ থেকে ২০ জন যুবক খালি হাতে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছিল। মেশিনগান নিয়ে একটি মিলিটারী জীপ তাদের কাছে হাজির হয়ে সোজা ঝাঁকের পর ঝাঁক গুলি বর্ষণ করল। তারা লুটিয়ে পড়ল। একজন ছাত্রের হাহাকার শুনেছেন পত্রিকার প্রতিনিধি। ছাত্রটি অশ্রু সংবরণ করতে করতে বলে ওঠে, 'হায়, হায়, তারা সবাইকে হত্যা করছে, সবাইকে খুন করছে'। ৩রা মে-র টাইম পত্রিকায় বলা হয়েছে, একজন যুবক সৈন্যদের কাছে আকুল প্রার্থনা জানায় তার যা কিছু করা হোক না কেন, তার ১৭ বছরের বোনটিকে যেন রেহাই দেওয়া হয়। তার সামনেই বেয়োনেট দিয়ে বোনটিকে হত্যা করে পশুরা। কর্নেল আবদুল হাই নামের একজন বাঙালী ডাক্তার সেনাবাহিনীতে ছিলেন। বাড়িতে শেষবারের মতো টেলিফোন করতে দেওয়া হয় তাঁকে। তারপরই তাঁর লাশ পাঠানো হয় তাঁর বাড়িতে। শুক্রবারের নামাজ আদায় করা একজন মুসল্লী সান্ধ্য আইন মানার চেয়ে ফরজ মনে করেছিলেন। মসজিদে ঢুকেই তিনি সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। ফ্রান্সের 'ল্য এক্সপ্রেস' পত্রিকায় (এপ্রিল ১২-১৮ সংখ্যা) একজন ইউরোপীয়ান ভদ্রলোকের (তিনি বাংলাদেশ থেকে চলে যান) উক্তিতে বলা হয়েছে, 'প্রতি রাতেই আমি মেশিনগান ও মর্টারের গুলির শব্দ শুনতাম। বাঙালীদের তাড়িয়ে তাড়িয়ে ধরত সৈন্যরা, তারপর যানবাহনের পিছনে এমন ভাবে বেঁধে দিত যাতে তাদের মাথা মাটিতে বারবার এসে আঘাত হানে।' সানডে টাইমস পত্রিকার পাকিস্তানস্থ প্রতিনিধি জানিয়েছেন (১৩ই জুন সংখ্যা) যে, পুরানো ঢাকার কয়েকটি এলাকা নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার

সময় সান্ধ্য আইনের সময় যে শত শত মুসলমানদের পাকড়াও করা হয়েছিল তাদেরও কোন চিহ্ন পরে আর মেলে নি। ১৫ই এপ্রিল তিনি ঢাকায় ঘোরার সময় দেখেন যে, ইকবাল হলের দুটি সিঁড়িতে প্রচুর রক্ত তখনও ছড়িয়ে আছে এবং হলের ছাদে চারজন ছাত্রের মাথা তখনও পচছে। দেয়ালে গুলির দাগ এবং রীতিমত ডি. ডি. টি. পাউডার ছড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও চারদিকে দুর্গন্ধ। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ২৩ জন মহিলা ও শিশুর পচা লাশ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

জগন্নাথ হলও সেনাবাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হয়। সেখানে অবস্থানরত ছাত্রদের গুলি করে হত্যা করা হয়। হলের সামনেই তাদের কবর দেওয়া হয়েছে। এখানে হলের ৮।৯ জন বেয়ারারকে কবর খুঁড়তে ও নিহত শিক্ষক, ছাত্র ও তাদের পরিবারবর্গকে কবরে টেনে আনার কাজে লাগানো হয়। কাজ শেষ হলে তাদেরকে কবরেরই ধারে সার বেঁধে বসিয়ে গুলি করা হয়। (পিটার হ্যাজেলহার্স্ট উদ্ধৃত : স্টেটসম্যান, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭১)। ঢাকার পিলখানায় ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর সদর দফতর সেনাবাহিনী চারদিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে একই ভাবে ধ্বংস করে দেয়। শত শত বাঙালী ই. পি. আর. শয্যায় নিহত হয়। রাজারবাগে কিছু পুলিশ কয়েক ঘণ্টা ধরে আত্মরক্ষার জন্ত যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত অধিকাংশই মারা যায়।

টিক্কা খান সৈন্যদের রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে বেতার মারফত তাণ্ডবলীলা পরিচালনা করে। সেই বেতার কথোপকথন কয়েকজন দুঃসাহসী বাঙালী রেকর্ড করে নেন। সেখানে সংশ্লিষ্ট পশুদের কথা ও উল্লাস ধরা পড়েছে। ১৩ই মে-র হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-সহ বহু পত্রিকায় তার প্রতিলিপি বেরিয়েছে। সেখান থেকে কিছু অংশ :

কন্ট্রোল : হ্যালো ৯৯—লাইনে থাকো…নতুন কোন খবর নেই। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এখনও যুদ্ধ চলছে। ওভার।

থেকে ৭৭ : ৮৮-র কাছ থেকে শেষ খবর—সে বেশ এগুচ্ছে। কিন্তু সেখানে বহু বাড়ি রয়েছে, ফলে তাকে একটার পর একটা ধূলিস্যাৎ করতে হচ্ছে… ওভার।

প্রতি ৭৭ : তাকে বলো যে, তার বড় ভাইরা (অর্থাৎ আর্টিলারি বাহিনী) সত্বরই তার কাছে যাবে, সুতরাং বাড়িগুলো ধূলিস্যাৎ করার জন্ত তাদের ব্যবহার করা যাবে। এবারে অন্তদিকে, আমার মনে হয় লিয়াকত ও

ইকবাল (অর্থাৎ লিয়াকত হল ও ইকবাল হল) এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আমি কি ঠিক বলছি ? ওভার।

থেকে ৭৭ : কাজ শেষ করার রিপোর্ট এখনও পাই নি, তবে এ দুটোর ব্যাপারে তারা খুবই খুশী। ওভার।

থেকে কন্ট্রোল : খুবই খুশীর খবর। ওভার।

প্রতি ৭৭ : দ্বিতীয়ত রাস্তার সেই সব বাধা সম্পর্কে ঘোষণা করতেই হবে। রাস্তায় বাধা তৈরী করতে কাউকে দেখা গেলে তাকে সেখানেই গুলি করে হত্যা করা হবে। ১নং, ২নং, কোন এলাকায় রোড ব্লক তৈরী করলে—সেই এলাকার অধিবাসীদের শাস্তি দেওয়া হবে এবং তাদের দায়ী করা হবে এবং সেখানে ডাইনে বাঁয়ে সমস্ত বাড়ি—আমি আবার বলছি—ডাইনে বাঁয়ে সমস্ত বাড়ি ধ্বংস করে দেওয়া হবে···ওভার।

প্রতি ৮৮ : তোমাদের ইমাম (অর্থাৎ কমাণ্ডিং অফিসার) কি বলেছে যে তোমরা কাজ শেষ করতে প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় নেবে ? ওভার।

থেকে ৮৮ : হ্যাঁ, কাজ সম্পূর্ণ শেষ করতে প্রায় তিন থেকে চার ঘণ্টা সময় লাগবে। ওভার।

প্রতি ৮৮ : ইমাম এখন ২৬ নম্বরের সঙ্গে। যদি তোমাদের আর কোন প্রকার সাহায্য লাগে তাহলে তাকে তোমরা জানাতে পার। বাম্বারদের (বাড়ি ধূলিস্মাৎ করার স্কোয়াড) সম্পর্কে বলছি, তারা তাঁদের ঘাঁটি থেকে যাত্রা করেছে এবং সকাল হওয়ার আগেই তোমাদের সামনের বাধা ধূলিস্মাৎ করার কাজে দ্রুত তারা তোমাদের সাহায্য করতে পারবে। ওভার।

২৬ থেকে ৯৯ : দুহাজার নম্বর অঞ্চল (অর্থাৎ পুলিশ লাইন) আগুনে পুড়ছে। আমি আবার বলছি অঞ্চল দুহাজার জ্বলছে। ওভার।

৯৯ থেকে ৮৮ : পিপলস্ ডেলীর খবর কি ? ওভার।

২৬ থেকে ৯৯ : উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি আবার বলছি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে···ওভার।

৭৭ থেকে ২৬ : মারঘোরে (অর্থাৎ এ্যাডজুটেন্ট) জানিয়েছেন যে, ইমাম বলেছেন, সকাল হওয়ার আগেই যত মৃতদেহ আছে সব সরিয়ে ফেলতে হবে ও একথা সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে। ওভার।

কণ্ট্রোল : হ্যালো ৪১—১৬, ৪১, ৮৮ তোমরা খবর পেয়েছ ? ওভার··· হ্যালো ৮৮—৪১ নম্বর যে খবরটি পড়ে দিল এটি কি পেয়েছ ?

প্রতি ৮৮ : হ্যাঁ, সেগুলো সরাবার ব্যবস্থা করছি। তুমি স্থানীয় শ্রমিক ব্যবহার করে সেগুলো সদর জায়গা থেকে সরিয়ে ফেলতে পার। ওভার।

প্রতি ৪১ : তোমার এলাকার গুরুত্বপূর্ণ লোকদের ব্যাপারে কাজ শুরু করার কথা তোমার ইমামকে বলতে পার। যে-সব মহিলাদের তুমি জান তাদের ওখানে যেতে পার এবং যে-সব স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ লোকদের আমাদের প্রয়োজন তাদের একটি তালিকা···ওভার !

প্রতি ৮৮ : ভালই করেছ। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা নিহত হয়েছে তাদের আনুমানিক সংখ্যা কত হবে বলে তোমার মনে হয়—তোমার মতে যা আনুমানিক ঠিক তাই বল। নিহত বা আহত বা ধৃত ব্যক্তির সংখ্যা কত হবে ? একটা মোটামুটি সংখ্যা দাও আমাকে। ওভার।

থেকে ৮৮ : অপেক্ষা করুন। প্রায় ৩০০। ওভার

প্রতি ৮৮ : ভালই করেছ, ৩০০ নিহত ? কেউ কি আহত বা ধৃত হয়েছে ? ওভার।

থেকে ৮৮ : আমি কেবল একটি জিনিসেই বিশ্বাস করি—৩০০ নিহত। ওভার।

প্রতি ৮৮ : হ্যাঁ, আমিও তোমার সঙ্গে একমত, সেটাই সহজতর—না কিছুই জিজ্ঞেস করা হচ্ছে না, কিছু না, তোমাকে কিছুই ব্যাখ্যা করতে হবে না। আবার বলছি ভালই করেছ। আবার আমি এই এলাকায় চমৎকার কাজ করার জন্য তোমাকে, তোমার সমস্ত জওয়ানকে ও তোমার সঙ্গের আজিজকে সাবাশ জানাচ্ছি। আমি খুবই খুশী। ওভার।

এই বাক্যবিনিময়ে একথা স্পষ্ট হয় যে, একটি পরিকল্পনা অনুসারে, ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নৃশংস ভাবে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে পশ্চিমী দস্যুরা, ধ্বংস করেছে ঘরবাড়ি।

লোরেন জেঙ্কিন্স (নিউজ উইক, ৫ই এপ্রিল, ১৯৭১) কমপক্ষে ছটি টি-৫৪ চীনা ট্যাঙ্ক ব্যবহার করতে দেখেছেন সেনাবাহিনীকে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রেস অফিসার (স্টেটসম্যান, ২০-এ এপ্রিল, ১৯৭১) ওয়াশিংটনে স্বীকার করেছেন যে, পাক-সেনারা ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে প্রচুর গোলাগুলি ছুঁড়েছে।

প্রথম চোটে ঢাকায় কত লোককে হত্যা করা হয়েছে তার সংখ্যা কোনদিনই জানা যাবে না, টেলিগ্রাফসহ প্রতিটি পত্রিকা এই মন্তব্যই করেছেন। ৩০-এ এপ্রিলের টেলিগ্রাফ ঢাকায় কমপক্ষে ৭০০০ লোককে হত্যা করা হয়েছে বলে মনে করেন। এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধি মর্ট রোজেনব্লুম ঢাকায় কমপক্ষে ১০,০০০ লোককে গুলি করে ও পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে বলে মনে করেন। কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকে ঠাসা ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যে-ধরনের আক্রমণ চালানো হয়েছে তাতে কয়েক লক্ষ লোক মারা গেছে বলে সহজেই অনুমান করা চলে। সেই কথাই বলেছেন ৩০-এ মার্চের নিউ ইয়র্ক টাইমস। তাঁদের মতে কেবল ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে ৩,০০,০০০ লোককে হত্যা করা হয়েছে। এর অধিকাংশই যে ঢাকায় তাতে কোন সন্দেহ নেই। মর্ট রোজেনব্লুম সেই ছয় জন সাংবাদিকেরই একজন যাদেরকে ২৫-এ মার্চ থেকে ছয় সপ্তাহ পরে বাংলাদেশে একটি নিয়ন্ত্রিত সফরে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁকে সামরিক কর্তারা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে, ২৬-এ মার্চ সকাল ৩টার দিকে বাঙালীরা বিদ্রোহ ঘোষণার পরিকল্পনা করেছিল। সেজন্যই সেনাবাহিনীকে তাদের কর্তব্য পালন করতে হয় এবং তাদের প্রতি গুলি করা না হলে সেনাবাহিনী গুলি ছুঁড়ে কাউকে হত্যা করে নি। কিন্তু যে-সমস্ত অফিসারদের কর্তৃপক্ষ ঠিকমত পাখিপড়া করে রাখে নি তারা তাঁকে জানিয়েছে যে, বাঙালীদের বিদ্রোহ করার পরিকল্পনাটি বানানো।

ঢাকার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যান্য শহরেও সেনাবাহিনী নেমে পড়ে। ২৪-এ তারিখেই চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী বহু লোককে বন্দর এলাকায় গুলি করে হত্যা করে। রোজেনব্লুম তাঁর রিপোর্টে বলেছেন যে, চট্টগ্রামের এক জুট মিলে

যাওয়ার রাস্তা বরাবর বাঙালীদের যত ঘরবাড়ি ও দোকান ছিল সবই সেনাবাহিনী জ্বালিয়ে ও উড়িয়ে দেয়। ঢাকায় কমপক্ষে ১২টি বাজার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঢাকা থেকে ময়মনসিং রেলপথের ধার বরাবর প্রায় ১৪৫ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে বহু লোকের ঘরবাড়ি সেনাবাহিনী ধূলিস্মাৎ করে দিয়েছে। রোজেনব্লুম ১২ই মে এই রিপোর্ট দিতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, কমপক্ষে ৫ লক্ষ লোককে হত্যা করা হয়েছে। বৃটিশ এম. পি. ডগলাস ম্যান মে মাসে বৃটেনের কমন্সসভাকে জানান যে, ১০ লক্ষেরও বেশী লোক বাংলাদেশে নিহত হয়েছেন (পোস্ট মাস্টারী সিরিজ, ২১-এ মে, ১৯৭১)। ম্যাসকারেনহাস জানিয়েছেন যে, দরকার হলে ২০ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করার ইচ্ছা তাঁর কাছে সামরিক কর্তৃপক্ষ প্রকাশ করেছেন। ২রা আগস্টের টাইম মন্তব্য করেছেন যে, নিহতের সংখ্যা ২ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষের মধ্যে।

বাংলাদেশের অন্যান্য জায়গায় যে ধ্বংসলীলা চালানো হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ মেলে বিশ্ব ব্যাঙ্ক মিশনের রিপোর্টে। ৩১-এ মে থেকে ১১ই জুন পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে মিশন বাংলাদেশের প্রায় সব কটি জেলা পরিদর্শন করেন। মিশনের জনৈক সদস্য হেনড্রিক ফ্যান ডের হাইজেন তাঁর ফিল্ড রিপোর্টে বলেছেন যে, যশোর অঞ্চলে সেনাবাহিনী শত শত গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। যশোর সেনানিবাস থেকে সেনাবাহিনী ৫ই এপ্রিল বেরিয়ে এসে সাংঘাতিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। তারা যশোর শহরেই ২০,০০০ লোককে হত্যা করে। সেখানে মোট অধিবাসীর সংখ্যা ৮০ হাজার থেকে নেমে গিয়ে মাত্র ২০ হাজারে পৌঁছেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেছে। শতকরা ৫০ ভাগ দোকান ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। শহরের সমস্ত বেকারী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। ১৫টি পেট্রোল পাম্পের মধ্যে মাত্র ৩টি অবশিষ্ট আছে। যশোরে কোন মহিলা বা শিশু নেই। যশোর জেলার ২৫ লক্ষ লোকের মধ্যে ৫ লক্ষই ভারতে পালিয়ে গেছে। অফিস আদালতে কোন লোক আসে না। স্কুল কলেজ সব বন্ধ।

খুলনা শহরও যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘরবাড়ি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। জান মালের কোন নিশ্চয়তা নেই। ৪ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে মাত্র দেড় লক্ষ আছে সেখানে। খুলনার প্লাটিনাম জুবিলি জুট মিল অঞ্চলে প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। পাকা বাড়ি ও অন্যান্য ঘরের ধ্বংসাবশেষ দেখলে ১৯৪৪ সালের আর্নহেম-এর কথা স্মরণে আসে।

মঙ্গলা বন্দরে চালনা বন্দরের হাজার হাজার শ্রমিক বাস করত। নৌবাহিনীর কামানে তাদের ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছে। ফলে ২২,০০০ অধিবাসীর সংখ্যা এখন ১০০০-এ এসে দাঁড়িয়েছে। এখানে চরম ধ্বংসকার্য সাধিত হয়েছে। ঘরবাড়ি, বাজার, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা প্রভৃতি সবকিছু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে গেছে।

ফুলতলা থানার শতকরা ৫০ ভাগ লোক পালিয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ এই থানাকে আঘাত করেছে সবচেয়ে বেশী। এখানকার কৃষিকাজ, উন্নয়নমূলক কাজ সবই বন্ধ হয়ে গেছে এবং আগামী ৫ বছরের মধ্যে তা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে না।

ঝিনাইদহ থেকে কুষ্টিয়ায় সেনাবাহিনী যায় ১৫ই এপ্রিল। ১২ দিন ধরে সেনাবাহিনীর কার্যকলাপ চলে সেখানে। ফলে কুষ্টিয়া একরকম ধ্বংস হয়ে যায়। এলাকাটি এখন জনমানবশূন্য। অধিবাসীর সংখ্যা কমে গিয়ে মাত্র ৫ হাজারে দাঁড়িয়েছে। ঘরবাড়ি, দোকান, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ভবনের শতকরা ৯০ ভাগ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বোমার আঘাতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহরের মত মনে হোল কুষ্টিয়াকে, আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পরদিনকার সকাল বলে মনে হোল। জনসাধারণ ভীত, হতবুদ্ধি হয়ে গেছে। কুষ্টিয়ার অফিসাররা দারুণ মানসিক আঘাত পেয়েছেন। আমি যাওয়ার পর বর্তমান ডেপুটি কমিশনার কোন কথাই বলেন নি। সেখানে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও কেউ কথা বলেন নি। রুটি পাওয়া যায়, এমন কোন দোকানের সন্ধান দিতে আমি দেড় ঘণ্টা ধরে বললাম। সেই ৯০ মিনিটের মধ্যে একটিও পাওয়া গেল না। কুষ্টিয়া হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর মাই লাই। সেখানকার ডেপুটি কমিশনার-সহ বহু অফিসারকে হত্যা করা হয়। কোন জায়গায় কোন লোক নেই। এমন কি হাসপাতালেও কোন লোক নেই। হাজার হাজার চাষী পালিয়ে গেছে। সবকিছুই সেখানে অস্বাভাবিক। এ এমন একটি অভিজ্ঞতা যা সবকিছু চুরমার করে দেয়।[৩৫]

মিশনের সরকারী রিপোর্টে আরো মন্তব্য করা হয়েছে : অধিকাংশ শহরের বাজার, দোকান, শ্রমিকদের ঘরবাড়ি ও রাস্তা বরাবর বস্তি এলাকা ধ্বংস করে

---

৩৫ World Bank Study on Bangla Desh: Printed and Published by Society for Human Rights, Bangla Desh, 1971, p. 1-12.

দেওয়া হয়েছে। বহু গ্রাম ও বাজার সাংঘাতিক ধ্বংসের শিকার হয়েছে। এমন বহু শহর আমরা দেখেছি যেখানকার বহু এলাকা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এমন বহু জেলাই আমরা পরিদর্শন করেছি যেখানকার অসংখ্য গ্রামের আজ আর অস্তিত্বই নেই।[৩৬]

ম্যাসকারেনহাস তাঁর রিপোর্টে বলেছেন যে, সামরিক বাহিনী এখন একটি তালিকা তৈরী করছে। তিনটি শ্রেণী থাকবে সেখানে : কালো, ধূসর ও সাদা। কালো তালিকায় যাদের নাম উঠবে তাদের হত্যা করা হবে, ধূসর তালিকাভুক্ত লোকদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হবে ও দরকার হলে জেলে পচানো হবে আর সাদা তালিকায় যাদের নাম উঠবে তারা রেহাই পাবে। ম্যাসকারেনহাস জানিয়েছেন যে, বহু লোককে সেনাবাহিনী খেয়ালখুশিমত হত্যা করছে। কুমিল্লা বেসামরিক প্রশাসন হেড কোয়ার্টারে বহু মানুষকে পিটিয়ে হত্যা করার সময় তাদের চীৎকার তিনি শুনেছেন। সান্ধ্য আইনের সুযোগ নিয়ে রাতের অন্ধকারে ট্রাকের পর ট্রাকে মানুষ বোঝাই করে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ গ্রাম ধ্বংস করতেও তিনি দেখেছেন। রাতে অফিসাররা তাদের মেসে এসে সারাদিন কে কত লোক হত্যা করল তা নিয়ে আলাপ করেছে, তিনি শুনেছেন।

'আজ তুমি কতজনকে সাবাড় করলে হে?'

সামরিক কর্তারা মনে করে যে, আওয়ামী লীগের স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনে হিন্দুদের বিরাট হাত ছিল। সুতরাং তারা তাদেরকে হত্যা করা প্রয়োজন বলে মনে করে। অন্যদিকে বাঙালী মুসলমানরা অর্ধ হিন্দু। অতএব তাদেরকেও হত্যা করা দরকার। 'এখানকার লোকদের নাম মুসলমান, কিন্তু তারা অন্তরে অন্তরে হিন্দু', ম্যাসকারেনহাসকে সেনাবাহিনীর অফিসাররা বোঝাবার চেষ্টা করেছে।

সেনাবাহিনী কি মর্মান্তিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে বাঙালীদের হত্যা করছে তার একটি উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। কুমিল্লার সামরিক আইনপ্রশাসক মেজর আগার কার্যালয়ে যখন তিনি বসেছিলেন তখন এক বিহারী পুলিশ সাব-ইনসপেক্টর কিছু বন্দীর একটি তালিকা নিয়ে প্রবেশ করল। আগা তালিকাটির দিকে একবার তাকিয়েই তাতে পেন্সিলের কয়েকটি দাগ দিয়ে বলল, 'এই চারজনকে সাবড়ে দেওয়ার জন্য আজ সন্ধ্যায় নিয়ে এস।' তারপর তালিকাটির

৩৬ ibid, p. 15

দিকে আবার তাকিয়ে পেন্সিল দিয়ে আর একটি দাগ কাটল, 'আর এই চোরটাকেও তাদের সঙ্গে নিয়ে এস।' আমাকে জানানো হোল যে, প্রথম দুজন হিন্দু, তৃতীয় একজন ছাত্র, চতুর্থ ব্যাক্তি আওয়ামী লীগের একজন কর্মী আর 'চোর'টির নাম হচ্ছে সেবাস্তিয়ান। তার অপরাধ সে একটি হিন্দুর বাড়ি থেকে জিনিসপত্র নিজের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল। সেই সন্ধ্যায় তাদেরকে হাত পা বেঁধে নিয়ে আসা হোল এবং সার্কিট হাউসের চত্বরেই তাদের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হোল।

চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী হত্যা ও লুঠতরাজের এক বিভীষিকা সৃষ্টি করে। গার্ডিয়ান পত্রিকার ৬ই এপ্রিল সংখ্যায় পত্রিকাটির প্রতিনিধি মার্টিন উলাকট লিখেছেন যে, 'ক্লান ম্যাকনেয়ার' জাহাজ ৫ই এপ্রিল চট্টগ্রাম থেকে ১১৯ জন বিদেশীকে কোলকাতায় নিয়ে আসে। তাদের কাছ থেকে খবর পাওয়া গেছে যে, চট্টগ্রাম ছারখার করে দেওয়া হয়েছে। বহু মৃতদেহ রাস্তাঘাটে পড়ে আছে, বহু অঞ্চল জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিদেশীরা আরো জানান যে, শহর সেনাবাহিনীর পুরো আয়ত্তে যাওয়া সত্ত্বেও তারা রাস্তায় বাঙালীদের গুলি করে হত্যা করছে। একজন ইঞ্জিনিয়ার জানান, 'আমি দেখলাম, পাঞ্জাবী সৈন্যরা দুজন বাঙালীকে ধরে তাদের ট্রাকের পিছনে টেলবোর্ডে পা দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল যাতে রাস্তা দিয়ে তাদের হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া যায়।' তিনি আরো বলেন, 'আর একদিন দেখলাম পাঁচটি মৃতদেহ স্তূপ করা আছে এবং কয়েকজন বাঙালীর দ্বারা সৈন্যরা কবর খুঁড়িয়ে নিচ্ছে। তারা সম্ভবত তাদের নিজেদের কবরই খুঁড়ছিল।' তিনি নিজে মোট ৪০টি মৃতদেহ শহরে দেখেছেন। আর একজন বিদেশী শরণার্থী জানান, 'আমি দেখলাম, সেনাবাহিনীর ট্রাকগুলো থামছে ও বাঙালীদের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, তারপরই অটোমেটিক ফায়ার করছে, তাতে লোকগুলো সবাই পড়ে যাচ্ছে মাটিতে।' বহু লোককে লোহার হেলমেটের কোণা দিয়ে আঘাত করে সোজা ট্রাকের মধ্যে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, তিনি জানান। অন্য আর একজন জানান যে, জাহাজে ওঠার পথে তিনি শত শত আগুনে ভস্মীভূত ঘরবাড়ি দেখেছেন। একজন ডাক্তার তাঁর হাতে আগুনে ভস্মীভূত হওয়া বহু মানুষের হাড় কয়েকটি অর্পণ করেন।

সরকার নিয়ন্ত্রিত সফরে নিউ ইয়র্ক টাইমসের একজন সাংবাদিক ছিলেন। তিনি জানিয়েছেন (১১ই মে সংখ্যায়) যে, চট্টগ্রামের বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের

একটি ঘরে ১০০০ বাঙালী আশ্রয় নিয়েছিল। সেনাবাহিনী এসে সবাইকে গুলি করে। বহু লোক মারা গেছে, কিছু লোক পালিয়ে গেছে। পত্রিকাটি আরো জানান যে, চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। কোলকাতায় চলে আসা একজন আমেরিকান কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার এ. স্তাওার্সকে কতকগুলি অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতার কথা জানান। স্তাওার্স CBS প্রতিনিধি এবং তাঁর রিপোর্ট নিউ ইয়র্ক থেকে ১২ই এপ্রিল বেতারে প্রচারিত হয়।[৩৭] ইঞ্জিনিয়ার জানান, 'সেখানে এই ক্যাপ্টেনটি ছিল বেশ ভাল। কিন্তু অসামরিক জনসাধারণকে গুলি করে হত্যার ব্যাপারে তাদের কারুরই কোন বিবেক বোধ ছিল না। সেখানে এক মেজর ছিল···যুদ্ধের পর কি করবে তাই নিয়ে সে বড়াই করতে লাগল। 'এটি একটি চমৎকার রক্তাক্ত তামাসা', সে বলল।

'যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে তখন কোন বাঙালী গাড়ি চড়বে না—কেবল বিদেশী ও পশ্চিম পাকিস্তানীরা। তারপর তাদের এই ক্লাব—চিটাগাং ক্লাব। কোন কুত্তা বা বাঙালীকে এই ক্লাবে ঢুকতে দেওয়া হবে না।'

'পুলিশ লাইনে কিছু প্রতিরোধ হয়, যারা বেঁচে ছিল তাদের দরজায় সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে গুলি করা হয়। তাদের দেহ কুত্তা দিয়ে খাওয়ানো হয়, 'কারণ একমাস ধরে কুত্তারা খেতে পায় নি,' মেজর বলল। মেজর আরো বলল, 'চট্টগ্রামে আমি একটি রক্ষিতা রাখব এবং আমি চাই যে, আমার সৈন্যরা প্রত্যেকেই একটি করে রাখুক।'

১০ই মে রয়টার জানাচ্ছেন[৩৮] যে, রাজশাহীর বাজার এলাকা রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একটি ভবন একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। শহরে মানুষ মূক হয়ে গেছে। সবাই দিশেহারা। বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গেও তারা কথা বলে নি। নাটোরে প্রধান রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সেনাবাহিনী সেখানকার ঘরবাড়ি ধূলিস্যাৎ করে দেয়। বহু ঘরবাড়ি, দোকান ও একটি থিয়েটার আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। গ্রামের লোকেরা সাংবাদিকদের একটি কুয়ো দেখায় যেখানে সেনাবাহিনী বহু লাশ ফেলে দিয়েছে। পূর্বে উল্লিখিত মর্ট রোজেনব্লুম

---

৩৭ Reproduced in The Black Book of Genocide in Bangla Desh, Jag Mohan, Geeta Book Centre, New Delhi, 1971, p. 13.

৩৮ ibid, p. 30.

নাটোর সম্পর্কে বলতে গিয়ে জানিয়েছেন : একটি ছোট ছেলে কাছের এক শেওলাভরা পুকুরের দিকে তাকিয়ে আছে যেখানে তার বাবা-মার মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, ২রা মে ঢাকার কাছাকাছি একটি ট্রেন অচল করে দেওয়ায় সৈন্যরা সেখানে গিয়ে যাকে দেখেছে তাকেই গুলি করেছে। ২০০ লোক মারা গেছে সেখানে।

একজন বিদেশী ছাত্র ২৫-এ এপ্রিল দিল্লীতে পৌঁছে ইউনাইটেড নিউজ অফ ইণ্ডিয়াকে একটি সাক্ষাৎকার দান করে।[৩৯] তার দেশের পরামর্শে সে নাম গোপন রাখে। সে একটি রোজনামচা দিয়েছে।

মার্চ ২৫ : আমরা আমাদের হস্টেল থেকে (ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস হস্টেল) দেখলাম সেনাবাহিনী ইকবাল হলে ঢুকছে। আমার প্রায় সব বন্ধু ও ৩০০ ছাত্রকে সেখানে হত্যা করা হয়।

সেনাবাহিনী এখন রোকেয়া হলে গোলা ছুঁড়ছে। মেয়েদের ও যে-সব ছেলেরা সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। মৃতদেহ হোস্টেলের বাইরে ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। ১৩ জন ছাত্রীকে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

মার্চ ২৬ : অবস্থা খুবই খারাপ। একটি বাচ্চা ছেলেকে তাড়িয়ে ধরা হোল··· রাইফেলের কুঁদো দিয়ে তাকে পিটিয়ে দৌড়াতে বলা হোল। দৌড়ানোর সময় তার পিঠে গুলি করা হোল।

সলিমুল্লাহ্ ও জগন্নাথ হলের সামনে লাশ ছড়িয়ে আছে। দুর্গন্ধ অসহ্য। আমার বন্ধুরা নিহত হয়ে পড়ে আছে, শুকুন তাদের খাচ্ছে।

মার্চ ২৭ : দুদিন ধরে কোন খাবার নেই। সকালে সেনাবাহিনীর একজন অফিসার সন্ধ্যায় খাবার এনে দেবে কথা দিল। আমরা রান্নাঘরে ও ডাইনিং হলে ১০০০ বাঙালীকে লুকিয়ে রেখেছি। সন্ধ্যায় অফিসারটি খাবার নিয়ে ফিরে এসে বাসনকোসন চাইল। রান্নাঘরের দরজা সে ভেঙে ফেলল। বাঙালীদের দেখে রিভলবার বার করে গুলি করতে চাইল।

তাকে বলে কয়ে নিরস্ত করলাম, কিন্তু বাঙালীদের বার করে দেওয়ার শর্তে। বাঙালীরা বেরিয়ে আসার পর বহুক্ষণ পর্যন্ত গুলি

৩৯ ibid, p. 14-15.

ছোঁড়ার শব্দ শুনলাম। আমার সমস্ত রুচি চলে গেছে। চারদিকে এক ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা।

মার্চ ৩০ : নিউ মার্কেট একদম জনমানবশূন্য। দোকানপাট সব লুঠ হয়ে গেছে। সেনাবাহিনীর লোকেরা দোকান ভেঙে ফেলে লুঠ করছে।

মার্চ ৩১ : শান্তিনগর আগুনে জ্বলছে। অফিসারদের তত্বাবধানে সমস্ত দোকান জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

আমাদের হোস্টেল সংলগ্ন তিনটি দোকানও লুঠ হয়ে গেল। শহীদ মিনার একেবারে ধূলিস্মাৎ করে দেওয়া হয়েছে দেখলাম।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেয়েদের হস্টেল ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। রেহাই পাওয়া এক বন্ধু বললেন, অনেক ডাক্তারকে হত্যা করা হয়েছে এবং মহিলা ডাক্তারদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়েছে।

এপ্রিল ১১ : রাজশাহী থেকে আসা কয়েকজন আরব দেশীয় ছাত্র বলল যে, তারা দেখেছে হস্টেল থেকে ছাত্রীদের সেনাবাহিনীর লোকেরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এমনকি হস্টেলের মধ্যেই কয়েকজনের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয়।

প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া এক খবরে জানায় যে, ১০ই এপ্রিল যশোরে সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার স্কুলের ছাত্রদেরকে মেসিনগানের গুলিতে হত্যা করা হয়।[৪০] স্কুলে প্রায় ৩০০ ছাত্র ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে বিদেশী ধর্মযাজককেও হত্যা করা হয়। ১০ই মে রয়টার জানিয়েছেন, ফাতিমা ক্যাথলিক হাসপাতালের জমিতে ইটালীর ফাদার মারিও ভেরোনেসেকে কবর দেওয়া হয়েছে। ৪ঠা এপ্রিল সেনাবাহিনী তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।[৪১] গীর্জার মধ্যেই আরো চার জন লোককে গুলি করে হত্যা করা হয় : ১৪ বছরের একটি মেয়ে, একজন মা ও দুজন পুরুষ।

স্টেটসম্যান পত্রিকার এক সংবাদ অনুসারে,[৪২] যশোরের কয়েক মাইল দূরে শিমুলায় ক্যাথলিক মিশনের একটি ছোট ঘরে একজন ধর্মযাজক ও তিন জন নানকে আটকে রাখা হয়। নানদের দুজন ইটালীয়ান, তৃতীয় জন বাঙালী।

৪০ ibid, p 39
৪১ ibid
৪২ ibid, p. 40

চারদিন ধরে তাঁদের না খাইয়ে রাখা হয়েছে। বাঙালী মেয়েটি পালাবার সময় ধরা পড়ে, সৈন্যরা তাকে প্রহার করে।

আরো ৭০ জন নানের সংবাদ মেলে নি। সৈন্যরা তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করেছে বলে জানা গেছে।

ইউ. এন. আই. ২০-এ এপ্রিল এক সংবাদে জানান যে,[৪৩] মহামান্য জ্যোতিপাল মহাথেরো (ওয়ার্ল্ড বুড্ডিস্ট ফেলোশিপ, পাকিস্তান শাখা ও পাকিস্তান বুদ্ধ কৃষ্টি প্রচারের সভাপতি) অভিযোগ করেছেন, বহু লোককে জোর করে রাস্তা মেরামতের কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়। একজন আশী বছরের বৃদ্ধ বৌদ্ধ পুরোহিতকেও রেহাই দেওয়া হয় নি। একই সংবাদ প্রতিষ্ঠানের আর একটি সংবাদে[৪৪] জানা যায়, বাংলাদেশের ৫ লক্ষ বৌদ্ধের মধ্যে এক লক্ষ হত্যা, অত্যাচার ও ধ্বংসের ভয়ে নিজেদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে গেছে। চট্টগ্রামের রাউজান, হাটহাজারী, রাঙ্গুনিয়া, পাঁচলাইশ প্রভৃতি এলাকার প্রায় ২৫টি গ্রাম থেকে বৌদ্ধরা হত্যা, অত্যাচার ও লুণ্ঠনের ফলে দলে দলে অন্যত্র চলে গেছে।

সানডে টাইমস পত্রিকার ২৮-এ জুন সংখ্যায় আর একটি দীর্ঘ সংবাদ বেরিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে :

রাজাকার নামের নতুন এক সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশে আমদানি করা হয়েছে। তারা সাধারণত সীমান্ত অঞ্চলের বাসিন্দা। এরা যথেচ্ছা লুঠপাট করে বেড়াচ্ছে।

ঢাকায় গেস্টাপোদের মত সেনাবাহিনী এক ত্রাসের প্রতিষ্ঠা করতে চায়। রাতে বা দিনে ঢাকার কোন কোন অংশ ঘিরে ফেলে সৈন্যরা হিন্দু, আওয়ামী লীগ-পন্থী ও ছাত্রদের সন্ধান করে। বহু লোককে যখন তখন গ্রেফতার করা হয়। কিছু লোককে সেনানিবাসে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের অনেকেই আর ফেরে না।

সবাইকে এখন পরিচিতি পত্র সঙ্গে রাখতে হয়। কারুর তা না থাকলে তাকে সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়।

৪৩ ibid, p. 41

৪৪ ibid, p.

২৮-এ মে খিলগাও অঞ্চল থেকে ১০০ জন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। ঢাকার একটি পাটকলের মালিকপক্ষ অনেক বুঝিয়ে কয়েক শ শ্রমিককে কাজে যোগদান করতে রাজী করান। কিন্তু সেনাবাহিনী তাদের তিনজন নেতাকে ধরে নিয়ে গেলে বাকী সবাই পালিয়ে যায়।

সেনাবাহিনী কমপক্ষে ৩৬ জন বাঙালী ম্যাজিস্ট্রেট ও মহকুমা অফিসারকে হত্যা করেছে অথবা তারা ভারতে পালিয়ে গেছে। সেনাবাহিনী কুমিল্লা, নোয়াখালি, ফরিদপুর ও সিরাজগঞ্জে ঢোকার পর সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টদেরকে হত্যা করে।

ভোলায় ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট আবু আওয়াল ১লা মে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। আমিন নামের একজন অফিসারকে তাঁর পরিবারসমেত সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর পরিবার ফিরে আসে, কিন্তু তিনি আর ফেরেন নি। একজন ক্যাপটেন ও দুজন সৈন্য মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে ডঃ রহমান ও তাঁর একজন সহকর্মীকে কাজের নামে ময়মনসিংহে নিয়ে যায়, তাঁদের আর কোন খবর মেলে নি। পূর্ব পাকিস্তানের সার্জন জেনারেল ডক্টর শামসুদ্দীনকে সিলেট হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারেই গুলি করে হত্যা করা হয়। পি. আই.-এ.র বহু কর্মচারীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। পূর্ব পাকিস্তানের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ফজলুল হক ও চীফ সেকটর পাইলট তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। পি. আই. এ. থেকে ২,০০০ বাঙালীকে বরখাস্ত করা হয়েছে। চট্টগ্রামে বেশ কিছু উচ্চপদস্থ রেল কর্মচারীকে হত্যা করা হয়েছে।

ডেনমার্কের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চট্টগ্রাম থেকে প্রত্যাগত হয়ে স্টেটসম্যানকে (৭ই এপ্রিল) জানান :

চট্টগ্রামের বাইরে একটি গ্রামে মেশিনগানের গুলি চালিয়ে সৈন্যরা বেশ কিছু লোককে হত্যা করে। ৩১-এ মার্চ সৈন্যরা 'বহু, বহু লোককে' হত্যা করে। একটি দোকানে ১৫ জন লোক রেশন নিচ্ছিল। তাদের বাইরে আসতে বলা হয় ও হত্যা করা হয়। মাত্র একজন লোক দুটি বুলেট-গুলি খেয়েও বেঁচে যায়। শহরের অনেক জায়গায় এ ধরনের কাণ্ড হয়েছে। ৩১-এ মার্চ সেনাবাহিনী বাজার ও কাঁচা বাড়ি পোড়াতে আরম্ভ করে। ছাদ থেকে শহরের চারদিকে আমি আগুন জ্বলতে দেখলাম। সেনানিবাসের কাছে ৪০টি ফ্যাক্টরি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সানডে টাইমস (২৮-এ জুন) পত্রিকা আরও জানিয়েছেন যে, ৫০০০ শ্রমিক কাজ করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দরে ১লা মে ফিরে এলে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। সামরিক বাহিনী, নৌবাহিনী ও অবাঙালী লোকদের সাহায্যে বন্দরে কাজ চালানো হচ্ছে। ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ২৫০ জন কুলি আনা হয়েছে। যশোরের প্রখ্যাত আওয়ামী লীগার জনাব মশিউর রহমানকে সেনাবাহিনী সপরিবারে নিহত করে বলে পত্রিকাটি সংবাদ দিয়েছেন।

বাঙালী মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার পাক-সেনাদের এক টিবিকৃত পেশায় পরিণত হয়েছে। সর্বত্র তারা সুযোগ পেলেই অত্যন্ত নৃশংসভাবে মেয়েদের উপর অত্যাচার করছে। সানডে টেলিগ্রাফের উদ্ধৃতি দিয়ে ২০-এ এপ্রিলের স্টেটসম্যান জানাচ্ছেন : 'সমস্ত সংবাদপত্রের রিপোর্ট দেখা যায় পাঞ্জাবী ও বালুচী সৈন্যরা নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে ও ধর্ষণ করেছে।' ২৫-এ মার্চ রাতে ঢাকায় সৈন্য নামার পর মেয়েদের রোকেয়া হল আক্রান্ত হয়েছিল তা আমরা জেনেছি। তার একটি ভয়ঙ্কর বর্ণনা দিয়েছেন এ. স্যাণ্ডার্স নামীয় একজন বৃটিশ ব্যবসায়ী। তিনি ২রা এপ্রিল ইংল্যাণ্ডের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। তাঁর একজন সহকর্মীর মেয়ে রোকেয়া হলে সৈন্যদের আক্রমণের শিকার হয়। তাঁর কাছ থেকেই তিনি এই বিবরণ জানতে পেরেছেন :

৩৫০ থেকে ৪০০ পাকিস্তানী সৈন্য হল আক্রমণ করে। সমস্ত ঘরে ঢুকে তারা মেয়েদের টেনে বের করে নিয়ে আসে, তাদের কাপড়-চোপড় একে একে টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেয় ও তাদেরকে মারধোর করে।

চারদিক থেকে আর্ত চীৎকার শোনা যাচ্ছিল। সাড়ী, স্কার্ট, সালওয়ার সব খুলে ফেলে দেওয়া হয়, তারপর ব্লাউজ, কামিজ, কাঁচুলি। মেয়েদেরকে পয়োধর বা চুল ধরে মাটি থেকে উচু করা হয়, কাউকে কাউকে মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে উচু করা হয়।

তারা যখন হাত দিয়ে তাদের লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করছিল তখন সৈন্যরা তাদের গোপনাঙ্গে ভারী বুট দিয়ে লাথি মারে, হাত দিয়ে ঘুঁষি চালায়, অনেকে সেখানে বেয়োনেটের আঘাত করে, তখন সেখান থেকে ঝরতে থাকে রক্ত।

এর পরই মেয়েদেরকে জোর করে……ধর্ষণ করা হয়।

মেয়েরা চীৎকার করে কাঁদতে থাকে, ব্যথায় ককিয়ে ওঠে, তাদের হাত

ছাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু পশুরা ধর্ষণ করতেই থাকে। একই মহিলাকে ১০।১২ জন জন্তু পর পর ধর্ষণ করতে থাকলে রক্তের স্রোত বইতে থাকে। সৈন্যরা তাদের শয়তানের ক্ষুধা মিটিয়ে চলে গেলে বহু মেয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

মেয়েদের অবস্থা এমনই সঙ্গীন হয়ে পড়ে যে, দেহ ঢাকার মত শক্তিও তাদের ছিল না।

তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল সৈন্যরা। পয়োধরের কোন কোন অংশ কামড়ে তুলে নিয়েছে, ঘুঁষি ও বুটের লাথিতে গোপনাঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে, বাধা দেওয়ার ফলে গলা চেপে ধরেছে।

ঠিক এই সময়েই বর্বরদের হাতে পড়ার ভয়ে হলের ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করে ৫০জন সাহসী ছাত্রী।

সবচেয়ে করুণ হচ্ছে হলের ছাত্রীদের দেখতে আসা একটি ১২ বছরের মেয়ের পরিণতি। এই কিশোরী এক জানোয়ার পাঠানের. পাশবিক অত্যাচারে মৃত্যুবরণ করে। মেয়েটি একবার করুণ চীৎকার করেই অজ্ঞান হয়ে যায়, কিন্তু জন্তুটি তবুও অত্যাচার চালাতে থাকে।...অবশেষে জন্তুটি কিশোরীর গোপনাঙ্গের ওপর বুটের এক লাথি মারে। তার আগেই মেয়েটি মারা গেছে। রক্তের প্রবাহ ছুটতে থাকে—যেন কোন ট্যাপ খুলে দেওয়া হয়েছে।

...পাঠানরা মেয়েদেরকে সমকামের জন্যও ব্যবহার করেছে।...যন্ত্রণা... চীৎকার...রক্ত। তথাপি শয়তানেরা ক্ষান্ত হয় নি।

নারী ও শিশুদের উপর পাঞ্জাবী ও পাঠান সৈন্যরা এ-ধরনের আচরণ ঢাকায় ১০।১২ জায়গায় করেছে।

এ. স্তাওর্স বোম্বের ব্লিৎস পত্রিকাকে উপরি-উক্ত বিবরণ নিজের স্বাক্ষর-সহ প্রকাশের জন্য প্রদান করেন (ব্লিৎস, ৬ই এপ্রিল, ১৯৭১)।

সানডে টাইমসের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে রাজাকাররা চট্টগ্রামের এক বিল্ডিংয়ে বহু যুবতীকে ধরে বেশ্যালয় চালাচ্ছে। বিভিন্ন অফিসারদের মেয়ে সরবরাহ করাই তাদের প্রধান কাজ। সেই সঙ্গে নিজেরাও দল বেঁধে পাশবিক অত্যাচার করে থাকে। ২৮-এ জুনের নিউজ উইক পত্রিকা রেভারেণ্ড জন হেস্টিংস নামক একজন মেথডিস্ট মিশনারীর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন: 'আমি নিশ্চিত, সৈন্যরা মেয়েদের ক্রমাগত ধর্ষণ করেছে ও শেষে দুই পায়ের

মধ্য দিয়ে বেয়োনেট চালিয়ে তাদের হত্যা করেছে। যশোরের এক পল্লীতে জোহরা নামের এক হতভাগীরও এই পরিণতি ঘটেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি 'বাংলাদেশ : থ্রু লেন্স' শীর্ষক যে আলোকচিত্রমালা প্রকাশ করেছেন সেখানে জোহরা নাম্নী এক মহিলার মর্মস্পর্শী পরিণতির ছবি গ্রথিত হয়েছে ; সৈন্যরা ধর্ষণ করার পর তাকে হত্যা করেছে, শিয়াল কুকুর তার দেহ ভক্ষণ করছে অবশেষে। নিউজ উইকের সাংবাদিক টনি ক্লিফটন মন্তব্য করেছেন : যে কেউ ক্যাম্পে বা হাসপাতালে গেলে বিশ্বাস করবে যে, পাঞ্জাবী সেনাবাহিনী যে-কোন অত্যাচার করতে সক্ষম। আমি গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এমন বহু শিশু দেখেছি। বেত মেরে পিঠ একেবারে রক্তাক্ত করে দেওয়া হয়েছে তাও দেখেছি। চোখের সামনে নিজেদের ছেলেমেয়েদের হত্যা করা হয়েছে বা নিজের মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার হয়েছে—এসব দেখে একেবারেই মূক হয়ে গেছে এমন বহু লোকই আমি দেখেছি। আমার কোন সন্দেহ নেই যে, পূর্ব পাকিস্তানে শত শত মাই লাই ও লিডিসেস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

তিনি ইসমত আরা নামের একটি ছোট মেয়েকে হাসপাতালে দেখেছেন যার চার বোন, মা ও বি. এস-সি. পাশ ভাইকে সৈন্যরা হত্যা করেছে। ইসমত আরা ছুরির আঘাত নিয়ে মৃতের ভাণ করে কোন মতে পালিয়ে আসে। একটি চার বছরের শিশুর পেটে গুলি করা হয়, সে আগরতলা হাসপাতালে কোন মতে বেঁচে ছিল। আর একজন মহিলার সামনে তার দুটি ছেলেমেয়েকে হত্যা করা হয়, ছোট বাচ্চাটির পিছনে গুলি লাগে এবং তাঁর বাঁ হাতের মধ্য দিয়ে গুলি চলে যায়। ফলে তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। জ্ঞান ফিরে পেয়ে সেই অবস্থাতেই তিনি সীমান্তে চলে আসেন। আর একজন মহিলা গুলি খাওয়ার পর তাঁর গর্ভের সন্তানের আগাম জন্ম দেন। সেই অবস্থাতেই তিনি অনেক কষ্টে সীমান্তে চলে আসেন। আরো দুটি ছেলের কথা বলেছেন তিনি যাদের চোখের সামনে সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। তারা এমনই ত্রাসিত যে, কোন অবস্থাতেই একজন আর একজনের হাত ছেড়ে দেয় না। তারা কথা বলতে ভুলে গেছে।

স্টেটসম্যান পত্রিকার ১২ই জুন সংখ্যায় ঢাকা থেকে আগত একজন প্রখ্যাত সাংবাদিকের জবানবন্দী ছাপানো হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন যে, ঢাকায় সামরিক অফিসাররা বিশেষ করে বুদ্ধিজীবীদের ঘরের মেয়েদের প্রতি বেশী

আকৃষ্ট হচ্ছে। তারা ইচ্ছামত যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে নিজেদের কাছে রেখে দেয়।

পাকিস্তানী সৈন্যরা আর একটি অভাবিত উপায়ে বাঙালীদের হত্যা করছে। উপরে উল্লিখিত ঢাকার সাংবাদিক আরও জানিয়েছেন যে, প্রতিদিনই ঢাকার বিভিন্ন এলাকা থেকে কম পক্ষে ৩০০ যুবককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয় ক্যান্টনমেন্টে, তারপর তাদের দেহ থেকে রক্ত বার করে তাদেরকে বেয়োনেট দিয়ে মেরে ফেলা হয় বা সেই অবস্থাতেই নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। ঢাকার বুড়িগঙ্গা তার নীরব সাক্ষী। প্রতিদিন পিছনে হাত পা বাঁধা ১৫-২০টি মৃতদেহ এক সঙ্গে ভেসে ভেসে আসছে দেখা যায়। কূটনৈতিক মহলের অনেকেই সাহস করে এই দৃশ্য দেখেছেন। তারপর থেকে সামরিক কর্তারা সাবধান হয়ে গেছেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, লাশগুলো ক্যান্টনমেন্টের গলফ খেলার মাঠের মধ্যেই একসঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়। ২৩-এ মে'র স্টেটসম্যান আরোও বলেছেন যে, ১৭ই মে ঢাকায় গেরিলা কার্যকলাপ হলে সেনাবাহিনী হত্যা করার উন্মত্ততায় ৫০০০ বেসমারিক লোককে ধরে নিয়ে তাদের রক্ত বার করে নেয়। বস্তুত এই ঘটনার পুনরানুবৃত্তি বাংলাদেশের সব জায়গাতেই হয়েছে ও হচ্ছে।

সেনাবাহিনী ট্যাঙ্ক, কামান ইত্যাদি ব্যবহার করার সময় বিমান থেকে প্রচুর বোমা বর্ষণ করেছে ও মেশিনগানের গুলি ছুঁড়েছে। বোমাবর্ষণ নির্বিচারে তারা চালিয়ে গেছে।

৩রা এপ্রিল চারটি স্যাবর জেট বোম্বার চুয়াডাঙ্গার প্রতি ইঞ্চি জায়গার উপর বোমা ফেলে। নূরনগর গ্রামের ওপর চারটি নাপাম বোমা ফেলা হয়। আটপাড়া গ্রামও বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একই সঙ্গে খুলনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, যশোর, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উপর বোমা বর্ষণ করা হয়। ফলে বহু নিরস্ত্র লোক নিহত হয়। (১লা, ৩রা ও ৪ঠা এপ্রিল, স্টেটসম্যান, ১৯৭১)। সিলেট-সহ উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জায়গায় পাকিস্তান বিমান বাহিনী নাপাম বোমা বর্ষণ করে (স্টেটসম্যান, ৯ই এপ্রিল)। ১৬ই এপ্রিলের টাইমস অফ ইণ্ডিয়া-অনুসারে ঐদিন সকাল সাড়ে নটায় আধঘন্টা ধরে স্যাবর জেট চুয়াডাঙ্গা শহরের উপর বোমা ফেলে। কম পক্ষে ২০টি নাপাম বোমা বর্ষণ করা হয়েছে। ফলে বেসামরিক ভবনাদি, ঘরবাড়ি, স্কুল, ব্যাঙ্ক, নতুন তৈরী একটি হাসপাতাল, আওয়ামী লীগ অফিস প্রভৃতি ধূলিস্যাৎ

হয়ে যায়। জেট থেকে ক্রমাগত গুলি ছোঁড়া হয়। তাতে কমপক্ষে ১৫০ জন অসামরিক লোক প্রাণ হারায়। আশপাশের গ্রামেও বোমা ফেলা হয়েছে। ফলে কম করে ২০টি গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

লাকসামের কাছে জনাকীর্ণ নয়াহাটি বাজারেও ৬ই এপ্রিল বোমা বর্ষণ করা হয়। ফলে ২০০ লোক নিহত ও বহু লোক আহত হয় (স্টেটসম্যান, ৭ই এপ্রিল, ১৯৭১)। আটাইকুলা গ্রামের উপরও হঠাৎ পাকিস্তান বিমান বাহিনী বোমা বর্ষণ করে। ঘরবাড়ি ছেড়ে যে-সব শরণার্থী সীমান্তের দিকে ক্রমাগত চলেছে তাদের উপরও বোমা ও গুলির সাহায্যে আক্রমণ চালানো হচ্ছে (স্টেটসম্যান, এপ্রিল ১৪)। জামালপুর ও মৈমনসিংহের বিস্তীর্ণ অংশেও বোমা বর্ষণ করা হয় ও বিমান থেকে গুলি ছোঁড়া হয়। ফলে ৭০০ গ্রামবাসী মারা যায়। টাইম পত্রিকার ২৬-এ এপ্রিল সংখ্যায় একটি রিকশার উপর বোমা বর্ষণের ফলে যাত্রী ও চালক নিহত হয়ে পড়ে আছে—এমনই একটি ছবি ছাপানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে স্বীকার করা হয়েছে যে, ট্যাঙ্ক ও জেট প্লেন বাংলাদেশে ব্যবহার করা হয়েছে (এসোসিয়েটেড প্রেস সংবাদ : স্টেটসম্যান, ৬ই মে, ১৯৭১)।

এ ছাড়া ফেণী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলেও বোমা বর্ষণ করা হয়। এই সব নির্বিচার বোমা বর্ষণের ফলে সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি, হাটবাজার, স্কুল-কলেজ, মন্দির, মসজিদ ও অন্যান্য ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে, বেসামরিক বহু লোক নিহত ও আহত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নাপাম বোমা থেকে যে মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাস বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তা জেলী-ধরনের এবং শরীরের কোন অংশে লেগে গেলে তা কোনমতেই ছাড়ানো যায় না, শরীরের চামড়া ও মাংস জ্বলে পুড়ে খসে যায়। নাপাম বোমার ব্যবহার যুদ্ধে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং একমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের বোমা তৈরী করে থাকে।

আমরা আগেই জেনেছি সেনাবাহিনী সর্বত্র জ্বালিয়ে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে। আরো কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

কুমিল্লা ও চাঁদপুরের মধ্যবর্তী রেলপথের দুধারের সমস্ত গ্রাম সেনাবাহিনী জ্বালিয়ে দিয়েছে। মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মাণিকগঞ্জ মহকুমার ৯টি গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে ৩০০০ লোক মারা গেছে। সিলেটের একটি

গ্রামে একটি পরিবারের সবাইকে মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করা হয়, পরিবারের কর্তা একজন স্কুল শিক্ষককে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয় (স্টেটসম্যান, মে ২৩, ১৯৭১)। ত্রিপুরার লঙ্কাকুরা ও ফকিরাটুয়া গ্রামের বিপরীতে বাংলাদেশের এলাকায় কতকগুলো গ্রাম পাকিস্তান সেনাবাহিনী জ্বালিয়ে দেয়, বহু গ্রামবাসী মারা যায়।

লণ্ডন টাইমস পত্রিকার (৫ই জুন) প্রতিনিধি পিটার হ্যাজেলহার্স্ট জানিয়েছেন, 'হাসনাবাদে কুষ্টিয়া জেলা থেকে পালিয়ে আসা হিন্দু শরণার্থীদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তারা বলেছে, সেনাবাহিনী গ্রামের ভেতর দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের গ্রামগুলো জ্বালিয়ে দিয়েছে···এরা খুব সরল চাষী, প্রচারের মূল্য বোঝার ক্ষমতা এদের নেই। কুষ্টিয়ার একজন মজুর আমাকে বলল যে, মাঠে পালিয়ে থাকার সময় তারা দেখল যে, সৈন্যরা তাদের বাড়িগুলো সব জ্বালিয়ে দিচ্ছে।'

সৈন্যদের বর্বরতা সম্পর্কে ৭ই জুনের আইরিশ টাইমস পত্রিকায় বলা হয়েছে, শরণার্থী শিবিরে শরণার্থীদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। কারণ তাদের সেই একই কাহিনী—সৈন্যরা এল, হত্যা ও ধ্বংস, তারা পালিয়ে এল···জানা গেছে কোন এক জায়গায় ২০০০ লোককে তাদের স্ত্রীপুত্রদের কাছ থেকে আলাদা করে তাদের উপর মেশিনগান চালায়। ৮০০ লোক সঙ্গে সঙ্গেই মারা যায়। অন্যরা মৃতের ভাণ করে। কিন্তু তখন সৈন্যরা দেহগুলো এক জায়গায় জড়ো করে তাদের উপর পেট্রোল ছড়িয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় দেহে আগুন নিয়েই অনেকে পালিয়ে যায়। একজন ধর্মযাজক ছাদের উপর থেকে অসহায় ভাবে দেখেন যে তাঁর স্কুলের ছাত্রদের সৈন্যরা গুলি করে মেরে ফেলছে। ২৬-এ মে'র টাইমস পত্রিকায় পিটার হ্যাজেলহার্স্ট লিখেছেন যে, যখন গতকাল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর তথাকথিত নিশ্চয়তা প্রদান করছিলেন তখনই ভারতের দিকে যে-সব নিরস্ত্র মহিলা ও শিশু নৌকায় করে ইছামতী নদী পার হয়ে চলে আসছিল তাদের উপর মেশিনগান থেকে গুলি করা হয়। অসংখ্য লোক গুলিতে ও পানিতে ডুবে মারা যায়। ২৭-এ মে'র গার্ডিয়ান পত্রিকা লিখেছেন যে, ভারতে আসার সময় ৪০০ শরণার্থীকে ঘিরে ফেলে গুলি করা হয় যাতে তারা তাদের কাহিনী ভারতে না নিয়ে যেতে পারে। স্টেটসম্যানের ২০-এ

এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত খবরে জানা গেছে যে, আদমজী জুট মিলে ৩০,০০০ শ্রমিক কাজে ফিরে এলে সৈন্যরা তাদের অনেককে এক নাগাড়ে মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করে শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলে দেয়। ২০-এ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গায় একটি রেশনের দোকান থেকে চাল ডাল নেওয়ার জন্য বেশ কিছু লোককে আদেশ দেওয়া হয়। খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সেই সব লোক যখন ফিরে আসছিল তখনই সেনাবাহিনী তাদের উপর মেশিনগান চালায়। ফলে কমপক্ষে ১০০ লোক মারা যায়। দি টাইমস পত্রিকায় একটি সংবাদ ৪ঠা জুলাইয়ের স্টেটসম্যানে ছাপানো হয়। ঢাকার কাছে সুন্দরী, বালিয়াদি, রাঙানগর, টেকের বাড়ি প্রভৃতি গ্রামগুলো সেনাবাহিনী জ্বালিয়ে দেয় ও বহুলোককে গুলি করে হত্যা করে। আগুন লাগা ঘর থেকে যখনই লোক পালাবার চেষ্টা করেছে তখনই সেনাবাহিনী গুলি ছুঁড়ে তাদের হত্যা করার চেষ্টা করেছে। হিন্দু গ্রামের উপর সেনাবাহিনী প্রায়ই আক্রমণ চালিয়েছে।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি ধ্বংস করার জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করছে, বাংলাদেশের সর্বত্র উর্দু'র ব্যবহার চালু করছে।

ইতিমধ্যে বহু কনসেনট্রেশন ক্যাম্প তারা প্রতিষ্ঠা করেছে। সেখানে বহু নরনারীকে অমানুষিক অবস্থায় বিনা বিচারে আটক করে রেখেছে। মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা হচ্ছে সবসময়। আটক করা লোকদের মধ্য থেকে যখন যাকে খুশী হত্যা করা হচ্ছে। তাদের উপর নানা পৈশাচিক অত্যাচারও করা হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাঁর বিচারের একটি প্রহসন করছে ইয়াহিয়া খান। বলা হয়েছে যে, তিনি পাকিস্তানী আইনজীবী ছাড়া কোন বিদেশী আইনজীবীর সাহায্য নিতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রেও ইয়াহিয়া খান বেআইনী পথ যে অনুসরণ করবে তা আর বিচিত্র কি! ইয়াহিয়া খানদের অন্যায় ও অত্যাচারের কাহিনীর শেষ নেই। প্রতিষ্ঠিত কোন আইনই তারা মানে নি, মানছে না। দিনের পর দিন সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র এনে সংঘর্ষের পরিসর বৃদ্ধি করছে।

সামগ্রিক বিচারে ইয়াহিয়া খান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা বিমান ও নৌবাহিনী ব্যবহারের সংশ্লিষ্ট সমস্ত আইন ভঙ্গ করেছে, জাতিসংঘের সনদ পদদলিত

করেছে, ১৯৪৮ সালের গণহত্যা চুক্তিসভাপত্র অমান্য করেছে, ১৯৪৯ সালের চারটি চুক্তিসভাপত্রও অগ্রাহ্য করেছে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক নয় এমন এক সশস্ত্র সংঘর্ষকালে যে-সমস্ত নিয়ম মানতে প্রতিটি রাষ্ট্র বাধ্য তা তারা অমান্য করেছে, সেই একই আইনানুসারে শেখ মুজিব-সহ বহু নিরপরাধ লোকের যথাযথ বিচার পাওয়ার অধিকার তারা হরণ করেছে, সংঘর্ষকালে ত্রাণকার্য সম্পর্কিত আইনকানুন গ্রাহ্যই করে নি এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ সম্পর্কিত আইনও তারা ভঙ্গ করেছে।

তারা জাতিগত, জাতীয়তাগত, ভাষাগত, ধর্মগত, সংস্কৃতিগত, গোত্রগত, ভেদ নীতি গ্রহণ করে অসামরিক নরনারীকে হত্যা করছে, অসামরিক জনসাধারণের সম্পত্তি বিনষ্ট করছে ও একটি জাতির সমস্ত অস্তিত্ব ধ্বংস করছে। আইনের চোখে তারা গণহত্যার জন্য, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য, সংঘর্ষকালে মান্য আইনকানুন অগ্রাহ্য করার জন্য ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রথাগত ও আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করার জন্য অপরাধী। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের বিচার হওয়া উচিত। জাতিসংঘ সনদে দত্ত অধিকার বলে বিভিন্ন রাষ্ট্র সংঘবদ্ধভাবে বা এককভাবে এবং জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল ব্যক্তিগতভাবে বাংলাদেশে মৌলিক মানবাধিকার হরণ ও গণহত্যার ব্যাপারে সরাসরি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন এবং তাঁদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে সেই পথে দ্রুত অগ্রসর হওয়া। পৃথিবীর প্রতিটি শান্তিকামী, বিবেকবান মানুষের কর্তব্য দুষ্টের দমন করে শিষ্টের নিরাপত্তা বিধান করা।

ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে, ক্ষমতাগর্বী, অন্যায়কারী সব সময়ই আত্মধ্বংসী নীতি গ্রহণ করে পৃথিবীর নিরপরাধ মানুষের দুর্দশার কারণ হয়, নিজেও ধ্বংস হয়ে যায়। হিটলারের মতো বহু অমানুষেরই শেষ পরিণতি এই। ইয়াহিয়া খানরাও ইতিহাসের হাত থেকে রক্ষা পাবে না।

আঁধার সরে যাবে, আলোর বন্যায় ছেয়ে যাবে দেশ—বাংলাদেশের মানুষ সেই নিশ্চিত আশা নিয়েই সংগ্রাম করছে।

পরিশিষ্ট

ঘটনাপঞ্জী

সংকলন : ফেরদৌসী মজুমদার

ডিসেম্বর, ১৯৭০

৭ জাতীয় পরিষদের নির্বাচন। সারা দেশে ২৯০টি আসনের জন্যে ১৫৪৭ জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বাংলাদেশের বাত্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে জাতীয় পরিষদের ৯টি ও প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি আসনের নির্বাচন স্থগিত।

৮ প্রাথমিক ফলাফলে সারা পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন। পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির সর্বাধিক সংখ্যক আসন লাভ। বাংলাদেশে ২টি আসন ছাড়া বাকী সব আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিজয়।

৯ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিপ্রধান মওলানা ভাসানী-কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রশ্নে গণভোট গ্রহণের জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে আহ্বান।

১১ নির্বাচনে দলগত সাফল্যের জন্যে আওয়ামী লীগপ্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টিপ্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার অভিনন্দন বাণী প্রেরণ।

১২ চট্টগ্রামের দুর্গত এলাকা সফরকালে এক জনসভায় শেখ মুজিবের ঘোষণা —শাসনতন্ত্র ৬-দফার ভিত্তিতেই প্রণীত হবে।

১৩ নির্বাচনে ভরাডুবির পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খানপন্থী কনভেনশন মুসলিম লীগপ্রধান ফজলুল কাদের চৌধুরীর পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১৪ ইয়াহিয়ার অভিনন্দন বাণীর জবাবে মুজিবের উক্তি—একমাত্র ৬-দফা ভিত্তিক একটি শাসনতন্ত্রই বিভিন্ন এলাকার মধ্যে ন্যায্য অধিকার ও মানুষে মানুষে সাম্য নিশ্চিত করবে।

পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের জন্যে মুজিব-কর্তৃক ভুট্টোর কাছে অভিনন্দন বার্তা প্রেরণ।

জামাতে ইসলামপন্থী কেন্দ্রীয় তথ্য মন্ত্রী নওয়াবজাদা শের আলী খানের পদত্যাগ।

১৫ ১৭ই জানুয়ারী বাংলাদেশের দুর্গত এলাকায় নির্বাচন—এ মর্মে নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা।

১৭ দেশব্যাপী প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন। বিভিন্ন প্রাদেশিক পরিষদের ৫৭৯টি আসনের জন্যে ৪৫৫৪ জনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বাংলাদেশের দুর্গত এলাকার প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি আসনের নির্বাচন স্থগিত।

১৯ বাংলাদেশ প্রাদেশিক পরিষদের জন্যে অনুষ্ঠিত ২৭৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের ২৬৮টি আসন লাভ। বাকী ১১টি আসনের মধ্যে নিরপেক্ষ ৬টি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি ২টি, নেজামে ইসলাম ১টি, জামাতে ইসলাম ১টি ও মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ১টি আসন লাভ।

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করানোর জন্যে শেখ মুজিব-কর্তৃক জনগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন সম্পর্কে পুনরুক্তি।

বাংলাদেশের দুর্গত অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্যে দেশী ও বিদেশী যত সাহায্য পাওয়া গেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের জন্যে সরকারের কাছে শেখ মুজিবের দাবী।

২০ তাঁর দলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকরী হ'তে পারবে না বলে ভুট্টার উক্তি। তাঁর মতে 'পাঞ্জাব ও সিন্ধুই সকল ক্ষমতার উৎস।'

২১ আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে সক্ষম—বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিনের ঘোষণা। এ প্রসঙ্গে ভুট্টোর দম্ভোক্তির জবাবে তাজউদ্দিনের এ উক্তি।

২২ বিভিন্ন অঞ্চলের সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক সুবিচার একান্ত প্রয়োজনীয় বলে ভুট্টোর অভিমত।

পাবনার আওয়ামী লীগ দলীয় নব নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য আহ্মদ রফিক আততায়ী-কর্তৃক নিহত।

২৫ কায়দে আজমের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক বাণীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উক্তি—জাতি এক নতুন উৎসাহে এবার জাতির পিতার জন্মবার্ষিকী পালন করছে। জাতি গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি চরম আনুগত্য প্রদর্শন করেছে এবং প্রজ্ঞার প্রমাণ দিয়েছে।

রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে তথাকথিত বিপ্লবীদের চরম উস্কানির মুখেও জনগণকে শান্ত থাকার জন্যে পাবনায় এক জনসভায় বক্তৃতা দান কালে শেখ মুজিবের আহ্বান।

২৬ করাচীতে মওলানা মহম্মদ আলী জওহর পার্কে এক জনসভায় বক্তৃতা-দান কালে জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, দেশের সব অঞ্চলের আশা আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হবে এমন একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়নে তাঁর দল সর্বতো-ভাবে সহায়তা করবে। তাঁর দলের পক্ষ থেকে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে কোন বাধা আসবে না বলে তিনি আশ্বাস দেন। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি যে কলোনী-সুলভ ব্যবহার করা হয়ে আসছে তার অবসান না ঘটলে দেশের দু' অংশ এক সঙ্গে থাকতে পারবে না—এ কথা পিপলস্ পার্টির গঠনতন্ত্রে লিখিত রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ভুট্টো বলেন, তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে শ্রদ্ধা করবে এবং তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে চলবে।

২৭ শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার জন্যে জানুয়ারীর প্রথম দিকে তিনি ঢাকা যাচ্ছেন—করাচীতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টো এ তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, তাঁরা সরকারে পূর্ব পাকিস্তানী সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে স্বাগত জানান এবং সে সরকারের উপর তাঁদের আস্থা রয়েছে।

২৮ করাচীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভুট্টোর বৈঠক। আলোচনা অত্যন্ত কার্যকরী ও গঠনমূলক বলে ভুট্টোর অভিমত।

৩০ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ঢাকাতে অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

জানুয়ারী, ১৯৭১

১ পাকিস্তানের নয়া আমদানি নীতিতে বাংলাদেশের ব্যাণিজ্যিক মহলে নৈরাশ্য।

২ ভুট্টোর দূত পাঞ্জাব পিপলস্ পার্টির সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তাফা খানের শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

৩ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনতার সামনে আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত ১৫১ জন এম. এন. এ. ও ২৬৭ জন এম. পি. এর শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের জন্যে শপথ গ্রহণ। সে সমাবেশে ভাষণদানকালে ঘোষণা করেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে পূর্ব প্রতিশ্রুতি-অনুযায়ী সমাজ-তান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করবে এবং ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা ও পাট ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করা হবে। তিনি পুনর্বার বলেন, ৬- ও ১১-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচিত হবে। অবাঙালী উদ্বাস্তুদের স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যেতে বঙ্গবন্ধু আহ্বান জানান। শাসনতন্ত্র প্রণয়নে পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দের সহায়তা চাওয়া হবে বলে তিনি জানান।

৪ ছাত্রলীগের ২৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত রমনা পার্কে এক ছাত্র-জন-সমাবেশে শেখ মুজিব নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাংলার ইতিহাস নতুন করে লেখার জন্যে বুদ্ধিজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান। এতে করে বাঙালীর উত্তরাধিকার সম্পর্কে ভবিষ্যত বংশধররা জানতে পারবে বলে তিনি অভিমত পোষণ করেন। বাংলাদেশে নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রয়োজন মত পরিবর্তনের ঘৃণ্য মনোবৃত্তির তিনি সমালোচনা করেন।

৬ শেখ মুজিবের সঙ্গে শীগ্গিরই তিনি সাক্ষাৎ করবেন বলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার তথ্য প্রকাশ।

৭ শেখ মুজিবের বাসভবনে আততায়ী সন্দেহে ছোরাসহ এক যুবক ধৃত।

৯ শেখ মুজিবের প্রাণনাশের চেষ্টা বিফল হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করে ইয়াহিয়ার বাণী প্রেরণ।

১০ পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের হয়ে কথা বলার অধিকার আছে বলে ভুট্টোর মন্তব্য।

চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ দলীয় নব নির্বাচিত এম. এন. এ. এম. এ. আজিজের প্রাণত্যাগ।

১১ শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়ার ঢাকা উপস্থিতি। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে আশাবাদী বলে বিমানবন্দরে ইয়াহিয়ার অভিমত।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল সফর সংক্ষিপ্ত করে মুজিবের ঢাকা উপস্থিতি।

প্রাথমিক আলাপ আলোচনার জন্যে মুজিব-ইয়াহিয়া রুদ্ধদ্বার বৈঠক।

১৩ তিনঘণ্টা ব্যাপী ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মুশতাক আহমেদ, মনসুর আলী, তাজউদ্দিন আহমেদ ও কামরুজ্জামান আলোচনায় মুজিবের সঙ্গী। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মুজিবের তথ্য প্রকাশ।

সামনের সপ্তাহে তিনি মুজিবের সঙ্গে দেখা করবেন বলে রাওয়ালপিণ্ডিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টোর তথ্য প্রকাশ।

১৪ করাচী যাত্রার প্রাক্কালে ঢাকা বিমানবন্দরে শেখ মুজিবকে দেশের ভাবী প্রধান মন্ত্রী বলে ইয়াহিয়ার উল্লেখ। আলোচনা সন্তোষজনক বলে অভিমত প্রকাশ। "যখন তিনি (শেখ মুজিব) ক্ষমতা গ্রহণ করবেন, তখন আমি আর থাকব না। শীগ্‌গিরই এটা তাঁর সরকার হ'তে চলেছে"- সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ইয়াহিয়ার উক্তি।

১৭ বাংলাদেশের দুর্গত অঞ্চলে স্থগিত কৃত জাতীয় পরিষদের ৯টি ও প্রাদেশিক পরিষদের ২১টি আসনের নির্বাচন।

লারকানায় ভুট্টোর বাসভবন 'আল-মুর্তাজা'য় ইয়াহিয়া-ভুট্টো দীর্ঘ বৈঠক। আলোচনার বিবরণ সাধারণ্যে অপ্রকাশিত।

কেন তিনি শেখ মুজিবকে ভাবী প্রধান মন্ত্রী বলেছেন, এ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হ'লে ইয়াহিয়া সাংবাদিকদের বলেন—'পার্লামেন্টারি পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠদলের নেতাই সাধারণত প্রধান মন্ত্রী হয়ে থাকেন। সে জন্যেই মুজিবের দেশের প্রধান মন্ত্রী হবার যৌক্তিকতা রয়েছে।'

১৮ গত কালকের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সব ক'টি আসনে আওয়ামী লীগ দলীয় প্রার্থীর জয়লাভ।

২২ সত্যিকার একটি ফেডারেশান গঠনের প্রশ্নে তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে একমত বলে ভুট্টোর উক্তি।

২৪ ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনষ্টিটিউটে সঙ্গীত শিল্পিগণ-কর্তৃক তাঁর সম্মানার্থে আয়োজিত এক সমাবেশে শেখ মুজিব শিল্পীদের লক্ষ্য করে বলেন,

আপনারা এতদিন সুখ দুঃখের গান গেয়েছেন। এবার বিপ্লবের গান গাইতে হবে। আইয়ুব খানের আমলে রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সাহিত্যের উপর নিষেধাজ্ঞা সমর্থন করে যে-সব শিল্পী-সাহিত্যিক বিবৃতি দিয়েছিলেন, শেখ মুজিব তাঁদের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি সংস্কৃতি বিকৃতির প্রচেষ্টারও নিন্দা করেন।

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন-কর্তৃক বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থান দিবস পালন।

২৬ গভর্নর আহ্সানের সঙ্গে শেখ মুজিবের সাক্ষাৎ।

২৭ ভুট্টোর ঢাকা আগমন। সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা রয়েছে বলে বিমানবন্দরে অভিমত প্রকাশ। শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ঐক্যমতের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ। বিমানবন্দর থেকে সোজা শহীদ মিনারে গমন ও ভাষা আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন।

শেখ মুজিবের বাসভবনে ৭৫ মিনিট ব্যাপী শেখ-ভুট্টো রুদ্ধদ্বার বৈঠক। শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি সুখী ও সম্মানিত বোধ করছেন বলে ভুট্টোর অভিমত।

২৮ ভুট্টোর হোটেল কক্ষে ৭০ মিনিট ব্যাপী মুজিব-ভুট্টো আলোচনা। আলাদা ভাবে দলীয় নেতাদের মধ্যে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা।

২৯ মুজিব-ভুট্টো তৃতীয় দফা বৈঠক। একটি গণমুখী শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে তিনি সবরকমে সহায়তা করবেন বলে ভুট্টোর উক্তি।

শেখ মুজিব অন্যান্য দল ও অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় ইচ্ছুক বলে তথ্য প্রকাশ। সবাইকে ঢাকা এসে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করার জন্যে শেখ মুজিবের সাদর আহ্বান।

ঘূর্ণীঝড়ের ৭৭ দিন পর সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার যোগে ভুট্টোর প্রথমবারের মতো উপদ্রুত অঞ্চল সফর।

৩০ ভুট্টোর সাংবাদিক সম্মেলন। আইনগতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারেন, তবে একটি ফেডারেশানে ঐক্যমত ছাড়া শাসনতন্ত্র অকেজো হয়ে পড়বে বলে ভুট্টোর অভিমত। পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তিনি আলোচনা করবেন বলে তথ্য প্রকাশ।

এম. এল. নাবিক যোগে ৫ ঘণ্টা ব্যাপী মুজিব ও ভুট্টোর নৌ-বিহার।

তথাকথিত কাশ্মীরী মুক্তিযোদ্ধাদ্বয়-কর্তৃক ভারতীয় বিমান 'গঙ্গা' জোর করে লাহোরে আনয়ন।

৩১ ভুট্টোর লাহোরে উপস্থিতি। বিমানবন্দরে বিমান অপহরণকারীদের সঙ্গে ভুট্টোর অন্তরঙ্গ আলোচনা।

ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১

১ লাহোরে কাউন্সিল মুসলিম লীগপ্রধান দওলতানার সঙ্গে ভুট্টোর বৈঠক। ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে পাঞ্জাব কাউন্সিল মুসলিম লীগ সভাপতি শওকত হায়াত খানের সাক্ষাৎ। আরো দু'জন পশ্চিম পাকিস্তানী নিরপেক্ষ এম. এন. এ.র মুজিবের সঙ্গে আলোচনা।

২ লাহোরে অপহৃত ভারতীয় বিমান 'গঙ্গা' ধ্বংস।

৩ ভারতীয় এলাকার উপর দিয়ে পাকিস্তানী সামরিক বিমান চলাচলের উপর ভারত সরকারের নিষেধাজ্ঞা জারী। ভারতীয় বিমান ধ্বংস-সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্যে শেখ মুজিবের দাবী। এ ঘটনার সুযোগ নিয়ে স্বার্থান্বেষী মহল যাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বিঘ্নিত না করতে পারে সে সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকার জন্যে দেশবাসীর প্রতি শেখ মুজিবের সতর্ক-বাণী। বিমান ধ্বংসের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের কোন দায়িত্ব নেই বলে ভুট্টোর অভিমত।

করাচীতে ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভুট্টোর সাক্ষাৎ।

শেখ মুজিবের বাসভবনে তাঁর সঙ্গে চীন, নেপাল ও পোলাণ্ডের রাষ্ট্র দূতত্রয়ের পৃথক পৃথক ভাবে সাক্ষাৎ।

৪ ভারতের উপর দিয়ে সব পাকিস্তানী বিমানের চলাচল ভারত সরকার-কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা।

মুজিবের সঙ্গে পাকিস্তানে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়া ও জাপানের রাষ্ট্রদূতদ্বয়ের সাক্ষাৎ।

৯ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানে বিলম্বের জন্যে শেখ মুজিবের উদ্বেগ প্রকাশ।

১০ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব করছেন বলে মুলতানে এক সভায় বক্তৃতা দানকালে ভুট্টোর অভিযোগ।

৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে সরকার ও শেখ মুজিবের মধ্যে 'যোগসাজস' রয়েছে বলেও তাঁর অভিযোগ। যদি ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণীত হয় তবে তিনি তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করবেন বলে হুমকি প্রদর্শন।

১১ ভুট্টো-কর্তৃক মুলতানের বক্তৃতা অস্বীকার। কতিপয় দেশী ও বিদেশী শক্তি পাকিস্তানের দু'টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টির চেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে বলে ভুট্টোর অভিযোগ।

১৩ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া-কর্তৃক ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান।

শেখ মুজিবের সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ।

কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগপ্রধান আবদুল কাইয়ুম খানের সঙ্গে ভুট্টোর বৈঠক।

১৪ নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহক পরিষদের সভায় ৬-দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পুনঃসংকল্প ঘোষণা।

এখন পর্যন্ত দেশবাসীকে দেওয়া সব প্রতিশ্রুতি পালনের জন্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহ্‌মদ-কর্তৃক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রশংসা।

১৫ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নবনির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের এক যুগ্ম অধিবেশনে শেখ মুজিবের ঘোষণা—একমাত্র ৬- ও ১১-দফার ভিত্তিতে রচিত শাসনতন্ত্রই সুখী ও শক্তিশালী পাকিস্তান গড়ে তুলতে পারে।

৬-দফার প্রশ্নে কোন আপোষ মীমাংসার সম্ভাবনা না থাকাতে তাঁর দলের পক্ষে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করা সম্ভবপর হবে না বলে পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভুট্টোর ঘোষণা। তবে ৬-দফায় কোন রদবদল বা আপোষের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'লে তাঁরা যে-কোন দিন ঢাকা যেতে পারেন বলে অভিমত প্রকাশ।

ভুট্টোর এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে শেখ মুজিবের অস্বীকৃতি।

বাংলা অ্যাকাডেমী আয়োজিত শহীদ-স্মরণ সপ্তাহের উদ্বোধন কালে শেখ মুজিবের ঘোষণা—সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করা হবে।

১৬ মুজিব জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা নির্বাচিত। প্রাদেশিক পরিষদে মনসুর আলী।

১৭ বাংলাদেশের ছাত্র, শ্রমিক, জনতা আজ মরতে শিখেছে। দুনিয়ায় কোন শক্তি নেই বাঙালীকে আর শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে—শহীদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে মুজিবের ঘোষণা।

মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের সিদ্ধান্ত।

ভুট্টোর সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের দুই অংশকে আলাদা করার উদ্দেশ্য নিয়েই গ্রহণ করা হয়েছে বলে বালুচ নেতা নওয়াব আকবর খান বুগ্‌তির মন্তব্য।

১৮ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জরুরী বার্তা পেয়ে ভুট্টোর পিণ্ডি যাত্রা।

মুজিবের সঙ্গে এয়ার মার্শাল (অবসরপ্রাপ্ত) নূর খান ও সিন্ধি নেতা জি. এম. সৈয়দের সাক্ষাৎ।

ঢাকায় জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থার অফিসে বোমা বিস্ফোরণ।

১৯ পিণ্ডিতে ৫ ঘণ্টা ব্যাপী ভুট্টো-ইয়াহিয়া আলোচনা।

সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতীয় পরিষদে উত্তম শাসনতন্ত্র রচিত হ'তে পারে বলে মুজিবের সঙ্গে আলোচনা শেষে নূর খানের মন্তব্য।

২০ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রশ্নে পিপলস্‌ পার্টি-কর্তৃক ভুট্টোকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান। পার্টির নির্বাচিত সদস্যরা পদত্যাগ করতে প্রস্তুত বলে অভিমত প্রকাশ।

২১ অন্যান্যবারের চেয়ে অধিকতর তাৎপর্যের সঙ্গে বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে শহীদ দিবস পালন।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের পূর্বে সব দলের নেতাদের প্রতি ৬-দফা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্যে শেখ মুজিবের সাদর আহ্বান।

২২ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বাতিল। গভর্ণর ও সামরিক আইন প্রশাসকদের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বিশেষ বৈঠক।

কাইয়ুমপন্থী মুসলিম লীগের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে অস্বীকৃতি।

২৩ মুজিবের সঙ্গে সোভিয়েত কনসাল জেনারেলের সাক্ষাৎ।

২৪ জনগণের বিজয় বানচাল করায় ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্যে পাকিস্তানের নির্যাতিত মানুষ ও বাংলাদেশের জাগ্রত জনতার প্রতি শেখ মুজিবের আহ্বান। পশ্চিম পাকিস্তানের ইউনিটগুলো কতটা স্বায়ত্ত-শাসন গ্রহণ করবে, তা নির্ধারিত করার অধিকার তাদের রয়েছে বলে মুজিবের অভিমত।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে কাউন্সিল মুসলিম লীগের অস্বীকৃতি।

২৫ যেভাবেই হোক্ একটা শাসনতন্ত্র প্রণীত হবে বলে ভুট্টোর আশাবাদ।

২৬ শেখ মুজিবরের বাসভবনে তাঁর সঙ্গে বাংলাদেশের গভর্নর আহ্সানের ৩০ মিনিট ব্যাপী আলোচনা। ইয়াহিয়ার কাছ থেকে শেখ সাহেবের জন্যে আন্তরিক শুভেচ্ছা বয়ে নিয়ে এসেছেন বলে গভর্নরের মন্তব্য।

ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভুট্টোর সাক্ষাৎ ও একত্রে দ্বিপ্রাহরিক ভোজ।

২৭ দলের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী পার্টির সামনে আওয়ামী লীগের খসড়া শাসনতন্ত্র পেশ।

এ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৬টি দলের ৩৩ জন সদস্যের জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে সম্মতি।

পরিষদের অভ্যন্তরে কোন অচলাবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর বলে ভুট্টোর অভিমত।

২৮ ভুট্টো-কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের দাবী। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্যে নির্ধারিত ১২০ দিনের সময়সীমা উঠিয়ে দিলে তাঁরা অবিলম্বে পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করতে প্রস্তুত আছেন বলে ভুট্টোর অভিমত।

মার্চ, ১৯৭১

১ ইয়াহিয়া-কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা। এ ঘোষণাকে একটি ষড়যন্ত্র বলে মুজিবের আখ্যাদান। প্রতিবাদে আগামীকাল ঢাকা শহরে ও পরশু সারা প্রদেশব্যাপী মুজিব-কর্তৃক হরতালের ডাক। বাংলাদেশের অন্যান্য নেতার সঙ্গে পরিস্থিতি

আলোচনা করবেন এবং ৭ই মার্চ তাঁর কর্মসূচী ঘোষণা করবেন বলে মুজিবের তথ্য প্রকাশ।

ইয়াহিয়ার ঘোষণার অব্যবহিত পরেই ঢাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলে দলে প্রতিবাদ মিছিল। বিক্ষোভরত জনতার উপর পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ।

রেডিও ও টেলিভিশন কেন্দ্রে সামরিক পাহারা নিয়োগ।

বাংলাদেশের গভর্নর আহ্সান পদচ্যুত। সামরিক আইন প্রশাসকের উপর প্রদেশের দায়িত্ব অর্পণ।

২ ঢাকায় ও প্রদেশের অন্যান্য কয়েকটি শহরে সর্বাত্মক হরতাল পালিত।

প্রতিবাদমুখর জনতাকে শান্ত করার জন্যে ঢাকায় ১১ ঘণ্টা ব্যাপী সান্ধ্য আইন জারী।

সামরিক বাহিনীকে ঢাকা বিমান বন্দরে প্রবেশ করতে বাধা দিলে এয়ারপোর্ট রোডে জনতার উপর গুলীবর্ষণ।

বিভিন্ন স্থানে সান্ধ্য আইন অমান্য করে মিছিল। সামরিক বাহিনীর গুলীতে প্রচুর হতাহত।

সংবাদপত্রের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে নতুন সামরিক বিধি জারী।

৩ সারা বাংলাদেশে পূর্ণ হরতাল পালিত। শেখ মুজিব-কর্তৃক ৪ দিন ব্যাপী হরতালের আহ্বান। বাংলাদেশের জনগণের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলবে বলে শেখ মুজিবের ঘোষণা। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার সঙ্গে কোন আলোচনা করার পরিবর্তে সংখ্যালঘু একটি দলের দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে বলে বঙ্গবন্ধুর অভিমত প্রকাশ। পুনরায় সান্ধ্য আইন বলবৎ।

ইয়াহিয়া-কর্তৃক ১০ই মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বিভিন্ন দলের নেতাদের এক বৈঠক আহ্বান। শেখ মুজিব কর্তৃক আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।

৪ ক্রুদ্ধ জনতার সঙ্গে সামরিক বাহিনীর সংঘর্ষে গত ২ দিনে প্রায় একশত জন নিহত ও কয়েক শত আহত হয়েছেন বলে তথ্য প্রকাশ।

রংপুর, শ্রীহট্ট, খুলনা, খালিশপুর ইত্যাদি শহরেও সান্ধ্য আইন।

নুরুল আমিন-কর্তৃকও ইয়াহিয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্যে তাঁর দল দায়ী নয় বলে ভুট্টোর উক্তি।

সামরিক বাহিনী ব্যারাকে ফিরে না গেলে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের প্রতিহত করবে বলে শেখ মুজিবের ঘোষণা।

বাংলাদেশ ব্যাপী হরতাল।

শেখ মুজিবের নির্দেশে বেতন দেওয়ার জন্যে স্টেট ব্যাঙ্ক সহ বাংলাদেশে অন্যান্য সব ব্যাঙ্কে দু' ঘণ্টার জন্যে কাজ চালু।

কেবল ঢাকা ও তার আশে-পাশেই সামরিক বাহিনীর গুলীতে ৩০০ জন নিহত ও ২,০০০ জন আহত হয়েছেন বলে শেখ মুজিবের তথ্য প্রকাশ।

ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক কয়েকটি স্থানে পাকিস্তানের পতাকা ও কায়েদে আজমের ছবি ভস্মীভূত। এক সমাবেশে বাংলাদেশের একটি নতুন পতাকা উত্তোলন।

জনগণকে শান্ত থাকার জন্যে শেখ মুজিবের আবেদনে ঢাকায় পরিস্থিতির যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে বলে সামরিক বাহিনীর প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

ইয়াহিয়ার সঙ্গে ভুট্টোর আলোচনা। বাংলাদেশে হরতাল।

ইয়াহিয়া-কর্তৃক ২৫-এ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহুত। সামরিক বাহিনী যে-কোন মূল্যে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করবে বলে ইয়াহিয়ার ঘোষণা।

অধিবেশনে যোগদানে পিপলস্ পার্টির স্বীকৃতি।

আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা। প্রতিদিন উড়োজাহাজ ও জাহাজযোগে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য এনে বাংলাদেশে পাক-সেনার ঘাঁটি মজবুত করা হচ্ছে বলে আওয়ামী লীগের অভিযোগ।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙে কয়েদীরা পালাবার সময় রক্ষীদের গুলীতে বেশ কয়েকজন কয়েদী হতাহত।

লেঃ জেনারেল টিক্কা খান বাংলাদেশের গভর্নর নিযুক্ত।

রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ। সামরিক আইন প্রত্যাহার, সেনাবাহিনীকে ছাউনিতে ফিরিয়ে নেওয়া, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর ও সাম্প্রতিক গণহত্যা-সম্পর্কে তদন্ত—এই চারটি শর্ত মানা হ'লে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের

অধিবেশনে যোগদান করতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে বিবেচনা করবে বলে মুজিবের ঘোষণা। অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ নেবার জন্যে সরকারী কর্মচারীদের প্রতি মুজিবের আহ্বান।

৮ শেখ মুজিবের আহ্বানে সারা বাংলাদেশে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু। গৃহশীর্ষে কালো পতাকা উত্তোলন, শহরে-গ্রামে সংগ্রাম কমিটি গঠন, সরকারী ও আধাসরকারী অফিস এবং আদালত বন্ধ, আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক নিয়মে চালু, সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যে কোন যোগাযোগ ব্যবস্থায় অসহযোগিতা, বাংলাদেশের ভেতর টেলিফোন ও ট্রাঙ্ককল ব্যবস্থা চালু, বিদেশে সংবাদ পাঠাবার বিশেষ ব্যবস্থা, স্বাভাবিক নিয়মে ব্যাঙ্ক চালু, বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে টাকা পয়সা প্রেরণ বন্ধ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ, সব রকমের কর প্রদান স্থগিত— এসব আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচী।

ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ সব বিচারপতি-কর্তৃক গভর্নর হিসেবে টিক্কা খানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনে অস্বীকৃতি।

৯ দু'এক দিনের মধ্যেই শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্যে তিনি ঢাকা রওয়ানা হবেন বলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণা।

ঢাকা থেকে সামরিক বাহিনীর অফিসারদের পরিবারবর্গ করাচী প্রেরণের হিড়িক।

১০ টিক্কা খান বাংলাদেশের সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত।

সম্প্রতি বিভিন্ন সংঘর্ষে শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বলে এক সরকারী ঘোষণা।

১১ বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের মানবিক অধিকারের দাবীর প্রতি কর্ণপাত করার জন্যে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের প্রতি মুজিবের আহ্বান। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও সমরসম্ভার এনে বাংলাদেশে সামরিক ঘাঁটি সুদৃঢ় করা হচ্ছে বলেও মুজিবের অভিযোগ।

১২ ঢাকার পথে ইয়াহিয়ার করাচী আগমন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্তৃক মুজিবের ৪-দফা দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর প্রাক্তন অধ্যক্ষ এয়ার

মার্শাল আসগর খান শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা শেষে করাচী এসে বলেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে দ্রুত ক্ষীয়মাণ সম্পর্কের শেষ সংযোগ হচ্ছেন শেখ মুজিব। জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা। বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর দফতর ছাড়া আর কোথাও পাকিস্তানের পতাকা তিনি দেখতে পান নি বলে তথ্য প্রকাশ।

১৩ রাজবন্দীদের মুক্ত করার জন্যে মওলানা ভাসানী-কর্তৃক জেল ভাঙার আন্দোলন শুরু করার ডাক। ইয়াহিয়া ঢাকা এলে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় রাজী আছেন বলে মুজিবের ঘোষণা।

১৪ যতদিন পর্যন্ত না বাংলাদেশের মানুষ তাদের অধিকার ফিরে না পায় এবং স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিকের মতো বাঁচতে না পারে, ততদিন পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে বলে এক সমাবেশে মুজিবের ঘোষণা।

১৫ আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবীতে শেখ মুজিব-কর্তৃক বাংলাদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ। কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে ৩৫টি বিধি জারী। বাংলাদেশের দু'টি ব্যাঙ্কে সরকারকে দেয় কর জমা দেওয়ার নির্দেশ। সব বেসরকারী, বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পুনরায় স্বাভাবিক নিয়মে চালু করার নির্দেশ।

কড়া সামরিক প্রহরাধীনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঢাকা আগমন। ২৩-এ মার্চ প্রেসিডেন্ট জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দেবেন বলে ঘোষণা।

সামরিক বাহিনীর বেসামরিক কর্মচারীদের কাজে যোগ দেওয়ার সামরিক নির্দেশের শেষ দিন অতিবাহিত। মুজিবের পরামর্শে কর্মচারীরা কাজে যোগদান থেকে বিরত।

শাসনতান্ত্রিক সমাধানের পূর্বেই যদি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হয় তবে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর দলের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে ভুট্টোর মন্তব্য।

ঢাকা এয়ারপোর্ট রোডে কতিপয় অবাঙালী-কর্তৃক আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক ও জনতার উপর গুলীবর্ষণ।

১৬ শেখ মুজিবের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী প্রথম দফার বৈঠক।

চীন থেকে আমদানিকৃত সমরাস্ত্রবাহী একটি জাহাজ থেকে মাল খালাসে চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মীদের অস্বীকৃতি।

১৭ এক ঘন্টা ধরে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা। আলোচনা অব্যাহত থাকবে বলে মুজিবের তথ্য প্রকাশ।

গত ২রা থেকে ৯ই মার্চ পর্যন্ত কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করার জন্যে সামরিক বাহিনী তলব করতে হয়েছিল, সে সম্পর্কে তদন্ত অনুষ্ঠানের জন্যে সামরিক কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক কমিশন নিয়োগ। পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও প্রাক্তন আইনমন্ত্রী এ. আর. কর্ণেলিয়াশের ঢাকা অবস্থান এবং ভুট্টো ও প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানকে ঢাকা আসার জন্যে প্রেসিডেন্টের জরুরী বার্তা প্রেরণে পাকিস্তানে অন্তর্বর্তীকালীন অসামরিক সরকার গঠন সম্পর্কে রাজনৈতিক মহলে আশাবাদ।

১৮ তাঁর মূল দাবী না মেনে একটি ধাপ্পা দেওয়ার প্রচেষ্টা বলে সামরিক সরকার-কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিশন শেখ মুজিব-কর্তৃক প্রত্যাখ্যান। তদন্তের জন্য মুজিব-কর্তৃক পৃথক কমিশন নিয়োগ।

বাংলাদেশের মানুষকে যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে বলে এক ছাত্র সমাবেশে ভাষণ-দানকালে মুজিবের ঘোষণা।

ইয়াহিয়ার সঙ্গে আলোচনার পর ওয়ালী খান-কর্তৃক মুজিবের সঙ্গে বৈঠক।

১৯ ইয়াহিয়ার সঙ্গে মুজিবের সকালে ৯০ মিনিট ধরে আলোচনা।

একই সময়ে ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে নিরস্ত্র গ্রামবাসীর উপর সেনা-বাহিনীর গুলীবর্ষণ। অন্যূন ২০ জন নিহত।

গুলীবর্ষণের সংবাদে মুজিবের ক্ষোভ। তিনি সকালের বৈঠক শেষে নির্ধারিত আগামী কালের বৈঠকে ইয়াহিয়ার সঙ্গে মিলিত নাও হ'তে পারেন বলে মুজিবের উক্তি।

ঢাকায় সান্ধ্য আইন জারী। সেনাবাহিনীর সঙ্গে জনতার সংঘর্ষে প্রচুর হতাহত।

অবাঙালী উদ্বাস্তুদের দল আঞ্জুমানে মোহাজারিনের সভাপতি-কর্তৃক স্থানীয় অবাঙালীদের জান মাল রক্ষার জন্যে শেখ মুজিবকে অভিনন্দন।

করাচীতে ভুট্টো-কর্তৃক পশ্চিম পাকিস্তান ব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার হুমকি। তাঁর কিছু প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পেলে তিনি প্রেসিডেন্টের আহ্বানে ঢাকা যেতে পারবেন না বলে তথ্য প্রকাশ।

২০ ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট ধরে মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনা। প্রথমবারের মতো উভয় পক্ষের উপদেষ্টাগণের উপস্থিতি। আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে বলে মুজিবের তথ্য প্রকাশ।

সন্তোষজনক উত্তর পেয়েছেন বলে ভুট্টোর ঢাকা যেতে স্বীকৃতি।

২১ ইয়াহিয়ার সঙ্গে মুজিবের ৭০ মিনিটের অনির্ধারিত বৈঠক।

সদলবলে ভুট্টোর ঢাকা আগমন। সর্বত্র তাঁর বিরুদ্ধে চরম বিক্ষোভ প্রদর্শন। সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে বলে ইয়াহিয়ার সঙ্গে দু' ঘণ্টা বৈঠকের পর ভুট্টোর মন্তব্য।

২২ ৭৫ মিনিট ধরে মুজিব, ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার মধ্যে বৈঠক। আওয়ামী লীগের সঙ্গে শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে মতৈক্যে উপনীত হবার সুযোগ দানের জন্যে প্রেসিডেন্ট-কর্তৃক পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা।

পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতাদের নিজেদের মধ্যে বৈঠক।

বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে 'বাংলার স্বাধিকার' শীর্ষক ক্রোড়পত্র প্রকাশ।

২৩ বাংলাদেশে পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপন।

পল্টন ময়দানে ছাত্র লীগের প্রতিরক্ষা বাহিনীর কুচকাওয়াজ। আনুষ্ঠানিকভাবে 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানের পর বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন। স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ-কর্তৃক অভিবাদন গ্রহণ। অন্যান্য ছাত্র প্রতিষ্ঠান-কর্তৃক গণবাহিনীর কুচকাওয়াজ, সভা ও শোভাযাত্রা।

শেখ মুজিবের বাসার সামনে ছাত্র লীগ বাহিনীর অভিবাদন গ্রহণকালে মুজিবের ঘোষণা—মূল সমস্যাবলীর প্রশ্নে কোন আপোষ নেই।

চীনা দূতাবাসভবন শীর্ষ থেকে ছাত্রবৃন্দ-কর্তৃক পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন। প্রায় সব দূতাবাসে বাংলাদেশের

পতাকা উত্তোলন। তবে চীন ছাড়া অন্য কোন দূতাবাসে পাকিস্তানের পতাকা দেখা যায় নি।

ইয়াহিয়া-কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত বেতার ভাষণ বাতিল। শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা দূর করার জন্যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এক সঙ্গে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে বলে এক বাণীতে ইয়াহিয়ার উক্তি।

মুজিবের কতিপয় দাবীর প্রশ্নে তাঁদের মতৈক্য হয়েছে বলে ভুট্টোর উক্তি।

আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের দু' দফা বৈঠক।

২৪ আওয়ামী লীগ নেতাদের ও প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠক।

আগামীকাল এক বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট একটি মতৈক্যের কথা ঘোষণা করবেন বলে রাজনৈতিক মহলে আশা।

ভুট্টোর দলের বেশীর ভাগ সদস্য ও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতাদের ঢাকা ত্যাগ। তিনি ঢাকাতে আরো ২।১ দিন থাকবেন বলে ভুট্টোর অভিমত প্রকাশ।

২৫ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সামরিক বাহিনীর গুলীতে কমপক্ষে ১১০ জনের নিহত হওয়ার সংবাদ। চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র খালাস করতে বাধা প্রদানকারী জনতার উপর সেনাবাহিনীর গুলীবর্ষণ। প্রচুর হতাহত। প্রতিবাদে শেখ মুজিব-কর্তৃক ২৭-এ মার্চ হরতাল আহ্বান।

মধ্যরাত্রে বাংলাদেশের ঘুমন্ত নরনারীর উপর ইয়াহিয়া বাহিনীর বর্বর হামলা ও নির্বিচার গণহত্যা শুরু।

আগেই ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর গোপনে ঢাকা ত্যাগ।

স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র

মুজিবনগর, বাংলাদেশ

১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১

যেহেতু ১৯৭০ সনের ৭ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭১ সনের ১৭ জানুয়ারী পর্যন্ত একটি শাসনতন্ত্র রচনার অভিপ্রায়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্যে বাংলাদেশে অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল

এবং

যেহেতু এই নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে ১৬৭ জনই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত করেছিলেন

এবং

যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি শাসনতন্ত্র রচনার জন্যে ১৯৭১ সনের ৩রা মার্চ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিবেশন আহ্বান করেন

এবং

যেহেতু আহূত এ পরিষদ স্বেচ্ছাচার ও বেআইনীভাবে অনির্দিষ্ট-কালের জন্যে স্থগিত ঘোষণা করা হয়

এবং

যেহেতু পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্তে বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চলাকালে একটি অন্যায় ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধ ঘোষণা করে

এবং

যেহেতু উল্লিখিত বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের জন্যে উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯৭১ সনের ২৬-এ মার্চ ঢাকায়

যথাযথভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান

এবং

যেহেতু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী একটি বর্বর ও নৃশংস যুদ্ধ পরিচালনা কালে বাংলাদেশের অসামরিক ও নিরস্ত্র জনসাধারণের বিরুদ্ধে অগুণতি গণহত্যা ও নজীরবিহীন নির্যাতন চালিয়েছে এবং এখনো চালাচ্ছে

এবং

যেহেতু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও নানাবিধ নৃশংস অত্যাচার চালিয়ে বাংলাদেশের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের একত্র হয়ে একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে ও নিজেদের সরকার গঠন করতে সুযোগ করে দিয়েছে

এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ তাঁদের বীরত্ব, সাহসিকতা ও বিপ্লবী কার্যক্রমের দ্বারা বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডের উপর তাঁদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন

সেহেতু

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পক্ষে যে রায় দিয়েছেন, সে মোতাবেক আমরা, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আমাদের সমবায়ে গণপরিষদ গঠন করে পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জন্যে সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বিবেচনা করে আমরা বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি এবং এতদ্দ্বারা পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা অনুমোদন করছি

এবং

এতদ্দ্বারা আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপ্রধান ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং

রাষ্ট্রপ্রধান প্রজাতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনী সমূহের সর্বাধিনায়ক হবেন,

রাষ্ট্রপ্রধানই ক্ষমা প্রদর্শন সহ সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার অধিকারী হবেন,

তিনি একজন প্রধান মন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য নিয়োগ করতে পারবেন,

রাষ্ট্রপ্রধানের কর ধার্য ও অর্থব্যয়ের এবং গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান ও মুলতুবীর ক্ষমতা থাকবে এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্যে আইনানুগ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে অন্যান্য সকল ক্ষমতারও তিনি অধিকারী হবেন।

বাংলাদেশের জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি, যে-কোন কারণে যদি রাষ্ট্রপ্রধান না থাকেন অথবা কাজে যোগদান করতে না পারেন অথবা তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে যদি অক্ষম হন, তবে রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা ও দায়িত্ব উপ-রাষ্ট্রপ্রধান পালন করবেন।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, বিশ্বের একটি জাতি হিসেবে এবং জাতিসংঘের সনদ মোতাবেক আমাদের উপর যে-দায়িত্ব ও কর্তব্য আরোপিত হয়েছে তা আমরা যথাযথভাবে পালন করব।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি যে, আমাদের স্বাধীনতার এ ঘোষণা ১৯৭১ সনের ২৬-এ মার্চ থেকে কার্যকরী বলে গণ্য হবে।

আমরা আরও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্যে আমরা অধ্যাপক ইউসুফ আলীকে ক্ষমতা দিলাম

এবং রাষ্ট্রপ্রধান ও উপরাষ্ট্রপ্রধানের শপথ-গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করলাম।

লেখক-পরিচিতি

রণেশ দাশগুপ্ত

বামপন্থী রাজনীতির প্রথম সারির প্রবক্তা। পাকিস্তান সৃষ্টির পরও দীর্ঘকাল কারা নির্যাতন ভোগ করেন। বিভিন্ন সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর রচিত 'শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে', 'জিজ্ঞাসা', 'আলো দিয়ে আলো জ্বালা' ও 'উপন্যাসের শিল্পরূপ' প্রগতিশীল সাহিত্যমহলে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। ঢাকার দৈনিক সংবাদের সহকারী সম্পাদক।

জহির রায়হান

যশস্বী সাহিত্যিক ও অগ্রণী চিত্রপরিচালক। 'হাজার বছর ধরে' গ্রন্থের জন্যে সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছেন। পর পর কয়েকটি ভিন্নধর্মী চিত্র নির্মাণ করে বাংলা চিত্রজগতে নতুন নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। গণ-আন্দোলন ভিত্তিক তাঁর সাম্প্রতিক ছবি 'জীবন থেকে নেয়া' উচ্ছসিত প্রশংসা অর্জন করেছে।

ডঃ আনিসুজ্জামান

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাবন্ধিক। অনেকগুলি মূল্যবান সংকলনের সম্পাদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় ও শিক্ষকতা জীবনে বিভিন্ন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ 'মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য' দেশে বিদেশে সমাদর লাভ করেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার।

শওকত ওসমান

বরেণ্য কথাশিল্পী। বিভিন্ন সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত। তাঁর লেখা অনেক উপন্যাস, ছোটগল্প ও নাটকের মধ্যে 'ক্রীতদাসের হাসি', 'জননী',

'চৌরসন্ধী', 'উভশৃঙ্গ', 'সমাগম', 'নেত্রপত্র' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ঢাকা কলেজের বাংলার প্রধান অধ্যাপক।

রামেন্দু মজুমদার

বিশিষ্ট অভিনেতা, প্রযোজক ও নাট্যকার। শওকত ওসমানের 'ক্রীতদাসের হাসি' ও বিদ্যাসাগরের 'ভ্রান্তিবিলাস'-এর নাট্যরূপ দান করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। চৌমুহানী কলেজের ইংরেজীর প্রাক্তন অধ্যাপক। ঢাকার সাপ্তাহিক 'এক্সপ্রেস'-এর করাচীস্থ সংবাদদাতা।

বুলবন ওসমান

প্রতিশ্রুতিশীল গল্পকার ও শিশুসাহিত্যিক। কিশোর উপন্যাস 'কানা মামা'র জন্যে সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছেন। 'মনোমুকুর' ও 'প্রত্যালীড়' নামে আরও দু'খানা গল্পের বই প্রকাশিত হয়েছে। ঢাকা চারু ও কারু মহাবিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক।

সন্তোষ গুপ্ত

প্রবীণ সাংবাদিক ও যশস্বী চিত্রশিল্প সমালোচক। তাঁর লেখা 'সংগ্রামী জনচিত্ত ও চিত্রকলা'-শীর্ষক সমালোচনা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। দীর্ঘকাল কারা-নির্যাতন ভোগ করেন। ঢাকার দৈনিক আজাদের সহযোগী সম্পাদক।

মতিলাল পাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কৃতি ছাত্র। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির উপর গবেষণা শেষ করে থীসিস লেখায় ব্যাপৃত। পাকিস্তান ইন্সটিট্যুট অব ডেভলপমেন্ট ইকনমিক্সের সঙ্গে সংযুক্ত অর্থনীতিবিদ্।

সত্যেন সেন

প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মী ও বরেণ্য সাহিত্যিক। স্বাধীনতালাভের পূর্বে ও পরে বিভিন্ন সময়ে মোট ২০ বছর কারাজীবন যাপন করেন। বেশীর ভাগ

লেখাই সে সময়কার রচনা। এ পর্যন্ত প্রকাশিত তাঁর ২৫ খানা গ্রন্থের মধ্যে 'মহাবিদ্রোহের কাহিনী', 'গ্রাম বাংলার পথে পথে', 'আলবেরুনী' 'পুরুষমেধ', 'অভিশপ্ত নগরী' 'পাপের সন্তান' 'সেয়ানা', 'উত্তরণ' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

অনুপম সেন

বিশিষ্ট সমাজতত্ত্ববিদ্। প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপনা করছেন।

আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

প্রতিভাবান সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও গীতিকার। বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁর লেখা কলাম অজস্র পাঠকের প্রশংসা অর্জন করেছে। 'সম্রাটের ছবি', 'কৃষ্ণপক্ষ' ও 'নাম না জানা ভোর' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। সাহিত্যে বাংলা একাডেমী ও ইউনেস্কো পুরস্কার পেয়েছেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতৃস্থানীয় কর্মী। 'ইত্তেফাক' ও 'আজাদ'-এর প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক। দৈনিক পূর্বদেশের সহকারী সম্পাদক হিসেবে কাজ করছেন।

আহমদ ছফা

প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ লেখক। প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর 'সূর্য তুমি সাথী', 'নিহত নক্ষত্র' ও বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত 'জাগ্রত বাংলাদেশ' শক্তিশালী লেখনীর নিদর্শন।

আসাদ চৌধুরী

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য তরুণ কবি ও প্রাবন্ধিকদের তিনি অন্যতম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ভাষায় মাস্টার ডিগ্রী গ্রহণের পর তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজে বাংলা ভাষার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ ছড়া এবং ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রেও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

আবদুল হাফিজ

গবেষক ও প্রাবন্ধিক। লোক-ঐতিহ্য সম্পর্কে গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। 'লোককাহিনীর দিগ-দিগন্ত' ও 'লোকসংস্কারের বিচিত্র কথা' উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গ্রন্থ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রিসার্চ ফেলো।

সৈয়দ আলী আহ্‌সান

আধুনিক কবি, সমালোচক ও মধ্যযুগের বাংলা ও হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের সার্থক গবেষক। প্রকাশিত কবিতার বই: 'অনেক আকাশ', 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত', 'সহসা সচকিত' ও 'উচ্চারণ'। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা', 'পদ্মাবতী', 'কবি মধুসূদন', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' ইত্যাদি। সোফোক্লিসের 'ইডিপাস' বিশিষ্ট অনুবাদ কর্ম। বাংলা একাডেমির প্রাক্তন পরিচালক। টোকিওতে ইউনেস্কোরও উপদেষ্টা ছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ।

জাফর সাদেক

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও অনুবাদক। একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। সাম্প্রতিক জার্মান গল্পের একটি অনুবাদ সংকলন উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা। প্রগতিশীল সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক। লেখক হিসেবে তিনি উপরি-উক্ত নাম ব্যবহার করছেন।

ফেরদৌসী মজুমদার

ঢাকা টেলিভিশানের যশস্বী অভিনেত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা ও আরবীতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেছেন। ঢাকার অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন।